বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

“কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।”

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫২ সংখ্যা | বৈশাখ ১৩০১—মে ১৮৯৪। | ৫ম কল্প ৩য় ভাগ

সংক্ষিপ্ত পঞ্জিকা।

১৩০১ সাল।

ইং ১৮৯৪-৯৫।

সংবৎ ১৯৫১-৫২, শক ১৮১৬,

ব্রাহ্মাব্দ ৬৫-৬৬।

*বৈ	*জৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শু	সো	বৃ	সো	বৃ	র
৩১	৩১	৩২	৩১	৩১	৩০
*এ	মে	জুন	জু	আ	সে
র	ম	শু	র	বৃ	শ
৩০	৩১	৩০	৩১	৩১	৩০

কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
বৃ	শু	শ	সো	ম	বৃ
৩০	২৯	৩০	২৯	৩০	৩০
অ	ন	ডি	জা	ফে	মা
সো	বৃ	শ	ম	শু	শু
৩১	৩০	৩১	৩১	২৮	৩১

‡শু	‡সো	বৃ	সো	বৃ	র	১†	৮	১৫	২২	২৯	বু	শু	শ	সো	ম	বৃ
শ	ম	শু	ম	শু	সো	২†	৯	১৬	২৩	৩০	বৃ	শ	র	ম	বু	শু
র	বু	শ	বু	শ	ম	৩	১০	১৭	২৪	৩১	শু	র	সো	বু	বৃ	শ
সো	বৃ	র	বৃ	র	বু	৪	১১	১৮	২৫	৩২	শ	সো	ম	বৃ	শু	র
ম	শু	সো	শু	সো	বৃ	৫	১২	১৯	২৬		র	ম	বু	শু	শ	সো
বু	শ	ম	শ	ম	শু	৬	১৩	২০	২৭		সো	বু	বৃ	শ	র	
বৃ	র	বু	র	বু	শ	৭	১৪	২১	২৮		ম	বৃ	শু	ম	সো	বু

	বৈ	জ্যৈ	আ	শ্রা	ভা	আ
শুঃএঃ	৪	২	১	২৮	২৬	২৫
পূঃ	৭	৬	৪	২-৩১	৩০	২৯
কৃঃএঃ	১৯	১৮	১৬	১৭	১২	১০
অঃ	২৩	২১	১৯	১৬	১৫	১৫

শুঃএঃ—শুক্লা একাদশী, পূঃ—পূর্ণিমা।

	কা	অ	পৌ	মা	ফা	চৈ
শুঃএঃ	২৪	২৩	২৪	২৪	২৪	
পূঃ	২৭	২৯	২৭	২৭	২৭	৩১
কৃঃএঃ	৯	৮	৮	৮	৯	৯
অঃ	১২	১১	১২	১২	১৩	

*বৈ—বৈশাখ শুক্রবারে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। জ্যৈ—জ্যৈষ্ঠ সোমবারে আরম্ভ, ৩১ দিনে মাস। এ—এপ্রেল রবিবারে আরম্ভ ৩০ দিনে মাস ইত্যাদি। †১লা বৈ শুক্র, ২রা বৈ শনি, ইত্যাদি, ১লা জ্যৈষ্ঠ সোম, ২রা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গল, ইত্যাদি। ‡বৈ শুক্র ১, ৮, ১৫, ২২, ২৯

∴ ৪ঠা বৈশাখ সোমবার ও ...মী. ৭ই বৈশাখ বৃহস্পতিবার

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বাঙ্গালী কমিসনর—সিবিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত বর্দ্ধমান বিভাগের কমিসনর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। কয়েক বৎসর হইতে জেলার ট ও জজের পদ প্রাপ্ত হইতে-ন, কিন্তু বিভাগীয় কমিসনর পদ াইবার এই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টান্ত। মহারাণী ও রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিনের জয় হউক।

অন্ধের জন্য সংবাদ পত্র—ংলণ্ডে এখন এত অন্ধলোক শিক্ষিত য়াছে, যে তাহাদের জন্য সংবাদ ত্রর প্রয়োজন হইয়াছে। ১৮৮২ :ের জুন মাস হইতে "Weekly ımmary নামে ৩ পেনী দামের এক-নি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হইতেছে। র অক্ষর সকল উঁচু উঁচু, ইহাতে হের আবশ্যক সংবাদ সকল থাকে। বোবারা শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের ও ক্রমে উপায় হইবে সন্দেহ ।

ইউরোপ প্রবাসী বাঙ্গালী— এক তালিকা দিয়াছেন, তাহাতে া যায় প্রায় ৫০টী বাঙ্গালী হিন্দু ন বিলাতে আইন, ডাক্তারী, বা ন্য বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন। ইহাঁ-ধ্যে ১ জন ইটালীতে চিত্রবিদ্যা

ফ্রান্সে স্ত্রীশিক্ষা—ফ্রান্সে গ্র কর্ত্রীর সংখ্যা ২১৩৩, ইহাঁরা গত বৎস ১২১১খানি গ্রন্থ প্রচার করিয়াছেন। ইহ দের মধ্যে ২১৭ জন শিক্ষয়িত্রীর কা করেন।

ইনকম্ ট্যাক্স—বঙ্গদেশ হইতে গত বৎসর ৪৩ লক্ষ টাকা আয়কর আদায় হইয়াছে। ভারতগবর্ণমেণ্ট ইহার অর্দ্ধভাগ লইয়াছেন।

চিনভাষী—পৃথিবীর চারিকোটী লোক চিন ভাষায় কাথাবার্ত্তা কয়। আর কোন ভাষা এত লোকের ব্যবহারে আসে না।

স্ত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি—বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীতে পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীসংখ্যা যেরূপ বাড়িতেছে, তদনুসারে এক জর্ম্মণ পণ্ডিত গণনা করিয়া দেখিয়াছেন ৩০০০ বৎসর পরে এক একটী পুরুষের স্থলে ২২০টী করিয়া স্ত্রীলোক হইবে। ইহার জন্য দুর্ভাবনা বৃথা, মানবের অপেক্ষা সৃষ্টির জন্য সৃষ্টিকর্ত্তার চিন্তা কি অধিক নয়?

বিবি বেজাণ্ট—গত নবেম্বর হইতে মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত ভারতের নানা-স্থানে ভ্রমণ করিয়া ১২০টীর অধিক বক্তৃতা করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ বাগ্মি-তায় শ্রোতৃবর্গ সর্ব্বত্র মোহিত হইয়াছেন।

স্ত্রীডাক্তার—শ্রীমতী গাদম্বিনী

শিক্ষা সমাপন করিয়া এল, আর, সি,পি, এল,আর,সি,এস প্রভৃতি উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন, তিনি ছোটলাটের আদেশে ইডেন হাঁসপাতালে বাহিরের রোগী সকলকে দেখিবার ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

বিবি টেলার—তিব্বত ভ্রমণ-কারিণী বিবি টেলার ১২ জন সঙ্গীর সহিত কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, পরে দার্জ্জিলিংএ গিয়াছেন।

নব-বর্ষ।

ত্রয়োদশ শতাব্দীরে করিয়া বিদায়,
চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শুভ সমাগম;
একদিকে মৃত যুগ করে হায় হায়,
নবযুগ আর দিকে খেলে নবোদ্যম।

যা গিয়াছে কালগর্ভে ফিরিবে কি আর!
শূন্য জননীর কোল পূর্ণ কে করিবে?
আঁধারে স্মৃতির বক্ষে বহে অশ্রুধার,
অবিরত--অফুরন্ত, বল কে মুছিবে?

হা রামমোহন কোথা নব বঙ্গরবি,
জগন্নাথ, রাধাকান্ত, মদনমোহন,
কোথায় রামগোপাল, কোথা গুপ্তকবি,
কোথায় দ্বারকানাথ, শ্রীমধুসূদন!

দিগম্বর, দীনবন্ধু, অক্ষয়কুমার,
হরিশ, গিরিশ, প্যারী, কোথা কৃষ্ণদাস,
কোথায় ঈশ্বরচন্দ্র সর্ব্ব গুণাধার,
কোথায় কেশব ধর্ম্ম-জ্যোতির উচ্ছ্বাস!

কোথায় রাজেন্দ্র, শিবচন্দ্র, প্যারীচাঁদ,
রামনারায়ণ, বিদ্যাভূষণ কোথায়,
বঙ্কিম বঙ্গের পূর্ণ সাহিত্যের চাঁদ,
ধর ধর সবে লয়ে অই অস্ত যায়!!
যুগোৎপাটনে ঢাকে আঁধারের ছায়,
প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ড বুঝি পুনঃ লয় পায়!!!

অতীতের শবস্কন্ধে যুগ পুরাতন,
অনন্ত আঁধারে মিশি বিলাপ আপনি,
নবযুগ নব বার্ত্তা করিয়া বহন,
শুনাও জগতে আশা-আনন্দের ধ্বনি।

এ বিশ্ব-বিধাতা যিনি, নিত্য লীলাময়,
মহিমা কণিকা তাঁর অতীতে প্রকাশ,
দেখ নাই যাহা তাহা দেখিবে নিশ্চয়,
অনন্ত ভবিষ্যে রাখ অটল বিশ্বাস।
মহাদাতা—মুক্তহস্তে জ্যোতি প্রাণ জ্ঞান
প্রেম পুণ্য সুখ শান্তি কতই বিলায়,
মহৎ-জীবন, তাঁরি করুণার দান,
মঙ্গল সংকল্প নিজ সাধিতে ধরায়।

শিব শুক নারদ বাল্মীকি বেদব্যাস,
বুদ্ধ ঈশা মহম্মদ চৈতন্য শঙ্কর,
হোমার বার্জ্জিল সেক্সপীর কালিদাস,
ভীষ্ম দ্রোণ কর্ণ পার্থ বীর সেকন্দর।
গৌতম কণাদ প্লেটো সোক্রাৎ কমত,
সীতা সতী সাবিত্রী মৈত্রেয়ী লীলা খনা,
কবি বাগ্মী ধর্ম্মবীর কর্ম্মবীর কত,
কত বীরাঙ্গনা তার কে করে গণনা?
নিঃশ্বাসে প্রকাশ যাঁর নিশ্বাসে বিলয়,
কে করিবে তাঁর জ্ঞান শকতির সীমা?

যা গিয়াছে পুনঃ তাহা হইবে উদয়
নববভাবে, প্রচারিতে তাঁহার মহিমা।

এস এস নবযুগ নববর্ষ সাথ
বিশ্বাস, আনন্দ, আশা জ্যোতি পরকাশ,
তব সঙ্গে বিশ্বদেবে করি প্রণিপাত,
জীবনের ব্রত পালি পূর্ণ করি আশ।

জননীর শূন্য কোল পূর্ণ হোক্ পুনঃ,
জননীর অশ্রুজল হউক মোচন,
প্রাণভরি গাই সবে বিধাতার গুণ,
নবভাবে তাঁর লীলা করিয়া দর্শন।
ত্রয়োদশ জন্মদাতা যাও আশীষিয়া,
চতুর্দ্দশে পুণ্যলোকে যাইব চলিয়া।

পরলোকগত বঙ্কিমচন্দ্র।

গত ২৬এ চৈত্র বঙ্গ সাহিত্য আকাশের উজ্জ্বল চন্দ্র বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অস্তমিত হইয়াছেন। তাঁহার বিয়োগে সমগ্র বঙ্গসমাজে হাহাকার ধ্বনি উঠিয়াছে। ইহা হইবারই কথা। তিনি একজন অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন লেখক ছিলেন। তিনি বঙ্গীয় উপন্যাসের সৃষ্টিকর্ত্তা, একথা বলিলেই যথেষ্ট হইল না; তিনি একজন সিদ্ধহস্ত লেখক—বিজ্ঞান, কবিতা, ইতিহাস, ধর্ম্মনীতি, সমালোচনা, যাহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় দিয়া পাঠকসমাজের চিত্ত আকৃষ্ট ও মোহিত করিয়াছেন। বঙ্গদর্শন তাঁহার প্রতিভার অক্ষয়কীর্ত্তি। তিনি রাজসেবায় অধিকাংশ জীবন ক্ষেপণ করিয়াও বঙ্গসাহিত্যের যেরূপ শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার সমধিক প্রশংসা।

সাহিত্য সেবায় সমস্ত জীবন উৎসর্গ করেন নাই বলিয়া তিনি নিজে দুঃখ করিয়া গিয়াছেন, ইহা করিতে পারিলে তাঁহা দ্বারা বঙ্গ সাহিত্য যে আরও লাভবান্ হইত, সন্দেহ নাই। বঙ্গদর্শন প্রকাশ করিয়া তিনি একটী নূতন আলোক প্রাপ্ত হন এবং সেই সময় হইতে তাঁহার জীবন ও কার্য্যের শুভপরিবর্ত্তনও লক্ষিত হয়। ধর্ম্মই যে মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য এবং ধর্ম্মচর্চ্চাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর চিন্তার বিষয়, শিক্ষিত সমাজে তিনি এই মহাসত্যের সাক্ষ্যদান করিয়া গিয়াছেন। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ইহলোকে তাঁহাকে যেরূপ কীর্ত্তিমান্ ও যশস্বী করিয়াছেন, পরলোকে তাঁহার আত্মার পরম শান্তি বিধান করুন্।

বঙ্কিমচন্দ্র জেলা ২৪ পরগণার অন্তঃপাতী কাঁটাল পাড়ার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী কালেক্টর বাবু যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের তৃতীয় পুত্র। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ও মধ্যমাগ্রজ বাবু শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র তাহার পূর্ব্বে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। তাঁহার কনিষ্ঠ পূর্ণচন্দ্র তাঁহার মৃত্যুশয্যায় উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র সন্তান

নাই, বিধবা পত্নী ও সন্তানের মধ্যে দুইটী কন্যা মাত্র আছেন। ৫৭ বৎসর বয়সে বহুমূত্র রোগে তিনি কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

বঙ্কিম বাবু হুগলী কলেজে শিক্ষা লাভ করিয়া সিনিয়ার ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত এবং তৎকালীন ছাত্রদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠ হন। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন অধ্যয়ন করেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাবু যদুনাথ বসুর সহিত প্রথম বিএ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পিতার ন্যায় তাঁহারা চারি সহোদরই ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট পদ ভূষিত করেন, কিন্তু তাঁহার মত উন্নতি ও রাজসম্মান লাভে কেহই সমর্থ হন নাই। তিনি রায় বাহাদুর ও সি,আই,ই উপাধি প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যানুরাগী এবং সাহিত্য-সংসারে পরিচিত। জীবনের শেষাংশ সাহিত্যসেবাতেই পরিসমাপ্ত করিয়াছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিয়োগে শিক্ষিত পুরুষ সমাজত আক্ষেপ করিবেনই, বঙ্গ মহিলার চিত্ত কিরূপ ব্যথিত ও আলোড়িত হইয়াছে, নিম্নলিখিত শোকসন্তপ্ত হৃদয়ের শ্বাস তাহার পরিচায়ক।

শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়।

"———কত দিনে পুনরায়,
ফলিবে এমন রত্ন?—ফলিবে কি আর?"

ওমা! অভাগিনী মাতৃভূমি! আজ মা, তোর একি সর্ব্বনাশের কথা শুনিলাম? তোর নাকি মণিরত্ন খসিয়া পড়িয়াছে, তোর নাকি শেষ যথা সর্ব্বস্ব ফুরাইয়াছে, তোর নাকি স্বর্গীয় আভরণ চুরি গিয়াছে—তোর হৃদয়াকাশের পূর্ণ চন্দ্র, তোর অহঙ্কার স্বরূপ 'বঙ্কিমচন্দ্র' নাকি তোর কোল শূন্য করিয়া গিয়াছে!! আহা! সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই মাতৃ-বক্ষের উজ্জ্বল রত্ন. বঙ্গ-সাহিত্যের নবজীবনদাতা, বঙ্গবাসীর নবজীবন-পথের-নেতা, রাজার বিশ্বস্ত, গৌরবান্বিত কর্ম্মচারী—আহা! সেই বঙ্কিমচন্দ্র, সেই একে "এক সহস্র" বঙ্গাকাশের ধ্রুব নক্ষত্র, যাহাকে পাইয়া বঙ্গবাসী অহঙ্কৃত হইয়াছিল, বঙ্গজননী গৌরবান্বিতা হইয়াছিল, ভারতভূমির বক্ষ আঁধার করিয়া চলিয়া গিয়াছে! আজ আর কাঁদিবার ভাষা নাই! বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমাদের জন্মভূমির যে কত সর্ব্বনাশ হইল, সে সব কথা বলিবার—সে সকল গুলি কথা বলিয়া প্রকাশ করিবার সাধ্য নাই! বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রের আজি সর্ব্বনাশ হইল, আর সেখানে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, বিষবৃক্ষ, কমলাকান্ত, আনন্দ মঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম প্রভৃতি অপূর্ব্ব গ্রন্থ সকল জন্মিবে না! বাঙ্গালার দর্শন শাস্ত্রের আজি সর্ব্বনাশ হইল, যে মাথায় "বঙ্গদর্শন" পত্র জাগিয়াছিল, আজি সে মাথা লইয়া কেহ কবির ভাষায় দর্শন শাস্ত্র বুঝাইতে বসিবে না! আজি বাঙ্গালার সামাজিক জীবনেরও সর্ব্বনাশ হইল, আজি বুকভরা প্রীতির উচ্ছ্বাসে কেহ জাতীয় জীবনের কর্ত্তব্য, স্বদেশের

কল্যাণানুষ্ঠান, মানবজীবনের সার্থকতা করিবার জন্য সর্ব্বসাধারণকে উত্তেজিত করিবে না! আজি বাঙ্গালার ধর্ম্মজগতেরও দারুণ ক্ষতি হইল, আর বঙ্কিমচন্দ্র সত্য ধর্ম্ম উদ্ধারের জন্য ধর্ম্মতত্ত্বের অমৃতময়ী ব্যাখ্যা, কৃষ্ণচরিত্রের অমৃতময়ী ব্যাখ্যা, ভগবদ্গীতার অমৃতময়ী ব্যাখ্যা, প্রচার করিবে না! তাই বলিতেছি বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমাদের যে কত সর্ব্বনাশ হইল, সে কথা বলিবার ভাষা মিলে না। গোপাল বাবুর মত মানুষ মরিলে তাহারই স্ত্রীর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়া যায়, তাহারই সন্তান ও পোষ্যবর্গ শোকাকুল হইয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বঙ্কিমচন্দ্রের সহধর্ম্মিণীর সিঁথির সিঁদুর মুছিয়াছে বলিয়া, আমাদের বঙ্কিম চন্দ্রের কন্যাগণ পিতৃহীনা হইয়াছে বলিয়া আজি আমরা সকলেই বহিয়া গিয়াছি! আমাদের মা'র—আমাদের চিরদুঃখিনী বঙ্গ জননীর সৌভাগ্যের শেষ চিহ্ন মুছিয়া গিয়াছে! মা আজি তাহার নয়নতারা, আদরের ধন বঙ্কিমচন্দ্রকে হারাইয়াছে!

আজি বঙ্গভূমির বক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র নাই!—এ যে শত বজ্রাঘাতের অপেক্ষা নিদারুণ শব্দ, বাঙ্গালায় আজি বঙ্কিমচন্দ্র নাই!! আর মায়ের কোল আলো করিয়া "বঙ্কিমচন্দ্র" হাসিবে না! আর শত প্রাণ দিয়া মায়ের সকল অভাব পূর্ণ করিতে চাহিবে না! আর একমাত্র পুত্রের গৌরবে মা শত পুত্রবতীর অধিক সুখ-সৌভাগ্য লাভ করিবে না! আর বঙ্কিম শ্যামসুন্দরের বাঁশির গীতির মত, মধুর, বাসন্ত কোকিলের কাকলীর মত, দিগন্তপ্লাবী, নারদের বীণাঝঙ্কারের মত পবিত্র মাতৃগাথা মাতৃ-স্তোত্র শুনাইবে না! আর দিগ্‌দিগন্তে অমৃতস্রোত ছুটাইয়া "বন্দে মাতরম্" গীত প্রবাহিত হইবে না! আর মাতৃভক্তির উচ্ছ্বাসে "বাহুতে মা তুমি শক্তি, হৃদয়ে মা তুমি ভক্তি" গাহিয়া পরের প্রাণে মাতৃভক্তি জাগাইয়া দিবে না! আর সর্ব্বস্ব পণ করিয়া মাতৃপূজা করিতে কেহ শিক্ষা দিবে না!—তাই বলিতেছি ওমা! জন্মভূমি! ওমা! বঙ্কিমচন্দ্রের "সুজলা, সুফলা, মলয়জ শীতলা" শ্যামাসুন্দরি! যে মুহূর্ত্তে তোর বঙ্কিমচন্দ্র জন্মের মত তোর নিকট হইতে বিদায় লইয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে তোর শেষ সৌভাগ্যরেখা মুছিয়া গিয়াছে! বঙ্গসাহিত্যের সঙ্গে আমরা বঙ্গবাসীও অতলসাগরে ডুবিয়াছি—আজি মায়ের কোল খালি করিয়া আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র চলিয়া গিয়াছেন। আজ আর আমাদের সে বঙ্কিমচন্দ্র নাই!

বঙ্কিমচন্দ্রের অভাবে আমরা বহিয়া গিয়াছি!—এ সংসারে তোমার আমার মত প্রাণী কত আসে, কত যায়; কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাত্মার অভাবেই স্বদেশবাসী বহিয়া গিয়া থাকে। কেন বহিয়া গিয়া থাকে, সে কথা কিছু বলিতেছি। তুমি আমি জগতে আসি, খাই দাই, ঘুরিয়া বেড়াই, দিন ফুরাইলে চলিয়া

যাই, ইহার অধিক আর কিছু করি না। কাজে কাজে তোমার আমার মত জীবাণুর জীবন মরণে প্রকৃত পক্ষে সংসারের লাভ ক্ষতি বিশেষ কিছুই হয় না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মত মহাত্মাদিগের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহারা জগতে আইসেন অপূর্ণ জগৎকে পূর্ণতার দিকে লইয়া যাইবার জন্য, জগতের কাজ করিবার জন্য, ভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম্মগ্রন্থ ও প্রবন্ধগুলি পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন "শরীর মন ও আত্মার সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণতা" ইহাই বঙ্কিমচন্দ্র "মানবজীবনের উদ্দেশ্য" বলিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বাস কর্ত্তৃক পরিচালিত। যাহাহউক, সে সম্পূর্ণতা লাভের জন্য তিনি দৈবের বা অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিতে বলেন নাই, শরীর মন ও হৃদয়ের শক্তি অনুশীলন, পরিস্ফুট ও চরিতার্থ করিতে পারিলেই বঙ্কিম বাবুর মতে মানবের সম্পূর্ণতা লাভ হইতে পারে। এই শেষোক্ত মত যে সর্ব্ববাদি-সম্মত নহে তাহা আমরা জানি, আমাদের মতামতের বিচারের দিন আজি নহে—আমরা এই মাত্র বলি যে আজিকার দিনে, বঙ্গদেশে, বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন বাস্তবিকই অনেক অংশে সম্পূর্ণ। বঙ্কিম বাবু কবি—পদ্যে নহে, বঙ্গভাষায় গদ্য কাব্য বঙ্কিমচন্দ্রেরই সৃষ্টি। বঙ্গভাষায় গদ্য কাব্যকার বঙ্কিমচন্দ্র অদ্যাপি অদ্বিতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাব, ভাষা, বিষয়-নির্ব্বাচন, সবই বাঙ্গালা সাহিত্যে অতুলনীয়। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের "সমালোচনা" পড়িয়াছেন, তাঁহারা জানেন ভাব গ্রহণ করিতে, পরের প্রাণের কথা বুঝিতে, বঙ্কিমচন্দ্রের কি অসাধারণ ক্ষমতা! বঙ্কিমচন্দ্র যেমন ভাবুকতায় সেইরকম ভাব-গ্রাহিতায় বঙ্গবাসীর শীর্ষ-স্থানীয়। যাঁহারা বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত, লোক-রহস্য প্রভৃতি গ্রন্থ পড়িয়াছেন, বিশুদ্ধ রসিকতায় পরের চিত্ত বিনোদন করিতে বঙ্কিমচন্দ্রের অলৌকিক নৈপুণ্যের পরিচয় তাঁহারা অবশ্যই পাইয়াছেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন "আমি রাজনীতিজ্ঞ নহি," কিন্তু কৃষ্ণচরিত্র ও বঙ্গদর্শনের অনেক প্রবন্ধ পড়িলে বুঝিতে পারা যায় বঙ্কিমচন্দ্রের মত রাজনীতিজ্ঞ, বঙ্কিমচন্দ্রের মত দার্শনিক এদেশে অতি অল্প লোকই আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার শেষ পুস্তকগুলিতে তাঁহার ধর্ম্মানুরাগের, তাঁহার ধর্ম্মনীতিজ্ঞতার যে পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে "সার্ব্বভৌমিক গুরু" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্বদেশের ও স্বজাতির হিতার্থে বঙ্কিমচন্দ্র যে অমানুষিক শ্রম করিয়া গিয়াছেন, তাহা বোধ হয় এদেশের অনেকেই জানেন। এতদ্ভিন্ন, অর্থোপার্জ্জন করা মনুষ্যত্বের প্রধান সহায় জানিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অর্থোপার্জ্জন করিতেও কখন বিমুখ হন নাই। রাজকার্য্যের নিপুণতায় রাজদ্বারেও উচ্চগৌরব—রায় বাহাদুর উপাধি লাভ করিয়াছেন; হিংসা ও দ্বেষের জন্য দুই চারিজন অন্য-

রূপ বলিলেও আমাদের দেশের অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন. এদেশে বঙ্কিম চন্দ্র জীবিতকালেই যশস্বী। সেক্ষপীয়ার কবি-যশলাভ করিয়াছেন, জীবনের পরে; মাইকেল মধুসূদন দত্ত কবিযশ-লাভ করিয়াছেন, সেও জীবনের শেষে; কিন্তু এদেশে বঙ্কিমচন্দ্র জীবিতেই তাঁহার মহতী প্রতিভার মহাপূজা পাইয়াছেন! দেবতার মত যশোলাভ করিয়াছেন! তাই বলিতেছি, ধর্ম্ম, জ্ঞান, ধন, যশ, লোকশিক্ষার উপযুক্ত ক্ষমতা, বঙ্কিমচন্দ্র সকলই লাভ করিয়াছেন—সকলেরই সদ্ব্যয় করিয়া গিয়াছেন! এমন সন্তান পাইলে মাতা পিতা কৃতার্থ হন, এমন স্বামী পাইলে ভার্য্যা কৃতার্থা হন, এমন পিতা পাইলে সন্তান কৃতার্থ হন, এমন বন্ধু পাইলে বন্ধু কৃতার্থ হন, এমন লোক দেশে জন্মিলে স্বদেশীয় মানব কৃতার্থ হন, এমন লোক জগতে আসিলে মা বসুমতী কৃতকৃতার্থা হন! এমন জিনিস—এমন দেবদুর্ল্ভ অমূল্য রত্ন আমরা অকালে, সাতান্নবর্ষ বয়সে হারাইলাম, তাই আমরা বহিয়া গিয়াছি! তাই আমাদের এ শোক "অফুরন্ত" হইয়াছে!

বঙ্কিমচন্দ্র সাতান্ন বর্ষ পরমায়ু মাত্র পাইয়াছিলেন। কিন্তু সাতান্নবর্ষ পরমায়ু পাইয়া তিনি বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার এবং বঙ্গবাসীর উন্নতি ও সুখের জন্য যাহা করিয়াছেন, তোমার আমার মত সাধারণ মানব সাত হাজার বৎসর পরমায়ু পাইলে ও তাহা করিতে পারে না অতএব বঙ্কিম চন্দ্রের জন্য দিগদিগন্তভেদী, হাহাকারই করি, বঙ্কিমচন্দ্রের জন্য অনন্ত অভাবই অনুভব করি, বঙ্কিমচন্দ্র—বঙ্গদেশে বঙ্কিম চিরদিনই জীবিত রহিবেন। মা'র "বঙ্কিম" মা'র কোলে অমর, অক্ষয়, হইয়া রহিবেন। বলিয়াছি মা'র বঙ্কিমচন্দ্র একাই এক সহস্র! যে দিকে চাহিব, সেই দিকেই বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইব! মা'র অণু পরমাণুতে মা'র "বঙ্কিমচন্দ্র" তাঁহার জ্যোৎস্না ছড়াইতেছেন।— বঙ্কিমচন্দ্র যাহা করিয়াছেন, তাহাতেই তিনি অমর। ইংরাজী সাহিত্যে সেক্ষপীয়ারের আসন যেখানে, সংস্কৃত সাহিত্যে কালিদাসের আসন যেখানে, বাঙ্গালা সাহিত্যে বঙ্কিম চন্দ্রের আসন সেইখানে। যতদিন বঙ্গসাহিত্য জীবিত রহিবে, ততদিন বঙ্কিম চন্দ্র অজর, অমর, অক্ষয়।—শরীর সম্বন্ধে যাহাই হউক, বঙ্গভূমির স্নেহের কোল হইতে, বঙ্গভাষার সোহাগের আঁচল হইতে, আর বঙ্গবাসীর হৃদয়মন্দির হইতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কাড়িয়া লইতে কোন্ যমের সাধ্য?

আর কি বলিব—যাও দেব! বঙ্কিম চন্দ্র! বঙ্গবাসীর নবজীবনের গুরু! আজ অমরধামে যাইতেছ, যাও। যাও দেব! তোমার শুভজীবনব্রত সম্পূর্ণ করিয়া, আত্মপ্রসাদের হাসি মুখে লইয়া ফিরিয়া যাইতেছ, আমরা কাঁদিয়া বাধা দিব না, আমরা তোমার সুখের পথের কাঁটা হইব না! যাও দেব!

যাও, বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন! বাঙ্গালীর গৌরব! যাও, অমরাবতীতে যাও। যে দেশে তোমার যশের মত সবই শুভ্র, সবই পবিত্র, যাও সেই অমরপুরে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার উপন্যাসাবলীর মত সবই চির নূতন, সবই আনন্দ ও সুখের প্রবাহ, যাও সেই দেব-দেশে যাও। যাও দেব! যে দেশে তোমার ধর্ম্মগ্রন্থাবলীর মত সবই নিরপেক্ষ, সবই অমৃতময়, যাও সেই বৈকুণ্ঠপুরে যাও। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, আজি নিমতলার শ্মশান-ভস্ম মাখিয়া, বঙ্গজননীর এ অধম সন্তানেরা যেন তোমার "শিষ্য" বলিয়া পরিচয় দিতে পারে; যেন তোমার দেব-প্রাণে অনুপ্রাণিত হইতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি তোমার জন্মভূমি জননীকে যে রাজরাজেশ্বরী দেখিতে চাহিয়াছিলে, মা'র এ অধম সন্তানেরা মা'কে যেন সেই রাজরাজেশ্বরী দেখিয়া মরিতে পারে। আশীর্ব্বাদ করিয়া যাও, তুমি যেমন ভগবানের চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া জীবনের কর্ত্তব্য পালন করিয়া গেলে, এ অধম জীবাণুরা যেন সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে পারে। তবে আয় ভাই বঙ্গবাসী! আজ বঙ্গ-ভূষণ বঙ্কিম চন্দ্রের চিতার পাশে দাঁড়াইয়া, একত্রে প্রাণ খুলিয়া ডাক্ ভগিনি, একবার প্রাণ খুলিয়া ডাক্——

"হরে মুরারে মধুকৈটভারে,
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ সৌরে!!"

লেখিকা—
শ্রী মা।

সঙ্গমিত্রা।

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের অনেক স্থানেই ইয়োরোপীয় রমণী প্রচারিকা দৃষ্ট হয়। ইহাঁরা মুক্তিফৌজ নামে অভিহিত। খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার এবং নানা উপায়ে জনসমাজের সেবা করাই ইহাঁদের জীবনের ব্রত। বিলাতের অনেক সম্ভ্রান্ত ও ধনাঢ্য বংশের কন্যাগণ সমুদয় সাংসারিক সুখ সুবিধা পরিত্যাগ পূর্ব্বক এই মহাব্রত অবলম্বন করিয়া এ দেশে আসিয়াছেন। কেহ কেহ বা চির-কৌমার্য্যব্রতে দীক্ষিত হইয়া দেহ মন প্রাণ ধর্ম্ম প্রচারার্থে উৎসর্গ করিয়াছেন। এই রমণী প্রচারিকা-দল এ দেশে আসিয়া ভারতীয় তপস্বিনী-গণের ন্যায় গৈরিক বসন পরিধান করেন, সর্ব্ব প্রকার বিলাসিতা পরিত্যাগ করিয়া অতি সামান্যভাবে জীবন অতিবাহিত করেন। ইউরোপীয় জাতি মাত্রেই মৎস্য মাংসাহারী। মৎস্য মাংস ভিন্ন তাহাদের আহার সম্পূর্ণ হয় না। এই প্রচারিকা ভগিনীগণ অনেকে নিরামিষ ভোজন করেন; শুধু তাহা নহে, এদেশীয়দিগের মত কেবল ডাল

ভাত খাইয়া জীবনধারণ করেন। ভারতবর্ষে রমণীগণের বক্ষঃস্থল সম্পূর্ণ আবৃত রাখা যেমন সামাজিক নীতি ও সভ্যতামূলক, বিলাতের রমণীগণের পদদ্বয় সম্পূর্ণ আবৃত রাখার নিয়মও সেইরূপ সভ্যতা অনুমোদিত। রমণীর অনাবৃত পদ ভয়ানক ঘৃণা ও লজ্জার কারণ। রমণী প্রচারিকাগণ এদেশে আসিয়া তাহাদের সামাজিক প্রথা লঙ্ঘন করিয়া এদেশের মহিলাগণের ন্যায় পদদ্বয় অনাবৃত রাখেন, সামান্য জুতা পরিধান করেন মাত্র।

পতিতা রমণীদিগকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য এই প্রচারিকাগণ কলিকাতায় একটী আশ্রম স্থাপন করিয়াছেন। যে সকল হতভাগিনী রমণীর আর ইহ জীবনে সাধুপথে সাধু সহবাসে যাইবার উপায় ছিলনা, এই দেব কন্যাগণের যত্ন ও উদ্যোগে তাহারা দিন দিন নীতি ও ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেছে। মাতা যেমন কন্যাকে লালন পালন ও শিক্ষা দান করেন, রমণী প্রচারিকাগণ সেই ভাবে পতিতা রমণীদিগকে পালন করিতেছেন ও শিক্ষা দিতেছেন। ইঁহাদের স্বার্থত্যাগ, ইন্দ্রিয়সংযম, বৈরাগ্য, সেবা, ধর্ম্মবিশ্বাস, জনহিতৈষণা এবং কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, শ্রমশীলতা প্রভৃতি সদ্গুণ দর্শন করিলে দেবী বলিয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধায় প্রাণ পূর্ণ হয়—শত কণ্ঠে ইঁহাদের প্রশংসাধ্বনি করিতে ইচ্ছা হয়। মনে হয়, যেন ব্যাধি-প্রপীড়িত, দুর্ভিক্ষগ্রস্ত, পাপে তাপে অভিভূত শ্মশানসম ভারতবর্ষকে মরণের গ্রাস হইতে উদ্ধার করিবার জন্য স্বর্গ হইতে এই দেবীগণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ ধর্ম্ম-প্রচারিকার অভ্যুদয় এদেশে নূতন ব্যাপার নহে। মহাত্মা মোক্ষমূলার বলেন "ভারতবর্ষ আধ্যাত্মিকতার জন্মভূমি।" বাস্তবিক এদেশে ধর্ম্মের উচ্চ নীতি, গভীর জ্ঞান, যোগ ভক্তি প্রভৃতি যেমন সাধকগণের প্রাণে প্রস্ফুটিত হইয়াছে, সেই স্বর্গীয় অমৃতরাশি আজ সমাজে বিতরণ করিবার জন্যও তেমনি আয়োজন হইয়াছে। অদ্য আমরা কেবল রমণীদিগের কথাই উল্লেখ করিব। ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি পরব্রহ্মের তত্ত্ব গম্ভীররূপে শিক্ষা করিতেন এবং প্রচার করিতেন। বর্ত্তমান সময়ে শত শত বক্তৃতায় যাহা না হয়, তাঁহাদের এক একটি কথায় তদপেক্ষা অধিক ফল প্রসূত হইয়াছে। তাঁহারা মানবের চিন্তাসাগরে এমন তরঙ্গ তুলিয়াছেন যে, তাহার ক্রীড়া এখনও চলিয়াছে। বৌদ্ধসমাজে, মহারাজা অশোকের সময় রমণী প্রচারিকাগণের দ্বারা অত্যদ্ভুত কার্য্য সাধিত হইয়াছে। সে সময়ের একজন বরবর্ণিনী প্রচারিকার কথা অদ্য আমরা সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

অশোকের ন্যায় নরপতি ভারতবর্ষে অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তিনি প্রথম বয়সে ভয়ানক ক্রূর প্রকৃতির

লোক ছিলেন। তিনি রাজপদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বে উজ্জয়িনী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। সেই সময় তাঁহার দুইটী সন্তান জন্মগ্রহণ করে—একটী পুত্র একটী কন্যা। পুত্রের নাম মহেন্দ্র, কন্যাটীর নাম সঙ্ঘমিত্রা। কালক্রমে অশোক ভারতের অদ্বিতীয় সম্রাট্ হইলেন। বৌদ্ধধর্ম্ম চতুর্দ্দিকে প্রচার করিবার জন্য ভিক্ষুকদিগকে পাঠাইলেন। অশোকের সময় বৌদ্ধধর্ম্ম প্রবল বন্যার ন্যায় জগৎকে যেরূপ প্লাবিত করিয়াছে, এরূপ আর কোনও ধর্ম্ম কোনও সময়ে করে নাই। তখন লক্ষাধিক প্রচারক চীন, ব্রহ্ম, সিংহল প্রভৃতি স্থানে প্রচার করেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বিজয়-ভেরী চতুর্দ্দিককে নিনাদিত করিল।

অশোক রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার ৬ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র মহেন্দ্র ভিক্ষুব্রত অবলম্বন করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করেন। ইনি প্রচারার্থে বহুতর ভিক্ষুসহ লঙ্কায় গমন করিলেন। তখন লঙ্কায় তিষ্য নামক নরপতি রাজত্ব করিতেছিলেন। মহেন্দ্রের দেবোপম ধর্ম্মভাব দর্শন এবং অমৃতময় বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া তিনি নবধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। রাজা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন দেখিয়া রাণী অনুলা এবং তাঁহার সহচরীগণ বিশেষরূপে নবধর্ম্ম সাধন ভজন ও ভিক্ষুকী হইবার জন্য অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন। মহেন্দ্র মহিলাগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "পাটলীপুত্র নগরীতে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতধারিণী আমার ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন। তিনি এখানে আসিয়া আপনাদিগকে শিক্ষা দান করিতে পারেন।"

মহেন্দ্রের নিকট সঙ্ঘমিত্রার বিবরণ শুনিয়া রাজা এবং মহারাণী-প্রমুখ মহিলাগণ অতিশয় আনন্দিত হইলেন। সঙ্ঘমিত্রাকে আনয়ন করিবার জন্য তাঁহারা মহেন্দ্রকে সানুনয় অনুরোধ করিলেন। উৎসাহী এবং ধর্ম্মপ্রাণ মহেন্দ্র ভগিনীকে আনয়ন করিবার জন্য তৎক্ষণাৎ পাটলীপুত্র নগরে স্বীয় জনকের নিকট লোক পাঠাইলেন। মহারাজ অশোক আনন্দচিত্তে মহেন্দ্রের আবেদন গ্রহণ করিয়া স্বীয় কন্যাকে লঙ্কায় গিয়া মহিলাদিগের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে আদেশ দিলেন। শুভদিনে শুভক্ষণে পাটলীপুত্র হইতে সঙ্ঘমিত্রা লঙ্কায় গমন করিলেন। সঙ্গে আরও অনেক প্রচারিকা গমন করেন, তন্মধ্যে কয়েক জনের নাম উল্লেখ করিতেছি:—উত্তরা, হেমা, মালাগল্লা, অগ্নিমিত্রা, তপা, পর্ব্বতছিন্না, মল্লা, ধর্ম্মদাসী। এই প্রচারিকাদল সিংহলে উপনীত হইয়া নবোৎসাহ এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের সত্য সমূহ মহিলাগণের প্রাণে মুদ্রিত করিয়া দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধুর উপদেশে নারীগণ দলে দলে 'অনলে পতঙ্গের ন্যায়' নবধর্ম্মে আত্মসমর্পণ করিতে লাগিল।

বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ

মানস চক্ষে সেই ভারতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের রাজত্ব দর্শন করুন। এখন যেমন ভারতে দলে দলে ইংরাজ রমণীগণ গৈরিক বসন পরিধান করিয়া খ্রীষ্ট ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন, তদ্রূপ ঐ দেখুন ভারত, সিংহল, চীন, তিব্বৎ প্রভৃতি দেশে পীত বসনে আচ্ছাদিতা, ধর্ম্মভূষণে ভূষিতা বৌদ্ধ ভিক্ষুকীগণ বুদ্ধের যোগনিশান হস্তে ধারণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন। তাঁহারা যেমন উপদেশ দ্বারা ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তেমন রোগীর সেবা, উপবাসীকে আহার দান, পশু পক্ষীর প্রতিও প্রেম স্থাপন করিয়া জনসমাজকে মোহিত করিতেন। "অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ" এই মহাবাক্য বৌদ্ধধর্ম্মই কার্য্যতঃ প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম্মের বাহ্যিক কলেবর এদেশ হইতে দূরীভূত হইয়াছে বটে; কিন্তু বুদ্ধের সার উপদেশ ভারতবাসীর রক্ত মাংসের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ভগবান করুন সঙ্ঘমিত্রার ন্যায়—ভিক্ষুকীদিগের ন্যায় শত শত রমণী প্রচারিকা পুনরায় অভ্যুদিত হইয়া অবশপ্রাণা ভারতরমণীদিগের প্রাণে বৈদ্যুতিক শক্তির সঞ্চার করুন।

পারিবারিক সঙ্গীত।

বুদ্ধ।

মিশ্র—একতালা।

("সুধা সাগরের তীরেতে বসিয়া" সুর)

বট তরু মূলে, বসিয়ে বিরলে,
মগন পরাণ ধ্যানে;
ছাড়ি রাজ্য আশ, পরি চীর বাস,
বাস গহন বনে।

নিরঞ্জনা বহিতেছে ধীরে ধীরে,
ঘুমায়ে বসুধা রজনীর ক্রোড়ে,
নীরব নিশীথে, পরিশ্রান্ত চিত
সিদ্ধার্থ রত সাধনে।

কোথা গোপা—কোথা রাজা শুদ্ধোদন,
কোথা কপিলবস্তুর সুরম্য ভবন,
গিয়াছে অসার, সুখের সংসার,
সুখ দুখ আর নাহি প্রাণে;

ছুটেছে বিহঙ্গ অনন্ত আকাশে,
পরম চৈতন্য জ্যোতির পরশে,
যত চলে যায়, ততই দূরে যায়?
কে তারে আর পায় ভবনে?

গভীর গভীর হইল রজনী,
নিদ্রিত মানব নিদ্রিত অবনী,
লভিল সিদ্ধার্থ অমৃতের খনি,
নির্ব্বাণ পরম ধনে;

সংসার তিমির করি পরিহার,
সত্যালোক প্রাণে হইল বিস্তার,
সংসার সাগর হইলেন পার,
বুদ্ধ নিত্য সত্য জ্ঞানে।

মনুর দীঘি।

জীবন রক্ষার্থ জল সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয়, এজন্যই জলের নাম "জীবন।" অপরিষ্কৃত জলপানে নানাপ্রকার ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। কলের জল পান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কলিকাতা মহানগরী ব্যারামশালা ছিল। বিসূচিকা, জ্বর, আমাশয় প্রভৃতি রোগে প্রতি সপ্তাহে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইত। জলের কল স্থাপিত হওয়ার পর হইতে মৃত্যু সংখ্যা অত্যন্ত হ্রাস হইয়াছে। প্রতি বৎসর পূর্ব্ববঙ্গে এখনও সহস্র সহস্র লোক বিসূচিকা রোগে জীবনলীলা সংবরণ করে। ইহার কারণ এই যে, পূর্ব্ববঙ্গ জলা দেশ, বর্ষাতে সমুদয় স্থান জলে প্লাবিত হইয়া যায়। যখন কার্ত্তিক মাসে জল শুকাইতে আরম্ভ হয়, তখন বৃক্ষাদি পচিয়া জলের মধ্যে প্রাণনাশক বিষের সঞ্চার করে। সেই কর্দ্দমাক্ত, শস্য ও বৃক্ষপত্র গলিত দূষিত জল পান করিয়াই বহুলোক বিসূচিকায় আক্রান্ত ও মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকে। পরিষ্কার জল পান করিলে এরূপ অপকার হওয়া অসম্ভব। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, জল পরিষ্কার রাখা দূরে থাকুক, লোকের দোষে পুষ্করিণী এবং খাল প্রভৃতির জল অত্যন্ত অপরিষ্কার হইয়া থাকে।

এদেশের পুষ্করিণীগুলি নরককুণ্ড বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীর নিকটেই একটী কি দুইটী পুষ্করিণী আছে। পুষ্করিণীর চারিধারে আম কাঁঠালের গাছ। সেই সমুদয় বৃক্ষের গলিত পত্র নিয়ত পুষ্করিণীতে পতিত হইয়া পচিতেছে। ইহা ভিন্ন জলের মধ্যে পানা ও ঘাস দামত আছেই। শিশু সন্তানগণের মল মূত্রের কাপড়, কাঁথা, মৎস্য প্রভৃতি পুষ্করিণীর জলে ধৌত করা হয়, বাসন পরিষ্কার করা, এবং মূত্র ত্যাগ করা হয়। এরূপ পুষ্করিণীতে স্নান ও সেই জল পান করিলে যে নানা ব্যাধিতে শরীর আক্রান্ত হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি আছে ?

বর্ত্তমান সময়ে কোন কোন বিদেশীয় সুবিজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, এদেশবাসিগণ নদীর জলকে যেরূপে অপরিষ্কৃত করে, তাহাতে প্রবাহশীলা নদীর জল পান করাও নিরাপদ নহে। মনে করুন, নদীর উজানে কলেরা ব্যারাম হইতেছে। গ্রামের লোকেরা কলেরা রোগীর মললিপ্ত বস্ত্রাদি নদীতে ধুইতেছেন, সেই বিষ স্রোতের সহিত দূরে যাইতেছে। এজন্য যাহারা বহু দূরে (ভাঁটিতে) থাকিয়া সেই জল পান করিতেছে, তাহারাও বিসূচিকায় আক্রান্ত হয়। তিনি বলেন যে, ইহার জন্যই নদীর ধারে বিসূচিকা আরম্ভ হইলে শীঘ্র শীঘ্র সংক্রামিত হইয়া থাকে।

জল কিরূপে পরিষ্কার করিতে হয় এবং পরিষ্কার রাখিতে হইলে কিরূপ সতর্কতার প্রয়োজন, তাহা ইংরাজজাতির কার্য্যকলাপ দেখিলে আমরা বিশেষরূপে শিক্ষা করিতে পারি। তাঁহারা পুষ্করিণীতে নামিয়া কাহাকেও স্নান করিতে কিম্বা মূত্র পরিত্যাগ করিতে দেন না। পুষ্করিণীর ধারে পতনশীল পত্রবিশিষ্ট বৃক্ষাদি রোপণ করেন না এবং সর্ব্বদা দাম ও পানা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। কলিকাতা এবং অন্যান্য বড় বড় সহরে গবর্ণমেণ্টের এরূপ সুরক্ষিত অনেক পুষ্করিণী আছে। সে সকল পুষ্করিণীর জল কেবল পান করিবার অধিকার সকলের আছে। ঐ সকল দীঘিগুলিকে 'Reserve Tank' কহে। এই সুরক্ষিত পুষ্করিণী গুলি পানার্থিগণের জীবন স্বরূপ। ইহাদের জল পরিষ্কার না রাখিলে ব্যাধির মূল ধ্বংস হইবে না, রাজকর্ম্মচারীগণ এ তত্ত্ব অতি পরিষ্কাররূপে অনুভব করিয়াছেন। এজন্যই এখন কলিকাতার ন্যায় অন্যান্য নগরে জলের কল স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু এই জল পরিষ্কার রাখিবার রীতি যে কেবল ইংরাজ জাতিই আমাদের সম্মুখে প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা নহে। এদেশের আর্য্যগণ এ নীতি সম্পূর্ণ অবগত ছিলেন। "জলেতে প্রস্রাব করে, ব্রহ্মহত্যা ধরে তারে" এক প্রাচীন বঙ্গকবি গাহিয়াছেন। জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে মহাত্মা মনু বলিতেছেন ;

নাপ্সু মূত্রং পুরীষং বা ষ্ঠীবনং বা সমুৎসৃজেৎ,
অমেধ্য লিপ্তমন্যদ্বা লোহিতং বা বিষাণি বা।

মনু ৪র্থ অধ্যায় ৫৬ শ্লোক।

মর্ম্ম এই, জলেতে প্রস্রাব বা বিষ্ঠা কিম্বা শ্লেষ্মা পরিত্যাগ করিবে না, বিষ্ঠা মূত্রলিপ্ত বস্ত্রাদি ক্ষালন করিবে না এবং রক্ত বা কোন প্রকার বিষ নিক্ষেপ করিবে না।

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যাহ্ন সময়ে মহাত্মা মনু জল পরিষ্কার সম্বন্ধে যে অমূল্য উপদেশ প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে ইউরোপ ভূমিত প্রকৃতির প্রিয় পুত্র শ্বেতাঙ্গগণ কর্ত্তৃক তাহা পরিপালিত হইতেছে, আর যাঁহারা মনুর বংশধর বলিয়া পরিচয় প্রদান করেন, মনুর বিধি পালন করেন বলিয়া গৌরব প্রকাশ করেন, তাঁহারা মনুর অমূল্য উপদেশ কার্য্যতঃ পালন করিতেছেন না। মনুর উপদেশ মত কাজ করিলে প্রত্যেক বাড়ীর পুষ্করিণী গুলিই রিসার্ভ টেঙ্ক (সুরক্ষিত পুষ্করিণী) করিতে হয়। যে জলে স্নান, যে জলে মূত্রত্যাগ, মললিপ্তবস্ত্র পরিষ্কার করা হয়, মনুর ভাষাতে কহিতে হইলে, সে পুষ্করিণী হিন্দুর পুষ্করিণী নহে।

মনু যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, গবর্ণমেণ্টের সুরক্ষিত পুষ্করিণী গুলি তদনুরূপ হইয়াছে। এজন্য ঐ সকল দীঘিকে আমরা "মনুর দীঘি" নামে অভিহিত করিলাম। গ্রামে গ্রামে ঐরূপ মনুর দীঘি না থাকিলে ব্যাধির করালগ্রাস হইতে এদেশ রক্ষিত হইবে না।

সুবিজ্ঞ ডাক্তার বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন যে, "জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে আমাদের দেশীয় লোকে বড়ই অবিবেচনা প্রকাশ করে।" বাস্তবিক একথা অতি সত্য। যে যে কারণে জল অপরিষ্কৃত হয়, তৎসমুদয় কারণই এদেশে বিদ্যমান। জল অপরিষ্কার করিয়া আমরা নিজের মৃত্যু নিজেই ঘটাইতেছি। ঐ আবর্জ্জনারাশি পূর্ণ, পঙ্কিল, পূতিগন্ধময় জলে সমুদয় ব্যাধির বীজ নিহিত। হায়! আমাদের নিজ নিজ দোষে বৎসর বৎসর কত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইতেছে! কত গ্রাম শ্মশানক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে!

জল পরিষ্কৃত রাখিতে হইলে প্রধানতঃ দুইটি উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। ১ম গ্রামে গ্রামে মনুর দীঘি রক্ষা করা, ২য় পানীয় জল সাধারণ ভাবেই হউক কিম্বা বিলাতি ফিল্‌টার দ্বারা হউক বিশেষ রূপে বিশুদ্ধ করা। আমরা দেখিয়াছি যাঁহারা জলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন, তাঁহারাই ব্যাধি হইতে প্রমুক্ত থাকেন। জল পরিষ্কৃত রাখিবার সম্বন্ধে মহিলাগণের বিশেষ দায়িত্ব আছে। তাঁহারাই পুষ্করিণীতে ময়লা বস্ত্র, বাসন ও মৎস্যাদি ধৌত করিয়া থাকেন। হইতে জল তুলিয়া ঐ সকল কার্য্য অবলীলাক্রমে সম্পাদিত হইতে পারে। সর্ব্বদা মনুর কথা স্মরণ রাখিবেন। জল আমাদের জীবন; জল নষ্ট করিলে পরোক্ষভাবে স্বীয় স্বীয় জীবনকে নষ্ট করা হয়। ভগবান্ করুন, বঙ্গের প্রতি পল্লিতে মনুর দীঘি স্থাপিত হউক, জল পরিষ্কৃত রাখিবার জন্য সকলে যত্নশীল হউন। আমাদের বিশ্বাস, এরূপ হইলে বঙ্গের অর্দ্ধেক ব্যাধি কমিয়া যাইবে, ম্যালেরিয়া বিসূচিকার প্রকোপ প্রশমিত হইবে।

মাধব সিংহের রাণী।

আজ কাল অনেক সভ্য ভব্য শিক্ষিত কৃতবিদ্য ব্যক্তি বৈষ্ণবের নাম শুনিলে, ভ্রূ কুটিত ও নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া স্ব ২ হৃদয়হীনতার পরিচয় দেন। তাঁহাদের মুখভঙ্গি দেখিলে বোধ হয়, যেন "বৈষ্ণবগণকে" তাঁহারা ধর্ম্ম-সেবক বলিয়াই বিবেচনা করেন না। তাঁহাদিগের বিশ্বাস উক্ত পদবীধারী ব্যক্তিগণ কেবল ধর্ম্মের অবমাননাকারী ভিন্ন কেহই প্রকৃত সেবক নহেন। বৈষ্ণবের নাম শুনিলে, আপনাআপনি, তাঁহাদিগের মনে তৎক্ষণাৎ "নেড়ানেড়ীর" কথা জাগিয়া উঠে, সঙ্গে সঙ্গে অমনি, অস্পষ্ট হাসি দ্বারা, বৈষ্ণবকে উড়াইয়া দেন ফলতঃ এসকল, তাঁহাদিগের কুশিক্ষা, এবং অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক তাহা নিঃসন্দেহ। কোন কপট

বৈষ্ণবনামধারী ব্যক্তি দ্বারা পবিত্র বৈষ্ণব ধর্ম্মের সমুজ্জ্বল দীপ্তি স্তিমিত হইলে আদি ধর্ম্মের উপর দোষারোপ করা, মূর্খতা ভিন্ন, আর কি বলিব? বস্তুতঃ এসকল, আলোচনা করিয়া আমরা উল্লিখিত ধর্ম্মের যশোবৃদ্ধি করিবার বাসনা করিনা; তবে, ভক্ত বৈষ্ণবের দ্বারা, কত সংসারাসাক্ত, পাপাচারীর কঠিন হৃদয় ভগবদ্ভক্তিতে তরল হইয়া গিয়াছে, তাহারই দুই একটী কথা আলোচনা করিবার জন্য এ প্রস্তাবের অবতারণা।—আমরা, সর্ব্বাগ্রে বৈষ্ণব মহিমার একটী উদাহারণ স্বরূপ নিম্নলিখিত গল্পটী লিপিবদ্ধ করিলাম।

পুরাকালে, মাধবসিংহ নামে একজন পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন। তিনি অলীক ঐশ্বর্য্য সুখে মুগ্ধ হইয়া অগণ্য বনিতা সহবাসে ও রাজ কার্য্যে জীবনের অধিকাংশ কাল অতিবাহিত করেন। তাঁহার অগণ্য মহিষীর মধ্যে সুবুদ্ধি, সুমতি, সর্ব্বগুণান্বিতা, ভোগবিলাসানভিজ্ঞা,একজন পাটরাণী ছিলেন। তাঁহার পবিত্র হৃদয়, দয়া দাক্ষিণ্য সৌজন্য ও বদান্যতায় পূর্ণ দ্বেষহিংসা পরিশূন্য, একাধারে সর্ব্বগুণের আকর স্বরূপ ছিল। কিন্তু, অপ্রমেয় সৌখীন সামগ্রী সজ্জিত বহুমূল্য মণিরত্নাচ্ছাদিত, ত্রিতল হর্ম্ম্য, অমাবস্যার তমসাচ্ছন্ন গভীর নিশীথে, একমাত্র আলোকাভাবে যেরূপ শোভাহীন হয়, সেইরূপ একমাত্র ঐশ্বরিকপ্রেমশূন্য হওয়ায় উল্লিখিত, সর্ব্বগুণপূর্ণ রমণীহৃদয় অপূর্ণ ছিল। অভক্ত মাধব সিংহের প্রেমশূন্যচিত্তে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ দ্বেষ বিরাজ করিত, তাহার ফল স্বরূপ রাজান্তঃপুরে কেহই কৃষ্ণ চিন্তার অবসর পাইত না। রাণী অতুল ধনৈশ্বর্য্য-পরিবেষ্টিত হইলেও ভগবৎপ্রেমাভাবে দিন দিন ম্লানমুখী হইতে লাগিলেন।

যিনি ষোড়শী সহধর্ম্মিণী সহবাস ত্যাগ করিয়া নবনীতোপম কোমল কমনীয় অঙ্গের চর্চ্চিত চন্দন মুছিয়া ফেলিয়া 'হরি হরি' বলিয়া গভীর নিশীথে সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি, স্বকীয় ভগবৎপ্রেমের প্রবল প্রবাহে অস্পৃশ্য গোখাদক, মুসলমানের কলঙ্কিত হৃদয়ের কলঙ্ক ভাসাইয়াছিলেন, সেই অলোকসামান্য ষড়ৈশ্বর্য্যশালী শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অথবা তাঁহার কোন সহবাসী বৈষ্ণব বর্ত্তমান থাকিলে আজ মহারাণীকে প্রেমাভাবে, ম্লানমুখী হইতে হইত না, কত শত মাধব সিংহ সেই বৈষ্ণব সহবাসে পবিত্র হইতে পারিত। কিন্তু, তৎকালে সমগ্র সাম্রাজ্যে এরূপ কোন ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন না, যিনি, বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত হইতে পারিতেন। বৈষ্ণব অভাবেই মাধব সিংহের প্রেমহীন হৃদয় এত অত্যাচার করিতে সমর্থ হইয়াছিল; তাই রমণীর দুর্ব্বল হৃদয় প্রেমপ্রবণ হইয়াও ফুটিতে পাইত না।

যাহাহউক, হিরণ্যকশিপুর অবতারস্বরূপ মহারাজা মাধব সিংহ, বহুদিন পরে প্রাণোপম পুত্র প্রেমসিংহ সমভি-

ব্যাহারে কাবুল রাজ্য শাসনে যাত্রা করিলেন। রাজা নাই, এক্ষণে পাটরাণীই অন্তঃপুরে সর্ব্বপ্রধানা হইলেন, কিন্তু সহচরী ও অন্যান্য পুরবাসীদিগের ভয়ে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে পারিতেন না—নীরবেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। ভগবানের অপার মহিমা, অন্তঃপুরে—সেই কৃষ্ণনাম-পরিশূন্য অন্তঃপুরে দাসী নামে একটী পরম বৈষ্ণবী ছিল। সে দিবা-নিশি হরি-প্রেমাস্বাদ করিত, অথচ কেহ জানিতে পারিত না। পরম ভক্তি-মতী দাসী অন্তঃপুরের প্রধানা রাণীর অন্তরের কথা কিছু অবগত ছিল। সে এক দিন, নির্ভয়ে দিবা দ্বিপ্রহরে হাসিতে হাসিতে মহারাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করিল। মহারাণী পালঙ্কে শায়িতা ছিলেন, দাসী পদপ্রান্তে উপবেশন করিয়া, পদসেবা করিতে লাগিল, আর অস্ফুট-স্বরে কহিতে লাগিল, "এ অনিত্য সুখ তাতে কত বা আস্বাদ, কৃষ্ণপ্রেম-ভকতির কি সুন্দর স্বাদ!" শ্লোক শুনিয়া মহারাণীর হৃদয়বেগ উথলিয়া উঠিল। অশ্রুত কৃষ্ণনাম শুনিলেন, নিজমুখে একবার উচ্চারণ করিবার ইচ্ছা হইল। দাসী কহিল "অনিত্য বিষয়সুখ হৈল আর গেল, কৃষ্ণপ্রেম পরাৎপর নিত্য করে আলো।" রাণী 'প্রেম' এই কথা শুনিয়া, আর অসাড় থাকিতে পারিলেন না। ভক্তিবারি নয়নপ্রান্তে বহিয়া বাহির হইল। দাসী সজলনয়নে কহিল, শ্রীগো-বিন্দ হরি হে, কৃষ্ণ হে, উভয়েই অশ্রু-মতী। আজ সঙ্গিনী মিলিয়াছে, রাণী কঠোর রাজ্যশাসন ভুলিয়া গেলেন, উচ্চৈঃ স্বরে অশ্রুপরিপ্লুত চক্ষে উর্দ্ধমুখে প্রকোষ্ঠ প্রকম্পিত করিয়া কহিলেন "হরি, দীন-বন্ধু! এদাসীরে কৃপা কর।" দাসী বিভোর হইয়া, নিমীলিতনেত্রে বাষ্পাকুলিত কণ্ঠে কম্পিতওষ্ঠে ধীরগম্ভীর স্বরে কহিল, "হরি হে কৃষ্ণ হে! আমি চিরকালই দাসী, করুণাময়, একবার কৃপা কর। আজ অসুর-গৃহে দেবলীলা শ্মশানে হরি সঙ্কীর্ত্তন!" হরি হরি, বৈষ্ণবের কি অলৌকিক ক্ষমতা—বৈষ্ণব ভিন্ন, এ শুষ্ক প্রাণে এত ভক্তি সলিল কেহ দিতে পারে কি? উভয়ে মিলিয়া এইরূপে অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। রাণী কহিলেন, "দাসী! আমিত তোমার পদ-সেবিকার যোগ্য নই, আমি যে তোমাকে দাসী বলি সে আমার অপরাধ, বিচার করিয়া দেখিলে তোমার দাসীর দাসী হইবার উপযুক্তও আমি নহি।" আহা! কৃষ্ণপ্রেম ভিন্ন, অহঙ্কারী মানবহৃদয়েকে এত হীন করিতে পারে কি? প্রবল প্রতাপান্বিত মহারাজাধিরাজ বীরশ্রেষ্ঠ মাধবরাজের প্রাণাধিকা অর্দ্ধাঙ্গিনী হইয়া, সামান্যা নগণ্যা দীন দুঃখিনী দাসীর পদসেবার জন্য লালা-য়িতা! রাণী আবার সাশ্রুনয়নে নম্রমুখী হইয়া কহিলেন, দাসী আমার চরণ ছাড়িয়া আমার মস্তকে চরণ রাখ, আজি হইতে তোমাকে গুরুবৎ মানিলাম, বিষয়সুখ ত্যাগ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেম কীর্ত্তনে রত হইলাম। দাসী রাণীর সেই ভক্তি-

ভাব দেখিয়া বিভোর হইয়া গেল, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। আমরা দুর্ভাগা, তাই হাসিবার জন্য ব্যাকুল হই; দাসীর মত কাঁদিতে পারিলে বোধ হয় আর কেহ হাসিতে চাহিতাম না। যাহাহউক, রাণী ও দাসী উভয়ে নির্ভয়ে হরিনাম করিয়া অনেক দিন কাটাইলেন। এইরূপে হরিনামামৃত পানে পুলকিত ও বিভোর হইতে লাগিলেন। একদিন দাসী কহিলেন, "বৈষ্ণব সেবন বিনা কৃষ্ণের পিরীতি, নাহি হয় শুনিয়াছি ভক্তজন প্রতি।" রাণী আর তখন রাণী নাই, তিনি মনে মনে কৃষ্ণের দাসী হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব নাম শুনিয়া আহ্লাদে বিমূঢ়া হইলেন। পরদিন "ইন্দু নীলমণি" দুই প্রতিমা, প্রতিষ্ঠা করিয়া, সমারোহে মহোৎসব দিলেন। রাজভয়ে দেশে বৈষ্ণবেরা কীর্ত্তনাদি বন্ধ করিয়াছিলেন, এক্ষণে রাণীর প্রশ্রয়ে নির্ভয়ে সঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। নিত্য নূতন মহোৎসব হইতে লাগিল। অন্তঃপুরে রাত্রিদিন ভক্তিমান্ বৈষ্ণবগণের সমাগম হইতে লাগিল, অন্তঃপুরবাসিনী রমণীগণ আর থাকিতে পারিলেন না, বৈষ্ণবগণের কীর্ত্তন স্রোতে ভাসিতে লাগিলেন সকলেরই চক্ষে জল, সকলেরই মুখে হাসি। অপূর্ব্বভাব বটে, একাধারে অশ্রু, হাসি! মহারাণী সহচরী, সপত্নী সঙ্গিনীগণ লইয়া নব নব আনন্দানুভব করিতে লাগিলেন।

এদিকে প্রধান রাজ-কর্ম্মচারী অন্তঃপুরে অসঙ্কোচে পুরুষ সমাগম দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না—ধীরে ধীরে মহিষী সমক্ষে গমন করিয়া কহিলেন—মহারাণী! আপনি রাজরাণী হইয়া,এরূপে লজ্জাহীনার ন্যায়—রাণী বাধা দিলেন, সাশ্রুনয়নে যোড়করে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন—

"আর রাণী না কহিও মোরে—
দাসী নাম লিখে দিনু যুগল কিশোরে,
পরদা উঠাইয়া, নূতন কিশোরের সঙ্গে
অঙ্গ সমর্পিনু ঢাক বাজাইয়া রঙ্গে,
জাতি পাতি তেয়াগিনু বৈষ্ণব সমাজে,
চতুর্ব্বর্গ তেয়াগিনু পিরীতের কাজে,
সরম ভরম মান ধন জন কাম,
যুগলের বালায়ের সনে ত্যজিলাম।"

দেওয়ান ব্যাপার বুঝিলেন; আনুপূর্ব্বিক মাধবরাজকে জ্ঞাত করাইলেন। রাজা পত্র পড়িয়া, পুত্রকে ডাকিলেন, এবং কহিলেন তোমার মাতা "নেড়ার" সঙ্গে "নেড়ী" হইয়াছে, বেপর্দ্দা হইয়া স্বেচ্ছাচারিণী হইয়াছে, এই দেখ পত্র আসিয়াছে। প্রেমসিংহ পত্র দেখিয়া আনন্দিত হইলেন,কহিলেন,—"বুঝিলাম, মাতা শ্রেষ্ঠপদে আরোহণ করিয়াছেন, কৃষ্ণসেবা ধরিয়াছেন, ইহাতে তিনকুল উদ্ধার হইবে, ইহা সুখেরই বিষয়। রাজা ক্রোধান্ধ হইলেন, বিরক্তভাবে রাণীর মস্তকচ্ছেদন জন্য পুত্রকে আদেশ করিলেন। এদিকে "প্রেমসিংহ কহে মোর মস্তক থাকিতে, কার সাধ্য আছে

মোর মাতারে হিংসিতে ?" ভক্তের সহায় এইরূপেই মিলে বটে; রাজা সহধর্ম্মিণীকে হত্যা করিবার অভিপ্রায়ে স্বয়ং স্বদেশে যাত্রা করিলেন, রাজ্যে উপস্থিত হইয়া মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির হইল, হঠাৎ স্বহস্তে স্ত্রীহত্যার প্রয়োজন নাই, পালিত হিংস্র ব্যাঘ্রের জঠরানল নির্ব্বাপিত করিবার জন্য রাণীকে দেওয়া হইবে।

পরামর্শমত কার্য্য হইল। একদিন মহারাণী গলে তুলসী মালা, সর্ব্বাঙ্গে নামাবলী, পরিধানে ক্ষৌম বসন, সম্মুখে, প্রতিষ্ঠিত ইন্দুনীলমণি মূর্ত্তিদ্বয়, নিমীলিত নেত্রে সহাস্য আননে যোড়করে উপবিষ্টা; সেই সময়ে নিষ্ঠুর মাধব সিংহ ক্ষুধার্থ শার্দ্দুলের পিঞ্জর দ্বার মোচন করিলেন। ব্যাঘ্র এক লম্ফে বৈষ্ণবী সমক্ষে উপস্থিত হইল, আক্রমণের উদযোগ করিল রাণীর চমক ভাঙ্গিল, সম্মুখে ভীষণ মুক্ত ব্যাঘ্র দেখিয়া রাণী কহিলেন "আইস আইস বাপু কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল।" হায় কি মুগ্ধতা, শত্রু মিত্র সমজ্ঞান, এমন না হইলে কি বৈষ্ণব হয়!—হরি হরি, ব্যাঘ্র খাইবে কি? সে কৃষ্ণ নাম শুনিয়া রাণীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিল।* বৈষ্ণবী যোগাসন হইতে উঠিলেন, ব্যাঘ্রকে বৈষ্ণব সাজাইলেন, তাহার গলে তুলসীর মালা, নাসিকায় তিলক দিয়া, হরিবোল, বলিয়া গাঢ় আলিঙ্গন করিতে লাগিলেন। রাজা পার্শ্বের প্রকোষ্ঠ হইতে এ দৃশ্য দেখিলেন, হিংস্র পশুর সরলতা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন, হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। মনে মনে ভাবিলেন "আমার দৌরাত্ম্য এত কৃষ্ণ না সহিবে" হায় হায় আর যায় কোথা; গর্ব্ব তেজ দূরে গেল, কৃষ্ণদ্বেষ নয়ন সলিলে ভাসিয়া গেল, "নিজ স্ত্রী বলিয়া অভিমান নাহি কৈল।" নিকটে যাইয়া রাজা সাষ্টাঙ্গে পড়িলেন, যোড়হস্তে স্তব স্তুতি অনেক করিলেন এবং অপরাধ ক্ষমা কর বলিয়া কাকুতি করিতে লাগিলেন।

রাণী কহিলেন "যাহ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল মঙ্গল হইবে, মুক্তি তব অধীনা জায়া অবশ্য রাখিবা।" রাজার তখন জ্ঞানোদয় হইয়াছে, নয়নে প্রেমাশ্রু পড়িতেছে, কাতর ভাবে কহিলেন বৈষ্ণবী তুমি সৃষ্টিস্থিতি নাশ করিতে পার, তুমিত কাহার অধীন নহ। বুঝিলাম, "বিপদ নাশের হেতু সম্পদের দাতা, ভক্তি মুক্তি আদি কৃষ্ণ প্রেমভক্তিপ্রদা"। বলা বাহুল্য এই সময় হইতে মহারাজ মাধব সিংহ একজন যথার্থ ভক্তিমান্ বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। ধন্য সেই বৈষ্ণবী যে, নির্ব্বিকারচিত্তে হিংস্র ব্যাঘ্রকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিতে অনুরোধ করে, যার কৃষ্ণপ্রেমের উন্মত্ততায় বিষ্ণুদ্বেষী ঘোর পাষণ্ড মাধব রাজের গর্ব্ব চূর্ণ হইল।

মহারাণীর একমাত্র বল হরিভক্তি।

* ভক্তমালে যেরূপ বর্ণন আছে, এই আখ্যায়িকাতে তাহাই উল্লিখিত হইয়াছে। এ বর্ণন অলৌকিক ও রঞ্জিত হইলেও এককালে অসম্ভব কে বলিবে? সুস্বর লহরীতে যখন বনের পশু মোহিত হয়, ভক্তের সাত্ত্বিকভাবে নৃশংস পশুও শান্ত হইতে পারে।

ভক্তিদ্বারা ভক্ত ভগবানের সহিত একাকার হয়। পাপচিত্তের মত্ততা দূর করিয়া তাহাকে সৎপথে চালিত করিবার পক্ষে ভক্তসহবাস ভিন্ন আর উপায় কি আছে?

কৃ, ঘ।

বিবি ফসেট

(৩য় প্রস্তাব)

এস্থলে একটী প্রকৃত ঘটনার উল্লেখ করিতেছি! একদা এক মানব-পশু সৈনিক এক যুবতী পরিচারিকাকে পথিমধ্যে দেখিয়া তাহাকে কুপথগামিনী করিবার চেষ্টা করে। সে হাবা গোবা, সাদাসিধে, পাড়াগেঁয়ে মেয়ে; সবে পাড়া গাঁ হইতে পেটের দায়ে লণ্ডন নগরে চাকরি করিতে আসিয়াছে। আসিয়া এক ভদ্র মহিলার পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত। এই মহিলার সহিত বিবি ফসেটের জানা শুনা ছিল। একদিন দাসী ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে কাঁদিতে কাঁদিতে কর্ত্রীর নিকট বলিল যে, দুর্বৃত্ত সৈনিক নানাপ্রকার ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে ভয়ানক বিপদে ফেলিবার চেষ্টা করায় সে অগত্যা তাহার মানস পূর্ণ করিবার আশ্বাস দিয়া সেই নর-রাক্ষসের হাত হইতে আপাততঃ পরিত্রাণ পাইয়াছে। আগামী কল্য সে এক নির্দ্দিষ্ট স্থানে থাকিবে বলিয়া দিয়াছে; সেটী গমনাগমনের পথ, তাহাকে সেই স্থান দিয়া যাইতে হইবেই হইবে। তাহার কর্ত্রী সমস্ত বিবরণ বিবি ফসেটকে বলেন। বিবি ফসেট শুনিয়া তৎক্ষণাৎ তাহার সতীত্ব রক্ষার উপায় বিধানে তৎপর হন। তিনি ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া জাতীয় দুর্নীতি নিবারণী সভার কতকগুলি ভীমের মত বলবান্ সভ্যের নিকট আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। আপনি চলিলেন ও তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইলেন এবং পরিচারিকাও চলিল। দুর্বৃত্ত সৈনিকও কীচকের মত পূর্ব্ব হইতে আসিয়া অপেক্ষা করিতেছিল। রমণীকে দেখিয়া যেমন সে তাহার নিকট অগ্রসর হইল, অমনি প্রহার আরম্ভ হইল। মার্জ্জার যেমন মুষিক ধরিয়া ক্রীড়া করিয়া থাকে, তাঁহারা সেইরূপ তাহাকে লইয়া করিলেন। তাঁহারা পুলিস ডাকিলেন এবং তাহাকে হোদলকুতকুতে সাজাইয়া একখানি কাগজে কতকগুলি অবজ্ঞা ও বিদ্রূপপূর্ণ কথা লিখিয়া আলপিন দিয়া তাহার কোটে আঁটিয়া দিলেন। চারিদিক হইতে লোক জমিয়া গেল, সকলে দেখিয়া হাসিতে ও হাত তালি দিতে লাগিল। পাপের অভিনয় এই স্থানে শেষ হইল না। কেহ বলিতে লাগিলেন "তুমি না মহারাণীর সেনাদলভুক্ত।" কেহবা সমবেত লোকদিগকে

ডাকিয়া বলিলেন ওহে তোমরা সকলে একজন সেনাকে দেখ। সে যে সমিতির সভ্য ছিল, তাহা হইতে বিদূরিত হইল; নারীসমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল এবং তাহার সহিত যে নারীর বিবাহ হইবার কথা হইতেছিল, তাহা আর হইল না। এই সব দেখিয়াও বিবি ফসেটের অন্তরে কিছুমাত্র দয়া হইল না, হইবেই বা কেন? দুষ্টের দমন মহত্ত্বের কি একটি পরিচয় নহে? পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে তিনি দেখিতে শীর্ণ ও খর্ব্বকায় ছিলেন; কিন্তু তৎসত্ত্বেও কেহ তাঁহার পানে সহসা চাহিয়া কথা কহিতে সাহস করিত না।

উক্ত বিবরণ পাঠ করিয়া আমাদিগের মনে একটি বিষয় উদিত হইতেছে, যাহা লিপিবদ্ধ না করিয়া আমরা ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। তাহা এই,—এই মহানগরী কলিকাতায় পল্লিগ্রাম হইতে অনেক দুঃস্থা নারী চাকরীর জন্য আসিয়া থাকে। ইহারা অবলা সরলা ও সচ্চরিত্রা, উক্ত প্রকার সৈনিকের বা অন্যবিধ নরপশুর সম্মুখে পড়িয়া ইহারা বিপন্না হয়, সর্ব্বস্ব হারায়, সতীত্ব হারায়—এমন কি প্রাণও হারায়। স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব অপেক্ষা মূল্যবান্ রত্ন আর কি আছে? যখন তাহাই গেল, তখন রহিল কি? কিন্তু এই রূপ কত শত স্ত্রীহত্যাকারী (আমাদিগের ধর্ম্মে স্ত্রী-হত্যার অপেক্ষা পাপ নাই) অবলীলা ক্রমে বিচরণ করিতেছে, কেহ দেখিতেছে না বা দেখিয়াও দেখিতেছে না এ দৌরাত্ম্য দমনের কি কোনও উপায় নাই? আমরা সুশিক্ষিত বলিয়া সভ্যজগতে পরিচিত হইতেছি, কিন্তু সুশিক্ষার প্রথম ও প্রধান নিদর্শন অবস্থা নির্বিশেষে স্ত্রী-সম্মান। আবার দেখ, স্ত্রীসম্মানের পূর্ব্বে স্ত্রীসংরক্ষণ। অগ্রে রক্ষণ করিলে, তবেতো সম্মান করিব। অতএব হে সুশিক্ষিত ভ্রাতৃবর্গ, এস স্ত্রীজাতির রক্ষণ হেতু আমরা সকলে বদ্ধ-পরিকর হই। আইস আমরাও দুর্নীতি নিবরণী সভা সংগঠন করিয়া সমাজের হিতব্রতে ব্রতী হইয়া আপনাদিগকে সুসভ্য ও সুশিক্ষিত বলিয়া পরিচয় দিবার উপযুক্ত হই।

শিশু-শিক্ষাতত্ত্ব।

শিশুরা মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই বহির্জগতের সহিত এক নূতন সম্বন্ধে স্থাপিত হয়। বহির্জগতের বিষয় গুলি চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় সাহায্যে মনের উপর কার্য্য করিতে থাকে। মনও বিধিনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে বহির্জগতের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়।

শারীরিক যেমন একটা নির্দ্দিষ্ট গঠন

আছে, মনেরও তেমন একটা গঠন আছে। কার্য্য করিবার জন্য শারীরিক যন্ত্র গুলির যেমন একটী নির্দ্ধারিত প্রণালী আছে, মনেরও তেমন একটী নির্দ্ধারিত প্রণালী আছে। এই স্বভাবজাত প্রণালীর অনুসরণ করিয়া জন্মমুহূর্ত্ত হইতেই মন বহির্জগতের জ্ঞান লাভে প্রবৃত্ত হয়। এই বহির্জগতের জ্ঞান লাভেই মনের বিকাশ ও পরিপক্কতা। কি প্রণালী অনুসারে মনের এই কার্য্য চলিতে থাকে, মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা নানা প্রকারে তাহা নির্দ্ধারণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। যথা জ্ঞানময়ী শক্তি, ভাবময়ী শক্তি ও ইচ্ছাময়ী শক্তি। মনের কার্য্য গুলিও এইরূপে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে পারে—যথা, জ্ঞান,ভাব ও ইচ্ছা। আমরা প্রথমে কেবল জ্ঞানের বিষয়েই আলোচনা করিব।

(মনঃসংযোগ—attention.)

মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, মনঃসংযোগ মানসিক শক্তি বিকাশের একটী সাধারণ অবস্থা অর্থাৎ জ্ঞানময়ী, ভাবময়ী ও ইচ্ছাময়ী এই ত্রিবিধ শক্তির বিকাশ পক্ষে মনঃসংযোগ নিতান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ মনঃসংযোগ না হইলে, জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির বিকাশ ও পরিপক্কতা হওয়া অসম্ভব। নিউটন-প্রমুখ পণ্ডিতেরা গভীর মনঃসংযোগকেই তাঁহাদের লোকপ্রসিদ্ধ অসাধারণ প্রতিভার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সুতরাং অতি শিশুকাল হইতেই ইহার যথারীতি অনুশীলন হওয়া আবশ্যক। অনেকেরই ধারণা, শিক্ষারম্ভের পূর্ব্বে এই বিষয়ে মনোযোগী হইবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ বিশ্বাস নিতান্তই ভ্রমাত্মক এবং মনোবিজ্ঞানশাস্ত্রে অনভিজ্ঞতার ফল। আমাদের দেশে প্রায় ৫। ৬ বৎসর বয়সে বালকদের শিক্ষারম্ভ হয়। এই ৫। ৬ বৎসরে বালকেরা বহির্জগতের অনেক জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া থাকে। মনোবিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, শিশুরা প্রথম ২। ৩ বৎসরে পৃথিবীর যত জ্ঞান লাভ করে, পরে বহুবৎসরেও তত জ্ঞান লাভ করিতে পারে না।

ফলতঃ মাতা যখন অঙ্গুলী-সঙ্কেত দ্বারা বস্তু বিশেষে শিশুর মনঃসংযোগ করিতে পারেন, তখনই শিশুর প্রকৃত শিক্ষারম্ভ হইল মনে করিতে হইবে। তখন নূতন নূতন আমোদজনক বস্তুর সাহায্যে মাতা সহজেই শিশুকে নূতন নূতন বিষয় শিক্ষা দিতে পারেন। অনেকে ধাত্রী অথবা অন্যের হস্তে শিশুর লালন পালনের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকেন। ইহাতে যে কত অনিষ্ট হয়, একটুকু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারা-যায়। বিধাতার বিধানে মাতাই শিশুর একমাত্র শিক্ষালয়। একজন শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত বলিয়াছেন,—"বালকদিগকে সর্ব্বদাই পিতামাতার নিকটে রাখিবে; বেশী বয়স না হইলে বিদ্যালয়ে পড়িতে পাঠাইবে না, অথবা অন্যের সংসর্গে যাইতে দিবে না।" শিক্ষিতা মাতা নিজ

হস্তে শিশুর শিক্ষার ভার লইলে, উহা কত সুফলপ্রদ ও সুখপ্রদ হয়!

বালকেরা স্বভাবতঃই চঞ্চলপ্রকৃতি। তাহাদের মন একবিষয়ে বেশীক্ষণ স্থির থাকিতে পারে না। কোনও বিষয় বিশেষে বালকের চিত্ত আকর্ষণ করিতে হইলে, অতি সাবধানে কার্য্য করিবে। বিষয়টীকে যত আমোদজনক করিয়া বালকের সম্মুখে ধরিতে পার, ততই ভাল। বিষয়টী সুন্দর এবং আমোদজনক হইলেই, বালকের মন সে দিকে সহজে ধাবিত হয়। ইহা শিক্ষার একটী গূঢ় তত্ত্ব। বিষয়টী জটিল হইলে, বিশেষণ দ্বারা উহাকে সরল ও আমোদজনক করিবে। সর্ব্বদা প্রফুল্ল মুখে বালকদিগকে পাঠাভ্যাস করাইবে। প্রসঙ্গক্রমে দুই একটী গল্প বলিয়া তাহাদের চিত্তরঞ্জনের প্রয়াস পাইবে। কতকগুলি অসম্বদ্ধ বিষয় একসময়ে বালকদিগকে অভ্যাস করিতে দেওয়া অথবা এক বিষয়ে অধিকক্ষণ তাহাদিগকে নিবিষ্ট রাখা অন্যায়। একবিষয় কিছুক্ষণ শিক্ষা দিয়া, তাহাদিগকে কিছুকালের জন্য অবসর দিবে। যে বিষয়ে একটুকু গভীর মনঃসংযোগের আবশ্যকতা, ক্লান্তি ও শ্রান্তির সময়ে এরূপ বিষয়ে তাহাদিগকে প্রবৃত্ত করাইবে না। শারীরিক অথবা মানসিক উত্তেজনার সময়ে কোনও বিষয় শিক্ষা দিবে না। যেস্থানে বসিলে, অন্যদিকে সহজেই চিত্তাকর্ষণ হইতে পারে, এরূপ স্থানে বসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিবে না। বালকদের পাঠগৃহ নির্জ্জন ও শোভাশূন্য হওয়া আবশ্যক।

প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়গুলি যত আমোদজনক হয়, ততই ভাল। শুষ্ক বিষয়ে বালকদের চিত্ত সহজে বসিতে চায় না। এই জন্য সাবধানে পুস্তক নির্ব্বাচন করিবে। জোর করিয়া কোনও বিষয়ে চিত্তাকর্ষণ করিবে না; তাহাতে কুফল ফলিবার সম্ভাবনা আছে। পড়িতে ইচ্ছা না করিলে, তাহাদিগকে আর পড়াইবে না। পাঠে অমনোযোগী হইলে, বেত্রাঘাত করিবে না অথবা অন্যরূপ কঠোর দণ্ড দিবে না। এরূপ কঠোর শাসনে তাহাদের মন ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে, তাহাদের তেজস্বিতা ও পুরুষত্বের বীজ অঙ্কুরেই বিনাশ পাইতে পারে। প্রসিদ্ধ শিক্ষাতত্ত্ববিদ্ জন্ লক্ বলেন "প্রশংসা ও ভর্ৎসনাই শিক্ষার সময়ে বালকদের একমাত্র পুরস্কার ও দণ্ড। বেত্রাঘাত কিম্বা অন্যরূপ দণ্ডের উপকারিতাতে আমার বিশ্বাস নাই। পাঠের সময়ে বালকের চিত্ত বিষয়ান্তরে ধাবিত হইলে, তাহাকে ভর্ৎসনা না করিয়া ধীরে ধীরে নানা কৌশলে তাহার চিত্তকে নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে টানিয়া আনিবে। সম্ভব হইলে, এরূপ অমনোযোগের কথা তখন তাহাকে আদবেই বলিবে না।"

শিশুরা দুগ্ধ অথবা অন্য জিনিষ খাইতে না চাহিলে—ক্রন্দন করিতে থাকিলে, অথবা বিষয়ান্তরে তাহাদের চিত্তাকর্ষণের প্রয়োজন হইলে, এদেশের গৃহিণীরা

"ভূত" "প্রেত" কিম্বা "কুম্ভীরের" ভয় দেখাইয়া থাকেন। এইরূপ প্রথা যে বিশেষ অনিষ্টকর, শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই তাহা বুঝিতে পারেন। কঠোর শাসন ও ভয় প্রদর্শন এই উভয়ের ফল প্রায় একপ্রকার। পরন্তু এইরূপ ভয় প্রদর্শন দ্বারা তদতিরিক্ত একটী কুসংস্কারের শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক মনস্বীরা বলিয়াছেন, "অনেক চেষ্টা করিয়াও পরিণত জীবনে তাঁহারা বাল্যকাললব্ধ অনেক কুসংস্কার ও কদভ্যাসের হাত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ পাইতে পারেন নাই।"

ইংরাজ প্রভৃতি ইয়োরোপীয় জাতিদের মধ্যে এইরূপ ভয় প্রদর্শনের প্রথা নাই বলিলেই চলে। এদেশে অনেক বুদ্ধিমান্ ও শিক্ষিত লোকের গৃহেও এরূপ প্রথার বহুল প্রচলন দেখিয়া অনেক সময় বিশেষ দুঃখিত হইতে হয়। (ক্রমশঃ)

বার মেসে চাস আবাদ।

জ্যৈষ্ঠ।

এই চাস আবাদ সম্বন্ধে বৈশাখ মাসের কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমরা চৈত্র মাসের পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে জ্যৈষ্ঠ মাসের কর্ত্তব্য এই বৈশাখের পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক কর্ম্ম নাই। অনেক গৃহস্থ স্বস্ব ভদ্রাসনের পার্শ্বে, বা স্বস্ব উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চারা লাগাইতে ইচ্ছা করেন। যাঁহাদিগের ঐরূপ ইচ্ছা হয়, তাঁহাদিগকে মাঘ মাস হইতে কিছু কিছু আয়োজন করিয়া বসিতে হয়। ঐ আয়োজন আর কিছুই নহে, মাঘ মাসে ৮ হস্ত অন্তর এক একটী দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহা কিঞ্চিৎ সারযুক্ত আটাল মৃত্তিকাদ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। চারি মাস কাল সমান পরিমাণে উহাতে বায়ু, উত্তাপ ও বৃষ্টিবারির সংযোগ হইবে। উহাতে কেবল এইভাবে একটু দৃষ্টি রাখিতে হইবে যেন, ঐ গর্ত্ত সকলে তৃণ বা অন্য উদ্ভিদ্ জন্মিয়া গর্ত্তস্থ মৃত্তিকার তেজ হরণ না করে। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ গর্ত্ত সকলে শিশু, শেগুণ, বেল, নিম, কদম, চাঁপা, বকুল, শিরীষ, আমলকী, হরীতকী ইত্যাদি বড় বড় বৃক্ষের চারা রোপণ করিবে। আম, জাম, কাঁঠাল, খেজুর, লিচু, লেবু, গোলাপজাম প্রভৃতি বিবিধ ফলের বীজ, চারা বা কলমও এই মাসে রোপণ করিবে। বেগুন ও ডাঁটার যে হাপোর চৈত্র বা বৈশাখ মাসে প্রস্তুত করা হইয়াছে, তাহাদিগের চারা হাপোর হইতে উঠাইয়া কথিত সমভূমিতে দুই বা দেড় হস্ত অন্তর সারি করিয়া পুঁতিয়া দিবে। তৃণ, পত্র, গোবর ইত্যাদি পচিয়া মাটীর উপরিভাগে যে সার জন্মে, বেগুণের পক্ষে তাহাই উত্তম সার। অতএব বেগুণ ক্ষেত্রে ঐরূপ সার দেওয়া উচিত।

মেটেল জমিতে অল্প বালি মিশাইয়া তাহাতে ডাঁটা রোপণ করিতে হয়; নতুবা ডাঁটা মিষ্ট হয় না। আমন ডাঁটা অগ্রহায়ণ মাস পর্য্যন্ত রাখা যাইতে পারে।

সাচি কুমড়া ও পুঁই,—এই দুই প্রকার চারা বর্ষার জলে সারস্তুপে প্রায় আপনিই জন্মিয়া থাকে। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে যেখানে সেখানে যথেষ্ট পরিমাণে ঐ দুই প্রকার চারা দেখা যায়। যদি পাওয়া যায়, তবে এই মাসেই ঐ দুই প্রকার চারা সংগ্রহ পূর্ব্বক যথাস্থানে রোপণ করা উচিত। এই মাসে রোপণ করিতে পারিলে, কিছু অগ্রেই কুমড়া পাওয়া যায়। সাচি কুমড়া অনেক কাজে লাগে। কচি কুমড়ায় উত্তম তরকারী হয়। পাকা কুমড়ায় বড়ি, মোরব্বা হয়। তদ্ভিন্ন কুমড়া অনেক উৎকট রোগের ঔষধে ব্যবহৃত হয়। বিখ্যাত "কুষ্মাণ্ডখণ্ড" ঔষধ এই কুমড়া ভিন্ন হয় না। ইহা ছাড়া হিন্দু রমণীগণের অনেক ব্রতাদি কার্য্যে ঐ কুমড়া আবশ্যক হয়। ঐ সময়ে অনেক মূল্য দিয়া ঐ কুমড়া ক্রয় করিতে হয়। আমরা শুনিয়াছি, কোন সময়ে বৈঁচির বাজারে কোন ব্রতের সময়ে দুইটী বড় মানুষের ভৃত্যের জিদাজিদিতে একটী সাচি কুমড়া শতাধিক মুদ্রায় বিক্রীত হইয়াছিল। যখন সময়ে সময়ে কুমড়ার এত আদর হয়, তখন গৃহস্থের বাড়ীর মাচায়, চালে, বা ছাদের উপর দশ পাঁচটা কুমড়া ফলিলে বড়ই আনন্দ হয়। কুমড়া ও পুঁই শাকের চারা স্থানান্তর করণ কালে উহার গোড়ার অনেকখানি মাটী শুদ্ধ তুলিতে হয়; নতুবা চারা বাঁচে না। পুয়ের শাক ও ডাঁটা অনেকে আদরপূর্ব্বক আহার করেন; কিন্তু উহা অতিশয় দুষ্পচ, এজন্য উহা অধিক খাইলে আমাশয় পীড়া হইতে পারে। সাধারণতঃ একটী কথা সকলেরই মনে রাখা উচিত। যে সকল শাক, সবজি ও তরকারী পাক করিলেও তাহার হরিৎবর্ণ যায় না বা কমে না, তাহা প্রায়ই দুষ্পচ। সেইগুলি আহার কালে একটু সতর্ক হইলে ভাল হয়।

হলুদ, কচু ও আদা; এই সকল ফসলের ভূমিতে যদি উত্তমরূপ চারা বাহির হইয়া থাকে, তবে সেই সেই ক্ষেত্রের ঘাস নিড়াইয়া জমি অল্প পরিমাণে খনন করা ভিন্ন এমাসে উহাদিগের অন্য কোন কার্য্য নাই।

বৈশাখ মাসে যে সকল ফসলের চাস আবাদ করিতে হয়, যদি দৈব দুর্যোগে বা অন্য কোন কারণে তাহা না ঘটিয়া থাকে, তবে এই মাসে সে সকলের আবাদ হইতে পারে। তাহাতে ফসল কিছু বিলম্বে হইবে, এইমাত্র; নতুবা তজ্জন্য অন্য কোন ক্ষতি হইবে না।

সতী ও শান্তি।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

তৎপরে সরোজিনী বলিতে লাগিলেন, প্রথমতঃ ছেলে প্রায় সমস্ত দিন ঘুমাইয়া থাকে। কেবল যখন খিদে লাগে, তখনই জাগে মাত্র। তার পর ক্রমশঃ ক্রমশঃ অধিকক্ষণ জাগিয়া থাকে। যেমন ঠিক্ সময়ে খাওয়ান, সেইরূপ ঠিক সময়ে ঘুমান অভ্যাস করান উচিত। ছেলে যাহাতে রাত্রিকালে অধিক সময় নিদ্রা যায়, তাহা অভ্যাস করান উচিত। সন্তান ছয়মাসের হইলে, দিনের মধ্যে তিনবার ঘুম পাড়ান উচিত। ছেলে যতদিন পর্য্যন্ত না তিন বছরের হয়, ততদিন পর্য্যন্ত তাহাকে দুপর বেলা ঘুমাইতে দেওয়া কর্ত্তব্য। জোর ক'রে ছেলের ঘুমপাড়ান উচিত নয়। অনেক মেয়ে ছেলেকে চাপ্ড়ে, "আয় চাঁদ আয় গো, সোণার যাদু ঘুমায় গো" এইরূপ গান গেয়ে অথবা যদি কাঁদে, তবে "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ শ্যাল আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" এইরূপ ভয় দেখিয়ে জোর ক'রে ঘুম পাড়ায়। এ গুলি ভারি দোষ। এইরূপ ভয় দেখান দ্বারা ছেলেদের যে কি সর্ব্বনাশ হয়, আমাদের দেশের মেয়েরা তা বোঝেন না।

পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "ছেলে একবার কাঁদ্‌তে সুরু কল্লে সহজে থামে না। তাই জোর ক'রে ভয়টয় দেখিয়ে কান্না থামাতে হয়।" শান্তি বলিলেন, তা ব'লে কি জোর ক'রে, ভয় দেখিয়ে কান্না থামাতে হবে? কেন, দিদি ত ব'লেছেন, ছেলে কেন কাঁদে, তা ভাল করে দেখা উচিত, যে যে কারণে ছেলে সচরাচর কাঁদে, সেই সব কারণ হ'তে ছেলেকে রক্ষা করা উচিত। এই সকল বিষয়ে যদি একটু সাবধান হওয়া যায়, তা হইলে আর "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" বলে জোর করে ছেলের কান্না থামাতে হয় না, আর অকারণ কতকগুলো মিথ্যাভয় ও কুসংস্কারে ছেলের সর্ব্বনাশও হয় না।"

এই কথা শুনিয়া আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "এতে আর ছেলের কি সর্ব্বনাশ হ'চ্চে মা? "ভূত আস্‌চে" বল্লেই কি অম্‌নি "ভূতে পায়," না "জুজু আস্‌চে" বল্লেই অম্‌নি জুজু এসে ছেলেকে ধরে? ও একটা ভয় দেখান মাত্র। ওতে আর ছেলের কি অনিষ্ট হয়? শান্তি বলিলেন, কোনও অনিষ্ট হয় না ব'ল্‌ছেন? আপনাদের মণি খোঁড়া হ'ল কেন? তিনি বলিলেন, শাণের উপর প'ড়ে গিয়ে, তার পা ভেঙে গেছ্‌লো, তাই খোঁড়া হ'য়েছে। শান্তি বলিলেন, কেন শাণের উপর প'ড়ে গেল? তিনি বলিলেন, ভয় পেয়ে যেমন দৌড়ে পালিয়ে আস্‌বে কি, না অমনি প'ড়ে

গেল। শান্তি বলিলেন, কেন ভয় পেলে? তিনি বলিলেন, চূণীর মা, ঘরের মধ্যে ছেলে ঘুম পাড়াচ্ছিল, ছেলে ভারি কান্না যুড়ে দিলে। তাকে থামা'বার জন্যে যেমন ব'ল্লে "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে রেঃ—বা—বা, চুপ্ কর্, চুপ্ কর্;" আমাদের মণি ছিল কোথায়, ও শুন্‌তে পেয়ে ভয়ে বাছা যেমন দৌড়ে ঘরের মধ্যে পালিয়ে আস্‌বে, অম্‌নি দড়াম্ ক'রে আছাড় খেয়ে শাণের উপর পড়্‌লো, আহা, বাছা একবারে অজ্ঞান হ'য়ে পড়্‌লো। একটা দাঁত ভেঙে গেল, মুখ ছেঁচে গেল, আর বাছার পা ভেঙে গিয়ে জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে গেল। কত ডাক্তার দেখ্‌লে, কত টাকা উড়ে গেল ওর জন্যে; সেই কালেজ হাঁসপাতালের সাহেব ডাক্তার একাই ত ওর জন্যে হাজার টাকা নিলে, কোনমতে ভাল হয় না, ভিতরে মস্ত ঘা হ'য়ে বাছাকে একবার "জের জরা" করে ফেল্লে। ছেলেটাকে নিয়ে ছ'মাস একবারে "নাস্তানাবুদ্"। শেষে ডাক্তার সাহেব পা'টী কেটে দিলে, বাছা একবারে জন্মের মত খোঁড়া হ'য়ে ঘরে ব'সে রইল।

শান্তি বলিলেন, "তবে দেখুন্ দেখি," ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে বলাতে মণির কি সর্ব্বনাশ হ'ল। আপনাদের এক মণি, সে ত খোঁড়া হয়ে ঘরে রইল, বেঁচে রইল, কিন্তু অমন কত মণি কেবল মাত্র মিথ্যা ভূতের ভয়ে মারা গিয়াছে, এরূপ শুন্‌তে পাওয়া যায়। দেখুন দেখি কি সর্ব্বনাশ!

শৈশবাবস্থা থেকে কেহ যদি "ঐ জুজু আস্‌চে, ঐ ভূত আস্‌চে" বরাবর এই কথা শুনে আসে, তা হ'লে ক্রমশঃ এই ভূতের ভয় জুজুর ভয় তাহার মনে একবারে বদ্ধমূল হ'য়ে যায়। মণি যদি ছেলে বেলা হ'তে ভূত আর জুজুর নাম না শুন্‌ত, তা হ'লে অমন করে দৌড় দিত না আর তাহার এরূপ সর্ব্বনাশও হ'ত না। দেখুন দেখি, মিথ্যা একটা ভয়ে সে নিজে কষ্ট পেলে, গোষ্ঠীশুদ্ধ সকলকে কষ্ট দিলে, কত টাকা উড়ে গেল, তা নয় যাক্, শেষে একটা পা কাটা গেল, জন্মের মত খোঁড়া হ'ল, নিষ্কর্ম্মা হয়ে ঘরে বসে রইল!!

একবার আমাদের বাড়ীর চাকরটার কলেরা হ'ল। কেহ আর ডাক্তার আন্‌তে যেতে রাজী নয়। যাকে বলা যায়, সে বলে, "আজ শনিবার, ওদের গোবর্দ্ধন মরেছে,"একসের দোষ" পেয়েছে,"পুষ্করা" হ'য়েছে। কে ডাক্তার আন্‌তে যাবে, আমি পার্‌ব না। দেখ দেখি বোন্, এমন বিপদের সময় ভূতের ভয়ে কেহই বেরুতে রাজী হয় না। কি ভাগ্যে কেশব দাদা এসে ওঁদের বাড়ীতে উপস্থিত হ'ল। তিনি বেচারীর অবস্থা দেখে দয়া ক'রে, নিজে গিয়ে ডাক্তার আন্‌লেন, তবে সে গরিবের প্রাণ বাঁচে। তা না হ'লে ঔষধ না পেয়ে গরিব মারা গেছ্‌ল আর কি! দেখ দেখি বোন্, মিথ্যা

ভূতের ভয়ে মানুষের কি সর্ব্বনাশ হচ্ছে। ভূতে যত করুক না করুক, মানুষ ভয়ে মরে যায়। কত দুষ্টলোক এইরূপ মিথ্যা ভয় দেখিয়ে কত লেকের সর্ব্বনাশ কচ্ছে, কে তাহার খবর রাখে? ঐ সকল প্রতারক প্রবঞ্চক, বদ্‌মায়েস্. চোর, উহারাই জীবন্ত ভূত, আর ভূত কে?

বাঙ্গালা প্রবচন।

১। হাতী কাদায় পড়িলে ভেকেও লাথী মারে।

২। হাতী ঘোড়া গেল তল,
মশা বলে কত জল?

৩। হাতী চড়ি ভিক্ষা করি,
ইচ্ছায় না দাও ঘর ভাঙ্গি।

৪। হাতীপর হাওদা ঘোড়ে পর জিন,
কালমুরগীপর ডঙ্কা বাজাবে হেসটিং

৫। হাতী পাঁকে পড়লে,
হাতীই উদ্ধার করে।

৬। হাতী বলে আমার দুই দাঁত,
শূকর বলে আমারও দুই দাঁত॥

৭। হাতী ম'লেও লাখ টাকা,
জিয়ন্তেও লাখ টাকা।

৮। হাতীর খোরাক।

৯। হাতীর গলায় ঘন্টা।

১০। হাতীর দর্প চূর্ণ হয় পাহাড়ের কাছে।

১১। হাতীর পিঠে আসে যায়,
হামা দেখে ডর পায়।

১২। হাতীর মিন মিন, ঘোড়ার দৌড়।

১৩। হাতে কড়ি, পায় বল,
তবে যাই লীলাচল।

১৪। হাতে কালী মুখে কালী,
বাছা আমার লিখে এসি।

১৫। হাতে খোলা, পাছে মালা।

১৬। হাতে গোধ পায়ে গোধ,
গোধ কর্ণমূলে;
কোন্ পুরুষের জানি ভাগ্যে,
ছিল গোধ চুলে॥

১৭। হাতে জল গলে না।

১৮। হাতে দই পাতে দই, তবু বলে কই কই।

১৯। হাতে না মেরে ভাতে মারা।

২০। হাতে নাই সিক্কা,
বাহিরে বাহির ফটকা॥

২১। হাতে নাই কড়া বট,
প্রাণ করে ছট ফট।

২২। হাতে যদি নাই ধন,
পাচে হও এক মন।

২৩। হাতে পাজি মঙ্গলবার।

২৪। হাতে মাথা কাটা।

২৫। হাতে নাই কড়াকড়ি,
ক'রে বেড়ায় বাড়াবাড়ি॥

২৬। হাতে যদি ফল পাই,
তবে কি আর আঁকুড়সি চাই?

২৭। হাতে শাঁখা নড়ে,

বিড়াল বলে আমার
ভাত বাড়ে॥

২৮। হাতে হাতেই ফল পাবে।

২৯। হাতের কঙ্কণ বেচে এনেছি বান্দী।
• সে হইল গৃহিণী,
আমি হলেম তার বান্দী॥

৩০। হাতে মুখ চিনে।

৩১। হাতের পাঁচটা
আঙ্গুল সমান নয়।

৩২। হাতের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলা।

৩৩। হাতের বাড়ি, পথের বন্ধু।

৩৪। হাতের শাঁখা দর্পণে দেখা।

৩৫। হাদোর গোঁসাই পরমেশ্বর।

৩৬। হাবাতে ফকির হল, দেশে ও
মন্বন্তর এল।

৩৭। হাবাতে যদ্যপি চায়, সাগর
শুকায়ে যায়।

৩৮। হাবাতে ঘটী হল, জল খেতে খেতে
প্রাণ গেল।

৩৯। হাবাতের ভুনো গ্রাস।

৪০। হায়রে আমড়া, কেবল আঁটি
আর চামড়া।

৪১। হাল যদি ধরে ঠেসে,
যায় কি তরি তুফানে ভেসে?

৪২। হাসি কান্না বোঝা যায় না।

৪৩। হিতে বিপরীত।

৪৪। হিন্দুর গরু মুসলমানের হারাম।

৪৫। হিন্দুর ঘরের বিড়ালও আড়াই
অক্ষর পড়ে।

৪৬। হিসাবের গরু বাঘে খায় না।

৪৭। হুকুমে হাকিম চলে।

৪৮। হুজুরের মজুরও ভাল।

৪৯। হুর্ম্মোদে সাগর ছেঁচে।

৫০। হেলায় কার্য্য নাশ।

৫১। হেলে ধরতে পারে না,
কেউটে ধরতে যায়।

৫২। হেলে যায় চষ্‌তে,
বামন যায় বস্‌তে।

৫৩। হেলে যায় হাল নিয়ে,
বিধাতা যায় ভুল নিয়ে।

৫৪। হেসে হেসে কথা কয়,
এ মিন্‌সে কি পেয়াদা নয়?

৫৫। হেঁপায় পড়ে সোঁতে ভাসা।

৫৬। হোসেন সার আমল।

৫৭। হোঁদল কুঁতকুঁতে।

পুস্তক প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। ভক্তচরিতামৃত—শ্রীঅঘোর নাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মূল্য ॥৵০ আনা। এই পুস্তকে বৈষ্ণব চূড়ামণি রূপ সনাতন ও জীব গোস্বামীর জীবনচরিত বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বৈষ্ণব সমাজের এবং ভক্তিতত্ত্বের অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে। ভক্তিপিপাসু সাধকগণ এতৎ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইতে পারিবেন।

২। শ্রীমৎ রঘুনাথ দাস গোস্বামীর জীবনচরিত——সংসারে বৈরাগ্য সাধন

করিয়া ভগবদ্ভক্তি লাভে যে সাধু-জীবন লাভ হয়, রঘুনাথ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এই ক্ষুদ্রজীবনী পাঠে সংসারাসক্ত জীবের চৈতন্যোদয় হইতে পারে।

উপনিষদঃ—শ্রীসীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক অনুবাদিত এবং মূল ও টীকা সহিত প্রকাশিত, মূল্য ১ টাকা। এই পুস্তকে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য এই ছয়খানি উপনিষদ সন্নিবেশিত আছে। উপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পরম সহায়। এরূপ গ্রন্থ বিশুদ্ধরূপে মুদ্রিত ও বঙ্গীয় পাঠকদিগের উপযোগী করিয়া গ্রন্থকার সাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

৪। ভক্তিসাধন ১ম খণ্ড,—মূল্য ॥০ আনা। মহাত্মা থিয়েডোর পার্কারের উপদেশ বাবু বিপিন চন্দ্র পাল বঙ্গভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি ইহা সম্পূর্ণ করিয়া ধর্ম্মার্থীদিগের বিশেষ অভাব পূর্ণ করিতে সমর্থ হউন এই আমাদের প্রার্থনা। ভক্তি কেবল ভাব নয়, কিন্তু জীবনে ঈশ্বরানুগত্য, পার্কারের এই সার উপদেশ সকলের শিক্ষণীয়।

নূতন সংবাদ।

১। রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়বাহাদুর গত ২৬এ চৈত্র জননী বঙ্গভূমিকে শোকসাগরে মগ্ন করিয়া পরলোক যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার স্মরণার্থ অনেক স্থানে অনেক সভাসমিতি হইতেছে। গত ৪ঠা মে টাউন হলে এক বিরাট সভা হইয়া স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের অর্থসংগ্রহার্থ এক বৃহৎ কমিটী নিযুক্ত হইয়াছে। বঙ্গমহিলাদিগের অনেকে যেমন শোক করিয়া পত্র লিখিতেছেন, এই পবিত্র কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ সহায়তা করা কর্ত্তব্য।

২। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলের ফল বাহির হইয়াছে। প্রবেশিকা পরীক্ষায় ৫৩৯২ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২২৬৯ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে;—১ম বিভাগে ৩৯৯, ২য় বিভাগে ৯৩৩ এবং ৩য় বিভাগে ৯৩৭ জন। ২৪ জন পরীক্ষোত্তীর্ণা বালিকার মধ্যে ১ম বিভাগে ৫, ২য় ১২ এবং ৩য় বিভাগে ৭ জন।

এফ এ পরীক্ষায় ৯২৬ জন উত্তীর্ণের মধ্যে ১ম বি ৪২, ২য় বি ২৩১ এবং ৩য় বি ৬৫৩ জন।

বিএ পরীক্ষায় অনর শ্রেণীতে ১০৩ এবং পাসে ৪৩৮ মোটে ৫১১ জন উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বেথুন কলেজের দুইটী ছাত্রী বিএ হইয়াছেন, তন্মধ্যে একজন সংস্কৃতে অনর পাইয়াছেন।

৩। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবারীর সহিত যুবরাজ-কন্যা কুমারী মডের শুভ বিবাহ হইবে স্থির হইয়াছে। মহারাণী এ বিবাহে মত দিয়াছেন।

৪। এক পণ্ডিত গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন একটী শামুকের এক মাইল পথ ভ্রমণ করিতে ১৪ দিন ৫ ঘণ্টা লাগে।

৫। কলিকাতার বিডন্ ষ্ট্রীটে বিবি থোবরন্ এবং আর কয়েকটী হিতৈষিণী রমণী নিরাশ্রয় রমণীদিগের জন্য একটী প্রকাণ্ড গৃহ খুলিয়াছেন। আমরা আশা করি হতভাগ্য রমণীগণ এই মহাপ্রাণা মহিলাগণের সাহায্যে সাধু ভাবে জীবন কাটাইতে সমর্থ হইবে।

৬। ইংলণ্ডেশ্বরী উইণ্ডসর পরিত্যাগের পূর্ব্বে গাড়ী হইতে পড়িয়া গিয়া জানুতে আঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, এখন সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়াছেন।

৭। সম্প্রতি এক শিল্পকার হীরক শলাকা দ্বারা এক খণ্ড কাচের উপরে এত ক্ষুদ্র অক্ষরে (Lord's prayer) খ্রীষ্ট উপদিষ্ট প্রার্থনা লিখিয়াছেন যে এক বুরুলের ৮০০০ ভাগের এক ভাগে তাহা সম্পন্ন হইয়াছে। অবশ্য, অণুবীক্ষণ দিয়া পড়িতে হয়।

৮। আফ্রিকা উকঙ্গা নদীর তীরে নরমাংসভুক্ রাক্ষসদিগের ভয়ানক প্রাদুর্ভাব। বাজারে আস্ত একটা মানুষ কিনিতে না পারিলে দশ জনে মিলিয়া কেহ হস্ত, কেহ পদ, কেহ মস্তক ক্রয় করিয়া থাকে। বিক্রেতা জীবন্ত মানুষটীকে বধ করিয়া সেই অঙ্গ গুলি কাটিয়া ক্রেতাদিগকে বিভাগ করিয়া দেয়!

৯। সম্প্রতি গ্রিসে আর একটী ভূমিকম্প হইয়াছে। আটলাণ্টিক্ ও থিব্স্ এক কালে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থানে গির্জ্জা ঘর পড়িয়া উপাসক মণ্ডলীকে কবরসাৎ করিয়াছে। কোন২ স্থানে বাড়ী ভাঙ্গিয়া সমগ্র পরিবার ভূগর্ভসাৎ হইয়াছে !!

১০। আমেরিকায় সৌন্দর্য্য শিক্ষার জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। যুবতীরা তথায় সুন্দর মুখভঙ্গী ও চাল চলন শিখিয়া থাকেন।

১১। আলবানীতে ১০০০০০ একলক্ষ লোকের বাস। তাহার মধ্যে ১৫০০০ শ্রমজীবিনী স্ত্রীলোক।

১২। ম্যানওয়াই প্যালিডো নাম্নী স্পেন দেশের একমাত্র স্ত্রী উকীল যুবতী ও পরমা সুন্দরী। বিশ্ব প্রদর্শনীতে স্পেন বিভাগের পুরোভাগে তাঁহার ছবি ছিল।

১৩। কুমারী লিলিয়ান মেরিট্ নাম্নী ইংরাজ মহিলার আশ্চর্য্য স্মরণশক্তি। তিনি শত শত অঙ্ক কেবল মনে রাখিতে পারেন, এরূপ নহে, কিন্তু মনে মনে তাহাদের যোগ, বিয়োগ, গুণন, ভাগ প্রভৃতি যদৃচ্ছাক্রমে করিতে পারেন।

বামারচনা।

শুভাশীর্ব্বাদ।

১৩০১ সাল—১২ই বৈশাখ।

প্রাণাধিকা !

কুমারী প্রিয়বালা বসু,

আয়ুষ্মতীষু।

বিষাদে সুখের স্মৃতি
আঁধারে মধুর বাঁশি,
বিপদে দেবের বর
হতাশে উদ্যম রাশি ;
কাঙ্গালের ধন মোর
প্রাণময়ী প্রিয়বালা,
শুভ বিয়ে আজি তোর
গেঁথে দিব ফুলমালা ;
আরো দিব কোটী চুমো
হৃদয়ের সোহাগিনি,
কি আর তোমারে দিব—
তোর "মা" যে "ভিখারিণী"—
চাহিনা সাজাতে প্রিয়,
সোণা, মণি মুকুতায়,
ও গুলো কঠিন বড়,
ব্যথা পাছে লাগে গা'য় ;
ফুলময়ী মেয়ে মোর
ফুলমালা গলে পর,
ফুলের সৌরভ ঢেলে
ঘর আমোদিত কর।
দেবতার হয়ে প্রিয়
দেবতার কাজে থেক,
"দীনবন্ধু দয়াসিন্ধু"
তাই সদা মনে রেখ।
সুখে প'র রাঙা শাড়ী
হাতে লোহা ক্ষয়ে যা'ক্ ;
চির দিন সিঁথি যুড়ে
অক্ষয় সিঁদূর থা'ক্।
পতি অনুকূল যার
তারে বলি "রাজরাণী,"
তুমিও মা প্রিয়বালা !
হও রাজ-রাজেন্দ্রাণী !
সোণার জীবন তোর
হো'ক্ চির সুধাময়,
হো'ক্ মা তোমার ঘরে
নিত্য সত্য সুখোদয়।
যে দেশে সাবিত্রী সীতা
অন্নদা জনমভূমি,
মনে রেখ মনোরমে,
সে দেশে এসেছ তুমি।
আপদ বালাই সব
যা'ক্ তোর শত দূরে,
হো'ক্ তোর বাস শুধু
আনন্দ সুখের পুরে।
বিধাতা করুন তোরে
সতী পতিপ্রাণা মেয়ে,
নারীর ভূষণ আর
কিছু নাই তার চেয়ে !

* * *

বেশি কি বলিব প্রিয়,
কত কি পরাণে ভাসে,
ভয় করে শুভ দিনে
পাছে চোখে জল আসে !
তোর লাগি বিভু পদে
এই শুধু ভিক্ষা চাই,
কাঁদিয়া জনম গেল,
হেসে হেসে ম'রে যাই !

আশীর্ব্বাদিকা
তোমার "মা।"

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৩ সংখ্যা | জ্যৈষ্ঠ ১৩০১—জুন ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

ইংলণ্ডেশ্বরী—মহারাণী বিক্টোরিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া উইণ্ডসর প্রাসাদে বাস করিতেছেন। মহারাণী আগামী ২৪এ মে ৭৫ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৭৬ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। পরমেশ্বর তাঁহাকে চিরজীবিনী ও স্থিরসুখিনী করুন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল—নিম্নলিখিত রমণীগণ নিম্নলিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। বি এ—সরলাবালা রক্ষিত, সংস্কৃত অনর ২য় বিভাগ. হেমপ্রভা বসু। এফ এ,—ক্ষীরোদকুমারী ঘোষ ৩য়, গ্রিণিং মেরী ৩য় বিভাগ।

প্রবেশিকা	বিভাগ	বিদ্যালয়।
শিশির কুমারী বাগচী	১ম	ব্রাহ্মবালিকা
ইলাইজা বলষ্ট	,,	ওব্রায়েন্স স্কুল
লিলী ক্রিশ্চিয়ান্	,,	লোরেটো
ক্লেয়ার ডি ভেয়ার	,,	ঐ
মেরী স্মিড	,,	লোরেটো
এমী রাইপার	,,	ডবটন
নলিনী বন্দ্যো।	২য়	বেথুন
সুলতা সরকার	,,	ঐ
চন্দ্রপ্রভা বিশ্বাস	,,	ঐ
সরোজিনী ঘোষ	,,	ঐ
লিলিয়ান ডিক্রুজ	,,	ডবটম
আগ্নেস ডি মণ্টি	,,	ঐ
শরৎবালা ঘোষ	,,	ক্রাইষ্ট চর্চ্চ
হজ মার্গারেট	,,	লোরেটো
রাচেল হাউয়ার্ড	,,	ওব্রায়েন্স
ই. এ. ওঝলী	,,	লামাটিনিয়ার
প্রেমদা দাস	,,	ব্রাহ্মবালিকা
শৈলবালা হাজরা	৩য়	বেথুন
সরলাবালা মিত্র	,,	ঐ

মৃত্যু—স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেনের পুত্রবধূ ও শ্রীমান্ করুণাচন্দ্র সেনের পত্নী মনোমোহিনীর পরলোকপ্রাপ্তি সংবাদে

আমরা শোকসন্তপ্ত হইয়াছি। ইনি নানা গুণে গুণবতী ও গৃহের গৃহলক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। পরিচারিকা সম্পাদন করিয়া স্ত্রীজাতির অনেক উপকার করিয়াছেন। ইহাঁর আত্মা স্বর্গের শান্তি ও অমৃত লাভ করিয়া শীতল হউক।

বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আরও দুইজন প্রসিদ্ধ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পরলোক গমন করিয়াছেন:—বাবু কালীচরণ ঘোষ ও বাবু ব্রহ্মনাথ সেন। সাধারণ হিতকর কার্য্যে ইহাঁদের যথেষ্ট অনুরাগ ও উৎসাহ ছিল। ডুমরাওনের মহারাজ কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন।

কুমারীকলেট—আমরা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ বিদুষী ও ভারত-হিতৈষিণী সোফিয়া ডবসন কলেট গত ২৭শে মার্চ্চ মানবলীলা সম্বরণ করিয়াছেন, ইহাঁর বিশেষ বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে। বামাবোধিনীর সহিত ইহাঁর ২০বৎসরের অধিক কালের যোগ। ঈশ্বর ইহাঁর আত্মার শান্তি ও কল্যাণ বিধান করুন।

নূতন ট্রামওয়ে—কৃষ্ণনগর হইতে নদিয়া শান্তিপুর দিয়া একটি ট্রামওয়ে নির্ম্মাণার্থ ছোট লাট অনুমতি দিয়াছেন।

দান—জন ক্লার্ক নামক এক সাহেব খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারার্থ ভারত খ্রীষ্টান সমিতিতে ৩৭ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন।

পাশ্চাত্য স্ত্রীলোকদিগের উচ্চ শিক্ষা—সেণ্ট এণ্ড্রুস বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৭৭ সাল হইতে স্ত্রীলোকদিগকে পরীক্ষা করিতেছেন, ইতিমধ্যে তথায় ৬৬০৫ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে ১২২৩ জন L. L. A অর্থাৎ সাহিত্যে পারদর্শিনী উপাধি পাইয়াছেন। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে গত জুলাই মাসে ২৭০ জন মহিলা প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন; একটী মহিলা L. L. B., চারিটী M. D., ছয়টী M. B., বারটী B. S. S. এবং ছয়টী M. A. ও উনআশীটী B. A. উপাধি পাইয়াছেন। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৬৩ সাল হইতে স্ত্রীলোকের প্রবেশাধিকার হইয়াছে। কুমারী রামসে সিনিয়র ক্লাসিক অর্থাৎ গ্রীক লাটিন পরীক্ষায় উচ্চ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। কুমারী ফসেট সে বৎসরের সিনিয়র র‍্যাঙ্গলারকে হারাইয়া দিয়াছেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮৮৪ সালে, মেলবোর্ণ ১৮৮০, এবং ম্যানচেষ্টারের বিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৮৮৩ সালে মহিলা-পরীক্ষার্থিনী লইতে আরম্ভ করিয়াছেন। ক্রিশ্চিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার পরীক্ষায় স্ত্রীলোকেরা উচ্চস্থান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ঝুরিচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১১১ জন বালিকা গত বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

সেবানন্দ।

ইষ্টদেবের সেবা করিয়া যে আনন্দ হয়, তাহাকে যদি জীবের একটা অর্থরূপে পরিগণিত করা যায়, তাহা হইলে স্বার্থ-শূন্য জীব নাই। কিন্তু এরূপ সেবানন্দ বাসনা বা ভক্তিকামনা লৌকিক অর্থ মধ্যে পরিগণিত হয় না। সেবানন্দ বা ভক্তিবাসনাকে নিষ্কাম ধর্ম্মই বলা হইয়া থাকে, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ভক্তিবাসনা বা সেবানন্দই জীবের চরম লক্ষ্য।

ইহ সংসারের লৌকিক জীবন হইতেই ভক্তিবাসনা ও ইষ্টদেব-সেবার সূত্র-হইয়া থাকে এবং মানুষের সেই ভাব বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কেমন আশ্চর্য্যরূপে পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বালক বালিকারা প্রথমে পিতামাতা ভিন্ন আর কিছুই ধরিতে পারে না। ইহাও যে তাহারা ইচ্ছা বা জ্ঞান পূর্ব্বক ধরে, তাহাও নহে। পিতা মাতা তাহাদিগের লালন পালন করেন এবং অন্নাদি দানে বাঁচাইয়া রাখেন, অতএব তাঁহাদের অনুগত হওয়া উচিত, এ জ্ঞান তখন তাহাদের থাকে না। স্বজাতীয় পদার্থ গণের মধ্যে যে একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, বালক বালিকাগণ প্রথমে যেন সেই শক্তির বশেই বাল্যজীবনে পিতা মাতার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সন্তানের প্রতি পিতা মাতার ভাব সম্পূর্ণ পরিস্ফুট;—তাহার নাম স্নেহ বা বাৎসল্য। এই স্নেহ দেবতার প্রতি প্রযুক্ত হইলে তাহা এক প্রকার সেবা বলিয়া কথিত হয়; তাহার নাম বাৎসল্য সেবা।

পিতা মাতার প্রতি বালক বালিকার যে ভাব, তাহা বয়োবৃদ্ধি সহকারে ভক্তি ও প্রীতিরূপে পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভক্তি বা প্রীতি, এবং সন্তানের প্রতি পিতা মাতার বাৎসল্য যেমন অবস্থা বিশেষে নিষ্মল হয় না; তেমনি মনুষ্যের দেব-ভক্তিও অবস্থা বিশেষে নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ হয় না। তাহাদিগের মধ্যে একটা কামনা অন্তঃসলিলা নদীর ন্যায়, অলক্ষিত ভাবে প্রবাহিত হইয়া থাকে। "সন্তান আমা-দিগের অসময়ে করিবে" সন্ততি-বৎসল পিতা মাতার মনে এই ভাব যে কিছু কালের জন্য না থাকে এমন নহে এবং "পিতা মাতা হইতে আমরা কতই উপকার পাইয়াছি এবং পাইব" পিতৃমাতৃভক্ত সন্তানগণের মনে যে এই ভাব থাকে না, তাহাও নহে। তবে উভয়েরই এমন একটা সময় আছে, যখন ঐ ভাব বিশুদ্ধ হইবার অবসর পায়। মনে কর, সন্তান এককালে অকর্ম্মণ্য ও চিররুগ্ন,—কোন কালেই তাহা হইতে বিন্দুমাত্র উপকার পাইবার সম্ভাবনা নাই,—অথচ পিতা মাতা অকাতরে ও অবিরক্তচিত্তে তাদৃশ সন্তানের লালন পালন বা সেবাশুশ্রূষা

করিয়া কর্ত্তব্যপালন জন্য বিমল আনন্দ ভোগ করিতেছেন। পিতা মাতাও জরা জীর্ণ, সকল কর্ম্মের বহির্ভূত ও সংসারের ক্ষতিজনক হইয়া পড়িয়াছেন, অথচ সন্তান সহস্র ক্ষতি ও অসুবিধা স্বীকার করিয়াও অক্লিষ্ট অধ্যবসায়ে তাঁহাদিগের সেবা করিতেছেন এবং সেই জন্য প্রচুর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই গুলিই ইহ সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, সেবানন্দ, বা প্রেম-ভক্তি-বাসনা, যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পার। কিন্তু দৈব—সংসারের নিষ্কামধর্ম্ম, ইহা অপেক্ষা অতিশয় কঠিন; কেননা জীবের ইষ্ট দেবতা কখনই অকর্ম্মণ্য, রুগ্ন, জরাজীর্ণ, ও ক্ষতিকারক হয়েন না;—তিনি সদা সর্ব্বক্ষণই সুপ্রসন্ন ও বরপ্রদ; দয়াশীল ও দাতা,—করুণাময় ও কল্পতরু। এ হেন ইষ্টদেবের নিকট কিঞ্চিদপি কামনা না জানাইয়া কেবল সেবানন্দে বিভোর হইয়া থাকা বিশেষ ভাগ্যবল-সাপেক্ষ। তবে ভরসা এই যে, নিরপরাধ হইয়া ভজন করিলে কখন না কখন জীবের এ ভাগ্য ঘটিতে পারে। তাহা কোন্ অবস্থায় কিরূপে হইতে পারে, পরে তাহা দেখাইবার চেষ্টা করা যাইবে।

যে উপাসনায় ভক্তি ও নিষ্ঠা আছে, তাহা যে আকারে হউক, ফলপ্রদ। নিরাকার চিৎ-স্বরূপের উপাসনা মুখ্য সাধনা হইলেও নিম্ন অধিকারিগণ সাকার উপাসনাদ্বারা ভগবৎ সেবার অধিকারী হন। আমরা এই প্রবন্ধটীতে সাধকের ক্রমোৎকর্ষ দেখাইবার চেষ্টা করিব; এই জন্য সাকার উপাসক হিন্দুগণের উপাসনা প্রণালী হইতে উদাহরণাদি সংগ্রহ করিতেছি কেননা এমন অধিকার ভেদ প্রথা আর কোন উপাসনায় দৃষ্ট হয় না।

যেমন বালক বালিকাগণ প্রথমে পিতা মাতা ভিন্ন জানে না; সেইরূপ উপাসক সম্প্রদায় মধ্যে যাঁহারা বালক বালিকা, তাঁহারা প্রথমে শ্রীভগবান্‌কে পিতা মাতারূপেই দর্শন করিয়া থাকেন। এই জন্য প্রথমাবস্থাপন্ন উপাসকগণকে প্রায়ই হর পার্ব্বতীর উপাসক হইতে দেখা যায়। তাঁহারা সদাশিবকে জগৎ পিতা ও পার্ব্বতীকে জগৎজননী বলিয়া পূজা করেন। মহাদেব স্বয়ং তমোগুণাবলম্বী হইয়াও সাধককে ক্রমশঃ রজঃ ও সত্ত্বের দিকে অগ্রসর করিয়া দেন। মানবগণ যেমন বয়োবৃদ্ধি সহকারে ক্রমশঃ বন্ধু বান্ধব ও স্ত্রী-পুত্রাদির প্রতি আসক্ত হইতে থাকে, উপাসকেরও ক্রমশঃ শ্রীভগবানের সহিত ঐরূপ সম্বন্ধ সকলের সৃষ্টি হয়। বয়োবৃদ্ধি সহকারে মানুষের আরও একপ্রকার সম্বন্ধ ঘটে, তাহার নাম প্রভুর নিকট দাসত্ব। ক্রমশঃ শ্রীভগবানেও উপাসকের ঐরূপ সম্বন্ধ সৃষ্ট হয়। শ্রীভগবান প্রভু, আমি তাঁহার দাস, উপাসকের এই ভাব বিশ্বজনীন ও জীবন ব্যাপক। বহুতর সাধকের ঐ ভাব পরিপক্ক হইয়া আমরণ রহিয়া যায়। এমন কি অনেক ভক্ত দাসত্বের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া নির্ব্বাণ মুক্তিও পায়ে ঠেলিয়াছেন। যেহেতু—

"——ভবান্ প্রভুরহং দাস
ইতি যত্র বিলুপ্যতে।"

লৌকিক লীলায় দৃষ্ট হয়, মানবগণ প্রায়ই বাল্যজীবন অতিক্রম করিয়া জীবিকাদি সূত্রে একটী প্রভুর অধীন হইয়া পড়ে। এই জন্য দাস্য ভাবকে উপাসকের দ্বিতীয় সোপান বলা যায়।

যে সময়ে শ্রীভগবান্ সাধকের মনে পিতৃ মাতৃভাবে বা প্রভুভাবে বিরাজ করিতে থাকেন, সেই সময়েই ভগবান্ যে পর নহেন, সর্ব্বাপেক্ষা আপনার জন,—এমন কি ঠিক্ যেন সুখের সুখী, দুঃখের দুঃখী, বন্ধু বান্ধবের মত, তাঁহার কাছে মনের সকল কথাই বলা যায়,—তিনি যেন আমার সকল গুহ্য কথা লুকাইয়া রাখিবেন,—এইরূপ একটী ভাবের সূত্রপাত হয়। পতিপরায়ণা যুবতী স্ত্রীকেও এই বন্ধু বান্ধবের মধ্যে ধরা যাইতে পারে। ক্রমোৎকর্ষশীল সাধকের মনে এই ভাব ক্রমশঃ এত বলবৎ হয় যে, পূর্ব্ববর্ত্তী দুইটী ভাবকে আপনার অন্তর্ভূত করিয়া ফেলে। তখন পিতৃমাতৃ ভাব ও প্রভুভাব অধিক স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না বলিয়া এককালে নষ্ট হইয়া যায় না। শ্রীরাম চন্দ্রের প্রতি গুহকাদির, শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজবালার ও ব্রজ রাখালগণের—শ্রীমান্ কৃষ্ণ চৈতন্যের প্রতি পুরুষোত্তম, নিত্যানন্দাদির এই ভাব!

যখন মানুষ এক দিকে পিতামাতার স্নেহবাৎসল্যলাভে কৃতার্থ হইতেছেন, *অন্য দিকে প্রভুর কৃপা কটাক্ষে প্রীত হইতেছেন, আর এক দিকে হৃদয়বন্ধু*গণের সহিত প্রণয়-কেলি করিয়া আনন্দসাগরে ভাসমান হইতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গরূপিণী পরম প্রণয়িনী যুবতী ভার্য্যার গর্ভে একটী পুত্র সন্তান জন্মিলে তাঁহার মনে কি ভাবের উদয় হয়, তাহা তিনিই জানেন, যে ভাগ্যবানের ভাগ্যে এরূপ ঘটনা ঘটিয়াছে। এরূপ ভাগ্যবানের সংখ্যা সংসারে যে নিতান্ত অল্প, তাহাও নহে। ফলে তখন যেন পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী ভাব নদীর আকার ধারণ করিয়া এই ভাবসমুদ্রে প্রবেশ করে। এখানেও স্মরণ করাইয়া দিতেছি, পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবত্রয় এই সমুদ্রে প্রবেশ করে বটে; কিন্তু একেবারে তলাইয়া যায় না,—মধ্যে মধ্যে ভাসিয়া উঠে,—বেশ দেখা যায়। আবার দেখা যায় বটে, কিন্তু সে সকলের প্রতি আর পূর্ব্ববৎ উন্মত্ত ভাব থাকে না। এখন "সবধন নীলমণি।'

তেমনি শ্রীভগবান্ পূর্ব্ববর্ত্তী ভাবময় দেহ ধারণ করিয়া সাধকের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে ক্রমশঃ উপরি উক্ত পুত্রের আকার ধারণ করিয়া বসেন। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে পিতৃ মাতৃরূপে,—প্রভুরূপে,—বা সখা সখীরূপে সাধককে যে আনন্দ প্রদান করিতেন, এখন পুত্ররূপে সেই সকল সুখ একীভূত করিয়া এবং তাহার উপর আরও শতগুণ বিচিত্র সুখের আবরণ দিয়া সাধককে প্রদান করিতে থাকেন। পুত্ররূপী শ্রীকৃষ্ণ

নন্দযশোদার (ভক্তগণের) সহিত যে বাৎসল্যরসের লীলাখেলা করিয়াছেন, তাহা ভক্তের বোধগম্য, তাহার সম্যক্ বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে আমাদের যেন কেমন একটু সঙ্কোচ হয়।

শ্রীভগবানের প্রতি কোন্ অবস্থায় কিরূপে নিষ্কাম ভক্তি হইতে পারে, আমরা তাহা দেখাইবার চেষ্টা করিব, এই প্রবন্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন স্থলে এরূপ প্রতিজ্ঞা আছে। বালক বালিকার যত-দিন পিতৃমাতৃ-আনুগত্য পরিত্যাগ করিবার উপায় থাকে না, ততদিন তাহাদিগের পিতামাতার প্রতি যে ভাব টুকু থাকে, তাহা বিশুদ্ধ এবং তৎকাল মধ্যবর্ত্তী পিতামাতার বাৎসল্যও বিশুদ্ধ। এই জন্যই বৈষ্ণবদিগের নিকট শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের কৈশোরলীলা! সর্ব্বপ্রকার স্বার্থশূন্য হইয়া পরের সুখে সুখ, দুঃখে দুখ;—এভাব যদি নরলীলার কোন স্থলে থাকে, তাহার একটী স্থল বালক সন্ততির প্রতি পিতামাতার ভাব। আর একটী স্থল পরে দেখাইব। যাহাহউক, ভক্তের মনে ভগবানের প্রতি পুত্র ভাব, সাধনার পরাকাষ্ঠা না হইলেও, সাধনার উচ্চতর একটী ভাব বলা যাইতে পারে। এই শ্রেণীর ভক্তগণের মধ্যেই শ্রীভগবান্ "স্নেহের পুতুল,—দুধের গোপাল,—গৌরগোপাল, যাদু,—বাছা,—"ইত্যাদি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যে সকল সাধকের মনে এই ভাবের ছায়া আদৌ পতিত হয় নাই, তাঁহাদের কর্ণে ঐ শব্দগুলি বাতুল প্রলাপ বোধ হইবারই কথা। হয়, হউক, তাঁহাদের সহিত এ প্রবন্ধের বড় সম্পর্ক নাই।

যেমন ব্যোম মরুতে পর্য্যবসান প্রাপ্ত হয়, মরুৎ তেজে,—তেজ অপে,—অপ্ ক্ষিতিতে পর্য্যবসিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ববর্ত্তী ভাব সকল আর একটি ভাবে সম্পূর্ণরূপে সমাহিত হইয়া থাকে। সেই ভাবই ভক্তি শাস্ত্রমতে সাধনার পরাকাষ্ঠা। সেই ভাবের নাম মাধুর্য্য বা পতিপত্নী ভাব। ভক্ত সাধক শিব-দুর্গারূপে এবং রাধাকৃষ্ণরূপে এই ভাবের সাধন করিয়াছেন। শ্রীভগবানের সহিত সাধকের পতিপত্নীত্ব সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হইলেই বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম মাধুর্য্য হয় না। লৌকিক কোন ভাবের সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে, তাহা দেখাইতেছি।

যুবক স্বামী ও যুবতী ভার্য্যার মধ্যে পতি পত্নীত্ব সম্বন্ধ আছে এবং তাহার ভাব মাধুর্য্যময় বটে; কিন্তু তাহা বিশুদ্ধ ও নিষ্কাম নহে, কেন না তাহাদের মধ্যে একটী ঐন্দ্রিয় বা কাম সম্বন্ধ আছে। সে সম্বন্ধের বশে উভয়ে উভয়ের নিকট আত্মসুখ কামনা করিয়া থাকেন। যে ভাবে এরূপ আত্মসুখকামনা, তাহাকে বিশুদ্ধ প্রীতি বা "প্রেম" বলা যায় না। তাহা কামেরই নামান্তর মাত্র।

"আত্মসুখে সুখী যেই তারে বলি কামী,
তাঁর সুখে সুখী যেই তারে বলি প্রেমী।"

এই জন্যই আমরা একস্থলে যুবতী ভার্য্যাকে বন্ধু বান্ধবের মধ্যে গণ্য করি-

য়াছি; কারণ সখা সম্বন্ধেও একটু স্বার্থগন্ধ আছে। এই কারণে যুবক যুবতীর ভাব ভগবানে প্রযুক্ত হইলে তাহা প্রকৃত মাধুর্য্যে পরিণত হয় না,—একটু নূতনত্ব রহিয়া যায়। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থলে প্রকৃত মাধুর্য্যের স্থল দেখাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, অতঃপর তাহারই প্রসঙ্গ করা যাইবে। (ক্রমশঃ)

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

বুদ্ধদেবের যখন নিত্যধন পাইবার পিপাসা বলবতী হইয়া উঠিয়াছিল, তখন তিনি দারাসুত, ভোগৈশ্বর্য্য ও রাজ্য ধনাদি অনিত্য বস্তু পরিত্যাগ করিয়া নিত্য বস্তু পাইবার আশায় যোগধর্ম্মাবলম্বন করিলেন; অনেক সাধনার পর জানিতে পারিলেন যে প্রেমই নিত্য, বিশ্বজননীর পুত্রকন্যাগণ সকলেই পরস্পর ভাইবোন, অহিংসাই পরম ধর্ম্ম, আর ভ্রাতা ভগিনীগণের শোকে সান্ত্বনা, দুঃখে সহানুভূতি ও আত্মার উন্নতি বিধান করাই মনুষ্য জীবনের কর্ত্তব্য। এই যোগ সাধনের পরই তিনি ভ্রাতা ভগিনীগণের নিকট স্বীয় মত প্রচার করিতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য যে তিনিও বর্ণভেদ, জাতিভেদ মানিতেন না, তাঁহার বিশ্বজনীন ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণে তৎকালীন লোক দলে দলে আসিয়া তাঁহার পবিত্র ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিল। কথিত আছে যে সিংহলের রাজকন্যা তাঁহার পবিত্রধর্ম্মের কিম্বদন্তীতে মোহিত হইয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিবার জন্য সওদাগরদিগের নিকট বুদ্ধকে চিটি লিখিয়াছিলেন এবং সদাশয় বুদ্ধদেবও লিঙ্গভেদশূন্য জ্ঞানে রমণী বলিয়া ঘৃণা না করিয়া পত্রোত্তরে ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উক্ত রাজকন্যাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেবের একটী আশ্চর্য্য উপদেশ ও সান্ত্বনার বিষয় শুনা যায়। তৎকালীন কোন বিধবার একটী মাত্র শিশুসন্তান কালকবলিত হইলে, সেই ব্যক্তির বিশ্বাস মত মৃত পুত্র কোলে করিয়া বুদ্ধের নিকট গমন করিয়া বলিল, প্রভো! তুমি দেবতার অবতার, আমার এই মৃত শিশুকে জীবিত করিয়া আমার জীবন রক্ষা কর।' বুদ্ধ শোকোন্মাদিনী রমণীকে সান্ত্বনা পূর্ব্বক বলিলেন—"ভগিনি! তুমি এমত গৃহ হইতে আমাকে এক মুষ্টি সর্ষপ আনিয়া দাও, যে গৃহে কখনও কাহারও মৃত্যু হয় নাই।" রমণী মৃত পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া বাড়ী বাড়ী সর্ষপ চাহিতে লাগিল, সকলেই বলিল "সর্ষপ আছে, কিন্তু এ গৃহে কেহ কখনও মরে নাই এ কথা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?"

এতক্ষণে রমণীর চৈতন্যোদয় হইল। সে বুদ্ধের কথার গভীর মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া মৃত পুত্র ত্যাগ করতঃ বুদ্ধের চরণ পান্তে আসিয়া বলিল "প্রভো! আমি বুঝিয়াছি,—মৃত্যু বিকারই জীবন, অর্থাৎ মৃত্যুই জীবনের মূল, এখন আমি তোমার শরণাপন্ন হইতেছি, আমাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান কর।" বুদ্ধদেব তাহাকে সাম্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন, রমণী বিশ্ব প্রেমে পুত্রশোক ভুলিল।

বিশ্বহিতে প্রবৃত্তি জন্মিলেই সহজে ভ্রাতা-ভগিনী মিলে, কেননা ভাল বাসিলে ভাল বাসা পাওয়া যায় এ কথা আমোঘ সত্য; তাহার প্রমাণ, বুদ্ধ, ঈশা, চৈতন্য, নানক ও মহম্মদ প্রভৃতি; কারণ তাঁহারা যেমন নিঃস্বার্থভাবে জগৎকে ভাল বাসিয়াছিলেন, জগৎও আজো তাঁহাদিগকে ভুলিতে পারে নাই, আজও সেই মহাত্মাগণের নাম শ্রবণ, গুণকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে অতি পাসণ্ডেরও প্রাণ পুলকিত ও ভক্তিরসে বিগলিত হয়। এমন পিতা মাতা কে আছেন যিনি সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শন করিলে সুখী না হয়েন? আর কেই বা এমন পিতা মাতা, যিনি সন্তানগণের অসদ্ভাবে দুঃখিত ও বিরক্ত না হয়েন? অতএব আমরা যখন প্রত্যক্ষ দেখিতে পাইতেছি যে সন্তানগণের সুখে পিতা মাতা সুখী, সন্তানগণের দুঃখে পিতা মাতা দুঃখী, আবার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলে সন্তানগণ ও পিতা মাতা সকলেই পরম সুখী, তখন বিশ্বজনক তাঁহার সন্তানগণের মধ্যে সদ্ভাব দর্শনে সুখী ও সন্তুষ্ট হয়েন, ইহাতে সন্দেহ নাই। ইহার প্রমাণ কাহারও সহিত কাহারও অসদ্ভাব ঘটিলে যুদ্ধ বিগ্রহ গালি গালাজ প্রভৃতি বিশ্বের অহিতকর ঘটনা ঘটে ও অসদ্ভাবকারীগণের মধ্যে উভয় পক্ষেই ঘোর অশান্তি অনুভব করিয়া থাকেন। আর কাহারও সহিত কাহারও সদ্ভাব থাকিলে পরস্পর আলাপেও কত সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকেন! অতএব আমাদের বিশ্বজনকের ইচ্ছা মঙ্গলময়ী, আমরা যে কোন কার্য্য করিয়া দীর্ঘকাল সুখ শান্তি অনুভব করিতে পাই তাহা ঈশ্বরানুমোদিত, নতুবা যে সমস্ত কার্য্য আপাত সুখ-শান্তি-পূর্ণ, পরিণামে বিষময়, তাহার অনুষ্ঠানে বিশ্বপিতা সন্তানগণকে কখনই অনুমতি দেন নাই। যদি কেহ বলেন যে অসৎকার্য্য করিয়াও ত লোকে সুখ শান্তি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে সেটী কখনই সুখ শান্তিকর হইতে পারে না। মনে করুন্ কোন মদ্যপায়ীর বিস্তর টাকা আছে, এবং তাঁহার স্ত্রী পুত্রেরও কোনরূপ অর্থের অভাব হইতেছে না, সুতরাং তিনি নিরুদ্বেগে মদ্য সেবন করিতেছেন, এমন কি পরিণামে অর্থাভাব ঘটিবার খুব সম্ভাবনা হইলেও না হয় ধরিলাম তাঁহার কোনও অর্থাভাব হইল না, কিন্তু এমন পীড়া আসিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিতে পারে যদ্দারা তিনি যাবজ্জীবন রোগশয্যায় শায়িত

হইয়া অতি কষ্টে কাল যাপন করেন। এইরূপ প্রত্যেক অসৎকার্য্যের ফল যে নিজের ও বিশ্বের অসুখকর, তাহার শত শত উদাহরণ আছে, অতএব অসৎ কার্য্যে যে সুখ লাভ হয় তাহা বিকৃতমস্তিষ্ক ব্যক্তির ক্ষণিক সুখ মাত্র। বিশ্বে সদ্ভাব জন্মিলে, বিশ্বের হিতের দিকে প্রবৃত্তি আপনিই চলে, এবং সেই প্রবৃত্তি দ্বারা নিজকে ও বিশ্বকে সুখী করা যায়। যদি কেহ বলেন যে সংসারস্থ সকলেই কি স্ত্রী পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া বুদ্ধ চৈতন্য ও ঈশা হইবেন? তদুত্তরে বলা যায় যে অবশ্যই নহে। হিন্দুগণ গৃহাশ্রমকে শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়াছেন, কেন না—"যথা বায়ুংসমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ। তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্ব আশ্রমাঃ॥" কিন্তু উহা অপ্রশস্তান্তঃকরণ গৃহানুরাগী স্বার্থপর ব্যক্তিগণের উপযুক্ত নহে। গৃহাশ্রমীর উচিত সর্ব্বভূতের তৃপ্তিপ্রদ হইয়া, রাজ্জাজনক হইয়া বিশ্বের হিতসাধন করা। ঈশ্বরের এমনই মহিমা যে স্বার্থের মধ্যে অলক্ষ্যে পরার্থ বিরাজ করে এবং পরার্থের মধ্যে স্বার্থ লুকাইয়া থাকে, ইহার প্রমাণ এই, আমরা যত সভ্য হইতেছি—যত বিলাসী হইতেছি—যত অভাবকে প্রসারিত করিতেছি, ততই আমাদের স্বদেশস্থ ও নিকটস্থ (আত্মীয় বর্গ) গণের কথা দূরে থাকুক, দূরস্থ ব্যক্তি বর্গের সহিত সম্বন্ধ দৃঢ়তর হইতেছে, কারণ, বস্ত্র, সাবান, সাবু, চা, কাফি, অডিকলোন, জুতো, আফিং, মদ্য, ঔষধাদি যে কিছু ব্যবহার্য্য জিনিষ আমেরিকা, ইংলণ্ড, জাপান, চীন, ল্যাপলণ্ড প্রভৃতি দেশে উৎপন্ন হয় এবং এক দেশের জিনিষ অন্য দেশে রপ্তানি হয়। এইরূপ হয় বলিয়া আমরা পরস্পরে পরস্পরের ভাল মন্দের ভাগী, যেহেতু ইংলণ্ডোৎপন্ন দ্রব্য যাহা ভারতে ব্যবহৃত হয়, সেই দ্রব্যাদি নির্ম্মাতাদিগের প্রতি যদি অধিক কর ধার্য্য করা হয় কিম্বা তাহাদের মধ্যে অনৈক্য জন্মে অথবা তাহারা অলস, বিলাসী বা রুগ্ন হয়, তাহাহইলে ভারতেরও স্বার্থে আঘাত লাগে, কেন না এরূপ স্থলে ঐ দ্রব্যাদি হয় অগ্নিমূল্য হইয়া উঠে, নয় একেবারে অপ্রাপ্য হয়, সুতরাং ভারত ইংলণ্ডের সুখ দুঃখের অংশী। 'সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎ সঙ্গে বনবাস,' এই যে প্রবচন আছে ইহার সারতত্ত্ব অনুসারে আমরা যাহাদের সহিত আলাপ কুশল, ব্যবসায় বাণিজ্যাদি করি, স্বার্থের জন্য তাহাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও সচ্চরিত্রতা কামনা করি, কেন না তাহারা রুগ্ন, কলহী ও অসচ্চরিত্র হইলে, তাহারা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হইবে, আমরাও তেমনি হইব। সুতরাং বিশ্বপিতা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমাদের যে বিশ্বপ্রেমের শিক্ষা দিতেছেন, এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ায়ও সেই বিশ্বপ্রেমের ছায়া পতিত। (ক্রমশঃ) কু, রা।

সতী ও শান্তি।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

শান্তির সমবয়স্কা একটি মেয়ে বলিলেন, আচ্ছা, দিদি, ভূত কি নাই?

শান্তি। তা কেমন ক'রে ব'লব? আমি ত কখনও ভূত দেখি নাই। ভূত আছেন কিনা ভুত ম'শায় নিজে তা বল্‌তে পারেন। কেন কিরণ, তোমাকে কি কখনও ভুতে পেয়েছিল নাকি?

কিরণ। ভুতের কথা ব'ল্লেই দিদি ঠাট্টা করেন আর ভূতের 'গল্প' শুন্‌লে আমাদের বুক গুর্ গুর্ করে, গা কাঁটা দিয়ে ওঠে। 'সেই লম্বা লম্বা ঠ্যাং, সেই লম্বা লম্বা হাত, সেই কুলোর মত দাঁত, সেই বিভীষণের মত রক্তমাখান মুখ, সেই কামারের জাঁতার মত চামড়ায় ঢাকা বুক, ধামার মত লাল টক্‌টকে দুটো চোখ্, যেন তাতে কাঠের আঙ্‌রা জ্বল্‌ছে,"—এ গল্প যখন মনে হয়, তখন গা কাঁপ্‌য়ে তোলে।

শান্তি। এ গল্পটি কার কাছে শুনেছিলে, কিরণ?

কিরণ। কেন দিদির কাছে।

শান্তি। তুমি এমন ভূত কোথায় দেখ্‌লে হিরণ?

হিরণ। দিদি, আমি কখন দেখিনি। মার মুখে শুনেছি।

হিরণের মা তথায় উপস্থিত ছিলেন, শান্তি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, 'আমি কখনও দেখিনি, তবে লোকের মুখে কতবার কত গল্প শুনেছি।' তখন শান্তি বলিলেন, ঐরূপ সকলে ব'লে থাকেন, কেহ কখন দেখেন নি, গল্প শুনে রেখেছেন। ভূত যদি থাকৃত, তা হ'লে কেহ না কেহ কখনও দেখ্‌ত। কিরণ বলিলেন, আচ্ছা দিদি, ভূত, প্রেত যদি না থাকবে, তবে ওসব কথা কোথা থেকে এল? শান্তি বলিলেন 'খরগোসের শিং' 'সোনার পাথর বাটী' 'কাঁটালের আঁবসত্ব,' 'পাঁটার গোহাড়' 'ঘোড়ার ডিম,' 'গগন ফুল' এ সকল কথা কোথা থেকে এল? তুমি কখন সোণার পাথর বাটীতে ক'রে কাঁটালের আঁব্‌সত্বের চাট্‌নী দিয়ে 'পাঁঠার গোহাড় খেয়েছ কি? কেমন লাগে ভাই? কিরণ বলিলেন, ছিঃ, তা হলে সদ্য 'মহাব্যাধ' হবে। শান্তি বলিলেন, "পাঁটার গোহাড়ে"র কথা হচ্চে, তুমি "ভগবতীর" হাড় আন্‌লে। তা যাক্ বাস্তবিক যেমন কাঁঠাল হইতে আঁব্‌সত্ব হয় না, তথাপি লোকে ব'লে থাকে "কাঁঠালের আব্‌সত্ব," বাস্তবিক "সোনার পাথর বাটী" নাই, তথাপি লোকে বলিয়া থাকে "সোনার পাথর বাটী"। এ সকল যেমন কথা মাত্র; ভূত প্রেত ডাকিনী, শাঁকিনী ও সব তেমনি কথা মাত্র। ভূত প্রেতের যে সকল "আজ্‌গুবী—আষাড়ে" গল্প শোনা

যায়, ওসব প্রায় দুষ্ট লোকের রচনা। কিরণ বলিলেন, কেন দিদি, দুষ্টলোকের ও সব গল্প রচনা ক'রে ফল কি?

শান্তি বলিলেন, যারা ঐ সব গল্প রচনা করেছে, তারা সব চোর। লোককে ঠকিয়ে খাওয়া তাদের ব্যবসা। রাত্রে ভূতের ভয়ে কেহ বেরবে না, চোরেরা সব চুরি করে নিয়ে যাবে। এমন অনেক গল্প শোনা গিয়েছে. যে কোন বাড়ীতে চোর পড়্‌বার আট দশ দিন আগে বাড়ীর মধ্যে রাত্রে খুব ঢিল পড়্‌ছে; কয়লা, হাড়, মড়ার মাথা, এই সব দু এক দিন অন্তর পড়্‌ছে। বাড়ীর লোকেরা একবারে সশঙ্কিত। বাড়ীর মধ্যে একটু টুঁ শব্দ হ'লেই মনে করে ঐ ভূত এসেছে, আর নিস্তার নাই। কিসে ভূতের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়? বাড়ীর বিধবা ঠাকুরমা ব'ল্‌ছেন, "আমি ছেলেদের বার্‌ বার্‌ বলি, তোরা বাপু গয়ায় যা, পিণ্ডি টিণ্ডি দিয়ে আয়্‌। বুড়োটা আর কত দিন ঐ রকম করে বেড়াবে। তা, ওরা বলে, "একবারে যাব।" তা, আমি অভাগী ম'র্ব্বো না, আর ওঁর উদ্ধারও হবে না।" বাড়ীর বড়বৌ বলিতেছেন, সেজো বৌর ছোট ছেলেটা ম'ল, "দুপো দোষ"পেলে, তা সে দোষ কাটিয়ে দিলে না। সাধে কি আর এ ভূতের অত্যাচার হয়? কেহ ব'লছেন "শান্তি স্বস্ত্যয়ন" কর, কেহ বলিতেছেন "গ্রহযাগ" কর, এইরূপে নানা জনে নানা কথা বলিতেছেন। দেখ্‌তে দেখ্‌তে অমাবস্যা এসে পড়্‌ল, সারা রাত্‌ অন্ধকার। আর ঐ অমাবস্যা রাত্রিতে ভূত, প্রেত, ডাকিনী; শাঁকিনীর মাহেন্দ্র যোগ। ছানা পোনা কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে সারা রাত্‌ নেচে বেড়ায়। যে বেরয়, তার ঘাড় মুড় ভেঙ্গে রক্ত খায়। কার ঘাড়ে দুটো মাথা, যে আজ্‌ রাত্রে বের'বে। ঐ যে ঘরের দরজা বন্ধ হ'ল, সারা রাতের মত। চোর এদিকে এসে ধানের মরাই কেটে সারা-রাত্‌ ধান ব'য়ে নিয়ে যাক্‌। ভোর হ'তে না হ'তে দু কাহন ধান পাতার্‌। সকাল হ'ল। কাক কোকিল ডাক্‌ল। বাড়ীর কর্ত্তা গিন্নী "দুগ্‌গা" বলে শয্যা ত্যাগ ক'র্লেন, চোক্‌ মুচ্‌তে মুচ্‌তে বের্‌য়ে এসে দেখেন এই কাণ্ড। সর্ব্বনাশ! দেখেই অমনি মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়্‌লেন। চৌকিদার ডাক্‌, পুলিস ডাক্‌, তদন্ত কর্‌। আর তদন্ত। চোর যখন "থানা পার" হয়েছে, তখন আর তাকে ধরে কে? বাড়ীর ঠাকুর মা ব'ল্‌ছেন, "আমি ঠাওর পেয়েছিলেম গো! যখন শব্দটা হ'ল, আমি মনে কল্লেম, আজ অমাবস্যা রাত্‌, বোধ হয় বাড়ীতে মড়ার মাথা পড়্‌লো, পর পর অনেক বার শব্দ হ'ল। আমি মনে কল্লেম, মড়ার মাথাটা বোধ করি উঠনে গড়িয়ে বেড়াচ্চে, আমি অম্‌নি রাম—রাম—রাম—রাম কত্তে লাগ্‌লেম। আর ঐ রাম নাম কত্তে কত্তে ঘুমিয়ে পড়্‌লেম। হায়, হায়, আমি অভাগী যদি তখন উঠি,

তা হ'লে আর এ সর্ব্বনাশটা হয় না। দেখ দেখি বোন্, তুমি ব'লছিলে কি অনিষ্ট হয়? এই দেখ কি হ'ল? যে সব ভূত প্রেতের গল্প শোনা যায়, ওসব চুরী ক'রে লোক ঠকাবার ফন্দি। ঐ গল্প শুনে মূর্খ লোকে বিশ্বাস করে, সত্য সত্য ও সব কিছুই নয়। মানুষের অনেক দুঃখ কষ্ট আছে। তার সঙ্গে আবার ভূত প্রেত ইত্যাদির মিথ্যা ভয় বাড়িয়ে কষ্ট বাড়ান নির্ব্বোধের কাজ।

ত্রিকাল।

অতীত।

যাহার অভাব হয়
ভাল লাগে বুঝি তারে,
সমুখে থাকিলে তার
সমাদর জানিনারে!
অতীত চলিয়া গেছে
স্মৃতি হৃদে লেখা আছে,
কেন বা চলিয়া গেল
কেন না রহিল কাছে!
যে দিন চলিয়া গেছে
সেদিনত ছিল ভাল,
অনাদরে অবহেলে
বুঝি বা চলিয়া গেল!
অতীত সেদিন গুলি
আর না আসিবে হায়!
এলে সমুচিতাদরে
প্রাণ ভরে তুষি তায়।
এখনো সে অতীতের
উজল কিরণ রেখা
হৃদয় নিভৃত কক্ষে
রয়েছে সুন্দর লেখা;
এখনো সে অতীতের
হরিষে আশার আঁকা
চিত্র খানি রহিয়াছে
পরাণে পরাণে মাখা;
এখনো সে অতীতের
সুন্দর মোহন ছবি
হৃদয় আকাশে যেন
উষার লোহিত রবি;
এখনো সে অতীতের
বাজানো বীণার তার,
মরুময় হৃদয়েতে
বরষিছে সুধাধার।

বর্ত্তমান।

চলিয়াছে বর্ত্তমান
ভবিষ্যতে লক্ষ্য করি,
ভাসিতেছে জীবকুল
ঘটনার স্রোতোপরি,
ঘটনার প্রতিকূল
যাইবারে কত জন
যুঝিছে ভাগ্যের সনে
করি যত্ন প্রাণপণ।

কত জন বর্ত্তমান
ঘটনা স্রোতেতে ভাসি
সুখের স্বপন কত
হেরিতেছে রাশি রাশি।
কতজন ক্ষুদ্র বাহু
করিতেছে সঞ্চালন,
তাড়াইয়া বর্ত্তমানে
লভিতে অমূল ধন।
কতজন পোষা আশা
সফল করিবে ব'লে
ভাবিতেছে বর্ত্তমান
দিনটা যাউক চ'লে।
সুখী জন ভাবিতেছে
'যাক চলি বর্ত্তমান,
আরও অধিক সুখ
নাচাইবে মনঃ প্রাণ।'
দুঃখীজন ভাবিতেছে
যাক এই বর্ত্তমান,
তা হলে হইবে মম
এ দুঃখের অবসান।'
কিন্তু থাক থাক থাক
থাক তুমি বর্ত্তমান,
কি দিন আসিবে বলে'
ভয়েতে আকুল প্রাণ!

ভবিষ্যৎ।

ভাবি! তুমি মম ঠাঁই
ভীষণ মূরতি হও,
কাঁপে প্রাণ তব নামে
রও তুমি দূরে রও।

কেন যে গভর তব
পূর্ণ অন্ধকার রাশি,
কেন যে তোমার নামে
মনে এত ভয় বাসি,
কেন যে তোমার নামে
দুরু দুরু কাঁপে হিয়া
সাধ হয় তব হাত
এড়াই পরাণ দিয়া,
অন্যের আরাধ্য হ'য়ে
কেন যে আমার ঠাঁই
ভবিষ্যৎ! বিন্দু মাত্র
তোমার আদর নাই,
তাহা কি বুঝিবে তুমি!
তুমিত অনন্ত-কণা,
ক্ষুদ্র, ভগ্ন জীবনের
কি যাতনা তা জাননা,
হতাশ জীবন মাঝে
কি যে ভয় সদা জাগে,
আমিও তোমার মত
নাহি জানিতাম আগে।
প্রতিপদে ভগ্ন আশ
হয়েছি, এখন তাই
স্মরিলে মূরতি তব
পরাণে চমক পাই,
তব চিত্র কল্পনাতে
কাঁপে হিয়া থর থর,
তাইতে চাহেনা প্রাণ
হতে আর অগ্রসর।

কু, রা।

৺ মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ঢালি নব ছাঁচে বাঙ্গালা ভাষারে
সাজাইলা নব রঙ্গে,
নর নারী সব নিরখি তাহায়
ভাসিল ভাব তরঙ্গে।
লেখনী প্রসঙ্গ সকলেরি মুখে
ঘরে ঘরে আলোচনা,
দুর্গেশনন্দিনী কপাল কুণ্ডলা
উপন্যাস অতুলনা।
ভাষার মাধুরী রচনা চাতুরী
লিপির নৈপুণ্য কত,
কিবা কাব্যরস বিষবৃক্ষে মধু—
ক্ষরিতেছে অবিরত।
সাহিত্য ভাণ্ডারে রতন মাণিক
মণি মুক্তা থরে থরে,
রাখিলা সেথায় কতই যতনে
সাজাইয়া নিজ করে।
দুষ্ট কাল কীট জীবন প্রসূনে
কাটিয়া করিল ক্ষয়,
বৃন্তচ্যুত আজ বঙ্গের বঙ্কিম
তাই বঙ্গ শোকময়।
প্রতিভায় যেন প্রদীপ্ত তপন
স্নিগ্ধতায়—শশধর,
রবি শশী দুই একাধারে যেন
বিরাজিছে নিরন্তর।
লেখক সমাজে সবার অগ্রণী
শিক্ষিত সমাজে বড়,
কবির সমাজে কবি চূড়ামণি
বিচারে প্রবীণ দড়।

এহেন রতন হারায়ে জননী
শোকেতে পাগল পারা,
বঙ্কিমের স্থান কে পূরিবে আর
নিবিল উজল তারা।
পূর্ণিমার চাঁদ শূন্য করি দিক্
তিরোহিত একবারে,
অঞ্চলের নিধি কেড়ে নিছে কাল
ধরা পূর্ণ হাহাকারে!
যাও সুর পুরে, অনিত্য শরীর
পুড়ে যাক্ চিতানলে,
আত্মা অবিনাশী, নিত্য সুখে ভাসি,
মিশুক অমর দলে।
নন্দন কাননে আনন্দে বিহার
কর সুখে অনুদিন,
মায়ার বন্ধনে বদ্ধ নহে জীব
সেথায় চির স্বাধীন।
জরা মৃত্যু শোক অতীত সেদেশ
অনন্ত সুখের খনি,—
সুধার ভাণ্ডার খুলিয়ে তোমার
দিবেন বিশ্ব-জননী।
বঙ্গের বঙ্কিম হ'লে বরণীয়
চির স্মরণীয় ভবে,
তোমার গৌরব গাইবে ভারত
শত কণ্ঠে উচ্চরবে।
ভাবী বংশধর ভুলিবে না কভু
অক্ষয় বঙ্কিম নাম,
বিস্ময়ে মগন হইবে সকলে
স্মরি তব গুণগ্রাম। চ।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫১ সংখ্যা ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

ভূপালী—মধ্যমান।

সংগ্রহ

সা | ধ. সা ঋ গ |

মে— রে স্ব—র যা—

প ধ প | গ ঋ | সা ধ.

জে স- র-

সা ঋ | সা ঋ গ ঋ |

সা সু- ন্দ- র

সা ঋ সা সা | সা ধ.

বী- ণা মৃ- দ ঙ্গ।

সা | ধ. সা ঋ | গ গ

মে- রে ঘ- র, ব- হু-

প সা | সা সা ঋ সা |

ত দি- ন- ন প- র

সা ঋ গ ঋ সা ধ প ঋ |

পি- য়া ঘ- র আ- এ

গ প ধ সা | ঋ সা |

স- ব মি- লি গা- ও

গ ঋ সা | প ধ সা প ধ প |

র- স কি তা-

গ ঋ ::

ন।

মিশ্র বিভাগ—কাওয়ালী।

আস্থায়ী।

ব্রঃ গীঃ

সা সা ঋ | গ গ প |

মন্ এক্ বার হ- রি বল্

ঋ ঋ ঋ গ ম | গ ঋ সা |

হ- রি বল। হ- রি বল্

প প প প | গ প ধ নি |

হ- রি হ- রি হ- রি ব- লে

প ধ প প গ | গ ম গ ঋ সা |

ভ- ব সি- ন্ধু পা- রে চল্।

অন্তরা।

গ গ প ধ | সা সা সা সা |

জ- লে হ- রি স্থ- লে হ- রি,

সা নি ধ ধ | সা নি ধ প |

চ- ন্দ্রে হ- রি সূ- র্য্যে হ রি,

১। । । । | +। । । । |
প প গ প | গ প ধ নি |

অ- ন- লে অ- নি- লে হ- রি,

৩। । । । |•। । । । ||
প ধ প প গ| গ ম গ ঋ সা|

হ- রি ময় এই ভূ- ম- ণ্ডল।"

(গীতটীর নিম্ন লিখিতাংশ অন্তরায় গেয়।)

"ক্ষুধা তৃষ্ণা পরিহরি,
বলরে মন হরি হরি,
হরি তোর ক্ষুধার অন্ন,
হরি তোর পিপাসার জল।
দুর্ব্বলের বল হরি,
অধমতারণ হরি,
পতিতপাবন হরি,
হরি ভকত-বৎসল॥
ভক্তি রস পান করি,
যে বলে হরি হরি,
বাঞ্ছা কল্পতরু হরি,
দেন তারে মোক্ষ ফল।
হরি বেদ হরি বিধি,
হরি মন্ত্র হরি সিদ্ধি,
হরি বল হরি বুদ্ধি,
হরি ভরসা কেবল।
পাষণ্ড-দলন হরি,
নাস্তিকের দর্পহারী,
যাঁহার পুণ্য প্রতাপে,
কাঁপে পাপাসুর দল।
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি,
গৃহ পরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি,
হরি সঙ্গের সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি,
শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি,
হরি শক্তি হরি বল।

চিন্ময় অরূপ হরি,
নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দ রূপ ধরি,
করেন প্রাণ শীতল,
প্রবাসে কাননে হরি,
পর্ব্বত পাথারে হরি,
আকাশে ভূতলে হরি,
হরি ব্যাপ্ত সর্ব্বস্থল।

গৃহে দেবালয়ে হরি,
পথে কর্ম্মক্ষেত্রে হরি,
আহারে বিহারে হরি,
হরি প্রাণের সম্বল।

অখণ্ড অব্যয় হরি,
ভক্তবাঞ্ছা-পূর্ণকারী,
দীন জনে দয়া করি,
দেন চরণ কমল।

সুখে হরি দুঃখে হরি,
বিপদে সম্পদে হরি,
জনমে মরণে হরি,
হরি পরম মঙ্গল।
হরি ভক্তি হরি মুক্তি,
হরি স্বর্গ হরি গতি,
হরি জগতের পতি,
হরি ইহ পরকাল।
হরি পিতা হরি মাতা,
হরি গুরু জ্ঞানদাতা,

হরি সর্ব্বজনত্রাতা,
শুদ্ধসত্ব নিরমল।
নয়নে দেখ হে হরি,
রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ,
হরি চরণ কমল।" (ক্রমশঃ)

তপস্বিনী রাবেয়া।

ভারতবর্ষে মৈত্রেয়ী ও গার্গী ব্রহ্মজ্ঞানে, তপস্যায় এবং ধর্ম্মবিজ্ঞানালোচনায় ঋষিদিগের ন্যায় শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছিলেন। শত শত ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন মহর্ষি ও রাজর্ষিগণ সেই স্বর্গীয়া বরবর্ণিনীগণের অসামান্য প্রতিভা ও ধর্ম্মভাব দর্শনে বিমুগ্ধ হইতেন। তাঁহারা অবলা হইয়াও বিপুল আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ঋষিগণের সহিত সুবৃহৎ রাজসভাতে, নৈমিষারণ্য ক্ষেত্রে ও যজ্ঞস্থলে শাস্ত্রের গভীর তত্ত্বালোচনায় সকলকে বিস্মিত করিতেন। সেই পুণ্যবতী রমণীগণের পবিত্র চরিত পুরাণ ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যান্য দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেও আমরা ঐরূপ দেবীগণের পবিত্র চরিতকাহিনী পাঠ করিয়া প্রীতি লাভ করিয়া থাকি। অদ্য আমরা মুসলমান তপস্বিনী রাবেয়ার অপূর্ব্ব জীবন বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণন করিব।

মুসলমান সমাজে চিরাবরোধ প্রথা প্রচলিত। এই অবরোধ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া রমণীগণ স্বাধীন ভাবে গমনাগমন, নির্জ্জনসাধন এবং পুরুষগণের সহিত ধর্ম্মালোচনা ইত্যাদি করিতে তেমন সুযোগ ও সুবিধা প্রাপ্ত হন না; কিন্তু যেখানেই স্বর্গীয় তেজ বিকীর্ণ হইয়াছে, সেখানেই এই সামাজিক শৃঙ্খল ভগ্ন হইয়াছে। আকাশবাসিনী বিহঙ্গিনীর ন্যায় উন্মুক্ত রমণীগণ পরমেশ্বরের সেবায় স্বাধীনভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন। জলস্রোত প্রবল হইলে মৃত্তিকার বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, তখন অতি প্রবল বেগে জল বহির্গত হইতে থাকে। কারাবরোধবাসিনী রমণীগণের প্রাণ যখন স্বর্গীয় তেজে উদ্দীপ্ত হয়, তখনও তাঁহারা সমাজের গণ্ডীকে অতিক্রম করিয়া নবভাবে, নব বলে ধর্ম্মের বিজয়পতাকা-হস্তে সংসার ক্ষেত্রে ভ্রমণ করিতে থাকেন।

তুরুস্কের অন্তর্গত বসোরা নগরে অতি দীন দরিদ্র গৃহস্থের পর্ণকুটিরে রাবেয়ার জন্ম হয়। রাবেয়া অতি শৈশবে পিতৃমাতৃহীন হইলেন। "বিপদ কখনও একাকী উপস্থিত হয় না।" কিছু দিন যাইতে না যাইতে বসোরা নগরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল। অন্নাভাবে সকলে বিষম প্রমাদ গণিল।

রাবেয়া এই সময় তাঁহার ভগ্নীগণের নিকট বাস করিতেছিলেন। এক জন দুষ্ট লোক ছলপূর্ব্বক রাবেয়াকে আত্মীয় গণের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কয়েকটী তাম্র মুদ্রার বিনিময়ে এক জঘন্য ক্রূরমতি ধনীর নিকট বিক্রয় করিল। দুঃখিনী রাবেয়া পরিজনের নিকট হইতে বিযুক্ত হইয়া দাসীরূপে অন্য গৃহে গমন করিলেন।

বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য দেশের লোকে পশু পক্ষীর প্রতিও সকরুণ ব্যবহার করিয়া থাকেন; কিন্তু সে সময় ক্রীত দাস দাসীর প্রতি লোকে তদপেক্ষাও হীন ব্যবহার করিত। যে ব্যক্তি রাবেয়াকে ক্রয় করিল, সে একে ধনগর্ব্বে গর্ব্বিত, তাতে আবার হিংস্রপ্রকৃতি, সুতরাং রাবেয়া ভয়ঙ্কর কষ্টে পতিত হইলেন। সেই নিষ্ঠুর প্রভু রাবেয়াকে এত কাজ করিতে আদেশ দিত, যে বালিকা তাহা কিছুতেই সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিত না। সকল কার্য্য সমাপন করিতে না পারিলে তাহাকে ভয়ানক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত।

এসময় হইতেই রাবেয়ার প্রাণের গভীরতম স্থানে ধীরে ধীরে ধর্ম্মবীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। তিনি প্রভুর তিরস্কার, অপমান ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া নির্জ্জনে গিয়া সেই অন্তর্যামী ভগবানের নিকট ক্রন্দন করিতেন। তাঁহার দুই চক্ষে জলধারা বহিত, প্রাণের সকল কথা দয়াময় পরমেশ্বরের নিকট নিবেদন করিতেন। প্রতিদিন এইরূপে নির্জ্জনে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলেন। নির্যাতনপ্রাপ্ত বালিকার কোমল প্রাণ পরমেশ্বরের দয়ার ভিখারিণী হইয়া তাঁহার দিকে ছুটিল। কিন্তু যতই দিন যাইতে লাগিল, ততই নির্যাতন বাড়িতে লাগিল। বালিকার প্রাণ অস্থির হইল। এই দুঃসময়ে পতিত হইয়া এক দিন তিনি পলায়ন করিবার উদ্দেশে গোপনে গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। অতি ব্যস্তসমস্ত হইয়া কণ্টক ও জঙ্গলময় পথে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন। হঠাৎ ভূপতিত হওয়ায় তাঁহার এক খানি হাত ভগ্ন হইয়া গেল। তখন তিনি আর গমন না করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করিয়া নিম্ন লিখিত মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন,—"দীনবন্ধো পরমেশ্বর! আমার পিতা মাতা নাই, অসহায় অবস্থায় পতিত হইয়া পরগৃহে বন্দিনীভাবে কালযাপন করিতেছি। আমি যে কষ্টে আছি, তুমি দেখিতেছ। কিন্তু ইহাতেও আমি শোক করিব না যদি তুমি প্রসন্ন হও। হে আমার পরমেশ্বর! তুমি কি আমার প্রতি প্রসন্ন"? প্রার্থনার পর তিনি প্রাণে স্বর্গীয় বল লাভ করিলেন। তখন পলায়নে বিরত হইয়া গৃহে প্রতিগমন করিলেন।

তিনি নিয়তই গভীর রাত্রে জাগ্রত হইয়া প্রার্থনা করিতেন। এক দিন তিনি গভীর রজনীতে তাঁহার শয়নকক্ষে বসিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন, এমন

সময় গৃহস্বামী জাগ্রত হইয়া সেই অস্পষ্ট প্রার্থনাধ্বনি শুনিতে পাইলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিকটবর্ত্তী হইয়া মনোযোগের সহিত শুনিতে লাগিলেন। সেই নির্জ্জন কুটিরে নৈশ নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে যে অমৃতনিস্যন্দিনী প্রার্থনার বাক্য উত্থিত হইতেছিল, তাহাতে গৃহস্বামীর কঠোর হৃদয় দ্রবীভূত হইল, পাষাণ গলিল, মরুভূমিতে জলধারা প্রবাহিত হইল। রজনী প্রভাত হইবামাত্র গৃহস্বামী রাবেয়াকে অতি বিনীতভাবে কহিলেন,"আপনার ন্যায় পূজনীয়া মহিলাকে দাসীরূপে গৃহে রাখিয়া আমি অত্যন্ত অন্যায় করিয়াছি। আমার অপরাধ মাপ করুন, আপনাকে স্বাধীনতা অর্পণ করিলাম। আপনি স্বীয় মনোমত স্থানে বাস করিয়া অভীষ্ট মহৎ ব্রত সাধন করুন।" রাবেয়া ক্রীত দাসীত্ব হইতে প্রমুক্ত হইলেন। তিনি সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া সাধন ভজনের অনুকূল স্থানে গমন করিলেন, এবং কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেকদিন নির্জ্জন অরণ্যে বাস করিয়া গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন ছিলেন। সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া পরিশেষে তিনি মক্কানগরে গমন করেন এবং সেখানেই অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করেন।

রাবেয়া মক্কানগরে তাঁহার কুটীরের মধ্যে উপবিষ্ট। বাহিরে অনেক লোক জন বসিয়া রহিয়াছেন। রজনী জ্যোৎস্নাময়ী। চন্দ্রালোকে চতুর্দ্দিক্ উদ্ভাসিত। সুনীল আকাশতল রজতবর্ণে অনুরঞ্জিত। এই মনোহর শোভা দর্শন করিয়া বাহির হইতে একজন লোক বলিয়া উঠিলেন—"আর্য্যে। একবার বাহিরে আগমন করুন, দেখুন সৃষ্টির কি অপরূপ শোভা হইয়াছে!" গৃহের অভ্যন্তর হইতে রাবেয়া উত্তর করিলেন "তুমি একবার ভিতরে আসিয়া স্রষ্টার অপূর্ব্ব শোভা দর্শন কর।" রাবেয়ার ঈশ্বরানুভূতি, ঈশ্বরপ্রেম কি গভীর ও সত্যমূলক ছিল! আর্য্যঋষিগণের ন্যায় তিনি স্বীয় আত্মার ভিতরে সেই চিন্ময় পরমাত্মাকে দর্শন করিতেন। যিনি ভিতরে ডুবিয়াছেন, তিনি কি বাহিরের অসার অকিঞ্চিৎকর সৌন্দর্য্য দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারেন?

রাবেয়া লেখাপড়া জানিতেন না; ধর্ম্মবিজ্ঞানের জটিল তত্ত্ব শিক্ষা করেন নাই; কিন্তু তিনি পরমেশ্বরের সহিত যোগলাভ করিয়াছিলেন। তিনি যাহা বলিতেন তাহার সহিত উন্নত ধর্ম্মশাস্ত্রের মিল হইত। যিনি পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি যোগযুক্ত অবস্থায় যাহা বলেন, তাহাই বেদ বেদান্ত, কোরাণ, বাইবেল। এজন্যই রাবেয়ার প্রত্যেক কথা সকলে—এমন কি মক্কার সাধুগণও ধর্ম্মশাস্ত্রের ন্যায় গ্রহণ করিতেন। রাবেয়াকে দর্শন করিয়া, তাঁহার পবিত্রবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতার্থ হইতেন। দলে দলে লোক রাবেয়ার উপদেশ গ্রহণের জন্য দূরদেশ হইতে আসিত।

রাবেয়া অনেক সময় সমগ্র নিশা

উপাসনাও ধ্যানে যাপন করিতেন। স্বর্গ নরক, পাপ পুণ্য এবং ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁহার অতি পরিষ্কার ধারণা ছিল। তাঁহাকে অনেকে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্ন করিত, তিনি অতি সুন্দররূপে তাহার উত্তর প্রদান করিতেন, সে সকল প্রশ্নের উত্তর পাঠ করিলে প্রতীতি হয় যে, তিনি ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গসাধনে ভারতের বৈদিক মহর্ষিদিগের সমশ্রেণী ছিলেন। নিরক্ষর, শাস্ত্রজ্ঞান বিহীনা রমণী যে কেবল ভগবদারাধনার ভিতর দিয়া আধ্যাত্মিক সমুদয় সত্য লাভ করিতে পারেন, রাবেয়া তাঁহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সত্যানুরাগ, ঈশ্বরানুভূতি, ভক্তি এবং ব্রহ্মজ্ঞানে তাঁহার হৃদয় বিভূষিত ছিল। তিনি জীবিতাবস্থায় যেরূপ স্বর্গীয়া দেবীরূপে মুষলমান জগতে সম্পূজিতা হইতেন, চিরকাল নানাদেশীয় সাধুগণের মুখে তাঁহার পবিত্র জীবন-কাহিনী সেইরূপ কীর্ত্তিত হইতে থাকিবে।

আশ্চর্য্য অতিথি সৎকার।

সকল ধর্ম্মে সকল দেশে অতিথি-সৎকার উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। কিন্তু মহম্মদীয় উপদেশাবলীতে ইহার কিছু প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। আরব মহম্মদীয় ধর্ম্ম-প্রধান দেশ; সুতরাং তথায় যে আতিথ্যের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হইবে, তাহার বৈচিত্র্য কি? আরবীয়দের আতিথ্য সুপ্রসিদ্ধ, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে বেদবান নামে এক গৃহশূন্য ভ্রমণকারী জাতি আছে, তাহাদিগের অতিথি-সৎকার্য্য অত্যাশ্চর্য্য, আদর্শস্থল ও অনুকরণীয়। নিম্নে হউরাণের বিদবান দিগের আতিথ্যের বিষয় প্রকটিত হইতেছে। ইরাক্ ও সিরিয়ার প্রান্তদেশে হউরাণ নামে এক প্রদেশ আছে। তথাকার বেদবানদিগের কাহারও বাটীতে (বাটী অর্থে যেখানে যে যখন তাম্বুতে বাস করে) অতিথি আসিলে বা আসিতে দেখিলে গৃহস্বামী তৎক্ষণাৎ অগ্রসর হইয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া আনেন এবং স্বহস্তে তাহার অশ্বরজ্জু গ্রহণপূর্ব্বক অবতরণে সহায়তা করেন। তদনন্তর অতি তৎপরতার সহিত সর্ব্বোৎকৃষ্ট গালিচা আনিয়া স্ত্রীলোকদিগের অনধিকৃত তাম্বুর এক অংশে তাহা স্বহস্তে বিছাইয়া দেন। শীঘ্র অগ্নি জ্বালিয়া কাফি প্রস্তুত করিয়া তাহাকে অগ্রে দিয়া, যদি অপর কেহ তথায় উপস্থিত থাকে, তাহাকে দেন, কিছু অবশিষ্ট থাকিলে অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক আপনি গ্রহণ করেন নচেৎ নহে। কিছু খাদ্য দ্রব্য তার পর আনিয়া ঐ রূপে দেন। সর্ব্বশেষে মাংস আনীত হয়। আপনি অতিথির হাত ধোয়াইয়া দিয়া "মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ করুন" এইরূপ সানুনয় বাক্যে তাহাকে ভোজন

করিতে অনুরোধ করেন। অতিথি স্বজন এইরূপ একত্রে ভোজন করিতে বসে। ইহার পর কেহ আসিলে, যতক্ষণ না পূর্ব্বোক্ত জনের আহার শেষ হয়, ততক্ষণ সে অপেক্ষা করে, তৎপরে সে বসে। অতিথি সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবস্থিতি করিলে, আরব তাহাকে পুনর্ব্বার ভোজন করাইয়া তাহার অশ্বের নিমিত্ত তৃণাদি আনিয়া দেয়। অতিথি বাটী পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে যতক্ষণ সে আর এক জনের আতিথ্য স্বীকার না করে, ততক্ষণ তাহার পশ্চাদ্গমন করে। ইহার মধ্যে তাহার যদি কোন ও বিপদ ঘটে, তজ্জন্য সে দায়ী ও কোনও ক্ষতি হইলে তাহাকে তাহা পূরণ করিতে হয়। যদি পথিমধ্যে অতিথির দস্যু হস্তে পড়িবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা-হইলে অতিথি-সেবক সশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া দলবলে তাহার অনুগমন করে। কোন দ্রব্য অপহৃত হইলে ও না ফিরিয়া পাইলে দস্যু যে দলে ভুক্ত, সেই দল-পতির নিকট গিয়া বলে যে, "মহাশয়! অমুক আপনার দলভুক্ত সে আমার অতি-থির অমুক দ্রব্য অপহরণ করিয়াছে; অতএব প্রতিপ্রেরণ করিতে আদেশ হয়।" ফিরাইয়া পায় ভালই, নচেৎ উভয় দলে বিবাদ আরম্ভ হয়—এমন কি অনেক সময় প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে।

আর একটী কথা। বাটী অবস্থিতি কালে অতিথির অশ্ব মরিয়া গেলে বা চোরে চুরী করিলে, গৃহস্বামীকে তাহার জন্য আর একটী ঘোটক দিতে হয়। আরবীয়দিগের মধ্যে এইরূপ অতিথি-সৎকার প্রথা না থাকিলে যে তৎসমাজে কত অনিষ্ট হইত, তাহা বলা যায় না।

আশ্চর্য্য সতীত্ব রক্ষা।

আমরা পদ্মাবতীর বিষয় সকলে অবগত আছি। ইনি স্ব সন্তান করাত দিয়া কাটিয়া অতিথির সেবা করিয়া-ছিলেন। এই প্রবন্ধে যাঁহার বিষয় আলোচিত হইতেছে, তিনি সন্তান বিস-র্জ্জন দিয়া সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন। ইনি একজন মহারাষ্ট্রীয় হিন্দু রমণী—মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা ও গৃহস্থের ভার্য্যা। কিছুদিন হইল সোলাপুর ও বিজয়পুরের মধ্যবর্ত্তী তদ্বল নামে ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে কোন স্থানে যাইবার জন্য সালঙ্কৃতা সুসজ্জিতা হইয়া ক্রোড়ে একমাত্র একবৎসরের শিশু সন্তান লইয়া উপস্থিত হন। ষ্টেশ-নের কর্ম্মচারিগণ পশুপ্রকৃতির মানব, দুরভিসন্ধি সিদ্ধির জন্য ইহারা ষড়্‌যন্ত্র করিয়া উঁহাকে উক্ত গাড়ীতে যাইতে দিল না। রমণী নিরুপায় হইয়া অন্য গাড়ীর প্রত্যাশায় তথায় কিছু সময় থাকিতে বাধ্য হইলেন। গাড়ী চলিয়া গেল, ইহারা উঁহাকে সসন্তান একটি ঘরে লইয়া গিয়া উঁহার সতীত্ব নাশের

কথা উত্থাপন ও চেষ্টা করে। সতী গত্যন্তর না দেখিয়া বোধহয় মল মূত্র ত্যাগের ভান করিয়া অনেক কষ্টে বাহিরে আসিতে পান। বাহিরে আসিয়াই অমনি ঘরের দরজার শিকল বন্ধ করিয়া দেন। দুরাত্মাগণ নানা প্রকারে অনুনয় করিল ও ভীতি প্রদর্শন করিল; কিন্তু সতী আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় তাহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিল না। ইহার পর উহারা বলিল যে, "তোমার সন্তানের প্রাণ বিনাশ করিব, যদ্যপি তুমি আমাদিগকে দরজা খুলিয়া না দাও।" তিনি কোনও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। দুরাত্মারা কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া গৃহের গবাক্ষ খুলিয়া মাতার সম্মুখে সন্তানের প্রাণহত্যা করিতে উদ্যত হইল। সতীর মন কিছুতেই টলিল না। পাষণ্ডেরা সত্য সত্যই সন্তানকে মারিয়া ফেলিল। মারিয়া মৃত দেহ গবাক্ষ দিয়া মাতার সম্মুখে ফেলিয়া দিল। ইত্যবসরে এক খানি মালগাড়ী ষ্টেশনের নিকটে আসিয়া অগ্রসর হইবার সঙ্কেত না পাওয়াতে থামিল। শকটচালক ও রক্ষক হাঁটিয়া ষ্টেশনে আসিয়া ঐ দুঃস্থা স্ত্রীলোকটীকে দেখিতে পাইল। রমণী ইহাদিগকে আদ্যোপান্ত সমস্ত বিবরণ বলিলেন। ইহাদিগের নিকট হইতে সংবাদ পাওয়াতে রেলওয়ের কর্ত্তৃপক্ষীয় ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণ ও নগরের বিস্তর লোক সমবেত হন। দুরাত্মাগণ ধৃত হইয়া বিজয়পুরে আনীত হইয়াছে। আশা করি উপযুক্ত দণ্ড পাইবে। সতীত্ব সংরক্ষার জন্য সন্তান বিনষ্ট হইতে দেখার এই প্রথম দৃষ্টান্ত।

সন্তানের জন্য নারী প্রাণ দিতে পারেন, কিন্তু সতীত্ব প্রাণাপেক্ষাও মূল্যবান্—সন্তান অপেক্ষাও মূল্যবান্, তাহা কিরূপে বিসর্জন দিবেন? সে যাহাহউক, কিন্তু অবলাদিগের প্রতি দুর্ব্বৃত্তদিগের এইরূপ ভয়ঙ্কর অত্যাচারের পথ কি রোধ হইবে না?

সফায়া ডবসন কলেট।

ভারতের পরম হিতৈষিণী কুমারী কলেট গত ২৭এ মার্চ্চ ৭২ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার মাতা ও আর কোন কোন আত্মীয় (Cancer) বক্ষের মধ্যে ক্ষত হইয়া মারা যান, সেই রোগে তাঁহারও মৃত্যু হইয়াছে। ৭।৮ বৎসর হইল, এই রোগের সূত্রপাত হয় এবং ডাক্তারেরা দুরারোগ্য রোগ বলিয়া ইহাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে স্থির করেন। ১৮৮৮ সালে আমাদের কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিলাতে গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করিতে যান, তাহাতে তিনি সহাস্যবদনে তাঁহাকে বলেন "অদ্য ২ গিনি (প্রায় ৪০৲ টাকা) দিয়া আমার

'মৃত্যুলিপি' ক্রয় করিয়াছি।" পরে তাঁহার পীড়া সম্বন্ধে ডাক্তারের লিখিত অভিপ্রায় দেখান। কয়েক বৎসর হইল তিনি বর্ষে বর্ষে আমাদিগকে লিখিতেন, "মৃত্যুর আর ৪ বৎসর, ৩ বৎসর, ২ বৎসর বা ১ বৎসর মাত্র বিলম্ব আছে, আমার কার্য্য শীঘ্র শেষ করিতে পারিলে হয়।" বস্তুতঃ সমুদ্রে জাহাজ ডোবার মত তাঁহার জীবন তাঁহার জ্ঞাতসারে ক্রমে ক্রমে ডুবিয়াছে এবং তিনি বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত প্রস্তুত হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে প্রবেশ করিয়াছেন। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্ব হইতে তিনি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া পড়েন, নিজে পুস্তক পাঠ করিতে পারিতেন না, অন্যকে ধর্ম্ম পুস্তকাদি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন এবং শুনিতেন। শেষান্তে অধিক মাত্রায় ঘুমাইতেন, যখন জাগিতেন রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিত যাহা লিখিতেছিলেন, তাহারই উল্লেখ করিতেন এবং বলিতেন তাঁহার যাহা কিছু বাঁচিবার সাধ, এই পুস্তকখানি সম্পূর্ণ করিবার জন্য। দুর্ভাগ্যক্রমে ইহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। রামমোহন রায়ের মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ হয়, ২৭এ সেপ্টেম্বর, কুমারী কলেটের ২৭এ মার্চ্চ। ৩রা এপ্রেল তাঁহার সমাধিকার্য্য সম্পন্ন হয়। যদিও তিনি ৭২ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন, কিন্তু তাঁহার পরিবারস্থ সকল লোকে অতি দীর্ঘজীবী এবং তিনি বলিতেন এ পরিবারের মধ্যে তিনিই অল্পবয়সে মরিলেন।

কুমারী কলেট ৭২ বৎসর বাঁচিয়াও আপনার অল্পায়ুর জন্য দুঃখ করিয়াছেন, কিন্তু যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন তিনি যে এতদিন কিরূপে বাঁচিলেন ইহা ভাবিয়াই তাঁহারা আশ্চর্য্য হন। তিনি বিকলাঙ্গ, কুব্জ ও খঞ্জপ্রায় ছিলেন; অতি কষ্টে চলিতে পারিতেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার এক পালিতা কন্যা কোলে করিয়া এক ঘর হইতে তাঁহাকে অন্য ঘরে লইয়া যাইতেন। তাঁহার শরীরের উপযোগী করিয়া একখানি কেদেরা নির্ম্মিত হইয়াছিল, তিনি তাহাতে বসিয়া লেখাপড়ার কার্য্যাদি করিতেন। গত ৭।৮ বৎসর পীড়ার যাতনা অতি তীব্র ও অসহ্য হইয়াছিল, তথাপি সাধ্যমত কার্য্য করিতে তিনি কখনও ত্রুটি বা শৈথিল্য করেন নাই।

তাঁহার মন চিরপ্রফুল্ল, এই জন্য তাঁহার মুখ সর্ব্বদা সহাস্য ছিল, ঘোর পীড়াযন্ত্রণার মধ্যেও তাঁহার আন্তরিক প্রফুল্লতা ফুটিয়া বাহির হইত। তাঁহাকে কেহ কখনও ম্লান, নিরুৎসাহ বা অবসন্নহৃদয় দেখেন নাই। তিনি এত অসুবিধার মধ্যেও যে ঈশ্বরের কার্য্যে খাটিতে পারিতেন এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা ধন্যবাদ দিতেন এবং তাঁহার করুণার উপর অটল নির্ভর করিতেন। তাঁহার অন্তরাত্মা ঈশ্বরে সমর্পিত এবং শরীর সেই আত্মার অনুগত ছিল।

ইংরাজী ১৮২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি কলেটের জন্ম হয়। তৎকালীন অন্যান্য ইংরাজবালিকার ন্যায় তিনি বিদ্যালয়ে সামান্যরূপ লেখাপড়া শেখেন, কিন্তু পরে আপনার যত্ন, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে বিদ্বৎসমাজে গণনীয় হইয়া উঠেন। তিনি বিলাতের অনেক পত্রিকায় নিয়মিতরূপে লিখিতেন। তাঁহার মতসকল অতি উদার ছিল এবং সাধারণের হিতব্রতে তিনি চিরকাল লেখনী ধারণ করিয়াছেন। ভারতের প্রতি তাঁহার অনুরাগ অতুলনীয়। ভারতবাসীদিগের দুঃখে দুঃখী ও সুখে পরম সুখী হইতেন। ভারতবাসী ইংরাজেরা প্রতি মেইলে স্বদেশের সংবাদের জন্য যেমন একান্ত উৎসুক হইয়া থাকেন, তিনি ভারতের সংবাদ পাইবার জন্য সেইরূপ উৎসুক হইয়া থাকিতেন। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা এজন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা উপহাস করিয়া বলিতেন "তোমার 'home' স্বদেশ অর্থাৎ ভারতের সংবাদ কি?" ব্রাহ্মসমাজ ভারতের ধর্ম্ম, সমাজ, জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের উন্নতির সহায়, এইজন্য তিনি নিজে খৃষ্টান দলভুক্ত হইয়াও ইহাঁদের সহিত একীভূত হন এবং ইহাঁদের কার্য্য আপনার কার্য্য বলিয়া চিরকাল প্রাণপণে তাহার সহায়তা করেন।

ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন নেতা বাবু কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে বিলাতে লইয়া যাইবার তিনিই প্রধান উদ্যোগী। তাঁহার বিলাত যাত্রার পূর্ব্বে তিনি প্রসিদ্ধ অনেক পত্রে ব্রাহ্মসমাজের মহৎ উদ্দেশ্য সকল প্রচার করেন এবং তিনি ইংলণ্ডে গমন করিলে তাঁহার সেবাতে কায়মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বিলাতে কেশব বাবু যে সকল বক্তৃতা করেন, তিনি সে সকল সংগ্রহ করিয়া "Keshub Chandra Sen's English Visit" নামে এক বৃহৎ পুস্তক অতি উৎকৃষ্টরূপে মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন। "Keshub Chandra Sen in England" নামে এক পুস্তক এবং "Sketch of the History of the Brahmo Samaj" নামে আর এক পুস্তক লেখেন। কেশব বাবুর পূর্ব্বতন বক্তৃতাগুলি হইতে কতকগুলি উৎকৃষ্ট বক্তৃতা নির্ব্বাচন করিয়া প্রচার করেন। ভারতের প্রাণ ব্রাহ্মসমাজ এবং ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ কেশব বাবু এই দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া তিনি কয়েকবৎসর কেশব বাবুর জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন।

এই উপলক্ষে বামাবোধিনীর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তদবধি তিনি ইহার নিয়মিত পাঠিকা ও উৎসাহদাত্রী ছিলেন। এদেশের রমণীদিগের সহিত পত্রালাপাদি করিবার জন্য তিনি বাঙ্গালা ভাষা স্বয়ং বহু পরিশ্রম করিয়া শিক্ষা করেন। বামাহিতৈষিণী সভার সম্পাদিকা কুমারী রাধারাণী লাহিড়ীকে তিনি স্বহস্তে বাঙ্গালা ভাষায় যে একখানি পত্র লেখেন, তাহার অক্ষরগুলি ছাপার অক্ষরের ন্যায়

এবং ভাষাও সুন্দর। একজন ইংরাজ রমণী অল্পদিনের শিক্ষায় এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গলায় রচনা করিতে পারেন, ইহা অতি বিস্ময়কর। ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে এই পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল, আমরা তাহা এখানে পুনরুদ্ধৃত করিলাম।

"লণ্ডন ২৯এ সেপ্টেম্বর ১৮৭৩।

শ্রদ্ধেয় ভগিনি!

বিগত জুন মাসের বামাবোধিনীতে আপনার লিখিত বামাহিতৈষিণী সভার বিবরণ আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকিলেও আপনার নিকট এই পত্রখানি লিখিতে সাহসী হইতেছি। এই বিষয়ের সবিশেষ সংবাদ জানিতে আমার এখন ইচ্ছা হইয়াছে এবং তজ্জন্য এই প্রশ্নগুলি জিজ্ঞাসা করিয়া বিরক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি।

(১) স্ত্রীলোক ভিন্ন অন্য কেহ এই সভায় পাঠ করিবার জন্য রচনা লিখেন কিনা?

(২) মহিলারা কি নিজেই স্ব-লিখিত রচনা পাঠ করেন? তাহা না হইলে রচনাগুলি কে পাঠ করেন?

(৩) আপনার সভা-বিবরণে যে সকল রচনার উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা কে কে লিখিয়াছেন?

(৪) এই সমুদায় রচনাগুলি কি প্রকাশিত হইবে? বিগত এপ্রিল মাস হইতে আমি বামাবোধিনী পাইতেছি, সুতরাং ইহাতে যাহা প্রকাশিত হয়, তাহা আমি দেখিতে পাই।

৪র্থ ও ৮ম রচনার শিরোনাম পড়িয়া বোধ হইতেছে যে এই রচনাগুলি অত্যন্ত ভাল হইবে।

(৫) বামারচনাবলীতে উদ্ধৃত রচনার মধ্যে কোন ২ রচনা ভারত সংস্কার স্ত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী কর্তৃক লিখিত হইয়াছে।

বাঙ্গালাতে আমার অতি অল্পই অধিকার, কিন্তু আমার ভরসা এই, যে সময় আপনার উত্তর পাইতে আশা করি, তখন বিনা সাহায্যে আপনার পত্র পড়িতে পারিব। আমাদের বামাকুলের উন্নতির জন্য আপনারা যেরূপ চেষ্টা ও যত্ন করিতেছেন, তাহাতে আমার কিরূপ গাঢ় সহানুভূতি তাহা কিরূপে প্রকাশ করিব?

আপনাদের উন্নতি হউক ইহা আমার আন্তরিক বাসনা।

আপনার ইংরাজ ভগিনী

সফায়া ডবসন কলেট।"

কুমারী কলেট ১৮৭৬ হইতে ১৮৮২ সাল পর্য্যন্ত "বৎসরকাল "Brahmo year Book" ব্রাহ্মসমাজের বিবরণী পুস্তক প্রচার করেন, ইহাতে তাঁহার গভীর গবেষণা, পাণ্ডিত্য, বিবরণসংগ্রহ ও সুসঙ্কলীকরণে পটুতা, সমালোচনা এবং ব্রাহ্মসমাজানুরাগ ও ভারতহিতৈষিতার সবিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার শরীর রুগ্ন ও ভগ্ন হওয়ার এবং রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশের ইচ্ছায় তিনি এ কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন। দুঃখের বিষয় ব্রাহ্মসমাজের কোনও ব্যক্তি অদ্যাপি তাঁহার এই কার্য্যের ভারগ্রহণ করিয়া আপনাদের সমাজের মহৎ অভাব পূর্ণ করিতে পারেন নাই।

কুচবিহার বিবাহ উপলক্ষে কেশব বাবুর সহিত কুমারী কলেটের সৌহৃদ্য বিচ্ছেদ হয় এবং তদবধি তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পক্ষপাতিনী হইয়া সাধ্য-মত তাহারই সহায়তা করিয়াছেন। আমরা শুনিলাম এই সমাজকে তাঁহার পুস্তকালয় দান করিয়া গিয়াছেন।

রাজা রামমোহন রায়ের প্রতি কুমারী কলেটের আজীবন প্রগাঢ় ভক্তি ও অনুরাগ ছিল এবং তাঁহাকে তিনি একজন অসাধারণ মহাপুরুষ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার মতে ব্রাহ্মসমাজের আর কোনও নেতা অদ্যাপি রামমোহন রায়ের নিকটবর্ত্তীও হইতে পারেন নাই। রামমোহন রায় যখন বিলাতে যান, কুমারী কলেট তখন ১০।১১ বৎসরের বালিকা। তিনি একেশ্বরবাদী খ্রীষ্টানের ঘরের মেয়ে, রামমোহন রায় এই সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষরূপে সম্মিলিত হইয়াছিলেন। রামমোহন লণ্ডনের লিটল পোর্টলেণ্ড ষ্ট্রীটের একেশ্বরবাদী-দিগের ধর্ম্মমন্দিরে গিয়া উপাসনা করিতেন, কুমারী কলেট সেখানেও তাঁহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলেন। রামমোহন রায় যেমন জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকল নরনারীকে এক ঈশ্বরের সন্তান ও নিজ পরিবার বলিয়া উদার-হৃদয়ে ধারণ করিয়াছিলেন এবং সকলের হিতসাধনে ব্রতী হইয়াছিলেন, কুমারী কলেটও তাহাই আপনার জীবনের আদর্শ করিয়াছিলেন। Encyclopedia Britannica নামক বিলাতের সর্ব্বপ্রধান বিশ্বকোষ প্রকাশকেরা তাঁহার লিখিত রামমোহন রায়ের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। রামমোহন রায়ের সম্পূর্ণ জীবনবৃত্ত প্রচার করিয়া মনের সাধ পূর্ণ করিবার জন্য কুমারী কলেটের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। তাঁহার জীবনের শেষ ১০।১২ বর্ষকাল তিনি রামমোহন রায় সম্বন্ধে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম অনুসন্ধান করিয়া প্রচুর উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন এবং জীবনীর কতক অংশ লিখিয়া ও কতক অংশ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। আমরা আশা করি তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও সুযোগ্য কোনও ব্যক্তি এ কার্য্যে অগ্রসর হইয়া ইহার পরিসমাপ্তি করিবেন।

কুমারী কলেট যে একজন উচ্চদরের মহিলা ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। রয়টার তাঁহার মৃত্যু সংবাদ তাড়িতযোগে ভারতে প্রেরণ করেন, বিলাতের অনেক প্রসিদ্ধ পত্রে তাঁহার শিক্ষা ও সদ্‌গুণের প্রশংসা বাহির হইয়াছে। আর যাঁহার লেখা "এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকার" ন্যায় সুবিখ্যাত পুস্তকে আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছে, তিনি স্বনামপ্রসিদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ভারতীয় অনেক প্রধান প্রধান পত্রে কুমারী কলেটের মৃত্যুর জন্য শোকপ্রকাশ করা হইয়াছে এবং ব্রাহ্মসমাজসকল কৃতজ্ঞ-

তার সহিত তাঁহার পবিত্র স্মৃতির সম্মাননা করিয়াছেন। এই প্রকৃত ভারত-হিতৈষিণীর নাম ভারত রমণীগণও কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করুন।

মহারাণী বিক্টোরিয়ার জীবনের কয়েকটী কথা।

মহারাণী বিক্টোরিয়া বাল্যাবস্থায় পরমা সুন্দরী ছিলেন। তাঁহার গুরুজনেরা তাঁহাকে আদর করিয়া "May Flower" বা "বসন্তের ফুল" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। মহারাণীর মাতা জর্ম্মনির মধ্যে অতি সুন্দরী মহিলা বলিয়া বিখ্যাতা ছিলেন। ইহাঁর ন্যায় ধর্ম্মভাবাপন্না রমণীও অতি অল্প দেখা যাইত। ইনি স্বীয় কন্যাকে ধর্ম্মশিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ তৎপরা ছিলেন, প্রত্যহ বিক্টোরিয়াকে (বাইবেল) ধর্ম্মপুস্তক অধ্যয়ন করাইতেন এবং তাঁহার হৃদয়ে যাহাতে ঈশ্বর-বিশ্বাস ও ভক্তির উদ্রেক হয় এরূপ উপদেশ দিতেন।

যখন মহারাণীর বয়স দ্বাদশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি জানিতে পারেন যে তাঁহাকে শীঘ্র ইংলণ্ডের সিংহাসনে অধিরোহণ করিতে হইবে। তাঁহার শিক্ষয়িত্রী তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথম এই সংবাদ দেন। বিক্টোরিয়া ঐ কথা শুনিয়া উত্তর করিলেন, "বড় গুরুতর কাজ। খুব গৌরবের কথা বটে, কিন্তু বড় দুরূহ ব্যাপার, রাজ্যেশ্বরী-পদের গৌরব আছে, কিন্তু তেমনি আবার দায়িত্ব আছে।" তৎপরে কিয়ৎকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া সেই অল্পবয়স্কা বালিকা গম্ভীর স্বরে বলিলেন "রাণী হইয়া আমি নিশ্চয়ই ভাল করিয়া কাজ করিব।" মহারাণী সেই বালিকাবস্থায় যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন, যে সেই প্রতিজ্ঞা তিনি এপর্য্যন্ত সম্পূর্ণ রূপে পালন করিয়াছেন। রাজ্যেশ্বরীরূপে, স্ত্রীরূপে, মাতারূপে তিনি স্বীয় কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদাই সম্পূর্ণ তৎপরা।

মহারাণী চিরকালই অতি বুদ্ধিমতী। বাল্যাবস্থায় ইনি অতি সহজেই স্বীয় পাঠাভ্যাস করিতে পারিতেন। দ্বাদশ বৎসর বয়সে ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষায় ইনি উত্তমরূপে কথোপকথন করিতে শিখেন এবং লাটিন ভাষায় বর্জ্জিল ও হোরেসের গ্রন্থ পাঠ করিতেন। বিক্টোরিয়া অল্পকাল মধ্যে গ্রীক ভাষা ও অঙ্ক বিদ্যা অতি উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। সর্ব্বাপেক্ষা অঙ্ক বিদ্যা শিখিতে ইনি অত্যন্ত ভাল বাসিতেন।

মহারাণীর সত্যপ্রিয়তা একটী প্রধান গুণ। তাঁহার বাল্যকালে একদিন তাঁহার মাতা তাঁহার পাঠাগারে গমন করিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেমন, বিক্টোরিয়া দুষ্টামি করেন না ত?" শিক্ষয়িত্রী বলিলেন, "একবার

দুষ্টামি করিয়াছিলেন, তাহার পর খুব ভাল ব্যবহার করিতেছেন।" বিক্টোরিয়া এই কথা শুনিয়া তাঁহার শিক্ষয়িত্রীকে বলিলেন "না, মহাশয়া, একবার নহে—দুইবার। আপনি ভুলিয়া একবার বলিয়াছেন।" বাস্তবিকই তাঁহার শিক্ষয়িত্রীর ভুল হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, বিক্টোরিয়ার এরূপ সত্যপরায়ণতা দেখিয়া তাঁহার মাতা ও শিক্ষয়িত্রী অতীব সন্তুষ্টা হইয়াছিলেন।

যখন চতুর্থ উইলিয়মের মৃত্যু হইল, তখন চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে রাজ্যের প্রধান ধর্ম্মযাজক বিক্টোরিয়াকে সংবাদ দিতে গেলেন যে তিনি যেন রাজ্যভার লইবার জন্য প্রস্তুত হয়েন। বিক্টোরিয়া প্রধান ধর্ম্ম যাজকের মুখে ঐ সংবাদ পাইয়া তাঁহাকে বলিলেন "আপনি আমার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন।" ধর্ম্মযাজক তাঁহার অনুরোধানুসারে ভক্তি-ভাবে এই প্রার্থনা করিলেন যে বিক্টোরিয়া যে গুরুভার গ্রহণ করিতেছেন তাহা বহন করিতে ঈশ্বর যেন তাঁহাকে বল ও সাহস প্রদান করেন। বিক্টোরিয়াও অবনত-জানু হইয়া ঈশ্বরের নিকট ঐ মর্ম্মে প্রার্থনা করিলেন। মহারাণী চিরকালই ধর্ম্ম-বিশ্বাসিনী ও প্রার্থনা শীলা।

পূর্ব্বে ইংলণ্ডে নিয়ম ছিল যে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহাতে রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইত। আমাদের মহারাণী রাজেশ্বরী হইবার কিছুকাল পরেই একজন সৈনিক পুরুষের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা হয়। ডিউক অব্ ওয়েলিংটন্ মহারাণীর নিকট সম্মতি লইতে তাঁহার নিকট গমন করেন। দণ্ডাজ্ঞা পত্র পাঠ করিয়া সজলনয়নে বিক্টোরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহার পক্ষে বলিবার কি কিছুই নাই?" ডিউক উত্তর করিলেন;—"না, এ ব্যক্তি তিন বার সৈন্যদল ছাড়িয়া পলাইয়া গিয়াছিল? তবে কোন কোন সাক্ষী উহার সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিল।" এই কথা শুনিয়া মহারাণী বলিলেন, "তবে ইহার দোষ পরিমার্জ্জনীয়," এবং দণ্ডাজ্ঞা-পত্রের উপর লিখিয়া দিলেন "ক্ষমা করিলাম।" মহারাণী অতীব দয়ার্দ্র-হৃদয়া, এবং কাহারও প্রাণদণ্ডাজ্ঞায় সম্মতি দেওয়া তাঁহার পক্ষে একপ্রকার অসম্ভব বলিয়া, উপরোক্ত ঘটনার পর হইতে নিয়ম হইল যে প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা বৈধ করিবার জন্য রাজা বা রাণীর সম্মতি আবশ্যক হইবে না।

মহারাণী তাঁহার দরিদ্র প্রতিবাসী ও প্রতিবাসিনীগণকে বড়ই ভাল বাসেন। "প্রতিবাসীকে ভাল বাস" খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মগ্রন্থে এই উপদেশ বারম্বার প্রদত্ত হইয়াছে। মহারাণী সে উপদেশানুসারে কার্য্য করিতে কুত্রাপি বিস্মৃত হয়েন না। উইণ্ডসর, কেনশিংটন, বেল্‌মোরেল, প্রভৃতি যে যে স্থানে মহারাণীর প্রাসাদ আছে, তাহার নিকটবাসী দুঃখী দরিদ্র পরিবারগণের প্রতি মহারাণীর অকপট স্নেহ মমতার বহুল উদাহরণ প্রাপ্ত হওয়া

যায়। এই সকল পরিবারদিগের সঙ্গে তিনি সময় পাইলেই সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন এবং তাহাদিগের যাহার যে অভাব জানিতে পারেন, তাহা মোচন করিয়া থাকেন। কাহারও গৃহে গিয়া দেখিলেন হয়ত নবজাত শিশুর শীত-নিবারক বস্ত্র নাই। মহারাণী প্রাসাদে প্রত্যাগমন করিয়া অমনি তাহার উপযোগী বস্ত্রাদি প্রেরণ করিলেন। কাহারও ঘরে দেখিলেন, হয়ত কেহ পীড়িত, অমনি তাহার চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। কাহারও গৃহে দেখিলেন পুত্র-বিয়োগ-কাতর হইয়া বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা ক্রন্দন করিতেছে, অমনি তাহার শোক দূরী-করণে তৎপরা হইলেন। একবার মহা-রাণীর প্রতিবাসীদিগের মধ্যে কোন শোক-সন্তপ্তা রমণীকে কোন এক ধর্ম্ম-যাজক হঠাৎ এক দিন অতীব প্রফুল্লমনা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আপনার কন্যাবিয়োগদুঃখ এত শীঘ্র কি করিয়া ভুলিলেন? তিনি উত্তর করি-লেন, "মহারাণী আমাকে একখানি ধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠাইয়া দিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি ঈশ্বরে নির্ভর করিতে শিখিয়াছি এবং অনেকাংশে শোক ভুলিয়াছি।" বেল্‌মোরেল্‌ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী দরিদ্র লোকদিগের সহিত তিনি কিরূপে সাক্ষাৎ করিয়া থাকেন তাহা মহারাণীর ঐ প্রাসাদে অবস্থিতি কালের এক দিনের বিবরণ তাঁহার নিজের লিখিত দৈনন্দিন লিপি হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিলে বেশ হৃদয়ঙ্গম হইবে। "আজ প্রাতে প্রথমে কিটি-কিয়ার নাম্নী বৃদ্ধা মহিলার কুটীরে আমরা দুইজনে গেলাম। কিয়ারের বয়ঃক্রম ৮৬ বৎসর। সে আজও বেশ খাড়া আছে। আমরা যাইবামাত্র সে সসম্ভ্রমে আমা-দের অভ্যর্থনা করিল। আমরা আসন-গ্রহণ করিলে কিটি কাপড় সেলাই করিতে করিতে আমাদের সঙ্গে গল্প করিতে লাগিল। আসিবার সময় আমি তাহাকে গরম কাপড়ের একটী জামা দিলাম। সে সকৃতজ্ঞচিত্তে বলিল, 'আমি আশীর্ব্বাদ করি ঈশ্বর আপনাদিগকে বরাবর সুখে রাখুন, সকল অমঙ্গল হ'তে রক্ষা করুন আর স্বয়ং আপনাদের পরি-চালক হউন। আমরা তাহার পর আরও তিনটী কুটীরে গমন করিলাম। বিবি লিমনের পুত্রটীকে পীড়িত দেখি-লাম। তাহার পর আর একটী বৃদ্ধা-মহিলার ঘরে গেলাম। সেখান হইতে ব্রেয়রের (সে কিছুকাল আমাদের বাদ্য-কর ছিল) কুটীরে গেলাম। ফিরিবার সময় বিবি গ্রাণ্টের ঘরে গেলাম এবং তাহাকে একটী পোষাক ও একখানি রুমাল দিলাম। সে তাহা পাইয়া কতই ধন্যবাদ দিতে লাগিল! এই সকল দরিদ্র পরিবারদিগের সহিত সহানুভূতি দেখান অতীব সুখকর।"

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। সিকাগো মহামেলায় ভারতবর্ষ হইতে কচ্ছের রাও সাহেব এবং লিম্বভীর ঠাকুর সাহেব পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন।

২। আমেরিকায় মিশুরী নদীর উপরে সম্প্রতি এক প্রকাণ্ড সেতু নির্ম্মিত হইতেছে। পৃথিবীতে ঝোলান সেতুর মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ হইবে।

৩। প্রিন্স বিসমার্ক ৪৮২ প্রকার সম্মান চিহ্ন লাভ করিয়াছেন। চিহ্নগুলি পাশাপাশি রাখিলে ১৪ হাত জায়গা ও কয়েক ইঞ্চি ঢাকিয়া যাইবে।

৪। রাজা রামপাল সিংহের ষ্টেটে হিন্দুমতে একটি বিধবা বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাত্রী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ও তাঁহার বয়স ১১ বৎসর।

৫। গ্রীসদেশে আবার ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে। দেশের এক সীমা হইতে অন্য সীমা পর্য্যন্ত ৮ দিন অনবরত ভূকম্পন হয়। শতসহস্র লোক সর্ব্বস্বান্ত ও কতশত বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে।

৬। বঙ্কিমচন্দ্র মেমোরিয়ল ফণ্ডে রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর ১ হাজার টাকা দান করিতে স্বীকার করিয়াছেন— মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ৪ শত এবং কোচবিহারের মহারাজা আড়াই শত টাকা দান করিয়াছেন।

৭। বিলাতের একজন ক্রোরপতি ৬০ জন ক্রোরপতিকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইয়াছেন। ৬০ জনকে খাওয়াইতে ২৪ হাজার টাকা খরচ হইয়াছে। প্রত্যেক লোকের আহারের জন্য ৪ শত টাকা করিয়া ব্যয়। লোকগুলি কি রাক্ষস?

৮। ডিট্রয়েটের স্ত্রীউকিল মিসেস্ মার্থা টি কৃল্যাণ্ড চিকাগোর মহিলাদিগের নিকট পার্লিয়ামেণ্টের আইন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতেছেন।

৯। আমেরিকার এক নিগ্রো মহিলা হেনরী সমারসেট্ নাম্নী একটী মহিলার অধ্যক্ষতায় ইংলণ্ডে মাদক নিবারণ বিষয়ে একটী বক্তৃতা করিয়াছেন।

১০। নিউজিল্যাণ্ডের অন্তর্গত ওয়ানহঙ্গা বাসিনী মিসেস ইয়েট্স্ নামক একজন মহিলা ব্রিটিষ সাম্রাজ্যের সর্ব্ব প্রথম স্ত্রী মেয়র বা ম্যাজিষ্ট্রেট্ হইয়াছেন।

১১। বিবী গ্ল্যাড্ষ্টোন ৮১ বৎসর পূর্ণ করিয়াছেন, বৃদ্ধ স্বামীর ন্যায় তাঁহারও শরীর মন সতেজ আছে।

১২। একজন মহিলা এল্ ফ্যাটাট নামক একখানি পাক্ষিক পত্রিকা মিসরের অন্তর্গত আলেকজণ্ড্রিয়া নগরে প্রকাশ করিয়াছেন। সিরিয়াবাসিনী কুমারী হিণ্ড এই পত্রিকার সম্পাদিকা এবং তাঁহার লেখার সাহায্যকারী সকলগুলিই মহিলা।

১৩। কলোরেডোরা স্প্রিংস্থ মিসেস্ এল সি ডিউলেল্, কলোরেডোর শাসনকর্ত্তা

দ্বারা তত্রত্য মূক বধির ও অন্ধগণের বিদ্যালয়ের ট্রষ্টি সভার সভ্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

১৪। চৈতন্য লাইব্রেরী। আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া প্রকাশ করিতেছি এই বৎসর চৈতন্য লাইব্রেরি হইতে নিম্ন লিখিত পদকগুলি প্রদত্ত হইবে:— (১) Blackie প্রণীত "Self-Culture" নামক গ্রন্থের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অনুবাদের জন্য একটি স্বর্ণ পদক; (২) "বাঙ্গলা নাটকের ইতিহাস" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাঙ্গালা প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক; এবং (৩) "বিজ্ঞান শিক্ষার নৈতিক ফল" সম্বন্ধে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইংরাজী প্রবন্ধের জন্য একটি রৌপ্য পদক। অনুবাদ ও প্রবন্ধগুলি আগামী ৩০ শে নবেম্বরের মধ্যে চৈতন্য লাইব্রেরির সম্পাদক, নং ৪।১ বীডনষ্ট্রীট, কলিকাতা, এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। সাধারণের প্রতিযোগিতা প্রার্থনীয়।

বামারচনা।

বঙ্কিম বিয়োগ।

শুয়েছে শ্মশানে নাকি মুদিয়া নয়ন
সুকবি বঙ্কিমচন্দ্র ভারতের ধন!
কবির লাগিয়া আজি প্রতি ঘরে ঘরে
ভাসে শোকে বঙ্গবাসী নয়নের নীরে॥
অস্তমিত হ'ল হায়! কবির জীবন,
নিবিল সুবর্ণ দীপ জন্মের মতন॥
বাঙ্গালা সাহিত্য আজি হইল রে দীন,
ভারতবাসীর প্রাণ হ'ল অর্দ্ধক্ষীণ॥
বঙ্গমাতা দুঃখে আজি ফেলে অশ্রুধারা,
হারায়ে সে পুত্রবরে পাগলিনী পারা॥
কে আর ছড়াবে মধু মধুর সে বোলে,
বসন্ত রাগিণী রাগ ভাসায়ে দুকুলে॥
সেফালিকা যূঁই যাতি কতই ফুটিত।
মধুর বহিয়া বায়ু মধু ছড়াইত॥
বিরহ মিলন মধু বঁধুর সে প্রাণ,
এক সুরে গেছে গেয়ে কবির সে গান॥
জুড়াত মানব প্রাণ নব কল্পনাতে,
আনি দিত ধরা পরে স্বর্গ হাতে হাতে।
যে মধু ছড়ায়ে কবি গেছে ফুলে ফুলে,
রয়ে যাবে চির দিন অনন্তের কোলে॥
বিষবৃক্ষে ফুটিয়াছে সূর্য্যমুখী ফুল,
ম্লানমুখী কুন্দকলি সৌন্দর্য্যে অতুল॥
করেছিল বনমাঝে কুটীরেতে আলা,
স্নেহের পালিতা কন্যা কপালকুণ্ডলা॥
না ফুটিতে মনোরমা খসিল মুকুল,
ভিখারিণী গিরিজায়া হাসিয়া আকুল॥
ভ্রমররূপিণী বালা ভ্রমরার প্রেম।
মণিতে জড়িত যেন সমুজ্জ্বল হেম।
এবং স্ত ছুটী ফুল দেখায়েছে কবি।
প্রতাপের ভালবাসা—শৈবলিনী ছবি॥
কবির কবিত্ব হৃদি বহিছে ধরায়,
প্রেমের সৌন্দর্য্য ছবি মাধুর্য্য ছড়ায়॥
কখন গাম্ভীর্য্যভাব, কখন নবীন।
ধর্ম্মেতে গঠিত হৃদি কখন প্রবীণ॥
লোকেরে হাসায়ে গেছে রহস্য কথায়,
এমন রসের কবি দেখিনে কোথায়॥

তেত কটু কদা মিঠা জগতের কাছে।
অম্বল মধুর রস ছড়ায়ে গিয়াছে॥
কাঁদরে ভারত মাতা কাঁদ অনিবার।
গিয়েছে তোমায় ছেড়ে বঙ্কিম কুমার॥
আর কি পুরাবে এসে কেহ তাঁর স্থান।
বাড়াও তাঁহার খ্যাতি-কবির সম্মান॥
গাওরে ভারত তুমি চিরদিন তরে,
সুকবি বঙ্কিম নাম জগতের 'পরে॥

শ্রীমতী গিরিবালা।

কিছুই লাগেনা ভাল।

প্রভাতের তরুণ তপন
বিহগের মধুর কূজন
বসন্তের সুশীতল বায়
নিশিভরা পূর্ণ জ্যোৎস্নায়
লাগেনা কিছুই ভাল হৃদয়ে আমার।

ফুলে ফুলে ভরা উপবন
লতিকার আনত বদন
নিরমল আকাশের পট
সুবিমল নির্ঝরের তট
লাগেনা কিছুই ভাল নয়নে আমার।

যবে থাকি নিশীথে শয়নে
ডুবে থাকি অলীক স্বপনে
আঁখিজল বহেনা তখন
ঢাকা পড়ে হৃদয় বেদন
তবুও না যায় মোর হৃদয়ের ভার।

আমি শুধু পথ পানে রাখি
চেয়ে আছি অনিমিখ আঁখি
কবে পুন আসিবে হেথায়
আঁখি ভরি হেরিব তোমায়
হইবে শীতল পরাণ আমার।

এ ভবনে পারিজাত প্রায়
ফুটেছ হে নব কলিকায়
সুবাস ঢালি আকুল জীবনে
তুষিতে সবারে নিশি দিনে
ভুলায়ে রাখিয়া মোহন মোহে।

ভেঙ্গনা ভেঙ্গনা সে কুহক
হৃদি মোর ডুবিয়ে থাকুক
সেই ঘুমের ঘোরে রহিব
চির সে সুস্বপন দেখিব
জাগায়ো না আর আমায় কেহ।

শ্রীনিস্তারিণী দেবী—কাণপুর।

অবসান।

কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।
কি গান গাহিয়া গেল,
কানে মাত্র প্রবেশিল,
সুধু এর, কটি প্রতিধ্বনি।
যতনে কুসুম গুলি,
আনিয়া ছিলাম তুলি,
সাজি ভ'রে, মালা গাঁথিবারে,
মালা ত হ'ল না গাঁথা,
ফুল গুলি হেথা সেথা,
ছড়ায়ে পড়িল ভূমি পরে।
আধেক না হতে মালা,
ভেঙ্গে গেল স্বপ্ন খেলা,
দেখি যে সে চলিয়ে গিয়েছে।
যা' কিছু সে এনেছিল,
কিছু না রাখিয়া গেল,
স্মৃতি সুধু জাগিয়া রয়েছে।
পাখী গুলি মনে মনে
মধুর ললিত তানে,
আরম্ভ করেছে সবে গান।
সুস্নিগ্ধ মলয় বায়,
সবে ধীরি ধীরি বয়
হেন কালে সব অবসান।
আধফোটা ফুল চয়,
ফুটিতে পেলেনা হায়,
আর—অলির ঝঙ্কার নাহি শুনি;
কখন যে এসেছিল,
কখনি বা চলে গেল,
কিছুই না জানি।

শ্রী নী—

৩৫৪ সংখ্যা

আষাঢ় ১৩০১—জুলাই ১৮৯৪।

৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনী পত্রিকা

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মহারাণীর জন্মোৎসব—২৪এর পরিবর্ত্তে গত ২৬এ মে মহারাণীর জন্মোৎসব হইয়াছে। মহারাণী ৭৬ বর্ষে পদার্পণ করিলেন এবং তাঁহার রাজত্ব ৫৮ বর্ষ হইল। জগদীশ্বর তাঁহাকে আরও দীর্ঘজীবিনী করিয়া প্রজাপালনে নিযুক্ত রাখুন।

কৃত্তিবাসের কীর্ত্তিরক্ষা—প্রসিদ্ধ রামায়ণগায়ক কবি কৃত্তিবাসের জন্মস্থান শান্তিপুরের নিকট ফুলিয়া গ্রাম। কতকগুলি সহৃদয় ব্যক্তি এইখানে একটী গৃহনির্ম্মাণ করিয়া রামসীতার মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবেন এবং বৎসর বৎসর একটী মেলা আহ্বান করিবেন, তাহার আয়োজন করিতেছেন। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে এই আয়োজনের সফলতা প্রার্থনা করি।

ভূদেবের বদান্যতা—স্বর্গীয় মহাত্মা ভূদেব মুখোপাধ্যায় সাধারণের হিতার্থ নগদ দেড়লক্ষ টাকা, তাঁহার বুধোদয় প্রেস এবং এডুকেশন গেজেট পত্রিকা প্রদান করিয়াছেন। দাতব্যগুলি এইঃ—

(১) চুঁচড়ার বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী. বার্ষিক অন্যূন ৩৯০৲ টাকা।

(২) ব্রহ্মময়ী ভৈষজ্যালয়, ৪৯২৲ টাকা।

(৩) সংস্কৃত পুস্তক প্রচার—ছাপাখানা আছে, তদ্ভিন্ন আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৩০০৲ টাকা।

(৪) এডুকেশন গেজেট—আবশ্যক হইলে বার্ষিক ৮০০৲ টাকা।

(৫) একজন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বেতন বার্ষিক অনধিক ৬৪৲ টাকা এবং অন্যান্য ব্যয় ৬৪৲ টাকা।

এই সকল দাতব্য কার্য্যে বর্ষে বর্ষে ২৬২০ টাকা ব্যয় হইবে, তদ্ব্যতীত ৩৭৮০ টাকা হইতে শ্রুতি, স্মৃতি, দর্শন শাস্ত্রের শিক্ষকদিগকে বর্ষে অন্যূন ৫০৲ ও ছাত্রদিগকে অন্যূন ৩০৲ টাকা করিয়া দেওয়া হইবে।

বিলাতী দেশালাই আমদানী—৩ বৎসর পূর্ব্বে ৩৩ লক্ষ টাকার দেশালাই আমদানী হয়, তৎপর বৎসর ৩৬ এবং তৎপর বৎসর ৩৭॥ লক্ষ টাকার আমদানী হইয়াছে। সামান্য দেশালাই কাঠী এদেশ হইতে ক্রমে ক্রমে অর্দ্ধকোটী ও কোটী টাকা হরণ করিবে।

বিলাতী ছাতা—গত ৩ বৎসরে যথাক্রমে ৪০, ৪৪ ও ৪৮ লক্ষ টাকার ছাতার আমদানী হইয়াছে।

দুর্ভিক্ষ—ফরিদপুর অঞ্চলে দুর্ভিক্ষ না কমিতে কমিতে মধ্য ভারতবর্ষ হইতে ভয়ানক দুর্ভিক্ষের সমাচার পাওয়া যাইতেছে। ইতিমধ্যে সাহায্যভাণ্ডার খোলাতে হাজার হাজার লোক খাটিতে আরম্ভ করিয়াছে।

জাপানে স্ত্রী স্বাধীনতা—জাপানে স্ত্রীলোক অপেক্ষা পুরুষ সংখ্যা ১০ লক্ষ অধিক, এজন্য প্রত্যেক রমণীকে বিবাহিত হইতে বাধ্য হইতে হইত। কোনও স্ত্রীলোক নিজে বর গ্রহণ না করিলে গবর্ণমেন্ট বর মনোনীত করিয়া দিতেন। এখন এ অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে জাপানী মহিলারা মুক্ত হইয়াছেন।

বরাহনগর বিধবাশ্রম—ইহার প্রতিষ্ঠাতা বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ইহার একটী স্থায়ী ফণ্ডের জন্য সচেষ্ট হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, ময়মনসিংহের জমিদার রাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী এই ফণ্ডে৫০০৲টাকা এব কাশ্মীরের মহারাজা ১০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। ঢাকার ৺প্রতাপচন্দ্র দাসও মৃত্যুর পূর্ব্বে ১০০ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। অন্যান্য ধনাঢ্যগণ হিন্দুবিধবাদিগের কল্যাণার্থে সাহায্য দান করিয়া অর্থের সার্থকতা করুন্।

মহিলা ডাক্তার—শ্রীমতী হেমবতী সেন এবার কলিকাতা কেম্বেল মেডিকেল স্কুল হইতে বিশেষ পারদর্শিতার সহিত উত্তীর্ণ হইয়াছেন। অনার পরীক্ষায় উচ্চ স্থান অধিকার করায় পাঁচটি রৌপ্য পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। গবর্ণর জেনারেল প্রদত্ত রৌপ্যপদকও তিনিই পাইয়াছেন। লেডি এলগিন এজন্য বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া উক্ত স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র লিখিয়াছেন। কেম্বেল মেডিকেল স্কুল স্থাপনাবধি এপর্য্যন্ত কোনও মহিলাই এরূপ যোগ্যতার সহিত উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই।

বিবী বেসান্টের প্রতিবাদ পত্র—ডাক্তার লুন নামক কোন খৃষ্টভক্ত হিন্দুধর্ম্মের গ্লানি করিয়া মেথডিষ্ট টাইম্‌স পত্রে এক প্রস্তাব লেখেন, বিবী বেসান্ট ইহার যে উত্তর দিয়াছেন তাহা যেরূপ যুক্তিগর্ভ, সেইরূপ বিজ্ঞতাপূর্ণ। এই পত্র ৯ই জুনের ইণ্ডিয়ান মিররে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা পাঠ করিলে হিন্দুদ্বেষী খৃষ্টানদিগের ন্যায় প্রাচীন সদাচারত্যাগী নামধারী হিন্দুদিগেরও চক্ষু ফুটিবে ও উপকার দর্শিবে।

রামায়ণ ও তদন্তর্গত নীতি।

"বাল্মীকি গিরিসম্ভূতা রাময়ণো মহানদী।
পুনাতি ভুবনং ধন্যা রামসাগরগামিনী।

শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য্য-সম্পন্ন নাম এদেশীয় আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই মনে প্রগাঢ়রূপে মুদ্রিত আছে। ভারতবর্ষের মধ্যে যে যে ব্যক্তির কবিত্ব বিষয়ে অভিমান ছিল, প্রায় সকলেই কোন না কোন প্রকারে তদীয় পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন পূর্ব্বক আপনাদের লেখনীর সার্থকতা সাধন ও অমরকীর্ত্তি লাভ করিয়াছেন। অলৌকিক কার্য্যদ্বারা তিনি জগতের মহোপকার করিয়া গিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহার নাম ও চরিত্রকে ভুলিতে পারা যায় না। স্বর্গীয় ধনপূর্ণ অক্ষয়ভাণ্ডারসহ তাঁহার চরিত্রের তুলনা দেওয়া অত্যুক্তি নহে। ক্রমাগত চারিসহস্র বৎসর লোকে তাঁহার নামোচ্চারণ করিয়াছে, তথাপি এখনও তাহা আনন্দকর নিত্য নূতন বলিয়া প্রতীত হইতেছে। রামচন্দ্র যথার্থই এক সর্ব্বলোকপ্রিয় রাজশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ ছিলেন। পৃথিবীর সহিত আততায়িরূপে যুদ্ধ করিয়া যবন নৃপতি সিকন্দর যদি একজন মহাজন বলিয়া আখ্যাত হয়েন; নেপোলিয়ন স্বকীয় দিগ্বিজয় দ্বারা যদি "ইউরোপের পরিত্রাতা" উপাধির যোগ্য হয়েন,তবে আমাদের রামচন্দ্র, যিনি স্বদেশে—এই বৃহত্তম ভারতরাজ্যে সুখশান্তি সমানয়ন করেন, যিনি নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের অতুলন আদর্শ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে এতদ্দেশীয় পণ্ডিতেরা যে ঈশ্বর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কোন মতেই বিচিত্র নহে। তাঁহার চরিত্রের তুলনাস্থল মিলে না। তিনি গৃহমধ্যে থাকিয়া স্বকীয় অপার ঔদার্য্যগুণ এবং বদান্য স্বভাব বশতঃ যদ্রূপ পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা, সুহৃদ এবং দীন দরিদ্র জনগণের পরম প্রীতির পাত্র হইয়াছিলেন, সিংহাসনস্থ হইয়া অপক্ষপাত সুবিচারদ্বারা প্রজাবর্গ হইতে তদ্রূপ ধন্যবাদ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, এবং অমিত তেজঃপ্রভাবে সংগ্রামস্থলে আততায়ী শত্রুদল নিপাত পূর্ব্বক সেইরূপ যশোভাজন হন। ঈদৃশ মহাত্মার চরিত্র অদ্য আমরা পাঠিকাগণের বিদিতার্থ সংক্ষেপে বর্ণনা করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

প্রথমে দেখা যাউক শ্রীরামের জীবনী সম্বন্ধে কি কি গ্রন্থ প্রচলিত আছে।

বাল্মীকির রামায়ণই সর্ব্ব জ্যেষ্ঠ ও প্রধান। রামের কীর্ত্তি যথার্থতঃ বাল্মীকি হইতে প্রচারিত হইয়াছে। তিনি যদি তাঁহার জীবনী রচনা না করিতেন, তবে রাম নাম জগতে এত পরিচিত হইত না। রামায়ণ চতুর্ব্বিংশ সহস্র শ্লোকাত্মক ও সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। ইহা কাব্য গুণাশ্রয় গ্রন্থ, রচনা সর্ব্বত্র সরল ও স্থানে

স্থানে বিলক্ষণ মাধুর্য্যব্যঞ্জক। গ্রন্থকার আত্মসময়ে ভারতবর্ষে কিরূপ লৌকিক ব্যবহারাদি প্রচলিত ছিল, তাহা উত্তমরূপে বিবৃত করিয়াছেন। বাল্মীকি রামের সমকালবর্ত্তী ছিলেন, এবং সর্ব্বপ্রথমে কাব্য রচনা করাতে "আদি কবি" বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন।

মহাভারতে রামের বৃত্তান্ত সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। ব্যাসদেব ইহাতে তাঁহার রামানুরাগের পরিচয় দিতে ক্রটী করেন নাই। অধ্যাত্ম রামায়ণ নামক আর এক গ্রন্থ ব্যাসদেব বিরচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্মভাবে পূর্ণ।

কালিদাস কৃত রঘুবংশ। বাল্মীকি যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়া সুচারু পরিচ্ছদ প্রদান করেন, কালিদাস স্বকীয় অলৌকিক হস্ত স্পর্শদ্বারা তাহাকে সজীব করিয়াছেন। রঘুবংশ ঊনবিংশ সর্গাত্মক মহাকাব্য, তন্মধ্যে নবমাবধি পঞ্চদশ পর্য্যন্ত সপ্তসর্গে দশরথ এবং রামের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। ইদানীন্তন এতদ্দেশীয় কোন সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিত কহিয়াছেন "রঘুবংশের আদি অবধি অন্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাংশই সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। যে অংশ পাঠ করা যায়, সেই অংশেই অদ্বিতীয় কবি কালিদাসের অলৌকিক কবিত্ব-শক্তির সম্পূর্ণ লক্ষণ সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়।" কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে একজন ছিলেন, সুতরাং ঊনবিংশতি শতবর্ষ পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। বণ্টলি প্রভৃতি যে কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে আধুনিকরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহারা কৃতকার্য্য হন নাই।

মহানাটক। বিক্রমাদিত্যের প্রাদুর্ভাবকালে হনুমান্ নামক কোন পণ্ডিত তাহা রচনা করেন। মহানাটক নয় অঙ্কে বিভক্ত ও ৬১২ শ্লোকাত্মক। এই গ্রন্থের স্থানে স্থানে উৎকৃষ্ট রচনা আছে।

ভট্টিকাব্য। ভট্ট নামক পণ্ডিত রচনা করেন। গ্রন্থখানি ২২ সর্গে বিভক্ত। গ্রন্থকার রামচন্দ্রের চরিত্রের সহিত ব্যাকরণের নানাবিধ উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া আশ্চর্য্য পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন।

বীরচরিত ও উত্তরচরিত। এই দুই উৎকৃষ্ট নাটক ভবভূতি প্রণীত। ভবভূতি কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সভাসদ ছিলেন, সুতরাং শকাব্দার সপ্তম শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হয়েন। পাশ্চাত্য সমালোচকদের মতে তিনি কালিদাস অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর কবি।

অদ্ভুত রামায়ণ নামে এক গ্রন্থ বাল্মীকির কৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, বস্তুতঃ তাহা অতি আধুনিক গ্রন্থ। গ্রন্থকার দশানন রাবণের উপাখ্যান শ্রবণে পরিতৃপ্ত না হইয়া শতানন রাবণের গল্প লিখিয়াছেন।

বশিষ্ঠ রামায়ণ বা যোগবাশিষ্ঠ। এই গ্রন্থে অতীব সংক্ষেপে রামচন্দ্রের এক কল্পিত অবস্থার বিষয় লিখিত হইয়াছে, বেদান্ত দর্শনকে সাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য।

রাঘব পাণ্ডবীয় নামক গ্রন্থ কবিরাজ

পণ্ডিত প্রণীত। ইহা এক অদ্ভুত গ্রন্থ। এক ভাবে ইহা শ্রীরামের চরিত্র,ভাবান্তর গ্রহণ করিলে পঞ্চ পাণ্ডবের বৃত্তান্ত হইয়া উঠে।

তুলসীদাস হিন্দীভাষায় এক রামায়ণ রচনা করেন। তিনি চিত্রকূট সমীপস্থ হাজপুর গ্রামে ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। যৌবনাবস্থায় কাশীনগরী-পতির দেওয়ানরূপে নিযুক্ত হয়েন। তিনি ৩১ বর্ষ বয়সে (১৬৩১ সম্বতে) বারাণসীধামে রামায়ণের অনুবাদ আরম্ভ করেন। রামগুণাবলী নামে এক গ্রন্থও তাঁহার দ্বারা রচিত হয়।

বৃহদ্ধর্ম্ম প্রভৃতি কোন কোন পুরাণে শ্রীরামের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

বঙ্গদেশে কৃত্তিবাস পণ্ডিত প্রায় দুই শত পঁচিশ বর্ষ পূর্ব্বে রামায়ণকে বাঙ্গালা পরিচ্ছদে প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুস্তকে স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার পুস্তক এক্ষণে পুনঃ পুনঃ মুদ্রিত, পরিবর্ত্তিত ও সংস্কৃত হইয়া বিভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্রামরসায়ন। বর্দ্ধমান নিবাসী শ্রীরঘুনন্দন গোস্বামী বাঙ্গালা পদ্যে এই গ্রন্থ বিরচন করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কৃত্তিবাসী রামায়ণের ন্যায় সুবৃহৎ ও সুললিত।

প্রায় ষোল বৎসর হইল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ভঞ্জ মহাশয়ের অনুমতি অনুসারে পণ্ডিতবর শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়দ্বারা বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোপাল ভক্ত মহাশয় বাঙ্গালা গদ্যে মূল বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজ ৺ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর মহোদয়ের ব্যয়ে মূল বাল্মীকি রামায়ণ বাঙ্গালা গদ্যে অনুবাদিত হইয়াছে।

কবিবর ৺ রাজকৃষ্ণ রায়ও বাঙ্গালা পদ্যে মূল রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

রামের চরিত্র ভারতবর্ষ মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল না। আরাকান দেশে এক গ্রন্থ আছে, তাহার উপাখ্যান এই, যে তোৎসকল নামক এক ব্যক্তি প্ররামের পত্নী নংসীদাকে হরণ করিয়াছিল; প্ররাম ও তাহার ভ্রাতা প্রালাক্ তোৎসকলকে বিনাশ পূর্ব্বক নংসীদার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

শ্যামদেশে অবিকল এইরূপ এক গ্রন্থ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার নাম রামকিউন্।

বলীদ্বীপে কবিভাষায় রামায়ণ গ্রন্থ আছে। বাল্মীকি তাহার রচনাকর্ত্তা বলিয়া উক্ত হন। এখনকার রামায়ণের ন্যায় তাহা সপ্তকাণ্ডাত্মক নহে; কিন্তু উত্তরকাণ্ড ব্যতীত অপর ছয় কাণ্ড একত্রীভূত হইয়া ২৫ সর্গে বিভক্ত হইয়াছে। উত্তরকাণ্ড একখানি পৃথক্ গ্রন্থ, তাহাও বাল্মীকিকৃত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

লঙ্কাদ্বীপের ইতিহাসে রাম ও রাবণের প্রসঙ্গ আছে।

কয়েক বৎসর অতীত হইল বারাণসী

কলেজের অধ্যাপক গ্রীফিথ সাহেব ইংরাজী পদ্যে বাল্মীকি রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত বিবরণদ্বারা প্রতীত হইতেছে, যে শ্রীরামচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

রমণী পরিত্রাণের সহায়।

রমণি! তোমরা স্বর্গের দেবী, আমরা তোমাদিগকে পূজা করিয়া থাকি। কেন পূজা করি, সে কথা আজ লিখিতেছি। রমণী-হৃদয়ে পবিত্র পরমেশ্বরের বাস, সেইজন্য এযুগে তোমরা আমাদিগের পূজ্য। অতি প্রাচীনকাল হইতে এপর্য্যন্ত রমণী-জাতিকে পুরুষগণ চিনিতে পারে নাই, তাই এত দিন গৃহের দেবী-প্রতিমা অনাদরে হতাদরে মলিন হইয়া গিয়াছে—পুরুষের খেলার সামগ্রী হইয়া রহিয়াছে, দশটা উপভোগ্য জিনিসের মধ্যে একটা উপভোগের পদার্থ হইয়া আছে। আজ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে পবিত্র স্বর্গের আলোকে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড জ্যোতিষ্মান্ হইয়াছে—জগতের কোথায় কি আঁধারে ঢাকিয়া ছিল, সমস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, আজ রমণী-হৃদয়ের অন্তর্দেশ উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে দেখা গেল, স্বয়ং পরমেশ্বরের জীবন্ত সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত।

রমণী আজ জড় নহে—ঘটি বাটী বা দশটা গৃহ সামগ্রীর একটা নহে—রমণী পুরুষের ইন্দ্রিয়সেবার বিষয় নহে। রমণী এতদিন পুরুষের দাসী ছিল, আজ আর দাসী নহে, দাসী দেবী হইয়াছে, পুরুষের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে এখন রমণীর আসন প্রতিষ্ঠিত। রমণী এতদিন পুরুষের শরীরের সেবা করিয়াছে, এখন হৃদয়ের সেবা করিতেছে—পুরুষের জীবনটাকে ধরিয়া বিশ্বাধিপের চরণতলে লইয়া যাইতেছে, সে চরণস্পর্শে পুরুষ মুক্তিলাভ করিতেছে—রমণী এযুগে পুরুষের পরিত্রাতা।

পরিত্রাণের প্রধান উপাদান প্রেম। প্রেমের স্পর্শে প্রেম বিকশিত হয়। রমণী-হৃদয় এই প্রেমে বিগঠিত, নারী-প্রেমের স্পর্শে পুরুষ কেন না পরিত্রাণ পাইবে? কেবল পুরুষের কথা বলিতেছি না, জন-সমাজের কল্যাণের জন্য—জন-সমাজকে মুক্তিধামের পথে লইয়া যাইবার জন্য সমাজ মধ্যে এই দেবী-প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিশ্ব-জননী আপনার হৃদয় হইতে তিল তিল করিয়া প্রেম, পবিত্রতা ও পুণ্য আহরণ পূর্ব্বক এই তিলোত্তমা প্রেম-প্রতিমা নির্ম্মাণ করিয়াছেন ও বিশ্বের পরিত্রাণহেতু বিশ্বমধ্যে স্থাপন করিয়াছেন। এ প্রতিমার হৃদয়ে প্রেম, হস্তে সেবা, মুখমণ্ডলে পবিত্রতা। জগৎ!

আজ হাসিয়া উঠ, তোমার পরিত্রাণের দিন সমাগত।

রমণি! তবে আজ এস, হৃদয়ের সিংহাসনে ব'স, আমরা তোমার পূজা করি, নারী-পূজা ভিন্ন এযুগে মুক্তি নাই, এ সমাচার জগতের দ্বারে দ্বারে ঘোষিত হইতেছে। ভারত আর ঘুমাইবে না, ভারতও জাগিয়া উঠিবে, এই বিশ্বব্যাপী মহাপূজায় যোগ দিবে।

জগতের চক্ষু আজ পবিত্র হউক, জগৎবাসী আজ পবিত্র চোখে রমণীর মুখপানে দৃষ্টি করুক। ঐ বিমল, সুন্দর, শোভন মুখের অন্তরালে যে সৌন্দর্য্যভাতি ফুটিয়া উঠিতেছে, উহার উৎস কোথায়? দেবী-মুখের অন্তরালে বিশ্ব-দেব আজ সৌন্দর্য্যের ফোয়ারা খুলিয়া দিয়া আপনি সেই সৌন্দর্য্যে মগ্ন রহিয়াছেন, বিশ্বাসী প্রেমিক! দেখিয়া মোহিত হও, ও সৌন্দর্য্যে ডুবিয়া যাও, তলাইয়া যাও, আত্মহারা হইয়া যাও, ক্ষুদ্রের মধ্য দিয়া অনন্তে মিশিয়া যাও। কে বলিল "কা তব কান্তা?" কে বলিল এ সৌন্দর্য্য অসার?—কে বলিল রমণীর মুখমণ্ডল পতনের সেতু? ভ্রান্ত মানব! চক্ষু মেলিয়া চাহিতে জান না, তাই সুধার ভাণ্ডার হইতে গরল আহরণ কর, সে গরল পান করিয়া মরণের কোলে শুইয়া পড়। পবিত্র চোখে চাও, দেবীর মুখের পানে যেমন করিয়া চাহিতে হয়, তেমনি করিয়া চাও, দেখ তোমার ইন্দ্রিয় নিভে কি না, প্রাণ জাগে কি না, হৃদয়ের শিরায় শিরায় জীবনের স্রোত বহে কি না, মুক্তিধামের পথ খুলিয়া যায় কি না?

প্রাচীনকালের শাস্ত্রে আছে পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ দেখিবে, আধুনিক কালের শাস্ত্র বলিতেছে, বিশ্বজননীর মাতৃভাব স্ত্রীলোক মাত্রেই দর্শন করিয়া তাহার পূজা করিবে। যে নিজের স্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিতে জানে না, সে যে পরস্ত্রীকে দেবীবৎ দেখিবে, তাহার কি কোনও প্রমাণ আছে? যে নিজের স্ত্রীকে দেবীর আসনে বসাইয়া পূজা করিতে পারে না, সে কি পরস্ত্রীকে দেবীর সম্মান দিতে পারিবে? যে নিজের ঘরে দেবী প্রতিমায় অসম্মান করে, সে কি পরগৃহে দেবী-প্রতিমার আদর করিতে শিখিবে? সমাজের শাসন উঠিয়া যাক্—রাজনীতির বাঁধন শিথিল হউক, দেখ দেখি এই অধঃপতিত দেশে শাস্ত্রের শাসন কিরূপে রক্ষা পায়।

কি বলিতেছিলাম. কোথায় আসিয়া পড়িলাম? দেবি! তোমার মুখখানি স্বর্গের ছবি। নয়নযুগলে কি আছে, জানি না, যখন ঐ মুখপানে প্রাণ ভরিয়া চাহি, তখনি ঐ নয়নযুগল হইতে এক স্বর্গীয় বৈদ্যুতিক শক্তি আসিয়া প্রাণের মাঝে প্রবেশ করে,প্রাণের কোন্ এক গুপ্তস্থানে গিয়া কি সে যেন আঘাত করে। প্রাণের সেই খানটা থেকে কি যেন খুলিয়া যায়, আমাকে কোন্ এক অজ্ঞাত স্থানে লইয়া যায়! সেখানে প্রেম ফুটিতেছে, পবিত্রতা উথলিতেছে, সবারি

মুখে হাসি রাশি, সবারি মুখে শুভ্র জ্যোতি, সকলে যেন পবিত্রতায় স্নান করিয়া উঠিয়াছে, প্রাচীন কালের ময়লা পোষাক ছাড়িয়া কি যেন এক স্বর্গের পোষাক—পুণ্যের পোষাক পরিয়াছে। এরা বুঝি দেবতা, আমি ইহাদের কাছে থাকিতে চাই। রমণি! তবে এস, আমি তোমার ঐ মুখের ঢল ঢল লাবণ্যের মধ্য দিয়া ঐ হৃদয়ের মাঝে ডুবিয়া যাই, দেবীহৃদয়ে এ হৃদয় ঢালিয়া দিয়া সেখানে প্রেম ও পবিত্রতায় স্নাত হইয়া আমিও ইঁহাদের মত পবিত্র হইয়া যাই, ও প্রেমের উৎসরূপী অনন্তের প্রেমে গা ভাসাইয়া দিয়া আপনাকে হারাইয়া ফেলি।

রমণি! তোমার হৃদয়ের অন্তরালে ঐ কাহাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছ? প্রাণের ঈশ্বর? পাহাড়, পর্ব্বত, নদ নদী, বন জঙ্গল কত কি খুঁজিয়া আসিলাম, যাঁহাকে পাইলাম না, আজ তোমার হৃদয়ের মূলে তিনি? এ কথা এতদিন বল নাই কেন? অথবা তুমি বলিয়াছিলে, আমি শুনি নাই। আমার চোক এত দিন পরিষ্কার হয় নাই, তাই ও হৃদয়ের মূলে নরক দেখিয়াছি—স্বর্গের ঈশ্বর অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতিকে দেখি নাই। তোমার হৃদয়ে প্রাণরূপী ভগবান্ বিরাজমান, তাই মহাযোগী, কঠোর সংযমী শাক্যদেব এত কঠোর সাধনার পরও তাঁহাকে পান নাই; যখন তোমার পানে দৃষ্টি পড়িল—যখন তোমার ঐ হৃদয় নিহিত প্রেমরূপী ভগবান্ সেবারূপে তোমারই হাত দিয়া এই সংসারহীন, পরিবারহীন, প্রেমহীন ক্লিষ্ট সাধকের মুখে ক্ষুধার সময় একটু পরমান্ন তুলিয়া দিলেন, তখনই তাঁহার মুক্তি ঘটিল। তুমি যে ঐ সেবার ব্যজনিকা হস্তে লইয়া পরিশ্রান্ত মানবের ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে বাতাস করিতেছ, উহা ভগবানের করুণার মলয় হিল্লোল। ও হিল্লোলে প্রাণ ঢালিয়া দিলে পরিত্রাণ পাইব না কেন? রমণি! তুমি ভগবানের প্রতিনিধি হইয়া আমার মুক্তির জন্য প্রেম, পবিত্রতা ও সেবার ভার লইয়া আসিয়াছ। তবে এস দেবি! এ হৃদয়কে স্পর্শ কর, আমি উদ্ধার হইয়া যাই।

পুরাণ কথা।

বৃত্রাসুর বধ।

ব্রহ্মার পুত্র ত্বষ্টা এক অসুর-কন্যার পাণিগ্রহণ করেন। অসুর-কন্যার গর্ভে ত্রিশিরা নামে একটী পুত্রের জন্ম হয়। তিনি এক সময়ে একটী মহা যজ্ঞ করিয়া আপনার মাতামহকুল অসুরদিগকে তাহার অংশ প্রদান করেন, ইহাতে দেবরাজ ইন্দ্র কুপিত হইয়া তাঁহার শিরশ্ছেদন করেন। ত্বষ্টা ঋষির তপোবলে

আর এক পুত্র হয়, তাহারই নাম বৃত্রাসুর। সে বিষ্ণুভক্ত ও মহাবলপরাক্রান্ত হইয়া ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লয় এবং সকল দেবতাকে পদচ্যুত করিয়া স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ত্রিভুবন অধিকার করিয়া বসে। দেবগণ তাহার ভয়ে ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া মানবগণের সহিত পৃথিবীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এরূপ কষ্টকর জীবন অধিক দিন ধারণ করিতে না পারিয়া তাঁহারা ব্রহ্মার নিকট গমন করিলেন এবং দুর্গতি মোচনের জন্য তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বিষ্ণুর সমীপবর্ত্তী হইলেন এবং অনেক স্তব স্তুতি করিয়া তাঁহাকে বৃত্রাসুর বধের উপায় নির্দ্ধারণ করিতে বলিলেন। বিষ্ণু বলিলেন বৃত্রাসুর বধের আর অন্য উপায় নাই, কেবল একমাত্র উপায় আছে—দধীচি নামে এক মুনি আছেন, যদি তাঁহার অস্থিতে বজ্র নির্ম্মাণ করিতে পার, তদ্দ্বারা অসুরের প্রাণনাশ হইবে। বিষ্ণুর উপদেশে দেবগণ দধীচি মুনির আশ্রমে উপনীত হইলেন এবং তাঁহার নিকট সবিশেষ সকল বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। পরম দয়ালু ঋষি দেবকার্য্যে দেহপাত হইবে ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন এবং পরমানন্দে দেবগণের নিকট প্রাণ উৎসর্গ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পরে তিনি যোগাসনে ধ্যানমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের আদেশে বিশ্বকর্ম্মা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন, দেবগণের মহা আনন্দ! তাঁহারা অবিলম্বে রণসজ্জা করিয়া বৃত্রের ভবনাভিমুখে গমন করিলেন এবং "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া তাহাকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। বৃত্র দলবল লইয়া ঘোরতর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল, অনেকক্ষণ যুদ্ধ হইল, কোনও পক্ষ জিত বা পরাজিত হইল না। অবশেষে দৈত্যবর মুখব্যাদান করিয়া ইন্দ্রকে গিলিতে ধাবমান হইল। সুরপতি অসুর-ভয়ে ভীত হইয়া দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। দেবগণও যুদ্ধ ভঙ্গ দিয়া যিনি যেখানে পারিলেন গিয়া লুক্কায়িত হইলেন। কিছু দিন পরে ইন্দ্রসহ দেবগণ পুনরায় বিষ্ণুর শরণাপন্ন হইলেন। বিষ্ণু বলিলেন তোমাদিগের একটী অভাব আছে। তোমরা আপনার তেজে যুদ্ধ করিতে গিয়াছিলে, তাহাতে কিরূপে জয়ী হইবে? তোমাদের মধ্যে বিষ্ণুতেজ চাই, এই লও আমি তাহা দিতেছি। বিষ্ণুতেজে প্রদীপ্ত হইয়া দেবগণ নির্ভয় ও মহোৎসাহপূর্ণ হইলেন। তৎপরে তাঁহারা অতুল সাহসে অসুরদিগের সহিত যুদ্ধ করিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র দধীচি মুনির অস্থিনির্ম্মিত বজ্র দ্বারা বৃত্রাসুরকে নিহত করিতে সমর্থ হইলেন।

এই উপাখ্যান হইতে অনেক গুলি সার উপদেশ লাভ করা যায়। (১) অন্যের অনিষ্ট করিলে নিজের অনিষ্ট হয়। দেবরাজ ত্রিশিরাকে বধ করিয়া বৃত্রাসুরদ্বারা যারপরনাই লাঞ্ছিত ও দণ্ডিত হন। (২) বিপদ্ কালে ভগবানের

শরণাপন্ন হওয়া ভিন্ন বিপদুদ্ধারের উপায় নাই। দেবতাগণকেও বিষ্ণুর আশ্রয় লইতে হইল। (৩) দধীচি মুনির অস্থি অশেষ শিক্ষাপ্রদ। দেবকার্য্য সাধনের জন্যই সাধুর জীবন এবং সাধু তাহাতেই জীবন উৎসর্গ করিয়া আপনাকে ধন্য ও কৃতার্থ মনে করেন। (৪) প্রাণদান বিনা কোনও দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন হয় না। একজন হৃদয়ের অস্থি দিউক, ত্রিভুবন তাহাতে নির্ভয় ও নিরাপদ হইবে। (৫) অব্যর্থ উপায় হস্তে পাইলেও নিজের তেজে জয়লাভ করিবার আশা করিলে তাহা বিফল হয়। (৬) বিষ্ণুতেজে অর্থাৎ স্বয়ং ভগবানের শক্তিতে পূর্ণ হইয়া অস্ত্রপ্রয়োগ করিতে পারিলে তবে মহাসুর নিপাত হয় এবং সংগ্রামে জয়লাভ হয়।

ধ্বনি বা শব্দ বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে কর্ণপটহে বায়ুতরঙ্গের সংস্পর্শ হইলে তৎসংলগ্ন স্নায়ুতে এক প্রকার বেগের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে নীত হইলে শব্দজ্ঞান নিষ্পন্ন হয়। এই বায়ুতে তরঙ্গ কিরূপে উত্থিত হয়, তাহাও আমরা পাঠিকাগণের হৃদ্‌গত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। নিম্নলিখিত উদাহরণ দ্বারা ঐ বায়ুতরঙ্গের প্রকৃতি অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। যদি ৫টী বা ৬টী বা তদধিক সংখ্যক হস্তিদন্তনির্ম্মিত গোলা কোনও এক মসৃণ স্থানে এক সরল রেখায় পরস্পর সংলগ্ন করিয়া শ্রেণীবদ্ধ রাখা যায়, এবং উহার এক প্রান্তের গোলাতে ঐ শ্রেণীর সমসূত্রে আর একটী গোলা গড়াইয়া আঘাত করা যায়, তাহা হইলে উহার অপর প্রান্তের গোলাটী মাত্র স্বস্থানচ্যুত হইয়া সরিয়া যাইবে, অন্যান্য গোলাগুলি যথাস্থানেই অবস্থান করিবে, স্থানভ্রষ্ট হইবে না। এই ব্যাপারে কি কি কাণ্ড ঘটিতেছে, অনুধাবন করা যাউক। প্রান্তস্থিত যে গোলাটীতে প্রথম আঘাত করা হইল, যদি সেই গোলাটী মাত্র সেই স্থানে থাকিত, তাহাহইলে নিঃসন্দেহই উহা আঘাত বলাভিমুখে ধাবিত হইত। কিন্তু উহার পরে আর একটী গোলা থাকাতে, উহা ঐ দ্বিতীয় গোলাতে চাপিয়া পড়িয়াই প্রতিঘাত পাইতেছে এবং ঐ দ্বিতীয় গোলাতে নিজ বেগ সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। আবার দ্বিতীয় গোলাটীও তৃতীয় গোলার উপর চাপিয়া পড়িয়া উহাহইতে প্রতিঘাত পাইতেছে, এবং নিজের বেগ উহাতে সংক্রামিত করিয়া স্বস্থানে ফিরিয়া আসিতেছে। তৃতীয়, চতুর্থ এবং মধ্যবর্ত্তী

আর যতগুলি গোলা আছে, তত্তাবতের ক্রিয়াই ঐ একরূপ হইতেছে। সকলের প্রান্তের গোলাটী প্রতিঘাত পাইবার কোন বস্তু না থাকাতে স্বস্থান হইতে ধাবিত হইতেছে। এই শেষোক্ত গোলাটীর সম্মুখে যদি একখানি পাতলা চর্ম্ম লম্বভাবে আবদ্ধ করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে গোলা সহজেই স্বীয় বেগ ঐ চর্ম্মে সংক্রামিত করিয়া ফিরিয়া আসিবে এবং চর্ম্মখানি আবদ্ধ থাকাতে কম্পিত হইতে থাকিবে। আমাদিগের যখন শব্দ জ্ঞান হয়, তখন কর্ণপটহে বায়বীয় পরমাণুর ক্রিয়াও অবিকল এইরূপ হইয়া থাকে। যখন কোন বস্তুতে আঘাতদ্বারা শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন ঐ আঘাত-বল পূর্ব্বোক্ত গোলার শ্রেণীর ন্যায় বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীর পূর্ব্ব পূর্ব্বটী হইতে পর পরটীতে ক্রমে সংক্রামিত ও কর্ণপটহে উপস্থিত হইয়া উহাকে কম্পিত করে। ঐ কম্পনে তৎসংলগ্ন স্নায়ুজালে বেগ বিশেষের উৎপত্তি হয়, এবং ঐ বেগ মস্তিষ্কে গিয়া শব্দে পরিণত হয়। এই ক্রিয়াগুলি এত শীঘ্র নিষ্পন্ন হয় যে যুগপৎ উৎপন্ন হইতেছে বলিয়া প্রতীত হয়। (ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

যে দেশে যত প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়, সেই দেশেই সেই সকল রোগের ঔষধ স্বরূপ উদ্ভিদ্, খনিজ বা অপর প্রকার দ্রব্য অবশ্যই আছে। যিনি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া থাকেন, যাঁহার কৃপায় আমরা সর্ব্বপ্রকার সুখভোগে সমর্থ হই, তিনি যে রোগরূপ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার উপায় করিয়া দেন নাই, অথবা স্বাস্থ্যসুখ সম্ভোগের উপায় বিধান করেন নাই, এমন কখনই হইতে পারে না। আমাদের দেশে যে সকল উৎকট রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, অনুসন্ধান করিলে ঐ সকল রোগের প্রকৃত ঔষধও আমাদের দেশে পাওয়া যায়। আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে এ দেশীয় অতি সামান্য ও অনায়াস-লভ্য পদার্থের মধ্যেই আমাদের রোগশান্তির উপায় আছে। বিচক্ষণ এবং সুপণ্ডিত ব্যক্তিরা যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান ও পরীক্ষা করিলে, অবশ্যই দেশীয় অতি সামান্য বস্তুর মধ্যেই কোনটী ওলাউঠার, কোনটী জ্বরের, কোনটী কাশের প্রকৃত ঔষধ বলিয়া স্থির করিতে পারেন, এবং সেই সকল ঔষধের দুই এক পান অথবা তাহার পাঁচনের দুই এক কাঁচ্চা সেবন করিলেই রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হইবে।

বহুকাল হইতে অস্মদ্দেশে "ঠাকুরুণ দিদির টোট্‌কা" বা মুষ্টিযোগ প্রণালী প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে এমন বাড়ী নাই যে বাড়ীর প্রাচীনারা সামান্য

সামান্য রোগ সকলের চিকিৎসা জানেন না। তাঁহাদের ভূয়োদর্শনের ফল নিশ্চয়ই উপকারক। আজ কাল পাশ্চাত্য চিকিৎসাপ্রণালী অস্মদ্দেশে প্রবেশাধিকার ও আধিপত্য লাভ করিয়াছে। এখন ক্রোড়স্থ শিশুর সর্দ্দি, উদরাময়, জ্বর (বালসা), ঘাম—এমন কি চুলকণা প্রভৃতি রোগের প্রতীকারার্থ আমরা ইংরাজী চিকিৎসক অর্থাৎ ডাক্তার না ডাকিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি না। ডাক্তারের হাতে প্রাণের পুত্তলিকাকে অর্পণ করিতে পারিলে সকল চিন্তা দূর হয়, কিন্তু এখনও এমন অনেক স্থান আছে, যেখানে আদৌ ডাক্তার মিলে না। ঐ সকল স্থানে পিতামহী ও তাঁহার অবর্ত্তমানে মাতাঠাকুরাণীর দত্ত ঔষধ দ্বারাই রোগ মুক্ত হয়। আহা! সে সকল কথা মনে হইলে বাস্তবিকই বড় কষ্ট হয়। এখন মাথা ধরিলেই, তাড়াতাড়ি ডাক্তারের নিকট যাই, অজীর্ণ হইলেই আহার বন্ধ করিয়া ডাক্তারের দত্ত পঞ্চাস্বাদ বিশিষ্ট ঔষধ সেবন করিতে থাকি। ফল এই হয়, না খেয়ে শুকিয়ে মরি, ঔষধের আস্বাদনে প্রাণান্ত হয়, অথবা কাষ্টকি, লিনিমেন্ট ও বেলেস্তারার জ্বালায় কিছুকাল ছট্‌ফট্‌ করিতে হয়। ব্যয়ের কথা আর বলিব কি, শেষে ভিটে নিয়ে টান পড়ে। পেটের অসুখ, অগ্নিমান্দ্য, অজীর্ণ, ইত্যাদি রোগে ঠাকুরুণদিদি কেমন সকল পাচক ঔষধ দিতেন, দুই এক দিন সেবনেই রোগত সারিতই, আহারও এক দিনের তরে বন্ধ থাকিত না। পাঠিকাদিগের বিদিতার্থ এই পত্রিকায় কতিপয় সারগর্ভ উপদেশ ও ব্যবস্থা এবং মুষ্টিযোগ সংগ্রহ পূর্ব্বক ক্রমশঃ প্রকাশ করা যাইবে।

ছেলেদের সর্দ্দি।

দুই এক দিবসের সর্দ্দিতে ছেলেদের দুধের পরিমাণ কমাইয়া দিতে হইবে। যে সকল শিশু কেবল স্তন্য দুগ্ধের উপর নির্ভর করে, তাহাদের প্রসূতিদিগকে একবেলা অন্নাহার দিবে, মৎস্যাদি খাইতে নিষেধ, স্নান বন্ধ। রাত্রে প্রায় উপবাস, অথবা দুই একখানি রুটি খাইতে দিবে, বৈকালে গা ধোয়া নিষেধ। ছেলেটীকে ভাল মধু ২০।৩০ ফোটা ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে, তাহাতে ২।১ বার পরিষ্কার দাস্ত হইবে। সর্দ্দি একটু বেশী হইলে বা তরল জলবৎ পদার্থ নাক দিয়া পড়িতে থাকিলে, ঐ মধুর সহিত প্রতিবারে ২।১ ফোঁটা আদার রস মিশাইয়া দিবে। সর্দ্দি বুকে বসিলে মধুর সঙ্গে কালা কপূরের রস প্রতিবারে ৩০।৪০ ফোঁটা মিশাইয়া দিবে ও প্রত্যহ ঐ নিয়মে ৩।৪ বার সেবন করিতে দিবে। গলা ডাকিতে থাকিলে সর্ষপ তৈল উষ্ণ করিয়া গলায় দিবে। সর্দ্দি বসিয়া গলা ডাকিতে থাকিলেও সেই সঙ্গে বৈকালে অল্প অল্প জ্বর হইলে মধু ও কালাকপূরের রসতো দিতেই হইবে, তা ছাড়া কাল তুলসীপাতার রস প্রতিবারে ৪০।৫০

ফোঁটা একটু মধুর সঙ্গে ঈষৎ উষ্ণ করিয়া ২।৩বার সেবন করাইবে। এই উপায়ে ৩।৪ দিনের মধ্যে সর্দ্দি ও জ্বর প্রায় আরোগ্য হয়। সর্দ্দিতো সারিবেই, সর্দ্দি সারার পরেও যদি জ্বর থাকে, তবে ৩।৪ দিন শেফালিকার পাতা ও কালমেঘের পাতার রস সেবন করাইলে, জ্বর আরোগ্য ক্ষুধা বৃদ্ধি ও শরীর সুস্থ হইবে।

পানে তৈল মাখাইয়া, উহা অগ্নিতে গরম করিয়া, শিশুদের বক্ষে লাগাইয়া রাখিলে সর্দ্দি ও কাশি সারে।

ময়ূরপুচ্ছ অন্তর্ধূমে, অর্থাৎ আবদ্ধ মৃণ্ময় পাত্রে রাখিয়া ভস্ম করিবে। পরে কিঞ্চিৎ পিপ্পলীচূর্ণ ও মধুসহ সেই ভস্ম বালকদিগকে সেবন করাইলে সর্দ্দি, ঘুংরি, হিক্কা ও প্রবল শ্বাস নিবৃত্তি হয়, ও সর্দ্দি তরল হইয়া মলসহ নির্গত হইয়া যায়, কতক বা বমি হইয়া উঠিয়া যায়।

বালকের বালসা প্রভৃতি রোগের চিকিৎসা।

কেশুরতে গাছের শিকড় অল্প পরিমাণে তিনটী গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া তিন দিবস ভক্ষণ করাইলে বালসার জ্বর আরাম হয়।

বনপুঁয়ের শিকড় ২॥টা গোলমরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে, অথবা কোঁকসিমের মূল ২॥টী মরিচ দিয়া বাটিয়া ভক্ষণ করাইলে বালকদিগের বালসা ভাল হয়।

পানের বোঁটায় ঘৃত বা তৈল মাখাইয়া, অথবা মুক্তবর্ষীর পাতা বাটিয়া, বা বকুল বিচি ঘষিয়া মল দ্বারে দিলে, শিশুদের সঞ্চিত বদ্ধ মল নির্গত হইয়া কোষ্ঠ বিশুদ্ধ হয়।

অচিরজাত শিশু স্তন্য পান না করিলে হরীতকী চূর্ণ অত্যল্প পরিমাণে, ঘৃত ও মধু সহ মিশাইয়া, তদ্দারা তাহার জিহ্বা ঘর্ষণ করিলে উপকার হয়। চোয়াল ধরিয়া বিবর্ণ হইলে কাল তুলসী-পাতার রস ও নাকদানা পাতার রস একত্র করত ঈষৎ উষ্ণ করিয়া গাত্রে মালিস করিলে উপকার দর্শে।

ধাইফুল ও পিপুল চূর্ণ আমলকীর ক্বাথ বা রসসহ সেবন করাইলে দন্তো-দ্ভেদ-জনিত শিশুর জ্বর, উদরাময়, বমি প্রভৃতি সমস্ত পীড়া নষ্ট হয়।

শিশুদিগের পীড়ায় স্তন্যদায়িনীকে সেই রোগোক্ত পথ্যাপথ্য পালন করিতে হইবে। পীড়াদি কোন কারণে তাঁহার স্তনের দুগ্ধ দূষিত হইলে অন্য ধাত্রীর দুগ্ধ পান করান কর্ত্তব্য।

কাশী ও গলা ঘড়ঘড়ানী ও বালসার ঔষধ।

আখগুপান—১টা, লবঙ্গ ১টা, জায়-ফল ১আনা, জবানী ১আনা, জল একতোলা, এই কয়েকটী দ্রব্য পেষণ করিয়া প্রদীপের উত্তাপে উষ্ণ করিয়া সেবন করাইলে দুই তিন দিবসের মধ্যে ভাল হয়।

একটী আকন্দ তুলার বালিস প্রস্তুত করিয়া উহা ছেলের মাথায় দিবে, এইরূপ করিলে ছেলেদের ঘুংরি, কাশি, কর্ণরোগ, চক্ষে জলপড়া, বাতশ্লেষ্মা রোগ জন্মে না।

বালকদিগের উদরাময়াদি পীড়ায় গাধার দুগ্ধ উপকারী। উদরাময় থাকিলে অর্দ্ধেক জল ও অর্দ্ধেক দুগ্ধ থানকতক বেল শুঁঠ সহ সিদ্ধ করিয়া সেই দুগ্ধ পান করাইবে। অজীর্ণ, দুদ্ তোলা থাকিলে দুগ্ধে ২।৪ ফোঁটা চূনের জল দিবে। এঁড়ে লাগায় পুষ্টিকর সহজ পাচ্য এবং অগ্নিকর আহার ব্যবস্থা করিবে। (ক্রমশঃ)

ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট।

আনি বেসাণ্ট ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী কোন স্থানে ১৮৪৭ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতামহ ইংরাজ হইলেও কর্ম্ম উপলক্ষে আয়র্লণ্ডে বাস করিতেন। এইস্থানে বেসাণ্টের পিতা জন্মগ্রহণ করেন, এবং অত্রত্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চিকিৎসা বিষয়ক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া উপাধি লাভ করেন। কিন্তু তিনি কখনও চিকিৎসা ব্যবসায়ে হস্তক্ষেপ করেন নাই। কিছুকাল পরে, তিনি ইংলণ্ডে আসিয়া কোন কর্ম্মোপলক্ষে জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করেন। বেসাণ্টের পিতা নাস্তিক এবং জননী ও ভগিনী ঘোর পৌত্তলিক ছিলেন। বেসাণ্ট বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যুকালে, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া নির্ব্বাহার্থ পুরোহিত আহূত হয়, কিন্তু তদীয় মুমূর্ষু পিতা ক্রোধে অধীর হইয়া তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে আদেশ দেন।

বেসাণ্টের পিতা ডাক্তার উড মরীস নাম্নী জনৈক আইরিস রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। বেসাণ্ট যখন শিশু, তখন তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। বেসাণ্টের জননী একজন গুণবতী রমণী ছিলেন। বেসাণ্ট তাহার সুখ্যাতি করিয়া বলেন, "She was the tenderest, sweetest, proudest, and noblest woman I have ever known" ১৮৫২ খৃঃ অব্দে ডাক্তার উডের মৃত্যু হইলে পর, বেসাণ্টের মাতা লণ্ডন সহর হইতে হারো নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। এই স্থানে মিসেস্ উড কয়েকটি ছাত্রকে অধ্যয়ন করাইতেন, এবং তাহা হইতে যাহা পাইতেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদিগের গ্রাসাচ্ছাদন নির্ব্বাহ হইত। হারো স্কুলের হেড্মাষ্টার সদাশয় ডাক্তার বটলার সাহেব, নানা প্রকারে এই বিপন্ন পরিবারের সহায়তা করেন। বেসাণ্ট বালিকা বয়সে বঙ্গবালিকার ন্যায় গৃহরুদ্ধা না থাকিয়া যথেচ্ছবিচরণ করিতেন। ইনি ক্রিকেট খেলাতে বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। গৃহসংশ্লিষ্ট উদ্যানে বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষে অবলীলা ক্রমে আরোহণ

করিতেন। একটী বিশাল বিস্তৃত বৃক্ষ তাঁহার পাঠাগার ও বিশ্রামাগারের কার্য্য করিত। বেসাণ্ট বহুক্ষণ ধরিয়া সেই বৃক্ষ-শাখায় বসিয়া অধ্যয়ন করিতেন। মিলটনের 'প্যারাডাইস্ লষ্ট্" বা স্বর্গচ্যুতি নামক গ্রন্থ পড়িতে তিনি অতিশয় ভালবাসিতেন। বেসাণ্ট বলেন, "এই প্যারাডাইস্ লষ্ট হইতে সয়তানের বক্তৃতা মুখস্থ করিয়া, সয়তান সাজিয়া, তাহার অভিনয় করিতাম।"

উপন্যাস-লেখক কাপ্তেন মেরিয়টের নাম অনেকে শুনিয়াছেন। ইহাঁর শিক্ষিত ভগিনী মিস্ মেরিয়ট জনৈক সম্পত্তিশালিনী রমণী ছিলেন। ইহাঁর এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে ইনি স্বয়ং শিক্ষাদান করিতেন। বেসাণ্টের জননীর সহিত মিস্ মেরিয়টের একদিন সাক্ষাৎ হয়। বেসাণ্ট তখন বালিকা। বেসাণ্টের আচরণ দেখিয়া মেরিয়ট যার পর নাই প্রীত হন। তিনি বেসাণ্টের জননীকে বলিলেন, আপনি যদি বেসাণ্টকে আমার বাটীতে লইয়া যাইতে দেন, তাহাহইলে আমি উহার শিক্ষার ভারগ্রহণ করিতে পারি। ইহাতে আপনার কিছু মাত্র অর্থ ব্যয় হইবে না। বাৎসল্যের বশীভূত হইয়া, দুহিতার ভবিষ্যৎ সমুন্নতির অন্তরায় হওয়া উচিত নয়, এই মনে করিয়া তিনি মিস্ মেরিয়টের প্রস্তাবে সম্মতা হইলেন। প্রেয়কে খর্ব্ব করিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করা, যুনানী মহিলাবর্গের এই এক চরিত্রের মহত্ব। বঙ্গমহিলাগণ এই মহত্ত্ব হইতে অনেকাংশে বঞ্চিতা।

মিস মেরিয়ট এক সুদৃশ্য পল্লীতে বাস করিতেন, বেসাণ্ট বৎসরের অধিকাংশ সময় এই স্থানে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতেন। কেবল পর্ব্বোপলক্ষে এক একবার বাটী যাইতেন। মিস্ মেরিয়ট নিরতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তিনি নানা উপায়ে দুঃখীর দুঃখমোচনে যত্নবতী ছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রীবর্গকে মধ্যে মধ্যে বলিতেন, "স্বয়ং বিদ্যাশিক্ষা করিয়া যদি অপর পাঁচজনকে সেই বিদ্যা দান করিতে না পার, তবে সেরূপ বিদ্যাশিক্ষা করা না করা সমান।" লোকশিক্ষারূপ কঠোর ব্রত গ্রহণের যে উচ্চাভিলাষ, তাহার বীজ এই সময়ে মিস মেরিয়ট কর্ত্তৃক বেসাণ্টের হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়াছিল।

মিস্ মেরিয়ট তাঁহার ছাত্রীগণকে সর্ব্ব প্রকার অশ্লীল নৃত্যগীতে যোগদিতে বা থিয়েটারে যাইতে নিষেধ করিতেন। ছাত্রীগণও তাঁহার আদেশের অন্যথাচরণ করিত না। বেসাণ্ট ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষা শিক্ষার্থ মিস্ মেরিয়টের সহিত সাতমাস কাল প্যারী নগরীতে অবস্থান করেন। এই স্থানে বেসাণ্ট ইংলণ্ডীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর দলভুক্তা হন। প্যারী হইতে প্রত্যাগমন করিলেন বটে, কিন্তু ফরাসী ও জর্ম্মণ ভাষার অনুশীলন পরিত্যাগ করিলেন না। এই সময় হইতে তিনি সঙ্গীত বিদ্যার আলোচনাতেও প্রবৃত্তা হন।

হিন্দুসমাজের ন্যায় খৃষ্টীয় সমাজও নানা প্রকার সম্প্রদায়ে বিভক্ত, তন্মধ্যে রোম্যান ক্যাথলিক ও প্রোটেষ্ট্যান্ট এই দুই সম্প্রদায় প্রধান। পূর্ব্বোক্ত সম্প্রদায় তেত্রিশ কোটি দেবতার উপাসক না হইলেও অনেকাংশে পৌত্তলিক। তাহারা ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠানের পক্ষপাতী এবং পোপের শাসনাধীন। এই সম্প্রদায়ের পুরোহিতগণ যাবজ্জীবন বিবাহ করিতে পান না। শেষোক্ত সম্প্রদায় তাহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইঁহারা পৌত্তলিকতা অথবা পোপের প্রাধান্য স্বীকার করেন না। আনি বেসান্ট সর্ব্বপ্রথমে কাথলিক খৃষ্টান ছিলেন। পরে এই শেষোক্ত সম্প্রদায়ভুক্ত হন। মিস মেরিয়টের নিকট অবস্থানকালে বেসান্ট কোন প্রকার নৃত্যগীত করিতে বা থিয়েটারে যাইতে পারিতেন না। যখন শিক্ষয়িত্রীর নিকট বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তাঁহার স্বাভাবিক বিলাসবাসনা বিশেষ বলবতী হইয়া উঠিল। এবার তাঁহার বহুকালের রুদ্ধ প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বলে কার্য্য করিতে লাগিল। তিনি প্রাণ মন খুলিয়া নৃত্যগীতে যোগ দান করিতে লাগিলেন। নানা প্রকার অঙ্গলাচনা ও প্রগল্‌ভতাতে দিন কাটিতে লাগিল :

এই সময়ে ইংলণ্ডীয় প্রোটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের মধ্য হইতে "হাই চার্চ্চ" সম্প্রদায় নামক এক নূতন দলের অভ্যুত্থান হয়। সাময়িক প্রবন্ধ ও বক্তৃতাদি দ্বারা এই নবদলের মত ও বিশ্বাস চারিদিকে বিঘোষিত হইতে লাগিল। পরিত্যক্ত কাথলিক মত ও অনুষ্ঠান শ্রেষ্ঠবোধে তাহা পুনর্গ্রহণের জন্য এই দলের বিশেষ আগ্রহ দেখা গেল। বেসান্ট এই সাময়িক উত্তেজনার হাত এড়াইতে পারিলেন না, প্রোটেষ্টাণ্ট মত পরিত্যাগ করিয়া কাথলিক মতে দীক্ষিতা হইলেন! অন্তর্দৃষ্টি যে পরিমাণে ক্ষীণ হইল, বাহ্যাড়ম্বরের মাত্রাও সেই পরিমাণে বাড়িয়া গেল। বেসান্ট স্বহস্তে ভজনালয় পত্র পুষ্প ও চিত্রাদি দ্বারা সুসজ্জিত করিতে প্রবৃত্তা হইলেন। এই সময় হইতে বেসান্ট জননীর সহিত লণ্ডন সহরে বাস করিতে লাগিলেন।

মিশন চ্যাপল হাইচার্চ্চ সম্প্রদায়ের একটি ভজনালয়। রেভারেণ্ড ফ্রাঙ্ক বেসান্ট এই মিশন চাপেলে আচার্য্য ও তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যের সহায়তা করিতেন। ইনি কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে কয়েকটি উপাধি লাভ করেন এবং স্বীয় জীবিকার্জ্জনের জন্য লণ্ডনের অন্তঃপাতী ষ্টকওয়েল গ্রামে একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কার্য্য করিতেন। খ্যাতনামা উপন্যাসলেখক মিঃ ওয়ালটার বেসান্ট ইঁহার সহোদর। আনি বেসান্ট ২০ বৎসর বয়ঃক্রমকালে রেভাঃ ফ্রাঙ্ক বেসান্টের পাণিগ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য আনি ধর্ম্মার্থিনী হইয়া স্বতঃ এই শিক্ষিত ও ধার্ম্মিক যুবককে পতিত্বে বরণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার

কিয়দ্দিন পরে মিঃ বেসাণ্ট ইংলণ্ডের পশ্চিমস্থ বেলটেনহাম নগরে শিক্ষকতা কার্য্যে ব্রতী হইয়া গমন করেন। আনি-পতির সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। এই স্থানে অবস্থানেকালে আনি ফ্যামিলী হেরালড্ নামক মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিতে লাগিলেন। ইহার দ্বারা তাঁহার কিছু কিছু আয় হইতে লাগিল। এই সময়ে ইনি "Lives of the Black Letter Saints" নামক এক খানি গ্রন্থ লিখেন। আর্থিক অভাব-নিবন্ধন আনি তাহা তৎকালে প্রকাশ করিতে পারেন নাই। সর্ব্বপ্রথমে আনি বেসাণ্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহা পাঠ করিলে জানা যায় ইনি তৎকালে হৃদয়ে রোমান কাথলিক মত পোষণ করিতেন এবং এই পুস্তিকায় আনি উপবাস-মাহাত্ম্য বর্ণন করিতে যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ইংলণ্ডের লর্ড চান্সেলার লর্ড হাথারলী মিসেস্ বেসাণ্টের পিতৃব্য ছিলেন। ইহাঁর সহায়তায় আনির স্বামী লিঙ্কনশায়ারের অন্তঃপাতী সিবসী নামক স্থানে বার্ষিক ৪৫০ পাউণ্ড বেতনে ধর্ম্মযাজকের পদে নিয়োজিত হন। ইতিমধ্যে খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সারবত্তা সম্বন্ধে আনিবেসাণ্টের মন সন্দেহ দোলায় দোলিত হয়। এ পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্মের সপক্ষে ও বিপক্ষে যতগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, আনি ক্রমে ২ তৎসমস্ত অধ্যয়ন করিলেন; কিন্তু কিছুতেই পরিতৃপ্তা হইতে পারিলেন না। অবশেষে আনি ডাক্তার পুসীর পরামর্শ গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বরানুরাগী পুসী বলিলেন, পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত সত্যাবধারণের আর প্রকৃষ্ট পথ নাই। আনি বেসাণ্ট তাঁহার পরামর্শ মতে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনাই সার ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিলেন।

এই সময়ে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা আন্দোলন সমুত্থিত হয়। মহাত্মা যীশুর মৃত্যু দিন স্মরণার্থ খৃষ্টীয় ভজনালয়ে এক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হয়। খৃষ্টানগণ সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে এইটীকে সর্ব্বপ্রধান ও অতি পবিত্র জ্ঞান করেন, ইহাকে ' Holy communion " বলে। সীবসী ভজনালয়ে যখন এই ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতেছিল, আনি বেসাণ্ট তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। এই অনুষ্ঠানে অনাস্থানিবন্ধন ব্রহ্মবাদিনী বেসাণ্ট ভজনালয় হইতে বাহির হইয়া আইসেন। তথায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে মনে করিলেন, শারীরিক অস্বুস্থতানিবন্ধন ইনি ভজনালয় পরিত্যাগ করিলেন। এই ঘটনার কয়েকদিন পরে বেসাণ্ট একখানি পুস্তিকা প্রচার করেন। তাহাতে খৃষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে কঠোর সমালোচনা বাহির হয়। বেসাণ্ট পুস্তকে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন নাই। বহির্ভাগে কেবল "জনৈক ধর্ম্মযাজক-পত্নী কর্তৃক" এই কথা কয়েকটি লিখিত ছিল। এই পুস্তিকা প্রকাশিত হইলে খৃষ্টীয় সমাজে এক মহা হুলস্থূল পড়িয়া

যায়। খৃষ্টান, প্রচারকের পত্নী অখৃষ্টান! এই গুরু অপরাধ অমার্জ্জনীয়। হয় আনি পতির সহধর্ম্মিণী হউন, নয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করুন, এই বলিয়া খৃষ্টীয় সমাজ রেভারেণ্ড বেসাণ্টকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। ইনি উভয় সঙ্কটে পড়িলেন। যদি পত্নীকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে চাকরী যায়, ধর্ম্মযাজকের পদ হইতে অপসৃত হইতে হয়; আবার যদি স্বীয়পদ অক্ষুন্ন রাখিতে হয়, তাহা হইলে প্রিয়তমা পত্নীকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ধর্ম্ম বিষয়ে মত ভেদ হইলেও আনি এক দিনও অন্য কোম প্রকারে পতির বিরুদ্ধাচরণ করেন নাই। অবশেষে আনি স্বীয় বিবেকবাণীর অনুকরণ করা শ্রেয়ঃ জ্ঞানে দুঃখের সহিত প্রিয় পতির নিকটে বিদায় গ্রহণ করিয়া জননীর নিকট আগমন করেন। রেভারেণ্ড বেসাণ্ট পত্নীর কথা একবারে বিস্মৃত হইতে পারিলেন না। আনিরসাংসারিক অভাব মোচনার্থ মাসে মাসে কিছু কিছু অর্থসাহায্য করিতে লাগিলেন। এদিকে বেসাণ্ট ধাত্রীর কার্য্য করিয়া এবং মধ্যে মধ্যে সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিয়া যৎকিঞ্চিৎ অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তদ্দ্বারা একপ্রকার সুখে স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। লণ্ডন নগরে অবস্থান কালে তত্রত্য ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা মনকিওর কনওয়ের (Moncure Conway) ধর্ম্মোপদেশ অভিনিবিষ্টচিত্তে নিয়মিত শ্রবণ করিতেন এবং তত্রত্য ব্রাহ্মসমাজে হৃদয়ের সহিত যোগদান করিতেন। এই সময় হইতে বেসাণ্ট বিশ বৎসর কাল খৃষ্টীয় পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে অপরাজিতচিত্তে সংগ্রাম করেন। খৃষ্টধর্ম্মের বিরুদ্ধে প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হইত।

১৮৭৪ খৃঃ অব্দে একদিন "ন্যাশ্যান্যাল রিফরমার নামক একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র আনি বেসাণ্টের হস্তগত হয়। এই সংবাদ পত্রে বিজ্ঞাপন পাঠ করিয়া বেসাণ্ট স্থানীয় বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডল সাহেবের বক্তৃতা শ্রবণার্থ গমন করেন। যৌবনের প্রথমাবস্থায় জড়বাদী নাস্তিক বলিয়া ব্রাডলর একটা দুর্নাম শুনা যায়। কিন্তু ব্রাডলর শেষ জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহার আস্তিক্য বুদ্ধির কতক আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রাডল এক বক্তৃতায় বলেন, (The Atheist does not say "There is no God," but he says I know not what you mean by God; I am without an idea of God "অর্থাৎ নাস্তিক একথা বলেন না যে ঈশ্বর নাই, কিন্তু এই কথাই বলেন যে "ঈশ্বর শব্দের অর্থ কি তাহা আমি জানি না। ঈশ্বর সম্বন্ধে আমার ধারণার অভাব"। অন্তিমকালে ব্রাডলর অন্তরে ভগবৎ প্রীতি সমুদিত হইয়াছিল কি না জানি না, তবে এ কথা সত্য যে তিনি যাবজ্জীবন

পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্যে দেহ মন প্রাণ নিয়োগ করিয়াছিলেন। মহামতি ব্রাডল আমাদিগের জাতীয় মহাসমিতির অন্যতম সহায় ছিলেন।

সেইদিন বিজ্ঞান মন্দিরে ব্রাডলর বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া বেসাণ্ট গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বেসাণ্ট উক্ত বাগ্মীর কূট বৈজ্ঞানিক তর্কজালে এরূপ আবদ্ধ হইয়াছিলেন যে কিছুতেই তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারিলেন না। ঈশ্বরের অস্তিত্ব এবং তাঁহার স্বরূপ বিষয়ে নানাপ্রকার সংশয় আসিয়া বেসাণ্টের কোমল মনকে বিজড়িত করিল। ইতঃপূর্ব্বে এক বিশেষ ঘটনা বেসাণ্টের আস্তিক্যবুদ্ধির স্রোতকে রুদ্ধ করিয়া দেয়। তাহা এইঃ—বেসাণ্টের একটি পুত্র ও একটি কন্যা। যখন কন্যার বয়স সাত মাস, তখন শিশুটী শ্বাসরোগে কষ্ট পায়। কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া কন্যাটীর ক্লেশ দেখিয়া বেসাণ্ট তাহার জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া একবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার মনে এক প্রশ্নের উদয় হইল যে, ঈশ্বরকে শান্তিদাতা বলা যাইতে পারে কি না? তিনি যদি শান্তিদাতা হইতেন, তাহা হইলে আমার কন্যা এতদিনে আরোগ্যলাভ করিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন ঈশ্বর শান্তিদাতা নন। ইহা মিথ্যা কথা। অবশেষে বেসাণ্ট ক্রোধিত হইয়া বলিলেন, "How canst Thou torture a poor baby so? Why dost Thou not kill her at once and let her be at peace" তুমি কেন এই হতভাগ্য শিশুকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? তুমি কেন এখনই ইহাকে মারিয়া ফেলিয়া ইহার সমস্ত ক্লেশের অবসান করিতেছ না? যাহাহউক অনেক কষ্টের পর কন্যাটী আরোগ্যলাভ করেন। কিন্তু এই সময় হইতে বেসাণ্ট ঈশ্বরের আরাধনা পরিত্যাগ করিলেন এবং পরে ব্রাডলর বক্তৃতাতে মুগ্ধ হইয়া নাস্তিকতা ও জড়বাদ গ্রহণ করিলেন।

(ক্রমশঃ)

বাঙ্গালী কমিসনার।

ধন্য ধন্য আজ ধন্য বঙ্গবাসী
কি নব উৎসবে সবে মাতোয়ারা,
এমন সুদিন কবে হবে আর?
খুলে গেছে শত আনন্দ-ফোয়ারা।

ভারতের ভাগ্যে যে পদ-মর্য্যাদা
ঘটে নাই কভু, বাঙ্গালী সে পদ
পাইলেন আজ প্রতিভার গুণে
এ হ'তে কি আছে অতুল সম্পদ?

কি সুখ বারতা শুনিনু শ্রবণে।
স্বদেশের মান করিতে বর্দ্ধিত,
কে কবে পেয়েছে এহেন সম্মান?
কমিশনারীতে রমেশ বরিত।

বাঙ্গালী বলিয়ে তুচ্ছ করে যারা,
দেখুক চাহিয়া বাঙ্গালী রমেশে,—
মানসিক বলে কত বলীয়ান,
কতই যশস্বী স্বদেশে বিদেশে!

কার্য্যপটুতায় ইংরাজ সদৃশ,
সুধীর প্রবীণ অগাধ পণ্ডিত,
উৎসাহে উদ্যমে অদম্য অটল,
স্বাধীনপ্রকৃতি সর্ব্বত্র বিদিত।

দেশের কল্যাণে সঁপি দেহ মন
কে খাটিবে এত রক্ত করি জল?
এ হেন সুহৃদ্ কেবা আছে আর,
নিয়ত কামনা প্রজার মঙ্গল।

সাহিত্য সমাজে স্বনাম-বিখ্যাত
সুলেখক বলি সকলে আদরে,
উপন্যাস লিখে কতই সুনাম!
মাতৃভাষা ঋণী রমেশের করে।

শিক্ষা বিভাগেতে উচ্চ অধিকার
কে পেয়েছে এত তাহার মতন?
"ইতিহাসে তিনি 'অথরিটী 'আজ'
শত মুখে সবে করিছে কীর্ত্তন।

যেদিগেতে চাই সেই দিগে তাঁর
সমকক্ষ লোক দেখিতে না পাই,
উদার ইংরাজ গুণ-পক্ষপাতী,
গুণীর গৌরব করেছেন তাই।

দেও ধন্যবাদ 'সার ইলিয়াটে'—
বঙ্গবাসী সবে একান্ত হৃদয়ে,
সব দোষ ভুলে গাও তাঁর গুণ
একতানে আজ একপ্রাণ হয়ে।

লর্ড এল্‌গিনের শাসন সময়
বাঙ্গালীর কত বাড়িছে সম্মান,
চিরস্মরণীয় এলগিন নাম
হইল ভারতে,—তাই যশোগান

করিছে সকলে—ভারত সন্ততি।
সাধে কি ও নামে বিশকোটী প্রাণ
মাতিয়ে উল্লাসে—দিয়ে করতালি
কহিছে "এল্‌গিন—উদার প্রকৃতি।"

ধন্য ভিক্‌টোরিয়া—শাসন তোমার!
রাজা প্রজা আজ সকলি সমান,
নাহি পক্ষপাত—'ইংরেজ নেটিভে,
গুণ দেখে সবে করিছ সম্মান।

থাকো মা সুখেতে—দীর্ঘজীবী হয়ে,
প্রজাহিত-ব্রত পালো অনিবার,
'জয় ভিক্‌টোরিয়া' হোক জয়ধ্বনি
হিমালয় হ'তে কুমারিকা পার!

দেও উলুধ্বনি পুরনারীগণ—
সবে মিলি আজ দেশের সম্মানে,
কদলী পুতিয়ে ঘরের দুয়ারে
রাখো পূর্ণ কুম্ভ রমেশ-কল্যাণে।

নির্ব্বাণ-প্রদীপ জ্বলিছে আবার!
নিরাশা আঁধারে আশা চন্দ্রোদয়,
বিধির বিধানে সকলি সম্ভব,
ভারত-ভবিষ্য উজ্জ্বলতাময়।

দৈববাণী যেন পশিয়াছে কানে
চির দুঃখ নাই অদৃষ্টে কাহার,
"সুখ অন্তে দুঃখ, দুঃখ অন্তে সুখ"
মহা সত্য হ'ক ভারতে প্রচার।

পাশ্চাত্য শিক্ষায় ফুটায়েছে আঁখি
অন্ধজনে এবে চিনিয়াছে পথ,
উন্নতি-শিখরে তাই অগ্রসর
হতেছে লঙ্ঘিয়ে অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত।

কে রোধিবে গতি ?—উন্নতির স্রোত
বহিছে ভারতে তর তর বেগে,
পাষাণ চাপুক—কি হইবে তায় ?
বাধা পেলে স্রোত ধায় মহাবেগে।

কিছুতে এ বেগ থামিবার নয়।
ভাসাবে পাষাণ তৃণের সমান,
শত বরষের বাধা বিঘ্ন যত
কঠিন আঘাতে হবে তিরোধান।

ইংরেজ শাসন উন্নতির মূলে,
কায়মনে তারে কর আলিঙ্গন,
দুঃখের তিমির হবে অবসান
উদিবে আবার সৌভাগ্য-তপন।

এস্‌কুইমোজাতি।

উত্তর মহাসাগরের অন্তর্গত দ্বীপ সমূহে এস্‌কুইমো জাতির বাসস্থান। তবে গ্রীনলণ্ড দেশে ইহাদিগের সংখ্যা যত অধিক্য এত আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। সমুদয় গ্রীনলণ্ডে ৫০০০ হাজার এস্‌কুইমো বাস করে।

এস্‌কুইমোগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষা খর্ব্বাকৃতি। ইহারা সাধারণতঃ ৫ ফুটের অধিক উন্নত হয় না। বিদেশীয় কোন জাতির সহিত এস্‌কুইমোদিগের ঘনিষ্টতা না থাকাতে ইহাদিগের ভাষা ও আচার ব্যবহার অদ্যাপি অপরিবর্ত্তনীয়ভাবে বর্ত্তমান আছে। ইহাদেরমধ্যে সভ্যতার স্রোত প্রবাহিত না হওয়াতে ইহারা আজিও প্রাচীন পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন করে নাই। ইহাদিগের পরিচ্ছদ শীল, বল্গা হরিণ কিম্বা তিমি মৎস্যের চর্ম্মে নির্ম্মিত সূচীর পরিবর্ত্তে পক্ষীর সূক্ষ্ম অস্থিতে এবং সূত্রের পরিবর্ত্তে বল্গা হরিণ, তিমি বা শীলের তন্তুতে ইহারা পরিচ্ছদের সেলাই কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

গ্রীনলণ্ডের উত্তর প্রদেশীয় এস্‌কুইমোগণ তুষার-গৃহে বাস করে। কিন্তু উত্তর দ্বীপের দক্ষিণাংশবাসিগণ প্রস্তর কিম্বা কাষ্ঠনির্ম্মিত কুটীর বৃক্ষশাখা ও কর্দ্দমাদিতে আচ্ছাদিত করিয়া তাহাতে বাস করিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এস্‌কুইমো জাতি চর্ম্মনির্ম্মিত তাঁবুতে বাস করিতে ভাল বাসে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় বহুসংখ্যক এস্‌কুইমো পরিবার অল্পস্থানের মধ্যে বাস ও আহার বিহারাদি করিয়া থাকে।

উত্তর মেরুপ্রদেশে যে সকল জন্তু দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে, তৎসমুদয়ই

এস্কুইমো জাতির ভোজ্য। কিন্তু বৎসরের কয়েক মাস শীল ও সিন্ধুঘোটক ইহাদিগের প্রধান খাদ্য। অপরিণামদর্শিতা অনেক সময় এস্কুইমোদিগের অসঙ্গতির কারণ। কাপ্তেন পারী বলেন, খাদ্যাভাবে এসকুমো পরিচ্ছদ চর্ব্বণ করিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি করিতেছে ইহা তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

এস্কুইমো জাতির সন্তান সন্ততিগণ যতদিন না ২।৩ বৎসরবয়স্ক হইয়া স্ব স্ব শরীর রক্ষার জন্য অন্যান্য ব্যক্তিদিগের অনুকরণ করিতে শিক্ষা করে, ততদিন জননীগণ তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত সর্ব্বদা পশম পরিচ্ছদে আবৃত করিয়া পৃষ্ঠে বহন করিয়া থাকেন। অতি বালককাল হইতেই এস্কুইমোগণ তীর ও ধনুক ব্যবহার করিতে আরম্ভ করে। লক্ষ্য স্থির করিবার জন্য প্রস্তর খণ্ড কোন নির্দ্দিষ্ট বস্তুর প্রতি ছুড়িবার প্রথা এজাতীয় বালকদিগের মধ্যে বড়ই প্রচলিত। বালকগণ যাহাতে নৌকা-চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইতে পারে, তজ্জন্য পিতা পুত্রকে দশম বর্ষ বয়ঃক্রম সময়ে এক খানি নৌকা প্রদান করিয়া থাকেন। ষোড়শ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পুত্র পিতার সহিত শীল ধরিতে গমন করে। প্রথম ধৃত শীল বন্ধুবান্ধবে একত্রিত হইয়া অতি আনন্দের সহিত ভোজন করিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকাগণ শেলাই, রন্ধন ও চর্ম্ম প্রস্তুত করণ প্রভৃতি কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে। ষোড়শবর্ষীয়া যুবতীগণ গৃহনির্ম্মাণ ও নৌকা চালন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী দেখা যায়।

পুরুষেরা পশু ও মৎস্য শিকারের সমুদয় অস্ত্র এবং বোটনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকগণ বোটসকল চর্ম্মাবৃত করে। কোন শীল মৎস্য ধৃত করিয়া তীরে আনীত হইলে এস্কুইমো রমণীগণ উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া রন্ধন করে এবং বস্ত্র পাদুকা ও অন্যান্য দ্রব্য নির্ম্মাণোপযোগী অংশ সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র করিয়া তাহাতে যথোপযুক্ত দ্রব্যাদি নির্ম্মাণ করে।

সূচিকার পরিবর্ত্তে রমণীগণ সূক্ষ্মধার অস্থি ব্যবহার করিয়া থাকে। অস্ত্রের মধ্যে গোলাকৃতি এক প্রকার ছুরিকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। যতদিন স্ত্রীলোকগণ পিতা মাতার নিকট প্রতিপালিত হয়, ততদিন তাহারা সৌভাগ্য ভোগ করে। কিন্তু বিংশ বৎসরের পর হইতে ইহাদিগের জীবন বড়ই কষ্টকর হইয়া পড়ে।

গ্রীনলণ্ডে পণ্য দ্রব্য অতি অল্পই আছে। প্রস্তরনির্ম্মিত রন্ধন পাত্র, তীর ধনু ও অন্যান্য শিকারোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র ব্যতীত এখানে অন্য কোন পণ্য দ্রব্য নাই। দক্ষিণ গ্রীনলণ্ডে ভাসমান কাষ্ঠ সকল দৃষ্টিগোচর হয়। ঐ সকল কাষ্ঠ এতদ্দেশীয় লোকদিগের পণ্যের

সংখ্যা বৃদ্ধি করে। দক্ষিণাঞ্চলবাসীরা ঐ সকল কাষ্ঠে নানাবিধ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া তাহার বিনিময়ে অস্থি, তিমি-তন্তু এবং সিন্ধুঘোটকের মাংস গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহারা সচরাচর বরফের উপর চলিতে সক্ষম। চক্রহীন শকট অথবা জলযানে পণ্য দ্রব্য লইয়া সপরিবারে বাণিজ্যার্থে বহির্গত হয়। এস্কুইমো জাতি ভ্রমণ করিতে এত ভাল বাসে যে কোন প্রয়োজন থাকিলেও তাহারা স্থান পরিবর্ত্তন না করিয়া থাকিতে পারে না। ইহারা প্রায়ই একবর্ষ বা ততোধিক কাল বিদেশে অতিবাহিত করে। জল ও স্থল উভয়ই ইহাদিগের সমান ব্যবহার্য্য।

স্বদেশীয়দিগের দ্রব্যাদি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করা ইহারা বড়ই ঘৃণাকর বলিয়া মনে করে। কিন্তু ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত প্রতারণা বা তাহাদিগের দ্রব্যাদি অপহরণ করিতে পারিলে বড়ই প্রীত হইয়া থাকে। স্বর্ণ এস্কুইমোদিগের নিকট টিন বা পিতল অপেক্ষা অধিক মূল্যবান বলিয়া বিবেচিত হয় না। লৌহ যেরূপই হউক না কেন ইহারা অতি যত্নের সহিত গ্রহণ করে।

এস্কুইমোগণ উৎসবাদিতে বড় অমনোযোগী নহে। তাহারা পরস্পর পার্শ্ববর্ত্তী হইয়া বরফের উপর বলের ক্রীড়া করিতে বড়ই ভাল বাসে। বালকগণ অস্থি লইয়া বরফের উপর অতি আনন্দের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। এস্কুইমো জাতির প্রধান উৎসবের নাম সূর্য্যোৎসব। ২১শে ডিসেম্বর যখন এখানে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অল্পকাল-ব্যাপী হয়, সেই সময় সূর্য্যের পুনর্দ্দর্শন পাইবার জন্য ইহারা এই উৎসব করে। সমস্ত গ্রীনলণ্ডে এই দিনে আনন্দ উৎসব হয়, ও আত্মীয় বন্ধু-বান্ধব পরস্পরে একত্রিত হইয়া প্রীতি-ভোজ, অভিনয় ও সঙ্গীতাদি করিয়া থাকে।

এস্কুইমোদিগের বাদ্য যন্ত্রের মধ্যে কাষ্ঠ বা অস্থিনির্ম্মিত এক প্রকার ঢক্কা দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ সকল ঢক্কা হরিণ চর্ম্ম বা তিমি মৎস্যের জিহ্বার ত্বক্ দিয়া আচ্ছাদিত। বাদ্য করিবার সময় এসকুইমোগণ সঙ্গীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মান হয় এবং প্রত্যেকবার যন্ত্রে আঘাত করিবার সময় নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি করিয়া এক এক বার লম্ফ দিয়া উঠে। ইহারা শীল মৎস্য শিকার বা সুন্দর ঋতু আগমনসূচক গীত গান করিয়া থাকে।

এসকুইমোদিগের কোনও রাজা নাই, সুতরাং রাজনৈতিক কোন নিয়মেরও অধীন হইয়া চলিবার প্রয়োজন হয় না। কতকগুলি চির প্রচলিত আচার পদ্ধতির অনুবর্ত্তী হইয়া তাহাদিগকে চলিতে হয় মাত্র। এস্কুইমোদিগের মধ্যে নিম্ন লিখিত পদ্ধতি সকল প্রচলিত আছে।

(১) যে কোন ব্যক্তি শিকারে প্রবৃত্ত হইতে পারে।

(২) আবাস গৃহের নিকটেই হউক বা দূরেই হউক যে কোন ব্যক্তি কোন ভাসমান কাষ্ঠ দেখিতে পাইয়া তাহার উপর এক খণ্ড প্রস্তর স্থাপন করিলেই উহা তাহারই নিজস্ব হইল।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন শীল মৎস্যের উপর বর্শা নিক্ষেপ করিয়াও উহা সংহার করিতে সক্ষম না হয়, আর অন্য কোন ব্যক্তি উহা সংহার করে, তাহাহইলে উক্ত শীল মৎস্য. প্রথম আক্রমণকারীর সম্পত্তি হইল।

(৪) দুই বা ততোধিক ব্যক্তি একত্রিত হইয়া কোন প্রাণী সংহার করিলে উহা সকলেই সমভাগে বণ্টন করিয়া লইবে।

(৫) অনেকে একত্রিত হইয়া যদি কোন শীল শিকার করে, তাহা হইলে যাহার তীর উক্ত প্রাণীর হৃদয় বা তৎসন্নিহিত কোন স্থানে বিদ্ধ হইবে, সেই উহা গ্রহণ করিয়া সহযোগিগণকে ইচ্ছানুসারে কিঞ্চিৎ অংশ প্রদান করিবে।

এস্‌কুইমোগণ কার্য্যোপযোগী উপাদানের ও শিক্ষার. অভাব সত্ত্বেও যেরূপ দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। ইহারা চিরপ্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম করিয়া কোন দ্রব্যের গঠন প্রণালীর উন্নতি করিতে মনোযোগী হয় না। ইহাদিগের গৃহ অতি সুন্দরভাবে নির্ম্মিত হয়। উহাতে তাপ ও আলোক সমাগমের বিশেষরূপ বন্দোবস্ত করে। গৃহ অপেক্ষা নৌকা নির্ম্মাণে ইহারা আরও নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেকে বলেন, সভ্যসমাজ চেষ্টা করিলে গ্রীনলণ্ডবাসীর অপেক্ষা সুন্দরতর কেয়াক(Kayak)নৌকা প্রস্তুত করিতে পারেন কিনা সন্দেহ। উক্ত নৌকা দেখিতে আমাদিগের দেশের সালতির ন্যায় এবং দৈর্ঘ্যে ৮ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। তবে সালতির ন্যায় ইহার প্রস্থ সর্ব্বত্র একরূপ নহে। ইহার মধ্যস্থল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত মধ্যস্থল হইতে ক্রমশঃ অপ্রশস্ত হইয়া দুইধারে সূক্ষ্ম হইয়া গিয়াছে। শুনিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় এক এক খানি কেয়াক এক দিন ৬০।৭০ মাইল গমন করিতে সক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

প্রতিবাসী।

১

কারে বলি প্রতিবাসী,
যারে আমি ভাল বাসি;
যে আমারে ভাল বাসে,
সুখে হাসে দুখে গলে।

যার কাছে সব খোলা,
যার কাছে সব বলা;
নাহিক কিছুই ছাপা,
যে আমারে সব বলে॥

২

যথা এক পরিবারে,
অন্ন বস্ত্র ভাগ করে ;
প্রতিবাসী—পরিবার,
সুখ দুখ করে ভাগ।
আপনার ভাব সবে,
তারাও আপন হবে,
নাহিক অভিন্ন কিছু,
অনুরাগে অনুরাগ॥

৩

ভাইরে এসেছি ভবে,
ভাব ফের যেতে হ'বে ;
বাহির হয়েছি মোরা
ভব তীর্থ দরশনে।
এক সঙ্গে খাই দাই,
এক সঙ্গে মিলি যাই ;
একত্রে ধরিত্রী কোলে
শুইব অমিল কেনে ?

৪

কেন বোন রাগ কর,
জ্বালাও ও জ্বলে মর ;
তুমি রাঁধ, এনে দিই
যা'পাই ভবের হাটে।
সুখেতে দুঃখের ভাত,
খাই এস পাতি পাত ;
বিরমিব সেথো সাথে
সরাইয়ে রাত কেটে॥

৫

খোঁড়া-মাথে ভারী বোঝা ;
যেতে নারে হয়ে সোজা ;
এই তো মোদের দশা,
তায় যাব বহু দূর।
না ফেলি চোকের জল,
ছাড়িবে সঙ্গীর দল ;
সম্বল করিয়া ধর্ম্ম,
চল ত্বরা পুণ্য-পুর।

৬

অতএব মিলে চল,
সবিনয় বাক্য বল ;
রুষ্ট ভাষে কারো মনে,
দিওনা দিওনা ব্যথা।
কারেও ভেবনা পর,
প্রতিবাসী সহোদর ;
তুমিও তাদের জেন,
নাহিক তার অন্যথা॥

৭

স্বার্থপর হয়ে পর
ভাব, কিন্তু অতঃপর
বুঝিবে কেহই নাই
প্রতিবাসী ধরাতলে !
কত কাল ভ্রমে পড়ি,
বেড়াইব মিছে ঘুরি ;
আত্ম পর মিছে বাছা,
মুক্তি এই যুক্তি বলে॥

৮

এক পিতা সবাকার,
নাহি ভিন্ন কিছু কার,
যাহে বাঁচি * আছে তাহা
সবাকার সমভাবে।
কারো মন্দ কারো ভাল,
নাহি হ'বে কোন কাল ;
সবারে আপন বল,
সুখে দিন চলে যাবে।

শ্রীন।

* যথা বায়ু, জল, আলোক।

যথার্থ প্রভুত্ব কি ?

আজ কাল প্রভুত্ব লইয়া সকলেই ব্যস্ত; পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পিতার প্রভুত্বে অসুখী, কনিষ্ঠ ভ্রাতারা এখন আর ভরত, লক্ষ্মণ, ভীম, অর্জ্জুন প্রভৃতির ন্যায় জ্যেষ্ঠের প্রভুত্বে সুখী নহেন, বধূ শ্বশুর শ্বাশুড়ীর প্রভুত্ব গ্রাহ্য করেন না, পত্নী স্বামীর প্রভুত্ব মানেন না—সকলেই স্ব স্ব প্রভুত্ব রক্ষা করিবার জন্য লালায়িত। বিশেষতঃ অন্তঃপুরবাসিনী সংসারানভিজ্ঞা বধূগণ প্রভুর উপর প্রভু হইয়া, পরিবারে কেমন একটা অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া সুখের সংসারকেও বিষময় করিয়া তুলেন। ইঁহারা নিয়ত স্বার্থ ও বিলাসিতার পূজা করিয়া মনে ভাবেন যে আমি প্রভু, কিন্তু ভাবেন না যে "তা বড় প্রভুরও প্রভু" আছেন, তিনি জগৎ-প্রভু। যদি এই অন্তঃপুর প্রভুগণ যথার্থ প্রভুত্ব করিতে জানিতেন তাহা হইলে সংসার বড়ই সুখের হইত; কিন্তু তাহাদের প্রভুত্ব কেবল "মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা।" তাঁহাদের প্রভুত্ব অনাথা মাতা, ননন্দা, নিরীহস্বভাব দাস দাসী এবং পত্নীব্রত বেচারা পতিকে পীড়ন করিবারও লাঞ্ছনা দিবার জন্য। শাস্ত্রে দমন ও পালনের দুইটী কথা আছে (অবশ্যই রাজা বা প্রভুদিগের পক্ষে)। এই অন্তঃপুর সম্রাজ্ঞীগণ অন্যান্য প্রভুধর্ম্মগুলি পালন করুন্ আর নাই করুন্, কিন্তু দমন, পালন দুটী তাঁহারা রক্ষা করিয়া থাকেন। তবে কিনা পুরাণের পুরাণত্ব আর এই সভ্যতার দিনে ভাল লাগে না, তাই নূতনত্বের আবশ্যক বলিয়া তাঁহারা "দুষ্ট দমন ও শিষ্ট পালনের" স্থলে শিষ্টদমন ও দুষ্টপালন করিয়া থাকেন। এই প্রভুগণের শাসনদণ্ড প্রায় দুইটি পরিবারে চলিয়া থাকে, তন্মধ্যে শ্বশুর পরিবারে দমন আর পিতৃপরিবারে পালন প্রথা প্রচলিত করিয়াছেন। (যে অন্তঃপুরবাসিনীগণ এইরূপ প্রভুত্বের পক্ষপাতিনী নহেন, তাঁহাদের জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নহে।) আর যাঁহাদের উপার্জ্জনে অন্তঃপুর প্রভুগণের প্রভুত্ব, সেই সব পত্নীব্রত পতিগণের ক্ষমতা যখন পত্নীকর্তৃক পরিচালিত, তখন তাঁহাদের জানিবার আবশ্যকতা নাই যে শ্বশুর সম্বন্ধী ব্যতীত ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আরও কতক গুলি পরিবার তাঁহাদের পোষ্য হওয়া উচিত। সুতরাং যাঁহারা প্রভু, তাঁহাদের নিকট বক্তব্য এই যে যাহারা নিরাশ্রয় হইয়া তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের সম্মান হরণ দ্বারা উৎপীড়ন করিলে তোমার প্রভুত্বের প্রভা বৃদ্ধি হইবে না। যদি নিজের এক টুকুও স্বার্থত্যাগ করিতে না পারিলে, তবে তোমার প্রভুত্বের ফল কি? অন্যকে সুখী করার জন্য ত্যাগস্বীকার করিয়া সুখী হওয়া, অন্যের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজ

জীবন দিতে প্রস্তুত হওয়া প্রভুত্বের ভিত্তি, কেবল আদেশ ও পীড়ন করিলে প্রভুর কার্য্য হয় না। যাহাহউক এই অন্তঃপুর প্রভুগণের জন্য তাঁহাদের ক্ষুদ্রবুদ্ধি ভগিনী একটী ক্ষুদ্র উপহার সংগ্রহ করিয়া তাহাদের করে অর্পণ করিল।

কোনও সময় ক্যাম্পাডাউনে ডচ্ ও ইংরেজে একটী যুদ্ধ সংঘটন হয়। উভয় পক্ষে বহুক্ষণ ধরিয়া সিংহবিক্রমে যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং বহুতর লোক হত ও আহত হইয়াছিল, কিন্তু অবশেষে বিজয়লক্ষ্মী ইংরেজের হস্তগত হইল। ডচ্দিগের অনেকগুলি জাহাজ ইংরেজাধিকৃত হইয়াছিল, তন্মধ্যে ডেল্ফট্ নামক একখানি জাহাজ ভগ্নপ্রায় হইয়াছে দেখিয়া ইংরেজগণ ৫ দিন কাল ধরিয়া উহা রক্ষা করিবার জন্য বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ জাহাজ রক্ষা হইল না দেখিয়া উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন। যদিও উহার আশা পরিত্যাগ করিলেন, কিন্তু কর্ত্তব্য ভুলিলেন না। তাঁহারা ডচ্ সেনাপতির জীবন রক্ষার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ঐ জাহাজে ডচ্ সেনাপতি হিউবর্গ অনেক গুলি আহত ও পীড়িত সৈন্যের সহিত অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণের অবস্থা তখন এমত শোচনীয় যে তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করা বা নিরাপদ স্থানে লইয়া যাওয়া অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং তাহাদের সহিত জলমগ্ন হইবার জন্য হিউবর্গ প্রতিমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। কিন্তু এখন ইংরেজ সেনাপতির প্রস্তাবে ডচ্ সেনাপতি বলিলেন, "আমি কি আমার অধীনস্থ স্বদেশবাসিগণকে পরিত্যাগ করিয়া নিজের জীবন লইয়া পলাইব? না,না, যে সকল সাহসিক সঙ্গী স্বদেশের জন্য প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে, আমি কখনও তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারিব না, তাহা অপেক্ষা সহস্রবার মৃত্যুকে শ্রেয়জ্ঞান করি।" হিউবর্গের এই মহদুত্তরে ইংরেজ সেনাপতির মন বিগলিত হইল, তিনি ডচ্ সেনাপতিকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন 'ঈশ্বর আপনাকে অনুগ্রহ করুন, আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আপনার সহিত ইহাদের রক্ষার্থ সাহায্য করিব।" এই বলিয়া তিনি তাহার লোকদিগকে রসেল নামা জাহাজ পরিত্যাগ করিতে বলিলেন এবং ডচ্দিগের সাহায্যে নিজে ডেল্ফট জাহাজে থাকিয়া রসেল জাহাজ হইতে বোট আনয়ন করিলেন। সেই বোটে যতগুলি লোক ধরে, ততগুলি করিয়া লোক দুইবার রসেল জাহাজে রাখিয়া আসিল, তৃতীয়বার ডেল্ফটের নিকট বোট না পৌঁছিতেই হঠাৎ ডেল্ফট্ জলমগ্ন হইল। ডেল্ফটে ইংরেজ সেনাপতি, হিউবর্গ, তিনজন পদস্থ ডচ্ ও ৩০ জন নাবিক ছিলেন। এই ঘটনায় ইংরেজ সেনাপতি লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক জলে পড়িয়া সন্তরণদ্বারা জীবন রক্ষা করিলেন, কিন্তু মহাত্মা হিউবর্গ তাঁহার প্রিয় ডচ্গণের সহিত চিরকালের তরে জলমগ্ন হইলেন।

হিউবর্গ! তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রভুত্ব! তোমার অধীনস্থগণও ধন্য, যাহারা তোমার ন্যায় প্রভুকে ভক্তি করিয়াছে—তোমার মত প্রভুর আদেশ পালন করিয়াছে!

"জাতিদ্রব্যবলানাঞ্চ সাম্যমেষাং ময়া সহ।
মৎপ্রভুত্বফলং ব্রূহি কদা কিংতদ্ভবিষ্যতি॥"

সেনাপতি হিউবর্গ! তুমি যথার্থ এই মহাবাক্যের সার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ! কু, রা।

মহারাণীর ৭৫ জন্মোৎসব।

আয় ভাই, সবে মিলি,
হয়ে একমন-প্রাণ,
গভীর আরাবে করি,
রাণী মা'র যশোগান।
রমণী-ললাম মাতা,
রূপে রমা, গুণে বাণী;
ভারতে ভারতেশ্বরী,
বিলাতে ব্রিটিশ-রাণী।
সাগর-সম্ভবা মাতা,
কমলা-রূপিণী যাই,
প্রতিভাত দেব-জ্যোতিঃ,
শ্রীমুখ-মণ্ডলে তাই।
বিলাত সরোজ-রূপে,
ভাসিছে জলধি-জলে;
সরোজ-বাসিনী মাতা,
ভাসেন সে শতদলে।
মরতে স্থাপিলা মাতা,
ত্রিদিবের জয়-কেতু,
দুষ্টের দলন, আর
শিষ্টের পালন হেতু।
আমরা ভারতে রই,
হিমগিরি-পাদ মূলে;
রাণী মা বিলাতে রন,
সুদূর সাগর-কূলে।
সন্তান আমরা তাই,
বহু পথ দূরে রই;
জননীর স্নেহ-গুণে,
দূরে থেকে দূরে নই।
আকাশের রবি শশী,
যদিও সুদূরে রয়;

তাদেরি আলোকে এই
ভূলোক আলোকময়।
শুনেছি যে ত্রেতাযুগে,
লঙ্কেশ পাশব বলে
বেঁধেছিল নাগপাশে,
বাসবাদি দেবদলে।
জননীর গুণে বাঁধা,
আজি সেই দেবগণ,
কলিতে পার্থিব ব্রত
করিছেন উদ্‌যাপন!
সংযমি কুলিশ-তেজ,
পরিহরি দেব-কাজ,
তারেতে তাড়িত বার্ত্তা,
সঞ্চালেন দেবরাজ।
চালান বরুণ বহ্নি,
বাষ্পরূপে অবতরি,
ভূমিতে পুষ্পক-রথ,
অকূলে অর্ণব তরি।
বিনদ্র বিতন্দ্র ভানু,
ভ্রমিছেন রক্ষি-বেশে,
রাণী মা'র পদাশ্রিত,
ভূভাগের ঊর্দ্ধদেশে।
মানুষ তো মানুষ সে,
বশীভূত দেবগণ,
সে হেন মায়ের ছেলে,
নহি মোরা সাধারণ।
মায়ের কোলেতে আছি,
মায়ের জয়েতে জয়;
শশি-কোলে মৃগ-শিশু,
নিষাদে কি করে ভয়?
মাভৈঃ ভারতবাসী!
কেন তবে ম্রিয়মান?
জননীর ভাগ্যবলে,
আমরাও বলীয়ান।
অচলে ভূতলে জলে,
যেখানে যখন যাই,
জননীর জয়ডঙ্কা,
সেখানে শুনিতে পাই।
দক্ষিণে গাহিছে সিন্ধু
জয় রাণীমা'র জয়!
গাও তবে সবে মিলি,
হয়ে এক-মন-প্রাণ
জলদ গম্ভীর রবে,
জননীর যশোগান।

শ্রীরাজভক্ত বিরচিত।

বীরবালা।

যখন সিকাগোর মহামেলা হয়, তখন একদা ৭০০ শত যাত্রী লইয়া একখানা রেলগাড়ী দ্রুতবেগে সিকাগো অভিমুখে যাইতেছিল। জেনি কেরি নাম্নী দশম বর্ষীয়া এক বালিকা জানিত, রেলগাড়ী যে সেতু পার হইয়া যাইবে, তাহা আগুণ লাগিয়া কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে ধ্বংস হইয়াছে। রেলগাড়ীর চালক তাহা জানিত না। বালিকার পরিধানে একখানা লালরঙ্গের বস্ত্র ছিল, সে সেই বস্ত্র খুলিয়া হাতে লইল এবং তাহা ঘুরাইয়া গাড়ী থামাইতে সঙ্কেত করিল। চালক অতি ক্রোধের সহিত পথিমধ্যে গাড়ী থামাইল, কিন্তু যখন অবগত হইল বালিকা কি মহৎ কার্য্য করিয়াছে, তখন চালক ও শত শত যাত্রী সমকণ্ঠে তাহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। অনেকগুলি ফরাশী যাত্রী এই গাড়ীতে ছিলেন, তাঁহারা স্বদেশে ফিরিয়া গিয়া ফরাসী সাধারণতন্ত্রের সভাপতিকে বলিয়া বালিকাকে এক সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত করিয়াছে।

সঞ্জীবনী।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ৪৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—মধ্যমান।
(রামমোহন রায় কৃত গীত।
নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।)

সা ম প প ধ ধনি ধ প
ম- নে- ক- র ম- নে- ক- র-
১মবার ২য়বার

মপ গম গ গম গম গঋ
শে- ষের সে

ঋ গ ম প গঋ গঋ সা
দি- ন ভ- য়ং- ক- র,

সা সা মগ গ প প ধ ধনিধপধ
অ- ন্যে বা- ক্য ক-বে কি- ন্তু,

সা সা ঋ সা সা সা নি ধ নি সা
তু- মি র- বে নি- রু-

নি ধ প ম প প প সা
ত্তর। যার প্র-

সা সা সা সা সা ধ ধ সা সা সা
তি য- ত মা- য়া, কি- বা পু- ত্র কি-

ঋ সা গ ঋ সা সা নি ধ নি ধ প
বা জা- য়া.

প প মগ ম প প ধ
তা- র মু- খ চে- য়ে ত-

ধ নি ধ পধ সা সা ঋ সা
ত, হ- ই- বে কা

সা নি ধ নি সা নি ধ প ম প
ত- র।

প প ধ নি ধ প ধ ধ সা নি ঋ সা
গৃ- হে হায় হায়

সা সা ধ ধ সা সা সা ঋসাগঋ
শ- ব্দ স- ম্মু- খে স্ব- জ- ন

সা সা নি ধনি ধপ প প মগ
স্ত ব্ধ, না ড়ী ক্ষী

ম প প ধনি ধপধ সা সা ঋ সা
ণ, দৃ ষ্টি হীন, হি- ম ক- লে

সা নি ধনি সা নি ধ প ম প
ব- র।

প প ধ নি সা ঋ সা সা সা সা
অ- ত- এব সা- ব- ধা-

সা ধ ধ সা সা সা সা ঋ গঋ
ন, ত্য জ দ- ম্ভ অ- ভি-

সা সা নি ধ নি ধ প প প মগ
মা- ন, বৈ- রা- গ্য

ম প প ধ নি ধ প ধ সা সা ঋ
অ- ভ্যা- স কর, স- ত্যে- তে

সা সা নি ধ নি সা নি ধ প ম প
নি- র্ভ- র।

স্বর সাধন প্রণালীতে যে গীত গুলির স্বরলিপি প্রদত্ত হইতেছে, সে গুলি হারমোনিয়ম, পিয়ানোফুট, ক্লারিয়নেট প্রভৃতি ইউরোপীয় বাদ্যযন্ত্রে এবং এসরাজ, সেতার, বেহালা সারঙ্গ ও বংশী প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্রে বাজাইতে পারা যাইবে।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। মহারাণী বিক্টোরিয়ার পৌত্রবধূ গত ২৩এ জুন একটী পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছেন। ইনিই ভারতের ভাবী সম্রাট্। জগদীশ্বর ইঁহাকে কুশলে রাখুন্।

২। গ্রীশদেশের ভূমিকম্পে দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকদিগের জন্য কলিকাতাতেও চাঁদা সংগ্রহ হইতেছে।

৩। ইউরোপের অধিকাংশ বিবাহ জুন মাসে হইয়া থাকে। এদেশে বৈশাখই প্রশস্ত।

৪। নরোয়েদেশে যাহাদের টিকা দেওয়া হয় নাই, তাহাদের ভোট দিবার অধিকার নাই।

৫। বহরমপুরের জলের কল প্রতিষ্ঠার জন্য মহারাণী স্বর্ণময়ী সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন।

৬। বিলাতে ১০ লক্ষ লোক কোনও ধর্ম্মের ধার ধরেন না, অথচ বিলাত সভ্যতম দেশ!

৭। জাপানে সের ও মন দরে পোষাক-বিক্রয় হয়। যে পোষাক যত ভারী, তাহার দামও তত বেশী।

৮। বিলাতের কমন্স সভার সভ্য শ্রেণীতে ১০ জন সংবাদপত্র সম্পাদক, ৬ জন প্রিণ্টার, ৪ জন দরজি, ৩ জন ষ্টেসনার, ২ জন কসাই, ৩ জন হোটেলওয়ালা, ৬ জন কৃষক, ১ জন কয়লার সওদাগর এবং ১ জন গাড়ীওয়ালা আছেন।

৯। এক অদ্ভুত পরিবার আবিষ্কৃত হইয়াছে ও সেই পরিবারের কর্ত্তা পুরস্কার পাইয়াছেন। কর্ত্তা মরিসন,উচ্চে ৪হস্ত দেড় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ ২৫ সের। গৃহিণী উচ্চে অবিকল কর্ত্তার মত, কেবল ওজনে বেশী-৩ মণ ১১ সের। বড় ছেলে টমাস উচ্চে ৪ হাত সাড়ে চারি অঙ্গুলি, ওজনে ৩ মণ ২৩ সের। মধ্যম পুত্র জেমস উচ্চে ৪হাত ছয় অঙ্গুলি, ওজনে ২ মণ আড়াই সের। তৃতীয় পুত্র জন উচ্চে প্রায় ৫হস্ত, ওজনে ৩ মণ ৩১ সের। আর সকলের ছোট মেয়েটীর বয়স ১৪ বৎসর, উচ্চে সওয়া চারি হাত।

১০। সম্প্রতি কাশ্মীরের রাজমাতার মৃত্যু হইয়াছে।

১১। ফ্রান্সের সভাপতি কার্ণোকে এক দুর্বৃত্ত হত্যা করিয়াছে।

১২। পৃথিবীতে পূর্ব্বে ২৩ মাংসের প্রয়োজন হইত, এখন শতকরা তাহার ৫৭ গুণ বাড়িয়াছে।

১৩। সমস্ত পৃথিবীতে যত ধন আছে, ইংলণ্ডের এক হাজার ব্যক্তি তাহার অর্দ্ধেকের অধিকারী।

১৪। মান্দ্রাজের টাউনহলে স্থাপিত মহারাণীরমূর্ত্তি এক বৈষ্ণব চন্দনে চর্চ্চিত করিয়া পূজা করিয়াছে। ধন্য রাজভক্তি!

১৫। মৃত-পত্নীর ভগিনীকে বিবাহ করিবার বিলখানি লর্ডহাউসে পাস হইল না।

১৬। মার্কিনের নিউগ্রানেডায় এক প্রকার বৃক্ষ আছে, তাহার ত্বকের রসে

ভাল কালি তৈয়ার হয়। এই কালি প্রথমে দেখিতে অল্প লালাভ,কিছুক্ষণ পরে কিন্তু ঘোর কাল হইয়া দাঁড়ায়। তৈয়ারি কালির লেখা অন্য দ্রব্যগুণে নষ্ট বা ফেঁকাসে হইয়া যাইতে পারে, কিন্তু এই রসের কালি সেরূপ হয় না।

বামারচনা।

বিদেশে।

আমার মেঘের ছায়া—ঘন আঁধারে,
এসেছি এ কোন্ দেশে, চিনিনে কারে!
আপনার জন যারা,
কেউ হেথা নাই তারা,
ভিজিল না তপ্ত বক্ষ করুণা-ধারে,
কে জানে এসেছি কোথা, চিনিনে কারে!

এ বিদেশে পর আমি, তাহে অবেলা,
বসে আছি এক পাশে, হয়ে একেলা;
এদেশে তমাল শাখে,
কলকণ্ঠ নাহি ডাকে,
না সাজায় দিগঙ্গনা বাসন্তী মেলা!
এখানে নরের হিয়া,
রহিয়াছে শুকাইয়া,
তাহারা কেবলি খেলে নিঠুর খেলা—
পদাঘাতে দীন হৃদি ভাঙ্গিয়া ফেলা!

আমার সে "স্নেহভূমি" কতই দূরে—
যেখানে বাঁশরী বাজে সোহিনী সুরে!
যেখানে বিকাল বেলা,
নিঝরিণী খেলে খেলা,
সুরভি সমীর টুকু বেড়ায় ঘুরে!
যেখানে শ্যামল গাছে
চাঁপা ফুল ফুটে আছে,
সবে সবা ভালবাসে পরাণ পুরে,
আমার সে ঘর বাড়ী, কতই দূরে?

যদি মোর স্নেহভূমি "দু'হাত" ধরা,
তবুও সে রোগ শোক যাতনা-হরা!
তবু তাহে স্নেহ প্রীতি,
তবু তাহে সুখস্মৃতি,
তবু তাহে রাশি রাশি আদর ভরা!
সেথা যে বিহগকুল,
তরু, লতা, ফল, ফুল,
আমারি আমারি তারা "নিজস্ব" করা!
হো'ক না সে স্নেহভূমি "ত্রিপাদ ধরা"!

একেলা রয়েছি আজ পরের দেশে,
সেই সব মনে মনে জাগিছে এসে!
শুনিতে স্নেহের ভাষ,
মরমে অতৃপ্ত আশ!
অন্ধ আঁখি, রুদ্ধ শ্বাস, কি হবে শেষে?
কে জানে বিধির লেখা,
হবে কি না হবে দেখা,
কোন্ স্রোতে কোন্ খানে যাইব ভেসে!
কৃতান্ত বা দেন দেখা "সুহৃদ" বেশে!

শ্রী কাব্যকুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বাসনা।

একত্র রহিব নাহি পরশিব,
অবাক্ হইয়ে সে মুখ হেরিব,
করিব তাঁহার সাধনা;
প্রেম ভক্তি দিয়া পূজিব সে হিয়া,
তাঁহার চরণে হৃদয় সঁপিয়া
করিব সে ছবি ধারণা।
তাঁহার জীবনে জীবন ঢালিয়া
তাঁর সুখ দুঃখে হাসি অশ্রু দিয়া,
করিব সে নাম জপনা;
তাঁহারি তরেতে এ সুখ যৌবন,
তাঁহারি তরেতে জীবন মরণ,
তাঁহারি চরণ বাসনা;
তাঁর প্রেমগান গাহিয়া গাহিয়া,
যাইব হরষে অনন্তে মিলিয়া,
তাঁহারি চরণ কামনা।

শ্রীমতী প্রিয়বালা রায়
কাটিহার।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৫ সংখ্যা	শ্রাবণ ১৩০১—আগষ্ট ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

নব রাজকুমারের নাম করণ—গত ১৬ই জুলাই শ্বেত-ভবনে ইংলণ্ডেশ্বরীর পৌত্রের নামকরণ সম্পন্ন হইয়াছে। আচার্য্য কান্টারবরীর প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ। মহারাণী, সপত্নীক যুবরাজ এবং রাজপরিবারস্থ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। নামটী যথোপযুক্ত হইয়াছে—এডওয়ার্ড আলবার্ট ক্রিশ্চিয়ান জর্জ আণ্ড্ পেট্রিক ডেবিড।

প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর হত্যা—"নিয়তিঃ কেন বাধ্যতে।" ইনি এ বৎসর ফ্রান্সের প্রেসিডেণ্ট পদ পুনর্গ্রহণ করিতে চান নাই। কিন্তু তাঁহার বন্ধুগণ অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে পদস্থ থাকিতে বাধ্য করেন। লিও নগরে তিনি এক প্রদর্শনী দেখিতে যান। এক নাট্যশালায় যাইতেছিলেন, পথেই জীবননাট্য শেষ হইল! পথিমধ্যে তাঁহার দর্শন লাভের জন্য বহুলোকের জনতা হয় এবং তাহারা উচ্চৈঃস্বরে বার বার তাঁহার জয়ধ্বনি করিতে থাকে। ইতিমধ্যে মিলানবাসী সাণ্টো নামক এক রুটীওয়ালা তাঁহাকে এক দরখাস্ত দিবার ভান করিলে তিনি যেমন হস্ত প্রসারণ করিবেন, অমনি তাঁহার উদরে ছোরার আঘাত করে। তাঁহার পাঁজরার হাড়, লিবার ও ধমনীমূল কাটিয়া যায়। ১০।৷০ টার সময় আহত স্থান বাঁধা হয়, ১২।৷০টার সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। দুরাত্মা হত্যাকারী বলে তাহার সঙ্গী কেহ নাই, সে অরাজক-প্রিয়, কার্ণো-বধে এক অত্যাচারীকে নিহত করিয়াছে!

মূক বধির বিদ্যালয়—ইহা কলিকাতা কলেজ স্কোয়ারে ৪ নং ভবনে

স্থানান্তরিত হইয়াছে। ছাত্রসংখ্যা ১৫টী হইয়াছে এবং বোর্ডিঙের বন্দোবস্ত হইতেছে। কলিকাতা মিউনিসিপালিটী মাসিক ১০০৲ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করিয়া সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন। এই বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক মূক-বধিরদিগের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষার জন্য শীঘ্র ইংলণ্ডে যাইবেন। ইহার জন্য ৬০০০৲ টাকার প্রয়োজন। আমরা শুনিয়া আনন্দিত হইলাম সার মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও বাবু কালীকৃষ্ণ ঠাকুর ১০০০ টাকা করিয়া দান স্বীকার করিয়াছেন। ফণ্ডের সাহায্যার্থ অন্যান্য দেশ-হিতৈষীদিগের অগ্রসর হওয়া আবশ্যক।

আদর্শ বঙ্গরমণী—স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেব মহাশয়ের পত্নী গত ২৮এ আষাঢ় মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। ইনি ৭ বৎসরে বিবাহিতা হন ও প্রায় ৬৫ বৎসর কাল স্বামীর সহধর্ম্মিণী ও সহকর্ম্মিণী হইয়া পরম পবিত্র দাম্পত্য সুখভোগ করেন। প্রায় ৩ বৎসর বৈধব্য জীবনের আদর্শ দেখাইয়া আশ্চর্য্য বিশ্বাসের পরিচয় দিতে দিতে দেবলোকবাসী স্বামীর সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহাঁর জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ স্থানান্তরে দৃষ্ট হইবে।

ইউরোপীয় রমণীদিগের কার্য্য—(১) প্রশান্ত মহাসাগরের জ্যোতিষী সভায় কুমারী রোস্ ওহালে-রান বৃত হইয়াছেন। ইনি সভার এক মাত্র স্ত্রীসভ্য।

(২) বকিংহামের ডচেস্ সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া "Glimpses of Four Continents" চারিখণ্ডের আভাস নামক পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। পুস্তকের ছবি সকল তাঁহার স্বহস্ত-অঙ্কিত।

(৩) নিউইয়র্কে জাতীয় চিত্রপ্রদর্শনী সভার উনসপ্ততি অধিবেশনে তিনটী স্ত্রীলোক উৎকৃষ্ট ছবির জন্য পুরস্কার পাইয়াছেন। এডিথ মিচেল্ ২০০ টাকা, ফ্রান্সিস্ মারফি ১০০ এবং ক্লারা ম্যাক-চেস্‌নি ৩০০ ডলার পাইয়াছেন।

(৪) স্ত্রীজাতির সুরাপান নিবারণী সভার আবেদন পত্র পৃথিবীর সমুদয় গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রেরিত হইবে, তাহাতে ৩০০০০০০ ত্রিশ লক্ষ স্বাক্ষর সংগ্রহার্থ লেডী হেনরী সমরসেট এবং কুমারী ফ্রান্সিস্ উইলার্ড স্পেশাল বাষ্পীয়পোত যোগে সমুদয় পৃথিবী ভ্রমণ করিবেন।

বৌদ্ধ রমণী।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সমাজের আদিম বিবরণ জানিবার জন্য অনেকেরই যে আগ্রহ বৃদ্ধি হইতেছে, তাহার অনেক কারণ দেখিতে পাওয়া যায়।

অধুনা সভ্য সমাজে যে প্রণালীতে সকল ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া থাকে, বোধ হয় পৃথিবীতে বৌদ্ধধর্ম্মই সর্ব্বপ্রথমে সে প্রণালীতে প্রচারিত হইয়াছিল। সিদ্ধার্থ গৌতম স্বয়ং নির্ব্বাণ সিদ্ধি উপার্জ্জন করিয়া অপর সাধারণকে স্বোপার্জ্জিত ধর্ম্মবল অর্পণ করিবার অভিলাষে অমিত উৎসাহে ও অভিনব উপায়ে জনসাধারণের মধ্যে স্বীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নূতন ধর্ম্ম ও নূতন প্রচার-পদ্ধতি কেবল যে পুরুষদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়াছিল তাহা নহে; নারীগণও তদীয় অলৌকিক ধর্ম্মভাবে আকৃষ্ট হইয়া বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারে ও বৌদ্ধ সমাজ সংগঠনে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তৎপূর্ব্ববর্ত্তী ইতিহাসে ঈদৃশ দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। যে ধর্ম্ম প্রথম হইতেই পুরুষ ও রমণী কর্ত্তৃক প্রচারিত ও সংগঠিত হইতে লাগিল, তাহা যে এক সময়ে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের ধর্ম্ম হইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি?

বৌদ্ধ ভাষ্যকার বুদ্ধঘোষ পালিভাষায় যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, ক্রমে ক্রমে সেই সকল গ্রন্থ যতই লোকের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, ততই বৌদ্ধ ধর্ম্মের ও বৌদ্ধ সমাজের আদিম বিবরণ প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে। ব্রহ্মদেশের ও সিংহলের গ্রন্থ সমুদয় হইতেও বহুল বিবরণ সংগৃহীত হইতেছে। উপরি উক্ত প্রাচীন ইতিহাস সকল হইতে জানিতে পারা যায়, গৌতম কর্ত্তৃক বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইবার অব্যবহিত পরেই এগার জন রমণী বৌদ্ধধর্ম্ম সাধনার্থ ও প্রচারার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিলেন। শ্রীঈশা, দ্বাদশ জন পুরুষ শিষ্য লাভ করিয়াছিলেন; শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভৃতি সহযোগী বন্ধুদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; গৌতম ভিন্ন অপর কোনও মহাপুরুষ জীবদ্দশায় ধর্ম্ম সংস্থাপনে রমণীদলের সাহায্য পাইয়াছিলেন, কি না, সন্দেহ। জনসমাজের এক হস্ত যদি পুরুষ, ও অপর হস্ত যদি রমণী বিবেচনা করা যায়, তাহা হইলে বলিতে হইবে,—জনসমাজের উভয়হস্তে বৌদ্ধধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইয়াছিল।

উপরিভাগে যে এগারজন তপস্বিনী বৌদ্ধ রমণীর কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাঁহাদিগেরই সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া যাইবে। ঐ একাদশ রমণীর নাম—(১) মহাপ্রজাপতি গোতমী, (২) ক্ষেমা, (৩) উপলাবণ্য, (৪) পতাকারা, (৫) ধর্ম্মদীনা, (৬) নন্দা, (৭) সোনা, (৮) সুকুলা, (৯) ভদ্রা—কুন্তলকেশা, (১০) ভদ্রা—কাপিলানী, (১১) কেশা গোতমী।

মহা প্রজাপতি গোতমী—মহা প্রজাপতি গোতমী, গৌতম-মাতা মায়াদেবীর কনিষ্ঠা ভগিনী। মায়াদেবী সন্তান প্রসবের সপ্তাহ কাল পরেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। কথিত আছে রাজা শুদ্ধোদন কোন এক উৎসব উপলক্ষে মায়াদেবীকে ও গোতমীকে

কপিলবাস্তুর রাজভবনে আনয়ন করেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া কপিলবাস্তুর ব্রাহ্মণগণ বলেন এই নারী দুইটীর গর্ভে যে সকল সন্তানের জন্ম হইবে, তাহারা এই বিশ্বের অধিপতি হইবে"। রাজা শুদ্ধোদন মায়াদেবীকে ও গোতমীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মায়াদেবীর লোকান্তর-যাত্রার পরে গৌতমের লালন-পালন-ভার গোতমীর হস্তে অর্পিত হয়। অল্পকাল পার গোতমীও এক পুত্র প্রসব করেন। গৌতমের প্রতি বিমাতার ঈদৃশ স্নেহ সঞ্চার হইয়াছিল, যে তিনি স্বীয় পুত্রের পালনভার তদীয় ধাত্রীর হস্তে অর্পণ করিয়া স্বয়ং গৌতমকেই পালন করিয়াছিলেন।

অধিকাংশ প্রাচীন ইতিহাস, বিশেষতঃ ধর্ম্মসমাজের ইতিহাস কবির রচনা। কবিত্ব ভেদ করিয়া ঘটনা নিষ্কাশন করা বড় কঠিন ব্যাপার। বৌদ্ধ ইতিহাসে লেখা আছে, গোতমী পূর্ব্বজন্মে বারাণসী নগরীতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। দয়া তাঁহার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ ছিল। তৎকালে সন্ন্যাসীগণ বৎসরের সকল ঋতুতে পর্ব্বতে ও অরণ্যে বাস করিয়া বর্ষাসমাগমে নগরে আসিয়া লোকালয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। এক বর্ষাকালে পাঁচ শত ভিক্ষু সন্ন্যাসী পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া ইসিপতানা নগরীতে এক ধনবান্ বণিকের আবাসে উপস্থিত হন। যে সময়ে তাঁহারা বণিকের ভবনে পৌঁছিলেন, তখন সন্ধ্যা সমাগতপ্রায়। সন্ন্যাসীরা বণিকের নিকটে আপনাদিগের প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন বটে, কিন্তু তাহা পূর্ণ হইল না। বণিক কহিলেন, "আমাদিগের এমন সময় নাই যে সন্ন্যাসীদিগের জন্য পাঁচ শত কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া দিই, তাঁহারা অন্যত্র গমন করুন্।" সন্ন্যাসিবর্গ বিফলপ্রয়াস হইয়া প্রস্থান করিলেন। পথিমধ্যে গোতমী তাঁহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কলস-কক্ষে দূর হইতে জল আনিতেছিলেন। পূর্ব্বে যখন সন্ন্যাসীরা নগরে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন। অল্পকালমধ্যে বিশেষতঃ সন্ধ্যার প্রাক্কালে নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতে দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসীদিগের প্রমুখাৎ আদ্যোপান্ত বিবরণ শ্রবণ করিয়া তিনি বলিলেন, "আপনারা নিরাশ হইবেন না; আমরা আপনাদিগের বাসগৃহ প্রস্তুত করিয়া দিব।" গোতমীর পাঁচ শত দাসী ছিল। তিনি তাহাদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "কন্যাগণ! তোমরা কি দাসীভাবেই চিরকাল থাকিতে চাও,—না মুক্তি প্রার্থনা কর?" তাহারা উত্তর করিল, "মা! আমরা মুক্তি প্রার্থনা করি।" গোতমী কহিলেন, "তবে এক কর্ম্ম কর। তোমরা পাঁচ শত দাসী আমার,—আপন আপন স্বামীকে এক দিনের জন্য আনয়ন কর ও পাঁচ শত সন্ন্যাসীর বর্ষাকালে থাকিবার জন্য পাঁচ শত খানি কুটীর প্রস্তুত করিয়া দাও।"

তাহারা তদনুসারে গোতমীর আজ্ঞা পরিপালন করিল। গোতমী সন্ন্যাসি-বর্গের জন্য ঐ সকল গৃহ সুসজ্জিত করিয়া দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, বর্ষার তিন মাস কাল তাঁহাদিগকে আহার-পানীয় প্রদান পূর্ব্বক দয়াধর্ম্ম প্রতিপালন ও সাধুসেবা করিয়াছিলেন। কথিত আছে, এইরূপ বহু সৎকার্য্যে গোতমীর পূর্ব্ব জন্ম অতিবাহিত হইয়াছিল।

মহাত্মা বুদ্ধ দেশে দেশে ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলে পরে তাঁহার পিতাও তৎপ্রচারিত নবধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া: ছিলেন। গৌতমের স্বরাজ্যে উপস্থিত হইবার দ্বিতীয় দিবসেই গৌতমীর পুত্র নন্দ বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন পূর্ব্বক সন্ন্যাসী হন। সপ্তম দিবসে গৌতম-নন্দন রাহুল ও তাঁহার অনুসরণ করেন। এই সময়েই রাজা শুদ্ধোদন পরলোক-প্রাপ্ত হন। রাজার লোকান্তর যাত্রার পরে গোতমী ও বুদ্ধের শিষ্যত্ব স্বীকার পূর্ব্বক সন্ন্যাসিনী হইবার জন্য ব্যাকুল হইলেন। তৎকালে বুদ্ধদেব বৈশালীর নিকটস্থ এক আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গোতমী তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়া স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সিদ্ধার্থ শাক্য তাঁহাকে এই মহাব্রতে দীক্ষিত করিতে প্রথমে স্বীকৃত হইলেন না। যে ব্যক্তি বৌদ্ধ-সন্ন্যাস-জীবনের সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হইয়াছে, সে নিবৃত্ত হইবে কেন? গোতমী নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি নাপিত ডাকিয়া কেশমুণ্ডন করাইলেন; তদনন্তর গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পুনরায় উপরিউক্ত আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। এবার বুদ্ধ-দেবের প্রধান শিষ্য আনন্দকে ডাকিয়া তিনি কহিলেন, "বৎস! আমাকে দীক্ষিত করিবার জন্য তুমি সিদ্ধার্থকে অনুরোধ কর।" আনন্দের অনুরোধ—বিশেষতঃ গোতমীর মহদভিপ্রায় বিশেষরূপে অব-গত হইয়া বুদ্ধদেব, মাতা গোতমীকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করিলেন। তাঁহার পাঁচশত দাসী ছিল, তাহারাও বৌদ্ধসন্ন্যাস ব্রত অবলম্বনপূর্ব্বক বুদ্ধ-দেবের উপদেশ লাভ করিয়া বৌদ্ধ-সমাজের গৌরবের স্থল হইল।

এখন নারীগণকে সেরূপ সন্ন্যাসিনী হইতে হইবে না বটে, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য, সমাজের জন্য, স্বদেশের জন্য আত্মোৎ-সর্গ করিতে হইবে। গোতমীর ন্যায়,—তাঁহার অনুচরী বর্গের ন্যায় কে কবে ধর্ম্মার্থ আত্মোৎসর্গ করিবেন?

[ক্রমশঃ]

শ্রীনগেন্দ্র চন্দ্র মিত্র।

বারমেসে।

(কৃষি বিবরণ)

আমরা যে নিয়মে দ্বাদশ মাসের কৃষি বিবরণ প্রকাশ করিতেছিলাম, তদনুসারে জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকায় আষাঢ় মাসের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত

ছিল ; কিন্তু দুর্দ্দৈববশে তাহা ঘটে নাই। এজন্য আষাঢ় মাসের পত্রিকায় আষাঢ় ও শ্রাবণ দুই মাসের বিবরণ প্রকাশিত হইল। শ্রাবণ মাস হইতে পুনরায় প্রতিজ্ঞাত নিয়মানুসরণের চেষ্টা করা যাইবে।

আষাঢ়।

জ্যৈষ্ঠ মাসে বেগুণের চারা রোপণ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। যদি তাহা না ঘটিয়া থাকে, এই মাসে রোপণ করিবে। ডেঙ্গো ডাঁটার ন্যায় বেগুণও দ্বিবিধ, আশু ও আমন। আউশ বেগুণ শীতের পূর্ব্বেই ফলিতে আরম্ভ হয় বটে; কিন্তু তাহা অধিক ফলে না এবং খাইতেও তত সুমিষ্ট হয় না। আমন বেগুণ যত শীত পড়ে, ততই ফলে। সাধারণতঃ আমন বেগুণ আউশ অপেক্ষা অনেক অধিক ফলে ও খাইতে সুস্বাদ হয়। সচরাচর আষাঢ় শ্রাবণ মাসেই তাহার রোপণ হইয়া থাকে।*

লঙ্কা—সসার দোআঁশ মৃত্তিকার চৌকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে পরিপুষ্ট লঙ্কার বীজ বপন করিবে! ইহাকে লঙ্কার হাপোর কহে। এ মাসে হাপোর দেওয়া ভিন্ন লঙ্কার অন্য কার্য্য নাই।

নারিকেল—নারিকেল পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ফল। যদি একমাত্র ফল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করা সম্ভব হয়, তাহা নারিকেল; কেননা শরীর রক্ষার্থ যতপ্রকার উপাদান আবশ্যক, নারিকেলে তৎসমুদায়ই বিদ্যমান আছে। সুবিখ্যাত উদ্‌ভিদ্‌তত্ত্ববিদ্‌ ও পূর্ব্বতন স্কুল ইন্‌স্পেক্‌টার (C. B. Clark) সাহেব বিদ্যালয় পরিদর্শন জন্য যখন মফঃস্বলে অবস্থান করিতেন, আমরা শুনিয়াছি, তিনি একমাত্র নারিকেল ভোজন করিয়া অনেক দিন কাটাইয়া দিতেন। এতাদৃশ উৎকৃষ্ট ফল নারিকেলের বৃক্ষ প্রস্তুত করিতে যদি কাহার ইচ্ছা হয়, তাঁহাকে এই মাসেই তাহার চারা রোপণ করিতে হইবে। ভদ্রাসনের মধ্যে নারিকেল চারা রোপণ করায় আরও একটী বিশেষ উপকার আছে। যদি কাহারও বাটীতে দৈবাৎ বজ্রাঘাত হয়, আর সেই বাড়ীতে নারিকেল গাছ থাকে, তাহা হইলে বজ্রাগ্নি নারিকেল গাছের মস্তকেই পতিত হইবে, কারণ সকল বৃক্ষ অপেক্ষা নারিকেল বৃক্ষ উচ্চ হইয়া থাকে।*

* খনার মতে বারমাসেই জল দিয়া বেগুণ ফলাইতে পারা যায়। এ কথা সত্য; কিন্তু সে বেগুণ খাইতে ভাল লাগেনা।

* উচ্চ পদার্থের উপর পতিত হওয়া বজ্রাগ্নির একটী স্বভাব। এই কারণেই অট্টালিকার এক কোণে অত্যুচ্চ লৌহময় শিক রক্ষা করা হয়। পরিচালক লৌহময় শিকের উচ্চতা ভিন্ন আরও একটী বিশেষ গুণ আছে। শিক যে স্থানে অবস্থিত. সেই স্থান হইতে ৮০ হস্ত ব্যাসার্দ্ধ লইয়া বৃত্ত অঙ্কিত করিলে যত স্থান ব্যাপ্ত হয়, সেই বিস্তৃত স্থানের মধ্যে যেখানেই বজ্রাঘাত হউক, শিকের মস্তকে পড়িবে এবং শিকদ্বারা পরিচালিত হইয়া ভূগর্ভে প্রবেশ করিবে। বজ্রাগ্নি যেমন মেঘ হইতে ভূতলে পতিত হয়, তেমনি কখন কখন ভূতল হইতে

নারিকেলের ফলন বন্ধ হইলে তাহার কতকগুলি পাশ শিকড় কাটিয়া দিবে। ডাব যত ভাঙ্গা যায়, ফলন তত বেশি হয়।

প্রত্যেক নারিকেলের চারা বার হাত অন্তরে রোপণ করিতে হইবে। প্রতি চারার নিকটে এক এক ঝাড় কলা গাছ লাগান উচিত। নারিকেল গাছ প্রস্তুত করিতে হইলে আর একটী কঠিন কার্য্য করিতে হয়, অনেকে আলস্য বা অজ্ঞতা বশতঃ তাহা করিয়া উঠিতে পারেন না; এজন্য তাঁহাদিগের নারিকেল গাছের তেজ হয় না এবং ফলও ভাল হয় না। চারা ২।৩ বৎসরের হইলেও উহার মূলদেশে শিকড়ের দ্বারা আবৃত বীজ নারিকেলটী রহিয়া যায়। অতি সাবধানে শিকড় না কাটিয়া ঐ বীজ নারিকেলটা বাহির করিয়া দিতে হয়। ইহাকে নারিকেলের "পিলে কাটা" কহে। পিলে কাটা কিছু কঠিন কাজ; কিন্তু পিলে না কাটিলেও গাছ ভাল হয় না। কলাগাছ দ্বারা নারিকেল গাছের দ্বিবিধ উপকার হয়। প্রথম, কলাগাছ চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী ভূমির রস আকর্ষণ করিয়া যেমন আপনার সজলদেহের পুষ্টিবিধান করে, তেমনি আপন গৃহাগত অতিথি নারিকেল গাছকেও ঐ রসের ভাগ দেয়। দ্বিতীয়, যদিই কোন গতিকে উহার নিকট গোরু বা মানুষ আইসে, সে ঢলঢলে কলা ত্যাগ করিয়া কখন নারিকেল গাছে মুখ দেয় না। কলাগাছ আপন দেহ দানে নারিকেল গাছকে রক্ষা করে।

বাঁশ,—বাঁশ গৃহস্থের অনেক কাজে লাগে। বিশেষতঃ বাঁশ বড় পাকা-আওলাত। যদি কাহার অধিক জমি থাকে, আর তিনি ৪।৫ শত ঝাড় বাঁশ প্রস্তুত করিতে পারেন, বার্ষিক ৪।৫ শত টাকা অবাধে আইসে। ঝাড় প্রতি ১৲ টাকা নিশ্চয়ই লাভ হয়। এই মাসে বাঁশের নুতন কোঁড়া বাহির হয়। সেই সকল কোঁড়া রক্ষা করা গৃহস্থের একটী প্রধান কার্য্য। কারণ যখন উহা ছোট থাকে, তখন অতি কোমল, গোরুতে খাইয়া ও ভাঙ্গিয়া বড় ক্ষতি করে। উহার তরকারী রাঁধিয়াও অনেকে খায়। খাইতেও উত্তম লাগে। কিন্তু ২।৩ খানি বাঁশ নষ্ট না করিলে আর এক দিনের তরকারী হয় না।

পুঁই ও সাচিকুমড়া,—জ্যৈষ্ঠমাসে এই দুই ফসলের আবাদ করিবার উপদেশ দেওয়া গিয়াছে। যদি ঐ মাসে চারার অপ্রাপ্তি বা অন্য কোন কারণে না ঘটিয়া থাকে, এ মাসেও উহাদিগের আবাদ হইতে পারে। এ মাসে উহাদিগের চারা চারিদিকে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়।

কলা,—কলার আবাদ গৃহস্থের বিশেষ উপকারী। উহার সকলই আমা-

উঠিয়া মেঘে মিলিত হয়। ঐ বৃত্তের অন্তর্গত যাবতীয় বজ্রাগ্নি ঐ শিকের মূলদেশ দিয়া উর্দ্ধে পরিচালিত হইয়া যায়।

দের প্রয়োজনে লাগে। মোচা, থোড়, কলা, (কাঁচা ও পাকা) পাত কত প্রয়োজনীয়, তাহা সকলেই জানেন। যাঁহারা বাপ মার শ্রাদ্ধ করেন, উহার গাছগুলাও তাঁহাদিগের কাজে লাগে। গ্রীষ্মকালে যখন খরতর রৌদ্রে মাঠের ঘাস শুষ্ক হইয়া যায়, এবং ঘরে বিচিলী না থাকে, তখন অনেক গোরু কলাগাছ খাইয়া জীবন ধারণ করে। বিশেষতঃ দুগ্ধবতী গাভীকে কলাগাছ খাওয়াইলে তাহার দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। তদ্‌ভিন্ন উৎসব ও মাঙ্গলিক কর্ম্মে কলাগাছ একটী প্রধান উপাদান। যাঁহাদিগের যথেষ্ট ভূমি আছে, তাঁহারা বিবেচনাপূর্ব্বক কলাবাগান করিতে পারিলে লাভবান্ হইতে পারেন। যাঁহাদের ভূমি নাই, তাঁহাদের বাটীর এক পাশে ২।১ ঝাড় কলাগাছ হইলে সংসারের বড় উপকার হয়।

"আট হাত অন্তর এক হাত বাই।
কলা পোঁতগে চাসা ভাই॥"

আট হাত অন্তরে এক হাত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া এই মাসেই কলাগাছ রোপণ করিতে হয়। কলার তেড় বা চারার যে দিকে নূতন তেড়ের মুখী থাকে, সেই দিক্ দক্ষিণ দিকে রাখিয়া পুঁতিতে হয়। আবার যে ঝাড় হইতে তেড় মারিতে হইবে, সেই ঝাড়ের দক্ষিণ দিকের তেড়গুলি রাখিয়া অপর তিন দিকের তেড় তুলিতে হইবে। কোন ঝাড় হইতে তেড় বা ফলবান্ বড় গাছ তুলিতে হইলে তাহার এঁটে অর্থাৎ মূলগুলা তুলিতে হইবে। ঝাড়ে এঁটে থাকিলে তাহা পচিয়া তাহাতে এক প্রকার কীট জন্মে। ঐ কীটে সমস্ত ঝাড় নষ্ট করিয়া ফেলে।

"কলা পুঁতে না কেটো পাত।
তাইতে কাপড় তাইতে ভাত॥"

উদ্ভিদ্ মাত্রেরই কতকগুলি শাখাপল্লব কাটিয়া দিলে, তাহার ফল ফুল বেশি হয় ও গাছ সুস্থ হয়; ইহা বিজ্ঞানসম্মত। তদনুসারে কলাপাত কাটায় কোন হানি নাই। তবে বোধ হয়, কলাপাত বাইল শুদ্ধ কাটিয়া ফেলিলে উহার কাণ্ডকোষ অর্থাৎ খোলা শুকাইয়া বা পচিয়া গাছ নষ্ট হইতে পারে, এই আশঙ্কায় এককালে পাতা কাটা নিষিদ্ধ হইয়াছে। বাইলের অর্দ্ধেক পরিমাণ রাখিয়া পাতা কাটিলে পাতার প্রয়োজন ও গাছ রক্ষা উভয়ই সিদ্ধ হইতে পারে। আমরা পুনরায় কলার প্রবন্ধ লিখিব।

সুপারি,—ইহাও উৎকৃষ্ট আওলাত। বঙ্গের সমস্ত দক্ষিণ প্রদেশে ইহার প্রচুর আবাদ হইয়া থাকে। বিশেষতঃ মেদিনীপুর, চব্বিশ পরগণা, খুলনা প্রভৃতি জিলার অনেকের সুপারির আবাদই উপজীবিকা। এই মাসে গাছ পাকা গুবাকের হাপোর দিতে হয়। যে ক্ষেত্রে গুবাকের আবাদ করা যায়, তাহার বেড়া পালিতা মাদারের বৃক্ষদ্বারা দিতে পারিলে ভাল হয়, কারণ খনার বচনে উক্ত হইয়াছে, ঐ পাতায় গুবাকের

উৎকৃষ্ট সার হয়। খনা গুবাকের আরও একটী সারের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহা গোবর পচা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

"শোন্‌রে বাপু চাসার পো।
শুপারি বাগে মান্দার রো॥
মান্দার পাতা প'ল্লে গোড়ে,
ফল বাড়ে ঝট্ ফট্ কোরে।"

প্রথমে শুপারির চারা আট হাত অন্তর রোপণ করিতে হয়। স্থায়ীরূপে চারা রোপণের পূর্ব্বে শুপারির চারা তিনবার নাড়িয়া পুঁতিতে হয়। আট হাত অন্তরস্থিত চারা সকল বড় হইয়া ফলবান্ হইলে, তাহার মধ্যে মধ্যে আর একটা করিয়া চারা পোঁতা যায়। তাহাতে কোনও গাছের ক্ষতি হয় না, অথচ অল্প স্থানে অধিক গাছ হয়।

চারা,—কোন প্রকার ফল বা ফুলের ছোট কিম্বা বড় চারাকে স্থানান্তর করিবার প্রয়োজন হইলে এই মাসেই করিতে হয়। যদি বুঝা যায়, যে চারাকে নাড়িতে হইবে, তাহার মূল শিকড়টা অনেক মাটীর নীচে গমন করিয়াছে, তাহা হইলে তুলিবার অন্যূন এক সপ্তাহ পূর্ব্বে নিড়ানী বসাইয়া ঐ শিকড়ের অগ্রভাগ ছেদন করিয়া রাখিতে হয়। ইহাকে "খাসি করা" কহে। বড় বড় চারা তুলিতে হইলে, চতুঃপার্শ্বের মাটী খুঁড়িয়া কতক মাটীর সহিত চারার মূলদেশ ছেঁড়া চট্ বা শুষ্ক কলার খোলার দ্বারা অগ্রে উত্তমরূপে বাঁধিয়া পরে চারা তুলিতে হইবে। তাহাতে কোন শিকড় নষ্ট বা আহত হইবে না।

আলবাল,—বাড়ীতে বা বাগানে যে সকল বড় বড় ফল ফুলের গাছ থাকে, তাহাদের গোড়া খুঁড়িয়া গোলাকারে এরূপ আইল বাঁধিতে হয়, যেন তন্মধ্যে জল দাঁড়াইতে পারে। এই মাসে এই কার্য্য করিতে হয়। ইহাকে গাছপালাকে "জল খাওয়ান" কহে! বর্ষাকালে এইরূপ; কিন্তু শীতকালে ইহার বিপরীত ব্যবস্থা। তাহা কার্ত্তিকমাসে বলিব।

আনারস, এই মাসে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। তাহার মুখে ও বোঁটার চারিপাশে যে সকল পত্র মুকুল (মুখী) থাকে, তাহার গোড়ায় গোবর দিয়া মাটীতে রোপণ করিলে এক একটী মুখীতে এক একটী আনারসের গাছ হইবে। আনারস উত্তম ফল। ইহার চাস আবাদ বড় সহজ। ইহা দ্বিবিধ ভূমিতে হইতে পারে। আওতা জমি অর্থাৎ অন্যান্য বৃক্ষের তলভাগে যে জমি থাকে, সেই জমি এবং ফাঁকা জমি উভয় স্থানেই আনারস হইতে পারে। আওতা জমির এক বিঘায় এক হাজার এবং এক বিঘা ফাঁকা জমিতে আড়াই হাজার আনারস গাছ হইতে পারে। মুখী পোঁতার তৃতীয় বৎসরে আনারস ফলে। যাঁহাদের অধিক জমি নাই, তাঁহারা মনে করিলে স্ব স্ব ভদ্রাসনে অনায়াসে ২০।২৫ টা আনারসের গাছ করিতে পারেন এবং

গাছপাকা আনারসের অমৃত স্বাদ বিনা-ব্যয়ে ভোগ করিতে পারেন।

বড়গাছ,—যে সকল গৃহস্থের ফলের বাগান আছে এবং তাহাতে সকল প্রকার গাছ রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন এই মাসে বাবলা ও তেঁতুলের, তাল ও খেজুরের আঁটি রোপণ করেন। বাগান ও পুষ্করিণীর চতুঃপার্শ্বে যে তোলা মাটী থাকে, এক একটু গোবরের সহিত তাহার উপর বাবলার বীজ রোপণ করিতে পারিলে গাছ শীঘ্র বড় হইয়া উঠে। বাবলা কাঠে দেশীয় গাড়ী ও লাঙ্গল সম্বন্ধে অনেক গড়ন হইয়া থাকে। এমন কি গাড়ীর চাকা বাবলা কাষ্ঠ ভিন্ন হয়না। এক এক যোড়া চাকা ১৫৲ হইতে কুড়ি টাকায় বিক্রয় হইয়া থাকে। তদ্ভিন্ন বাবলা কাষ্ঠে উত্তম জ্বালানি কাঠ হয়। সহরের লোকেরা পাতুরে কয়লার কল্যাণে কাষ্ঠের ধার বড় ধারেন না; কিন্তু মফঃস্বল জীবন যাত্রার উহা একটী প্রধান উপাদান। বাবলার বৃদ্ধি বড় সত্বর হয়। এজন্য উহা ব্যবসায় ও জ্বালানি উভয়তঃই উপকারজনক। যাঁহাদিগের ১০।২০ ঝাড় বাঁশ ও কিছু বাবলা করিবার স্থান আছে, তাঁহাদিগের জ্বালানির কোন চিন্তা নাই। শুষ্ক বাঁশে অনেক গৃহস্থের অনেক জ্বালানি কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে।

তেঁতুল,—গৃহস্থের বিশেষ প্রয়োজনীয়। উহার গাছ আপনার বাগানে ২।৪ টী করিয়া রাখিতে পারিলে নিজগৃহের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া অনেক টাকায় বিক্রয় হইতে পারে। তেঁতুলের ব্যবসায় যে বিশেষ লাভজনক ও অল্প মূলধনে চলিতে পারে, "সুধাকর" নামক মুসলমান পত্রিকায় তাহা উত্তমরূপ প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। আজ তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করিতে পারা গেল না।

তাল ও খেজুরের আঁটি এই মাসে রোপণ করিতে হয়।

"এক পুরুষে রোপে তাল।
অন্য পুরুষে করে পাল।
অপর পুরুষে ভুঞ্জে তাল॥"

এই ভয়ে কেহই তালের গাছ করিতে যান না। আমরাও তজ্জন্য কাহাকে অনুরোধ করি না। তবে আপনার বাড়ী বা বাগানে সকল প্রকার ফলের বৃক্ষ থাকা, যিনি বড় সুখের বিষয় মনে করেন, তিনি এই মাসে তালের আঁটি রোপণ করিতে পারেন। খেজুরের আবাদ বিশেষ লাভজনক। তাহার বিবরণ আমরা অন্য সময়ে বলিব। আপনার অধিকারে ১০।১৫ টা গাছ থাকিলে এবং তাহা শিউলীদিগকে জমা করিয়া দিলে শীতকালে দেবদুর্ল্ভ "জিরেন-কাঠের রস" ও নলেন্ গুড় পাইবার আর কোনও ব্যাঘাত থাকে না। ঐ দুই পদার্থ যাঁহারা যথাকালে উপভোগ করিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিবেন, আমি "দেব দুর্লভ" কেন বলিলাম। এই মাসে খেজুরের "জাপোর" দিতে হয়।

শ্রাবণ।

এই মাসে প্রবল বর্ষা হয়। জল উদ্ভিদের যেমন ইষ্ট করে, অতিরিক্ত জল গাছের গোড়ায় বসিয়া তেমনি অনিষ্ট করে। এই মাসেই তদ্রূপ অনিষ্ট হইবার অধিক সম্ভাবনা। যদি বুঝিতে পারা যায় যে, কোন গাছের গোড়ায় জল বসিতেছে, তাহা হইলে আলবালের আইল ভাঙ্গিয়া এরূপ গোড়া খুড়িয়া দেওয়া উচিত, যেন গাছের গোড়া শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়। এমন কি পাশের শিকড় গুলিতেও একটু রৌদ্র পাইলে ভাল হয়। যদি আষাঢ় মাসে কলাগাছ লাগান না হইয়া থাকে, এ মাসে লাগাইলেও চলিবে।

বেগুন, আদা ও হলুদ, এ মাসে এই তিন ফসলের বিশেষ কার্য্য নাই। কেবল উহাদিগের ক্ষেত্র পরিষ্কার করিয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিতে হইবে।

ইক্ষু,—যদি ইক্ষুর আবাদ থাকে, কি সাংসারিক প্রয়োজন জন্য বাড়ীতে ২।৪ ঝাড় ইক্ষু করা হইয়া থাকে, তাহাদিগের নিম্নদিকের কতকগুলি পাতা ভাঙ্গিয়া দিয়া অবশিষ্ট পাতাগুলি গাছের গাত্রে জড়াইয়া দিতে হয় এবং গাছগুলি যখন বেশ বড় হয়, তখন পরস্পর নিকটবর্ত্তী ৩।৪ টা গাছ একত্র বাঁধিয়া দিতে হয়। নহিলে বাতাসে গাছ হেলিয়া পড়ে, কি ভাঙ্গিয়া যায়।

লঙ্কা,—এই মাসে হাপরে লঙ্কার চারা প্রায় অর্দ্ধ হস্ত পরিমিত হয়। যে স্থানে সর্ব্বদা রৌদ্র পায়, এমন স্থানের উত্তমরূপে কর্ষিতক্ষেত্রে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া ঐ লঙ্কার চারা রোপণ করিতে হয়। রৌদ্র না পাইলে লঙ্কায় ঝাল হয় না। এই মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে লঙ্কার চারা ক্ষেত্রে রোপণ করা নিতান্ত আবশ্যক, কেননা তদন্যথায় লঙ্কার ফলনে ব্যাঘাত ঘটে। যে স্থানে ধানের ঝাড়াই মাড়াই হয়, ধান উঠিয়া গেলে, সেই স্থান ঝাঁইট দিয়া যে ওঁচলা মাটী জমে, তাহা লঙ্কার উৎকৃষ্ট সার। অতএব যাঁহারা উত্তমরূপে লঙ্কার চাস আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের বিশেষ যত্নে ঐ মাটী সংগ্রহ করা উচিত। খনার বচনে ভাদ্র কি আশ্বিনে লঙ্কা রোপণের ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতির পরিবর্ত্তনে এখন শ্রাবণ মাসে লঙ্কা রোপণ অপরিহার্য্য হইয়াছে।

"হাউয়ে লাউ উঠানে ঝাল।
কর বাপু চাসার হাওয়াল।"

উঠানের ন্যায় পরিষ্কার ক্ষেত্রে লঙ্কা করিবে।

শাঁকআলু—যে দোআঁশ মাটীতে বালির অংশ অধিক থাকে, তাহা শাঁক আলুর পক্ষে বিশেষ উপযোগী। শাক আলুকে দেশান্তরে কেশুর কহে। উহা স্নিগ্ধ, পুষ্টিকর ও রৌদ্রের সময় ভোজনে সুখপ্রদ। দুর্ভিক্ষকালে কোন কোন স্থানের দুঃখী লোকেরা কেশুর খাইয়া জীবন ধারণ করে। এই মাসে উহার আবাদ করিতে হয়। উপরি উক্ত মৃত্তিকার ক্ষেত্রে এক কি দেড় হাত অন্তর

দাঁড়া বাঁধিয়া তাহার উপর অর্দ্ধহস্ত অন্তরে ২টী করিয়া শাঁকআলুর বীজ রোপণ করিতে হয়। দাঁড়ার যত শিথিল (শল) হয় আলু ততই বড় ও কোমল হইয়া থাকে।

আশুধান্য,—এই মাসের শেষভাগে, কিম্বা ভাদ্রের প্রথমে আশুধান্য ছেদন করিয়া বাড়ীতে বা খামারে আনিতে হয়।

হৈমন্তিক ধান্য,—এ প্রবন্ধে ধান্যাদি ফসলের, অর্থাৎ যাহাদিগের অল্প পরিমাণে চাস আবাদে কোন লাভ নাই, তাহাদিগের বিশেষ বিবরণ বলিবার কথা নাই, তবে তত্তৎ ফসল সম্বন্ধে ২।১টী গুরুতর কথা মাত্র বলিয়া যাইব।

"আষাঢ়ে কাড়ান মাণকে।
শ্রাবণে কাড়ান ধানকে॥
ভাদরে কাড়ান শিষকে।
আশ্বিনে কাড়ান কিস্‌কে॥

এই প্রবাদ দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, এই মাসেই হৈমন্তিক রোপণের প্রশস্ত সময়। বর্ত্তমানেও এই নিয়ম অক্ষুন্ন আছে। কৃষকদিগের এ কথাটা ভাল করিয়াই মনে রাখা উচিত। ভাদ্রের ১২ই পর্য্যন্ত রোপণ চলিতে পারে।

"শ্রাবণের পুর ভাদ্রের বার।
এর মধ্যে যত পার।" খনা।

শ্রাবণে আর কোন বিশেষ কার্য্য নাই।

কবির পরিণাম।

সতীশ বাল্যকাল হইতেই কবিতা লেখে। যখন সতীশ স্কুলের বালক ছিল, তখন তাহার সহপাঠীরা বিস্মিত-নেত্রে দেখিত যে আকাশে নীল মেঘস্তবক অথবা জ্যোৎস্নাময়ী শুভ্রা রাত্রি দেখিলে, প্রফুল্ল ফুলবন বা শ্যামল প্রান্তরবাহিনী নদীকূলে বেড়াইতে গেলে বালক সতীশ মুগ্ধবৎ বসিয়া কি ভাবিতে থাকে; তার পরে বিনা আয়াসে—বিনা অভিধানে, একটী সুন্দর কবিতা লিখিয়া ফেলে।

এ কথা যখন অনেকের কাণে পৌঁছিল, তখন অনেকে সতীশের উপরে বড় অসন্তুষ্ট হইল। কেহ বলিল "ও ছেলের লেখা পড়া হইবে না," কেহ বলিল "এ ছেলের প্রকৃত বুদ্ধি হইবে না" যাঁহারা সাধারণের নিকটে আপনাদিগকে অধিক বুদ্ধিমান্ বলিয়া প্রতিপন্ন করেন, তাঁহারা অপেক্ষাকৃত গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "মাথা কিছু খারাপ বলিয়া সতীশের ঐ একটা রোগ হইয়াছে।" এসব কথার মধ্যে কোন্‌গুলা সত্য কোন্‌গুলা মিথ্যা আমরা তাহা জানি না, তবে এই মাত্র জানি যে "যে রোগের জন্য"

সতীশ মাষ্টার মহাশয়ের কাছে ধমক খাইল, গুরুজনদিগের কাছে গালি খাইল, বন্ধুরা "কালিদাস, শেলি, মাইকেল দত্ত" বলিয়া তাহাকে ঠাট্টা করিল; তাহার সে দারুণ রোগ কিন্তু কিছুতেই তাহাকে ছাড়িল না।

ক্রমে সতীশের বয়স তেরো ছাড়াইয়া তেইশ, তেইশ ছাড়াইয়া তেত্রিশে পৌঁছিল, সতীশচন্দ্রও স্কুল ছাড়িয়া কলেজে, কলেজ ছাড়িয়া আপিসে উপস্থিত হইলেন। সেই সঙ্গে সেই "দুশ্চিকিৎস্য রোগ"ও প্রবল বেগে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তখন কাজে কাজে সতীশের শুভাকাঙ্ক্ষিগণ এই কবিতা-রোগগ্রস্তের "আরোগ্য" আশা ছাড়িয়া দিয়া একরূপ নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিলেন।

অন্য লোকে এইরূপ "নিশ্চেষ্ট" হইলেও, একজনের চেষ্টায় "নির্"উপসর্গ যোগ করিতে আমাদের সাধ্য হইল না। কারণ সতীশের সহধর্ম্মিণী শ্রীমতী সরোজিনী দেবী স্বামীর এই "দুরারোগ্য রোগ" দূর করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।—যখন সতীশ কলিকাতায় কলেজে পড়িত, যখন ছুটীর সময়ে বাড়ী গিয়া, গভীর রাত্রিতে অচিরজাগ্রতা পঞ্চদশ বা ষোড়শ বর্ষীয়া ভার্য্যা সরোজিনীকে "সুন্দর পূর্ণিমা-নিশি" কিম্বা "ফুটিছে বকুল ফুল" অথবা "কার মুখ পড়ে মনে" প্রভৃতি, মধুর পদাবলী যুক্ত নিজের রচিত কবিতা গুলি সরল ব্যাখ্যা সহ শুনাইতেন, তখন যে সরোজিনীর তাহা ভাল লাগিত না, একবার শুনিলে আবার শুনিতে ইচ্ছা হইত না, তাহা কখনই নহে। বরং আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, সতীশের সে মধুর গাথা, বাসন্ত কোকিলের ঝঙ্কারের মত সরোজিনীর হৃদয়ে অতি নিভৃত স্থানে প্রতিধ্বনিত হইত! আরও শুনিয়াছি "কবির ভার্য্যা" বলিয়া সরোজিনীর মনে বেশ একটু গর্ব্বও জন্মিত।

যাহা হউক এখন আর সরোজিনীর সে দিন নাই। এখন সরোজিনী ঘরে গৃহিণী, শিশু সন্তানের জননী, দাস দাসীগণের শাসনকারিণী; তাই এখন আর কবিতা বা কবি-হৃদয় লইয়া সরোজিনীর চলে না। এখন নিজের পুরাতন বালা দুগাছি নূতন করিয়া গড়ান চাই; খোকা খুকীর সাটীনের পোষাক চাই; লোক জনের কাছে লৌকিকতা ও প্রতিপত্তি চাই। যে সময়ে যা' শোভা পায়। চিরদিন ও সব ছেলেমী ভাল লাগিবে কেন?

সুতরাং স্বামীর "ছেলেমী" ঘুচাইতে সরোজিনী রাগ করিল, অশ্রু ফেলিল, কোনও দিন "প্রচণ্ড" মুখঝামটা সহ তীব্র বাক্য বাণ, সেই কবিতা-রোগগ্রস্ত, উপর ওয়ালার জ্বালায় ত্রস্ত, স্বামীটীর হৃদয়ে বিদ্ধ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু সে হৃদয় কিছুতেই আঘাত প্রাপ্ত হইল না! সে হৃদয় জড় কি পাষাণ তাহা জানি না, কিন্তু সরোজিনীর তীক্ষ্ণাস্ত্র সকল ভোঁতা হইবার উপক্রম হইল। অবশেষে সরোজিনী

"ব্রহ্মাস্ত্র-প্রয়োগ করিতে বাধ্য হইলেন— উপবাস করিলেন; তখন কবিতা-রোগী বিনয় বচনে বলিল "তোমার বালা ও ছোট খোকার পোষাক কি নয়া দিব, কিন্তু দিন কতক পরে। সেভিংস ব্যাঙ্কে যে টাকা রহিয়াছে, তাহা দিয়া শীঘ্র একখানি পুস্তক ছাপাইব। সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে যে সকল কবিতা লিখিয়াছি, সে সকল যতক্ষণ একখানি পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে না পারিব, ততক্ষণ আমার মনের তৃপ্তি নাই।—আগে বইখানি হউক, তার পরে তুমি যা চাও তাই দিব।"

রাগে সরোজিনীর মুখ লাল হইল। এ রকম কাণ্ডজ্ঞানশূন্য পুরুষের উপরে রাগ করিয়া উপবাস করা বিফল, তাই সরোজিনী উঠিয়া ভাত খাইল। সেই দিন হইতে সহধর্ম্মিণী সতীশের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিল না; কেবল মনে মনে ডাকিল "হে ঠাকুর! হে সিদ্ধেশ্বরি! তোমরা ওঁর এ রোগ দূর কর, আমি তোমাদের পূজা দিব।"

যথাসময়ে সতীশের কবিতা পুস্তক মুদ্রিত হইল। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া সতীশ অতি সুন্দর কাগজে, অতি সুন্দর অক্ষরে, তাঁহার প্রাণময়ী কবিতাগুলি প্রকাশ করিলেন। বাঁধানও খুব সুন্দর হইল। সতীশ কৃতকৃতার্থ হইলেন।

শ্রীনাথ বাবু নূতন সমালোচক। বাঙ্গালার অনেক বিখ্যাত সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রের প্রধান লেখক। গ্রন্থ সমালোচনায় তিনি কৃতী শুনিয়া সতীশ একখানি পুস্তক জামার পকেটে লইয়া তাঁহার বৈঠকখানায় উপস্থিত হইলেন।

দুই চারি কথার পরে, নূতন মক্কেল যেরূপ সঙ্কোচে উকীলের নিকটে কথা কহে, কন্যাদায়গ্রস্ত ব্যক্তি যেরূপ সঙ্কোচে পাশ করা ছেলের পিতার নিকটে কথা কহে, সেইরূপ সঙ্কোচে—সেইরূপ ইতস্ততঃ করিয়া সতীশ শ্রীনাথ বাবুকে, নিজের লিখিত পুস্তকখানির বিষয়ে প্রকৃত মতামত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করিলেন।

সতীশকে "কৃপাপ্রার্থী" জানিয়াই শ্রীনাথ বাবুর মুখে সহসা গাম্ভীর্য্য উদিত হইল। অনেকেরই এ রকম হইয়া থাকে। সতীশের প্রার্থনায় কোনও উত্তর না দিয়া, নিজে কি কি কাগজে লেখেন এবং সম্পাদকগণ তাঁহার লেখা পাইবার জন্য কিরূপ "লালায়িত" হন, কল্পনা দেবীর সহায়তার শ্রীনাথ বাবু সেই সকল পরিচয় দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সতীশ বেচারাকে অগত্যা সেই সকল কথা ধীর মনোযোগ সহ শুনিতে এবং বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করিতে হইল।

আরও খানিক ক্ষণ পরে, শ্রীনাথ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার গ্রন্থখানির নাম কি?" ধীরে ধীরে সতীশ উত্তর করিলেন "আজ্ঞে, এখানির নাম 'অশ্রুধারা।" পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে শ্রীনাথ বাবু বলিতে লাগিলেন, "অশ্রুধারা! নামটী আমি ভাল বিবেচনা করি না।

কথা কি জানেন, নামের ভিতরে মাধুর্য্য গুণের অপেক্ষা ওজো গুণই অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়। কৃতী লেখক সেই রূপই করেন।"

অতর্কিত ভাবে সতীশের এক দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়িল। সতীশ কি তবে অকৃতী লেখক?

ডিবা হইতে পান লইয়া চিবাইতে চিবাইতে শ্রীনাথ বাবু বলিলেন "আপনার গ্রন্থের একটু পড়ুন দেখি।" সতীশ পুস্তক হাতে করিয়া পড়িতে লাগিলেন; প্রথমে কবিতার নাম পড়িলেন "গঙ্গা স্তোত্র" তার পরে কবিতা পড়িলেন—

"নমো দেবি সুরধূনী, পতিতপাবনি!—"

একছত্র না ফুরাইতেই সমালোচক বাধা দিয়া "এযে ভট্টাচার্য্যদিগের পাঠ্য মন্ত্র—এরকম কবিতার এখন চলন নাই। আপনি আর একটী পড়ুন।"

আমরা সত্য কথা বলিব; সতীশ যদি দার্শনিক বা বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লিখিতেন, তাহা হইলে অন্ততঃ নিজ পক্ষ সমর্থনে দুইটী কথা বলিতে পারিতেন; কিন্তু দুর্ভাগ্য ক্রমে তিনি কবিতা লিখিয়াছেন। লোহার গায়ে অনেক আঘাত সহে, কিন্তু ফুলের গায়ে হাতের ভর সহেনা। যাহা হউক সতীশ, কম্পিত-হৃদয়ে কম্পিতকণ্ঠে, তাহার "বরষা" শিরস্ক কবিতা পড়িলেন—

"পরাণ কেমন করে!
আকাশে বরষা, ধরায় তমসা,
একেলা রয়েছি ঘরে!
মোহন ঠমকে, চপলা চমকে,
হেরিয়া নয়ন ঝরে!—"

শ্রীনাথ বাবু বাধা দিয়া বলিলেন "থা'ক্, আর আবশ্যক নাই। স্বভাব-কবিতায় যেরূপ উচুঁদরের ভাষা ও জীবন্ত ভাব থাকে, ইহাতে সে সব কিছুই নাই। আপনার কবিতা কৃত্রিমতা-দুষ্ট; আপনি কষ্ট কল্পনার কবি!"

ভেড়ার শৃঙ্গের আঘাতে হীরার ধার ভাঙ্গিল! বেচারা সতীশ, এতকালের পরে আজি সমালোচকের কাছে আখ্যা পাইল "কষ্ট কল্পনার কবি!" এতদিনের পরিশ্রম, এত দিনের আনন্দোচ্ছ্বাস, আজি সমালোচনার আগুণে পুড়িয়া ভস্ম হইল! সতীশ নীরব, নিস্পন্দ!

করুণ-হৃদয় শ্রীনাথ বাবু তখন অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া বলিতে লাগিলেন "আপনি দুঃখিত হবেন না; চেষ্টা করুন, কালে ভাল ফল হ'তে পারে। জানেন, সতীশ বাবু! আমার ভগিনী-পতি এক জন সুকবি—স্বভাব কবি; তিনি 'চিদানন্দ বিকাসিনী' নামে একখানি কাব্য লিখিয়াছেন, আমরা সকলে সেখানি 'বঙ্গভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য' বলিয়াছি। আপনাকে তা থেকে কয় ছত্র শুনাই।" অতি কষ্টে সতীশ ধৈর্য্য সংগ্রহ করিয়া বসিলেন; সমালোচক "চিদানন্দ বিকাসিনী" খুলিয়া পড়িতে লাগিলেন; কবিতার নাম পড়িলেন "বিদ্যুৎ।" তার পরে পড়িলেন—

"হে বিদ্যুৎ! হে বজ্রাগ্নি!
তব স্রোতে ভাসিছে গগণ,
আরো, প্লাবিত হতেছে সারা বিশ্ব;
কি প্রখর তেজস্বিনী,
কিবা বঙ্কিমহাসিনী,
কোথা মিলে হেন অপূর্ব্ব সুদৃশ্য!
সম্বর্ত্ত আবর্ত্ত পুষ্করাদি মহামেঘ যত,
সবে চায় লইতে আশ্রয়, তব পদাম্বুজে
অবিরত।"

সতীশ আর বসিলেন না। শ্রীনাথ বাবুকে পুস্তক দিলেন না। এক পলকের মধ্যে এক নির্জ্জনে উপস্থিত হইলেন। তার পরে সাশ্রুনেত্রে সেই কবিতা পুস্তকখানি বুকে চাপিয়া বলিলেন "কবিতে! তোমার জন্য আত্মীয় পরের অবাধ্য হইয়াছি, বিদ্বেষভাজন হইয়াছি, গালি খাইয়াছি, তোমার জন্য সবই সহিতে পারি, কিন্তু বজ্রদংষ্ট্রা কীটের মত নির্ম্মম সমালোচক যে তোমার সুকোমল প্রাণ চিবাইতে থাকিবে—আমার হৃৎপিণ্ড তাহার ভোঁতা অস্ত্র দিয়া হত্যা করিতে থাকিবে, তাহা আমি কখনই সহিতে পারিব না। পরের প্রীতিকামনায় অথবা নিজের যশো-বাসনায় আর তোমাকে বাহিরে পাঠাইব না—আমার হৃদয়ান্তঃপুর বাসিনী কবিতা দেবি! তুমি আমার হৃদয়ে থাকিলেই আমার সকল সুখ, আমার স্বর্গসুখ! তোমার জন্য খ্যাতি সম্মান ছাড়িয়াছি, ভার্য্যার প্রণয় ছাড়িয়াছি, এবারে চল, লোকালয় ছাড়িব; কেবল তোমাকেই ছাড়িব না!"

আর সতীশ চাকরি করিল না, বাড়ী আসিল না; কোথায় গেল সে সংবাদও পাওয়া গেল না! সরোজিনী পিতৃগৃহে বাস করিয়া সন্তান কয়টীকে মানুষ করিতে লাগিল; কিন্তু সে নিজে জীবন্মৃতা।

লেখিকা—
শ্রীমা—

বিবি ফসেট্

(৩৫২ সংখ্যা ২০পৃষ্ঠার পর)

বিবি ফসেটের কার্য্যপ্রণালী সমস্ত পরিপাটী ও সুনিয়মাধীন। গণিতশাস্ত্রে যেরূপ সমস্ত ঠিক্, কিছুই ভুল হইবার যো নাই, ইঁহার মানসিক প্রক্রিয়া সম্বন্ধে সেইরূপ বলা যাইতে পারে। আমরা অনেক বিষয় অনেক সময়ে সামান্য ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করিয়া উপেক্ষা করি; কিন্তু আমাদিগের সর্ব্বদা মনে রাখা উচিত যে সামান্য ও ক্ষুদ্র বিষয় হইতে অসামান্য ও মহৎ কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছে ও হইতেছে। মহত্ত্বের একটি প্রধান পরিচয় সামান্য বিষয় গুলিকে তুচ্ছজ্ঞান না করা। পরিচ্ছন্নতা, নিয়মপরতা ও সত্যপরায়ণতা—এই গুণত্রয় তাঁহাতে

অনুপ্রাণিত ছিল। মহৎ বিষয় সকলে এই গুণগুলি উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইত। তিনি অপক্ষপাতিনী ও ন্যায়পরায়ণা। জন ষ্টুয়ার্ট মিল সম্বন্ধে কথিত আছে যে অন্যায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করা যে কি, তাহা তিনি কখনও জানিতেন না। সেইরূপ নিয়মিত ও পরিমিতরূপে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিলে, আদৌ স্খলিতপদ হইতে হয় না। বিবি ফসেট, স্খলিতপদ হওয়া যে কি তাহা জানিতেন না। এগুণ অমূল্য। ইহা যাঁহার আছে, তিনি ধন্য। বিবি ফসেটকে এ গুণের জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমরা তাঁহাকে ধন্যবাদ না করিয়া কি থাকিতে পারি? কপটতা তাঁহার নিকট অমার্জ্জনীয় পাপ। মুখে এক কথা, অন্তরে আর এক ভাব, কার্য্যে অন্য প্রকার—এইরূপ ভণ্ডামি অবলম্বন করিয়া লোকের নিকট ভাল বলিয়া পরিচিত হইতে পার, কিন্তু আপনার অন্তরাত্মার নিকট পার না, সর্ব্বদর্শী পরমেশ্বরের নিকট পার না—বিবি ফসেটের নিকটও পার না, তাঁহার এতদূর সূক্ষ্মদর্শিতা ও অন্তর্দর্শিতা। কি অর্থ বিষয়ে, কি অন্য কোনও বিষয়ে কোনও মনুষ্যের আচরণে কপটতার বিন্দুমাত্র প্রমাণ পাইলে তাহার নিকট হইতে সুদূরে থাকিতে সচেষ্ট হইতেন। পতিত নর নারীদিগের জন্য তিনি মর্ম্মাহত হইতেন। যাহারা আত্মনির্ভর না করে, বা আপনার সহায় আপনি হইতে প্রস্তুত না হয়, তিনি তাহাদিগের সহায়তা করেন না। সুখ দুঃখে ইহাঁর সমভাব। ইহাঁর শান্ত মূর্ত্তি সর্ব্বদা অবিচলিত। যদি তুমি সন্তান সমভিব্যাহারে তাঁহাকে দেখ, যদি তুমি তাঁহাকে কোনও রূপ মানসিক বা শারীরিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত দেখ, যদি তুমি তাঁহাকে কোনও এক সুসম্পাদিত প্রশংসনীয় কার্য্য সম্বন্ধে কিছু বলিতে শুন, তাহা হইলে তুমি জানিতে পারিবে যে, সেই প্রশান্ত বাহ্যাবরণ ভেদ করিয়া কোমল রমণী-হৃদয় সুশোভিত ও আলোকিত হইতেছে।

ধন্যা রত্নপ্রসবিনী ধরণী, যেহেতু তুমি বিবি ফসেটের ন্যায় নারী গর্ভ্তে ধারণ করিয়াছ! ধন্য সেই জাতি, যে জাতিতে তাঁহার মত মহিলা থাকিয়া জাতীয় গৌরব বৃদ্ধি করিতেছে, ধন্য সেই পিতা মাতা, যাঁহাদিগের তাঁহার মত কন্যা আছে। ধন্য সেই স্বামী, যিনি তাঁহার মত বুদ্ধিমতী বিদ্যাবতী পুণ্যবতী ভার্য্যা পাইয়াছিলেন। ধন্য সেই পুত্র-কন্যা, যাঁহারা তাঁহার মত মাতা পাইয়াছেন। ধন্যা সেই কন্যারত্ন ফিলিপা ফসেট যাঁহার কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষার বীজ সেই বিদুষী মাতা বপন করেন, এবং এক্ষণে যাহার সৌরভ সমস্ত সভ্যজগতে বিস্তৃত হইতেছে। আমরা এস্থলে আপাততঃ ইহাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত সমাপ্ত করিলাম।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৪ সংখ্যা ৭৮ পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রী-রোগ।

যজ্ঞডুমুরের রস মধুর সহিত পান করিলে, প্রদর নষ্ট হয়।

শ্বেত আকন্দের শিকড়ের ছাল ২তোলা, গোল মরিচ অৰ্দ্ধ তোলা, জল দিয়া বাটিয়া পীড়িত স্ত্রীলোককে এক দিন খাওয়াইবে।

পথ্য টাটকা মৎস্যের ঝোল এবং কিঞ্চিৎ শীতল সামগ্রী খাইবে। এক দিনেই রক্ত প্রদর ভাল হয়।

অশোক ছাল ২ তোলা ও দুগ্ধ এক পোয়া, ১ সের জলে সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া সেবন করিলে অধিক রক্তস্রাব ও প্রদর রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

সোহাগার খৈ ১০ রতি ও দারুচিনি চূর্ণ ৫ রতি একত্র সেবন করিলে রজোরোধ নিবারণ হয়।

আম ও জাম ছালের ক্বাথ, খৈ চূর্ণ সহ সেবন করিলে গর্ভিণীর গৃহিণী রোগ নষ্ট হয়।

ঈষদুষ্ণ শির্কায় নেকড়া ভিজাইয়া ১০।১২ ঘণ্টা স্তনোপরি বাঁধিয়া রাখিলে এক দিনেই ঠুনকা আরোগ্য হয়।

পুষ্করিণীর বড় পানার শিকড় লইয়া প্রসূতির মাথার চুলে বাঁধিয়া দিলে, বিনা কষ্টে প্রসব হয়।

ওলটকম্বলের শিকড় দুই ইঞ্চি পরিমাণ, ৮।১০ টা গোল মরিচ সহ বাটিয়া ঋতু হওনের ২ দিন পূর্ব্বে এবং ঋতুকালীন ৩ দিবস ও পরে দুই দিবস খাইলে বাধক ব্যামোহ আরোগ্য হয়। এইরূপে ৫।৬ মাসের ঋতুকালে ব্যবহৃত হইলে জরায়ুর দোষ সংশোধিত হয়। এই সময়ে স্ত্রীর সাচারা সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া সর্ব্বথা শুদ্ধাচারে থাকা কর্ত্তব্য।

মেথি এক তোলা আট তোলা দুগ্ধের সহিত উত্তমরূপে পিশিয়া ২।৩ দিন প্রাতে সেবন করিলে,বাধক, বন্ধ্যা, মৃতবৎসা, অকালে প্রসব প্রভৃতি দোষ নষ্ট হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল কটিদেশে বাঁধিয়া রাখিলে গর্ভপাত হয় না।

স্তনের বোঁটায় ক্ষত হইলে, সোহাগার খৈ ও ঘৃত একত্র মাড়িয়া তথায় প্রয়োগ করিলে উপকার হয়।

চাটিম কলাগাছের পাতা যাহা একটুও ছেঁড়া নাই, সেই পাতার ডগার শিষ লইয়া কোমরে বাঁধিয়া দিলে সহজে প্রসব হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

স্রোতের ফুল।*

১

কমল-মুকুল ওই স্রোতে ভেসে যায়,
ধূলা-মাখা কালি-মাখা,
লাবণ্য পড়েছে ঢাকা,
চঞ্চল সমীর ভরে ছুটেছে কোথায়!
ও যে কলি এক বিন্দু,
সুমুখে অকূল সিন্ধু
হুঙ্কারে গরজে, ধরা গরাসিতে চায়!
হয়ে যাবে ছিন্ন ভিন্ন,
রবে নাক শেষ চিহ্ন,
ও তরুণ কচি প্রাণ মরিবে ব্যথায়!
হতভাগা শতদল!
কে তোরে ছিঁড়িল বল?
কেড়ে নিয়ে পরিমল, কে দলিল পায়?
সে পাষণ্ড নিরমম,
তার কি ছিল না যম,
দিল না পবিত্র ফুল দেবতা-পূজায়!
কমল-মুকুল তাই স্রোতে ভেসে যায়!

২

ভুলিয়া চলেছে ফুল ডুবিয়া মরিতে—
কোথা সে রূপের ছটা,
ভুবন-মোহন ঘটা!
"অপবিত্র পদ্মফুল," কে পারে সহিতে!
নিঠুর বাতাস হায়,
ডুবায়ে মারিতে যায়!
ও' দারুণ পরিণাম পায়নি দেখিতে!
বোঝেনি অবোধ হিয়া,
তাই আসিয়াছে নিয়া,
দেবভোগ্য সুধারাশি, পিশাচে পূজিতে!
সরবস্ব যায় ভাসি,
তবু তার মুখে হাসি!
জানে না যে রসাতলে চলেছে ডুবিতে!
জানে না সে "বিষ-পান, কেবলি মরিতে"!

৩

মহামূর্খ বায়ু! তোর নাহি কাণ্ডজ্ঞান,
কি করিলি মাথা খেয়ে,
অমল কমল মেয়ে,
ভাসালি পঙ্কিল স্রোতে নিঠুর পাষাণ!
ও'তো আপনার মনে,
ফুটেছিল পদ্মবনে,
ও'র কাণে কত পাখী শুনাইত গান;
তপন সোণার হাসি,
দিত ও'রে ভালবাসি,
কতই আদর ও'র কত ছিল মান;
মধুর মলয় বা'য়,
হাত বুলাইত গা'য়,
ভ্রমর করিত স্তুতি খুলিয়া পরাণ;
বড় সাধ ছিল মালি,
সাজায়ে পবিত্র ডালি,
দেবের চরণে ও'রে করিবে প্রদান!
জনম সফল হবে সর্ব্বোচ্চ সম্মান!

* একটী পতিতা অল্পবয়স্কা রমণী দর্শনে লিখিত।

তোর ও পাষাণ চিত,
হ'ল না কি বিচলিত,
ছিঁড়িতে সে পূত কলি, দিয়ে বজ্র টান?
কি করিলি নীচাশয়, নিরেট পাষাণ!

৪

যাস্'নে ভাসিয়া ফুল, আয় ফিরে আয়!
পূত "গঙ্গাজল" ঢালি,
ধোয়াইয়া দিব কালি,
জাগিবে পবিত্র রক্ত নীরক্ত হিয়ায়!
আয় রে! শুনাব নিতি,
"পতিত-পাবন" গীতি,
আবার শোভিবি বালা কমল-মালায়!—
—না গো না আমারি ভুল,
কি সুখে ফিরিবে ফুল,
আসি এ নিঠুর দেশে দাঁড়াবে কোথায়?
ওর তরে হেতা মেলা
ঘৃণা গালি অবহেলা,
কি সুখে ফিরিবে ফুল, কেবা ওরে চায়?
গাছের উপরে পাখী,
তারও অরুণ আঁখি,
উপহাসে ঢেউ সব দূরে স'রে যায়!
কণ্টকে আকীর্ণ কূল,
যা'ক্ ভেসে পোড়া ফুল,
ম'রে যা'ক্, ডুবে যা'ক্ জলধি-তলায়,
ফিরিলে দাঁড়াবে কোথা, কে উহারে চায়!

৫

কার বুকে রক্ত আছে, আয় চলি আয়!
এক বার বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়ে জলে পড়ি,
দেবতার ফুল কেন স্রোতে ভেসে যায়!
ধূলি মেখে কালি মেখে,
মাধুরী গিয়েছে ঢেকে,
দুরন্ত সমীর হায়! অতলে ডুবায়!
এই বেল চল! ফুলে—
ধরিয়া আনিগে' কূলে,
পূত মন্দাকিনী-জলে ধোয়াইয়া কায়;
সঞ্জীবনী মন্ত্র দিয়া,
দে'গো! ও'রে বাঁচাইয়া,
সুগন্ধি চন্দন মেখে দিব দেবতায়;
কেন গো! দেবের ফুল স্রোতে ভেসে যায়।

৬

আমাদের ভয়ে ফুল যদি ভেসে যায়,
যদি অনুতাপী পাপী প্রীতি নাহি পায়;
বৃথা গান ধর্ম্মগীতি,
বৃথা ভান 'বিশ্ব-প্রীতি'
আমাদের এ জীবন বৃথা এ ধরায়!
আয়! তোরা বাঁচি মরি,
ঝাঁপ দিয়া জলে পড়ি,
বাঁধিয়া আনিব ফুলে স্নেহ মমতায়;
পথ-হারা দিশাহারা,
হইয়া পড়েছে সারা,
একটু স্নেহের ছা'য় দাঁড়াইতে চায়;
হাসুক অবোধ ঢেউ,
তাবলে ভেবনা কেউ,
পাখীর গরম আঁখি কেইবা ডরায়?
শত দোষ অবহেলি,
ঘৃণা' রোষ দূরে ফেলি,
"পতিত-পাবন" বলি, আয় তোরা আয়!
ধরিয়া স্রোতের ফুল দিব দেবতায়।

কাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

স্বর্গীয় অম্বিকা দেব-জায়া।*

যে ধর্ম্মপ্রাণা পতিপ্রাণা স্নেহময়ী করুণাময়ী নারী-দেবীর বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলিবার ভার এই অভাজনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে, আমি নিজের সম্পূর্ণ অক্ষমতা সত্ত্বেও সেই পুণ্যবতীর অশেষ গুণরাশি দুই চারিটী কথায় বিবৃত করিতে প্রয়াসী হইয়াছি। বিধাতা যেন তাঁহাকে আদর্শ নারী করিবার জন্য সকল সুবিধাই করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গোপালনগর নিবাসী ৺ বৈদ্যনাথ ঘোষ ঋষিতুল্য মনুষ্য ছিলেন এবং তাঁহার জননীকে মূর্ত্তিমতী দয়া বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যদিও তিনি অল্প বয়সেই পিতৃমাতৃহীনা হয়েন, তথাপি তিনি যে তাঁহাদের সমস্ত সদ্‌গুণের উত্তরাধিকারিণী হইয়াছিলেন তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি নিজে সর্ব্বদাই বলিতেন আমার যে কিছু সৌভাগ্য ঘটিয়াছে, সমস্তই আমার পিতা মাতার পুণ্যে। ইহা কেবল তাঁহার মুখের কথা নহে; পিতৃদেবের স্মরণার্থে তিনি নিজ ব্যয়ে কোন্নগরে গঙ্গাতীরে একটি সুন্দর ঘাট নির্ম্মাণ করিয়া দেন, তাহা এখনও তাঁহার অসাধারণ পিতৃভক্তির পরিচয় দিতেছে। নবম বর্ষে তাঁহার বিবাহ হয়। যে মহাপুরুষকে তিনি পতিত্বে বরণ করেন, তাঁহার কথা আর কি বলিব? কোন্নগর গ্রামের সকল শ্রীবৃদ্ধির মূল কারণ এক মাত্র তিনি বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এরূপ পতিলাভ অতি অল্পসংখ্যক মহিলার ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। বিবাহের দুই এক বৎসর পরেই তিনি স্বামীগৃহে বাস করিতে যান। সেকালে বধূজনের জীবন নিতান্ত সুখাবহ ছিল না। যদিও তাঁহার শ্বশুর ৺ ব্রজকিশোর দেব সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, তৎকাল-প্রচলিত প্রথানুসারে তাঁহার দাস দাসী অধিক ছিল না এবং সংসারের পাকাদি সমস্ত কার্য্য পৌরাঙ্গনাদ্বারা নির্ব্বাহিত হইত। সুতরাং নববধূকেও পর্য্যায়ক্রমে সেই বৃহৎ পরিবারের উপযোগী অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিতে হইত। এ কার্য্য তাঁহার ন্যায় বালিকার পক্ষে কতদূর দুষ্কর ছিল তাহা ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে ভাতের হাঁড়ী নামাইবার সময় তাঁহাকে অপরের সাহায্য লইতে হইত। তাঁহার বিবাহের পূর্ব্বেই তাঁহার শ্বশ্রূঠাকুরাণীর কাল হয়, সুতরাং তাঁহাকে যত্ন করিবার লোক কেহই ছিল না, কিন্তু তিনি নিজগুণে তাঁহার শ্বশুর, ননন্দা ও যাতৃবৃন্দের বিশেষ স্নেহভাজন হইয়াছিলেন। বৃদ্ধ শ্বশুরের পরিচর্য্যায় তিনি সম্যক্ যত্নবতী ছিলেন এবং তাঁহার স্বামী কলেজ হইতে যে মাসিক বৃত্তি পাইতেন, তাহার কিয়দংশ যাহা তাঁহাকে প্রদত্ত হইত তিনি প্রায় তৎসমস্তই ননন্দা ও যাতৃদিগের তৃপ্তি-

* ইহাঁর শ্রাদ্ধবাসরে ইহাঁর এক কৃতবিদ্য দৌহিত্র কর্ত্তৃক পঠিত।

সাধনে ব্যয় করিতেন। শিশুকালেই তিনি অসাধারণ মেধাবিনী ছিলেন, কিন্তু তৎ-কালপ্রচলিত কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার পিতৃদেব তাঁহার শিক্ষাসম্বন্ধে কোনওরূপ চেষ্টা করেন নাই। সে অভাব তাঁহার স্বামীর যত্নে দূর হয়। কিন্তু এজন্য তাঁহাকে সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে হয় নাই। তাঁহার স্বামী পঠ-দ্দশায় কলিকাতা হইতে সপ্তাহান্তে বাটী যাইতেন। সেকালে স্ত্রীলোকদিগের দিবাভাগে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎকার হইত না। সুতরাং তাঁহাকে সমস্ত দিবস যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিয়া গৃহকার্য্য সমাপনপূর্ব্বক নিশীথে স্বামীর নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিতে হইত। এবিষয়ে অন্যের নিকট সহায়তা লাভ করা দূরে থাকুক, তিনি যে লেখাপড়া শিখিতেছেন ইহা অতি সতর্কতার সহিত গোপন করিতে হইত। তাঁহার নিজের মুখেই শুনিয়াছি যে রন্ধন করিতে করিতে তিনি অঙ্গারখণ্ড লইয়া ভূমিতলে বর্ণমালা লিখিতে অভ্যাস করিতেন। এইরূপ কষ্ট স্বীকার করিয়া তিনি অল্পকাল মধ্যে তৎকালপ্রচলিত অধিকাংশ বাঙ্গালা পুস্তক অধ্যয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। স্বামীর বিদেশে কর্ম্ম হওয়ায় তাঁহাকে প্রবাসে যাইতে হয়। এই সময়ে তিনি নানাবিধ উপাদেয় আহারীয় প্রস্তুত করিতে শিখেন ও বিশেষ যত্নে তাঁহার স্বামীর বন্ধুজনকে খাওয়াইতেন। লোককে খাওয়াইতে তিনি বিশেষ ভাল বাসিতেন, এই প্রবৃত্তি তাঁহার আমরণ বলবতী ছিল। তাঁহার গৃহিণীপনা অতি প্রশংসনীয়। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে কোনও দ্রব্যের অপ্রতুল ছিল না, অথচ কোনও রূপ অপব্যয় হইত না। তাঁহার যেরূপ পতিভক্তি, তেমনি সন্তানবাৎসল্য ছিল। তাঁহার অনেক-গুলি কন্যাসন্তান হয় ও একটি মাত্র পুত্রসন্তান জীবিত। কিন্তু ভুলেও কোনও সন্তানকে কখন প্রহার করেন নাই। দাসদাসীদিগকেও তিনি সন্তাননির্ব্বিশেষে প্রতিপালন করিতেন। গো-সেবায় তাঁহার আন্তরিক যত্ন ও অনুরাগ ছিল। তিনি গৃহ সংসারে কোনও রূপ অপরিচ্ছন্নতা দেখিতে পারিতেন না, তাঁহাকে কখনও মলিন কিম্বা ছিন্ন বস্ত্র পরিধান করিতে দেখি নাই। তিনি সকল প্রকার অপরাধ মার্জ্জনা করিতেন, কেবল মিথ্যাকে বড় ঘৃণা করিতেন। তাঁহার দয়ার ইয়ত্তা ছিল না। তাঁহার দানের কথা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। দরিদ্র প্রতিবেশী-দিগের দুঃখের কথা তিনি আগ্রহের সহিত শুনিতেন ও যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ মোচন করিতেন। এই উপচিকীর্ষা প্রবৃত্তি তাঁহার ক্রমেই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর অল্প দিন পূর্ব্বে তিনি শ্রদ্ধা-স্পদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়কে বলি-য়াছিলেন রাস্তার মুটিয়াকে ও আমার সন্তানদিগকে আমি সমান স্নেহের চক্ষে দেখিতে সমর্থা হইয়াছি। সেণ্টভিন্‌সেণ্ট হোমে গিয়া তথাকার দয়াবতী নন্‌-দিগের কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া তিনি

মুগ্ধ হইয়া ঐ আশ্রমের ও দাসাশ্রমের অর্থসাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার উইলের মর্ম্ম আমি অবগত নহি, কিন্তু আমার বিশ্বাস যে তাহাতে তাঁহার পরার্থপরতার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কোন্নগরের ব্রাহ্মসমাজে ও বালিকাবিদ্যালয়ে তিনি রীতিমত চাঁদা দিতেন ও নিজব্যয়ে উক্ত গ্রামে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন এবং যাহাতে এই চিকিৎসালয়ের কার্য্য সুচারুরূপে চলে, মৃত্যুশয্যায় পড়িয়াও তাহার বন্দোবস্ত করিবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রকৃতি অতি কোমল ও মধুর ছিল। রোগের যন্ত্রণায় তাহার কোনওরূপ বৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। তাঁহার পতিভক্তির কথা কি বলিব? ৬৫ বৎসর কাল একাদিক্রমে স্বামীর সহিত সুখে কাটাইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একদিনের জন্যেও উভয়ের মনান্তর হয় নাই। তিনি প্রকৃতপক্ষে স্বামীর সহধর্ম্মিণী ছিলেন। তাঁহারই অনুরোধে তাঁহার স্বামী সবল ও সুস্থশরীর থাকিতে থাকিতেই উচ্চ বেতনের লোভ পরিহার করিয়া রাজকীয় কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করেন ও দেশের বিবিধ হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন। এই সকল অনুষ্ঠানে তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। তিনি প্রথমে লোক প্রচলিত হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবতী ছিলেন, পরে স্বামীর উপদেশে সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিতা হন ও প্রত্যহ ঐকান্তিক শ্রদ্ধার সহিত ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মধর্ম্মের উদার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার হৃদয়ে কোনও রূপ সঙ্কীর্ণতা বা সাম্প্রদায়িকতা ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর তাঁহার ধর্ম্মভাব আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তিনি অহরহ কেবল ভগবানের নাম জপ করিতেন ও বলিতেন যে অন্য কর্ম্মে ব্যাপৃতা হইলে আমার মনে হয় আমার সময় নষ্ট হইতেছে। মৃত্যুশয্যায় শয়ানা হইয়াও তিনি রোগের যন্ত্রণাকে উপেক্ষা করিয়া সানন্দে ব্রহ্মনাম গান ও উপাসনা করিতেন। বস্তুতঃ মৃত্যুশয্যায় তিনি আমাদিগকে ভগবদ্ভক্তির যে পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন, তাহা আমরা জীবনে ভুলিতে পারিব না। মৃত্যুর সপ্তাহ পূর্ব্বে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন যে আমি যে কি আনন্দ বোধ করিতেছি তাহা তুমি বুঝিতে পারিবে। এখানে এই টুকু বলা আবশ্যক যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার স্ত্রীবিয়োগ হয়। পুণ্যবতী তাঁহার প্রাণবল্লভকে আনন্দধামে পাইয়া বিরহ যন্ত্রণা ভুলিয়াছেন। তাঁহার পবিত্র স্মৃতি যেন আমাদের জীবনপথের চিরসহায় হয়।

বুঝিতে পারে এবং যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, তাহাকে সার্প অর্থাৎ সর্পসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

আহারকামমতিদুঃখশীলাচারমসূয়কমসংবিভাগিনমতিলোলুপমকর্ম্মশীলম্প্রৈতং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার আহারে সর্ব্বদা অত্যন্ত অভিলাষ, আচার ও উপচার দুঃখজনক, যে অসূয়াপরতন্ত্র, অসংবিভাগী (কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিধায়ক বুদ্ধিশূন্য) লোভী এবং অকর্ম্মণ্য, তাহাকে পৈপ্রত অর্থাৎ প্রেতসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অনুষক্তকামমজস্রমাহারবিহারপরং অনবস্থিতমমর্ষিণমসঞ্চয়ং শাকুনং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যাহার মনে সর্ব্বদা কামনা বিদ্যমান থাকে, আর যে সর্ব্বদা আহার ও বিহারাসক্ত, অনবস্থিত, অমর্ষণশীল এবং অসঞ্চয়ী, তাহাকে শাকুন অর্থাৎ শকুনসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

সেইরূপ মোহাংশ বলিয়া তামসসত্ত্ব ত্রিবিধভেদে বিভক্ত, যথা—

নিরাকরিষ্ণুমধমবেশমজুগুপ্সিতারং আহারবিহারমৈথুনপরং স্বপ্নশীলং পাশবং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে কেবল সর্ব্বদা নিরাকরণ করিয়া থাকে, যাহার নীচবেশ, যে নিয়ত নিন্দনীয় আহার, বিহার ও মৈথুনাসক্ত এবং নিদ্রাপরতন্ত্র, তাহাকে পাশব অর্থাৎ পশুসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ভীরুমবুধমাহারলুব্ধমনবস্থিতমনুষক্তকামক্রোধং সরণশীলন্তোয়কামং মাৎস্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে ভীরু, মূর্খ, আহারলোভী, অনবস্থিত এবং সর্ব্বদা কাম ও ক্রোধের দ্বারা অভিভূত, গমনশীল ও সর্ব্বদা জলকামী, তাহাকে মাৎস্য অর্থাৎ মৎস্যসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

অলসং কেবলমভিনিবিষ্টমাহারে সর্ব্ববুদ্ধ্যঙ্গহীনং বানস্পত্যং বিদ্যাৎ।

অর্থাৎ যে অত্যন্ত অলস, যাহার কেবল আহার ও বিহারবিষয়ে সর্ব্বদা অভিনিবেশ এবং আর আর বিষয়ে বুদ্ধিহীন, তাহাকে বানস্পত্য অর্থাৎ বনস্পতিসত্ত্ব বলিয়া জানিবে।

ইত্যপরিসংখ্যেয়ভেদানাং খলু ত্রয়াণামপি সত্ত্বানাং ভেদৈকদেশো ব্যাখ্যাতঃ।

অর্থাৎ তিনপ্রকার সত্ত্বের অপরিসংখ্যেয় ভেদ হইলেও আমরা কিন্তু সেই সত্ত্বের ভেদবিষয়ে একদেশ মাত্র ব্যাখ্যা করিলাম।*

কতকগুলি সুমাতা।

মানব প্রকৃতির একটি বিশেষ গুণ এই যে যাহাকে ভাল বাসা যায় সে উপস্থিত অনুপস্থিতে, বর্ত্তমান অবর্ত্তমানে সর্ব্বদাই তাহার চিন্তা মনে উদিত হয়। সে কোন্ দিন কোন্ কথাটি বলিয়াছে, কোন্ দিন কোন্ গল্পটী করিয়াছে মনে পড়ে। লক্ষ্য করিয়া দেখিলে শিশু-

* চিকিৎসা সম্মিলনী হইতে গৃহীত। বা, বো,স।

জীবনেও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে না। ক্ষুদ্র-শিশু তার মাতা পিতাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বাসে। পিতা কি মাতার অনুপস্থিতিতে শিশুর মুখে প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় "ভাই মা অমুক কথা বলিয়াছেন," "না ভাই! বাবা ও কাজ করিতে নিষেধ করিয়াছেন" সমবয়স্কদিগের সহিত ক্রীড়া কালে শিশুগণ প্রায়ই এই কথা বলে। পিতা অপেক্ষা আবার মাতার উপরেই শিশুজীবন অধিক নির্ভর করে। মাতার নিকটেই শিশু অবিকক্ষণ থাকে, সুতরাং মাতাকেই সে সমধিক অনুকরণ করে এবং জননীর নিকটেই অধিক আবদার করে ও তাঁহাকেই অধিক ভালবাসে। সন্তানের শরীর রক্ষার জন্য জননী যেরূপ দায়ী, সন্তানের মনোবৃত্তি বিকাশের জন্য সুমাতার ততোধিক যত্ন করা কর্ত্তব্য। জননী শৈশবকালে সস্নেহ চুম্বনের সহিত সুকুমার শিশুকে যে শিক্ষা দেন, বা গল্পচ্ছলে যে উপদেশটী বলিয়া থাকেন, শিশুর চির দিন তাহা মনে থাকে। জননী যদি সুশিক্ষিতা উচ্চহৃদয়া বুদ্ধিমতী হয়েন, তাহাহইলে "বাবা পাপা" বলিবার সময়েই শিশুকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন। সে যাহাহউক শিশু শিক্ষা কি? উহা কত গুরুতর বিষয়? কি করিলে সুমাতা হওয়া যায়? তাহা বামাবোধিনীতে পুনঃপুনঃ আলোচিত হইয়াছে ও হইতেছে। পৌরাণিক সময় হইতে আধুনিক উনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্ত মাতৃগুণে কত জন ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বুদ্ধিমান্, বীর্য্যবান্ বীর জন্ম গ্রহণ করিয়া পৃথিবীকে পবিত্র ও মানব সমাজের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহাই আমরা ক্রমশঃ আলোচনা করিব।

১। সুনীতি। ত্রেতাযুগে উত্তানপাদ রাজমহিষী ধ্রুবের মাতা সুনীতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই ধ্রুবকে তিনি হরিভক্তিই উত্তম জ্ঞান, সংসারে হরি- চরণই জীবের একমাত্র মুক্তির উপায়, একমাত্র হরিই মানবকে দুঃখ বিপদ ও অপমান হইতে উদ্ধার করিতে পারেন, যে তাঁর উপর ভারার্পণ করে তিনি তাহাকে কখনই নিরাশ করেন না ইত্যাদি শিক্ষা ধ্রুবের হৃদয়ে বদ্ধমূল করিয়া দিয়াছিলেন। যে দিন উত্তানপাদ নৃপবর ধ্রুবকে অপমানিত করিয়া সিংহাসনারোহণ করিতে দিলেন না, দুঃখিত ও অপমানিত ধ্রুব রোদন করিতে করিতে নিজ মাতা সুনীতির নিকট গমন করিলেন। রোদনপরায়ণা ধ্রুবের সহিত সেই রাত্রি সুনীতির কথোপকথন দৃষ্টান্ত স্বরূপ উল্লেখ করা যাইতে পারে।

ধূলা-ধূসরিত ও ব্যথিতচিত্ত ধ্রুব রোদন করিতে করিতে মাতৃ-কুটীরে সমাগত হইয়া রাজার দুর্ব্যবহারের বিষয় বলিলেন। সুমাতা সুনীতি কিছুমাত্র অধৈর্য্য না হইয়া সস্নেহ চুম্বনপূর্ব্বক ধ্রুবকে ক্রোড়ে লইয়া আঁচল দিয়া ধূলা মুছাইয়া দিলেন ও কহিলেন "বৎস! ভবিতব্য খণ্ডন করিবার দেবতারও সাধ্য

নাই, তুমি কোন্ ছার ক্ষুদ্র মানব মাত্র। ঈশ্বর জীবের কর্ম্ম দেখিয়া ফল দেন, আমি মন্দভাগিনী পূর্ব্ব জন্মে অনেক অপকর্ম্ম করিয়াছি তাই এজন্মে ভগবান্ প্রায়শ্চিত্ত করাইতেছেন। হতভাগিনীর সম্পূর্ণ প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ভগবান তোমাকেও কষ্ট দিতেছেন। মানবের নিকট ইহার প্রতীকার হইবেনা। দয়াময় হরিই এ বিপদুদ্ধার করিতে পারেন। তুমি একান্ত ভাবে তাঁহারই শরণাপন্ন হও। অনন্ত দয়াময়, অনাথনাথ পদ্ম-পলাশলোচন নিশ্চয়ই দয়া করিবেন। বৎস! পূর্ব্বকালে জটীল নামে এক অনাথ ব্রাহ্মণ কুমার ছিলেন। লোকালয় হইতে কিছুদূরে একটী অরণ্যে তাঁহারা বাস করিতেন। অল্প বয়সে তাপসকুমারের পিতৃবিয়োগ হইয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহাকে একাকী শিক্ষার্থ পাঠশালায় আসিতে হইত। পঞ্চম বৎসরের শিশু জটীল অরণ্য মধ্য দিয়া একাকী আসিতে ভয় পাইত। তাই জটীলমাতা বলিয়া দিয়াছিলেন "জটীল বনে যখন ভয় পাইবে তখন "দীনবন্ধু রক্ষা কর" বলিয়া ডাকিও, তাহা হইলে তিনি ভয় দূর করিবেন"। বালক জটীল মাতৃশিক্ষামত "দীনবন্ধু আমাকে রক্ষা কর, গভীর অরণ্য পার করিয়া দাও" বলিয়া সরল বিশ্বাসের সহিত ডাকিলেই ভক্তবৎসল দীনবন্ধু প্রকাশিত হইয়া তাহাকে অরণ্য হইতে গ্রামে ও আসিবার সময় গ্রাম হইতে কুটীরে পৌছাইয়া আসিতেন। বালক জটীল দীনবন্ধুর শিক্ষামত কাহাকেও ওকথা বলেন নাই। কিন্তু সে নির্ভয় নিশ্চিন্ত, তার এখন ভয় নাই, ভগবানকে পাইয়া সে দিব্য চক্ষু পাইয়াছে। এইরূপে এক বৎসর পরে জটীলের শিক্ষকের পিতৃশ্রাদ্ধ উপস্থিত। শিক্ষক শ্রাদ্ধাদি করিলে প্রত্যেক ছাত্র ফলাহারের উপকরণ দ্রব্যের এক একটীর ভার লইলে ব্রাহ্মণ ফলাহার করাইবেন ঠিক্ হইল। তদনুসারে দরিদ্র বালক জটীলের উপর দধি যোগাইবার আদেশ হইল। জটীল জানিত গৃহে মাতা শূন্যহস্ত, গাভীও নাই যে দধি প্রস্তুত করিবেন। মাতাকে দধি চাহিলে স্বামীকে স্মরণ পূর্ব্বক রোদন করিবেন মাত্র। এই সকল চিন্তা করিয়া সুবোধ বালক জটীল দীনবন্ধুর নিকট দধি চাহিলেন। দীনবন্ধু একটী ক্ষুদ্র ভাণ্ডে দধি দিয়া বলিলেন "এই দধি অনুপম সুমধুর, এক অঙ্গুলী পরিমাণ দধি লইয়া প্রত্যেকের পাত্রে দিবে, পরিপূর্ণ হইবে। এদিকে ফলাহার আরম্ভ হইলেই জটীলের উপর দধি আনিবার আদেশ হইল। ভাণ্ড হস্তে জটীল দধি পরিবেশনে উদ্যত দেখিয়া সহপাঠীরা অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া হাসিলেন এবং শিক্ষক মহাশয় ক্রুদ্ধ হইয়া একটী বেত্রদ্বারা জটীলকে প্রহার করিয়া বলিলেন "অবোধ! যদি দধি দিতে না পারিবি পূর্ব্বে বলিলি না কেন? এই ভাণ্ডের দধিতে কি কখন এত লোকের ভোজন করান হয়? যা দূর হ,

হতভাগ্য আজ আমাকে যথেষ্ট লজ্জায় ফেলিল।” বালক জটীল বলিলি “আমি দধি বণ্টন করিতেছি, ভয় নাই আপনাকে লজ্জা পাইতে হইবে না।” এই বলিয়া যথাযোগ্যরূপে ঋষিকুমার জটীল দধি বণ্টন করিয়া পরিপূর্ণ দধি-ভাণ্ড শিক্ষকের হস্তে দিলেন। ব্রাহ্মণ-গণ পুনঃ পুনঃ দধির প্রশংসা করিলেন। পরিপূর্ণ দধিভাণ্ড দেখিয়া ব্রাহ্মণশিক্ষক আশ্চর্য্য হইয়া জটীলকে ‘দধি কোথায় পাইলে?’ জিজ্ঞাসা করিলেন। বালক সরল ভাবে সমস্ত বলিল। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ শুনিয়া জটীলকে সহস্র আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন তাত! তোমাকে শতশত ধন্যবাদ, ঈশ্বরকে তুমি প্রত্যহ দর্শন কর, তোমার ভাগ্যের সীমা নাই। তোমার মত ছাত্র পাইয়া আমিও ধন্য হইলাম। বৎস! তোমার দীনবন্ধুকে একবার দেখাইতে হইবে। সরল বালক জটীল গুরুর কাকুতি মিনতি শুনিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া দীনবন্ধুকে দেখাইলেন। বৃদ্ধ তাপস দেখিলেন অন্যায়রূপে জটীলকে তিনি যে বেত্রাঘাত করিয়াছেন সেই চিহ্ন ভক্তবৎসল হরি নিজ পৃষ্ঠে গ্রহণ করিয়াছেন। পরে দয়াময় হরির কৃপায় তাঁহার দিব্যচক্ষু হইল। শিষ্যের সাহায্যে তাঁহার ভব-বন্ধন মোচন হইল। তজ্জন্যই বলি-তেছি বৎস ধ্রুব! হরি ভজনে দেশ কাল সময় অসময় নাই। ভবার্ণব পার হইবার ও কষ্ট দুঃখ দূর করিবার একমাত্র মহৌষধি হরিনাম চিন্তা। তুমি কায়মনে তাঁর শরণ লও, সরলভাবে আপনার প্রাণের ব্যথা তাঁকে জানাও, তিনি নিশ্চয়ই তোমাকে অভীষ্ট বর প্রদান করিবেন। বৎস! সংসারের লোককে দুঃখ কষ্ট জানাইলে কেহ বিদ্রূপ করে, কেহ বা ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যুত্তর দেয়, এক মাত্র শান্তিদাতা হরি বিনা কেহই শান্তি দিতে পারে না। সুমাতা সুনীতির সান্ত্বনাবাক্যে দগ্ধপ্রাণ ধ্রুব উৎসাহিতচিত্তে হরিসাধনার জন্য মাতৃচরণে প্রণাম করিয়া বনমধ্যে প্রস্থান করিলেন। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটী এক বৎসরের জন্য কলিকাতা মূক-বধির বিদ্যালয়ে মাসিক ১০০৲ টাকা করিয়া সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। বিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক শিক্ষার্থ শীঘ্র বিলাত যাইবেন।

২। কোরিয়া লইয়া জাপান ও চীনে যুদ্ধ বাধিয়াছে। জাপানই যুদ্ধ বাধা-ইবার মূল।

৩। ইউরোপের রাজ্ঞীদিগের মধ্যে ডেনমার্কের রাজকুমারী এবং পর্তুগালের রাণীই সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবনী।

৪। পাতিয়ালার মহারাজের পাট-রাণী একজন শ্বেতাঙ্গিনী, ইহা সকলেই জানেন। সে দিন ভাওয়ালপুরের নবাবও

দেখা দেখি এক ইংরাজ রমণীর পাণি-গ্রহণ করিয়াছেন।

৫। মহারাণী যখন সিংহাসনে অধিরোহণ করেন, তখন ইংরাজদিগের মধ্যে শতকরা ৪১ জনেরও অধিক নিজের নামটি পর্য্যন্ত লিখিতে জানিত না, এক্ষণে নাম দস্তখত করিতে পারে না এমত লোকের সংখ্যা শতকরা ৭ জনের অধিক হইবে না।

৬। গত ২৫শে জুন নর্দ্দম্‌টন নগরে ভারতবন্ধু মৃত মহাত্মা ব্রাডল সাহেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। এই উপলক্ষে সেখানে ২০ হাজার লোকের সমাগম হইয়াছিল। প্রতিমূর্ত্তি এমন ভাবে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে ব্রাডল যেন মহাসভায় দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছেন। ইংলণ্ডের জন সাধারণের ও ভারতবাসীর তিনি যে অকৃত্রিম বন্ধু ছিলেন, প্রতিমূর্ত্তির নিম্নে সে কথা অঙ্কিত হইয়াছে।

৭। কুলু অঞ্চলে পাহাড় ধ্বংস হওয়ায় সম্প্রতি ৯ জন লোক, ৭ টা ঘোড়া এবং প্রায় ২৫০০ ভেড়া চাপা পড়িয়া মরিয়াছে।

৮। চীনের কোন কোন সম্প্রদায় স্বজাতীয় রমণীদিগকে নিরামিষ আহার করিতে উপদেশ দেয়। তাহারা বলে নিরামিষ খাইলে আর তোমার রমণী হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইবে না।

৯। সাক্‌সনীর রাজ্ঞী তিন জন ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন, তাঁহারা কেবল দরিদ্র রোগীর ঔষধাদি ব্যবস্থা করেন।

১০। একজন ফরাসী ডাক্তার একজন স্ত্রীলোকের লুপ্ত ওষ্ঠের স্থানে একটি নূতন ওষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রীলোকটির হাতের চামড়া কাটিয়া লইয়া ঐ ওষ্ঠ নির্ম্মিত হয়।

১১। বরদার গুইকুমারের জনৈক সহচর মিষ্টার আব্বাস তয়াবাজীর পত্নী সার উইলিয়ম ওয়েডরবরণ ও দাদাভাই নৌরজীর সহিত মহাসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। মুসলমান রমণীদিগের মধ্যে তিনিই এই সর্ব্ব প্রথম মহাসভা দর্শন করিলেন।

১২। মাননীয় ডবলিউ, সি, বনার্জ্জির কন্যা মিস্ এস্, এ, বনার্জ্জি বিলাত হইতে "রেঙ্গলার" হইয়া এদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

বামাগণের রচনা।

শোক সঙ্গীত

পরাণে সহেনা
লেখনী সরেনা
কোথায় যতীন্দ্র মম অমূল রতন !
বুক ফেটে যায়
হায়, হায়, হায় !

অভাগী দিদির তুই কাঙ্গালের ধন ;
কি দোষ পাইয়া
গেলিরে ছাড়িয়া
যেন রে অপরিচিত পান্থের মতন,

জননী-জীবন,
বুক-চিরা-ধন!
তোরে বিসর্জ্জিয়া ধিক্, রয়েছে জীবন।

২

সে চারু আনন
কমল লোচন
সুবর্ণ সুবর্ণ, নবনীতোপম দেহ,
বাসনা আমার
আর এক বার
দেখি যদি দয়া করে দেখায় রে কেহ।
বড়ই দুর্জ্জন
কৃতান্ত শমন
জানিরে হৃদয় তার কাঠিন্যের গেহ,
তবু ধরি পায়
কাল মহাশয়!
প্রাণের যতীনে মোর ফিরাইয়া দেহ।

৩

প্রাণের যতীন।
আজ কত দিন
হেরি নাই বাপ তোর চারু চন্দ্রানন।
ও বচন সুধা
হরিত রে ক্ষুধা
'মাসীমা' বলিয়া ডাক জুড়াক জীবন।
ঈশ্বর-কৃপায়
এ শূন্য হৃদয়,
পুত্র-স্নেহ সরোবর তোদের কারণ।
ভরা পরিমল
স্বর্ণ শতদল
ফুটেছিল চারি ভাই হৃদয়-নন্দন,
পাষাণ হৃদয়
যম নিরদয়
নির্ম্মম হইয়া তোরে করিল হরণ।

৪

বড় সাধ মনে
শ্মশান শয়নে
তোদের সমুখে আমি ত্যজিব জীবন,
বৃথা হ'ল সাধ
একি পরমাদ!
আমার সম্মুখে তোর অন্তিম শয়ন!

বড় সুখ-আশে
পরিণয় পাশে
বাঁধি তোরে মাতা তব আনন্দে মগন,
(সেই) বন্ধন ছিঁড়িয়া
গেলে পলাইয়া
সে চারু লতিকা হ'ল ভূতলে পতন!
সেই কচি মেয়ে
পর মুখ চেয়ে
বহিয়া বৈধব্য জ্বালা কাটাবে জীবন,
আহা! চারুবালা
নিতান্ত সরলা
বুঝেনা সে সংসারের কুটিল ঘটন;
বুঝেনি সে হায়!
ভ্রাতৃজায়া পায়
কিরূপে করিতে হয় মস্তক লুণ্ঠন,
যাতৃ-গণ পাশে
অনুগ্রহ আশে
কি ক'রে করিতে হবে মানস রঞ্জন;
হায়! অভাগিনী
আজত বুঝেনি
কি অমূল কণ্ঠহার হরিল শমন!

জগতের সার
স্বামী কণ্ঠহার
হারায়েছ বৎসে! তুমি বুঝিবে যখন,
পূর্ব্বেই তাহার
যেন রে তোমার
* * *
পাষাণে বেঁধেছি বুক তবুও এখন
বলিতে সে কথা
কেন লাগে ব্যথা?
পতিহীনা নারীর ত মঙ্গল মরণ।
তুইরে সরলা বালা
বুকে পোষি শত জ্বালা
কেমনে কাটাবি কাল? তাই তোর তরে
অভাগী মাসীমা মৃত্যু আশীর্ব্বাদ করে।

শ্রীকুমুদিনী রায়

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে ১৮৯৩-৯৪ অব্দের পারিতোষিক দান কালে ১টি ৮০ টাকা ও আর একটি ৪০৲ টাকা করিয়া দুইটি পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে। "মনুষ্য ও পশুর প্রতি দয়া" বা "শিশুদিগের নীতিশিক্ষা" এই দুইটি বিষয়ের অন্যতরটি অবলম্বন করিয়া প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

পারিতোষিক দানের নিয়ম—

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিক-প্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৪ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্টবুক কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিক রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনায় গুণানুসারে তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

এ, ক্রফ্‌ট,

বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

কলিকাতা ১১ জুলাই ১৮৯৪।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৬ সংখ্যা	ভাদ্র ১৩০১—সেপ্টেম্বর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

বামাবোধিনীর একত্রিংশ জন্মোৎসব।

মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরের কৃপায় বামাবোধিনী ৩১ বৎসর পূর্ণ করিয়া ৩২ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই বর্ষ বৃদ্ধির জন্য আমরা সেই দেব-দেবের চরণে সর্ব্বান্তঃকরণে প্রণত হই। তিনি তাঁহার এই ক্ষুদ্র সেবিকার মস্তকে শুভাশীষ বর্ষণ করুন—ইহার সকল আপদের শান্তি হউক এবং তাঁহার সেবায় বয়োবৃদ্ধির সহিত ইহার অনুরাগ ও শক্তি বর্দ্ধিত হউক। বামাবোধিনীর গ্রাহক গ্রাহিকা পাঠক পাঠিকা এবং সহানুভূতিকারী ও হিতৈষী সকল শ্রেণীর ভাই ভগিনী-দিগকেও আজি সাদরে ও কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অভিবাদন করিতেছি, তাঁহারা এই পত্রিকাকে প্রসন্নচক্ষে দর্শন করিয়া ইহার শুভোন্নতির সহায়তা করুন্।

দুর্ভাগ্য বঙ্গদেশে দুর্ভাগিনী রমণী-দিগের হিতসাধন উদ্দেশ্য করিয়া এই ক্ষুদ্র পত্রিকা যে শতাব্দীর প্রায় তৃতীয়াংশ কাল জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইল, ইহা সামান্য সৌভাগ্য ও আনন্দের কথা নহে। বামাবোধিনীর এই দীর্ঘ জীবন নারীজাতির প্রতি দেশস্থ সাধা-রণের স্নেহের নিদর্শন। বামাবোধিনীর জন্ম সময়ে এদেশের রমণীগণের যে অবস্থা ছিল, আজি তাহার কত শুভকর পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে হৃদয় আনন্দে পরিপ্লুত হয়। যে স্ত্রীলোক-গণের বিদ্যাশিক্ষা হওয়া উচিত কি না, এই তর্ক লইয়া আমরা পত্রিকার অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, আজি সেই স্ত্রীলোকগণ সুশিক্ষিতা ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উপাধিতে ভূষিতা! তাঁহাদিগের মধ্যে কত শিক্ষয়িত্রী, কত কবি, কত গ্রন্থকর্ত্রী,

কত চিকিৎসাপারদর্শিনী ও কত নরসেবাব্রতে দীক্ষিতা রমণীর অভ্যুদয় হইতেছে! বঙ্গনারীগণ আর এখন মৃৎপিণ্ডরূপে হেয় নহেন এবং দাসীর ন্যায় পুরুষের কৃপাপাত্রী নহেন। নারীর মর্য্যাদা ও সম্মাননা জনসমাজে সমধিক বর্দ্ধিত হইয়াছে এবং পুরুষের সহিত জ্ঞান, ধর্ম্ম, ভোগ ও মোক্ষে তাঁহার সমান অধিকার ক্রমশঃ তাহা স্বীকৃত হইতেছে। স্ত্রীজাতির অশেষ দুঃখ ও দুর্গতির কারণ বাল্য বিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথা সকল কেমন ক্রমে ক্রমে নিঃশব্দে তিরোহিত হইতেছে! আমরা আশা করিতেছি স্ত্রীজাতির জ্ঞান, ধর্ম্ম ও কৃতিত্ব যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবে, সেই পরিমাণে তাঁহারা উচ্চহইতে উচ্চতর অধিকার লাভ করিবেন এবং সমাজের উৎকৃষ্টতর অর্দ্ধাঙ্গরূপে পরিগণিত ও পূজিত হইবেন।

গত ৩১ বর্ষের মধ্যে বেগবান্ পরিবর্ত্তনের স্রোতে পড়িয়া স্ত্রীজাতির সকল বিষয়ে কেবলই উন্নতি হইয়াছে, কোনও বিষয়ে অবনতি হয় নাই, একথা আমরা বলি না। মানব সংসারে অবিমিশ্র সুখ সৌভাগ্য কোথায় আছে? বিশেষতঃ পরিবর্ত্তনের যুগে তাহার আশা করা দুরাশা মাত্র। বঙ্গনারীদিগের, আংশিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আংশিক অবনতি লক্ষিত হইতেছে। প্রাচীনাদিগের ধর্ম্মনিষ্ঠা, বিনয় ও লজ্জাশীলতা, সরলতা ও স্বার্থত্যাগ, ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও কর্ম্মঠতা এবং সর্ব্বোপরি গুরুভক্তি ও পরিজনের সেবায় আত্মবিসর্জন এ সকল গুণের কতক অপচয় দৃষ্ট হয়। কিন্তু আমরা আশা করি এ ক্ষতি সাময়িক মাত্র এবং সুবুদ্ধি নব্যাগণ আংশিক উন্নতিতে কখনও সন্তুষ্টা হইয়া থাকিবেন না। তাঁহারা জ্ঞানের আলোকে আপনাদের অবস্থা প্রকৃতরূপে বুঝিতে পারিবেন এবং আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনে সমর্থা হইবেন। ভগ্ন প্রাচীন ঘর ভাঙ্গিতেছে, কিন্তু তাহার উপর যে গৃহ নির্ম্মিত হইবে, বিধাতার কৃপায় তাহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

দান—(১) সিন্ধু দেশের মুসলমানদিগের উচ্চশিক্ষার সাহায্যার্থ খয়েরপুর ষ্টেটের মীরফয়েজ মহম্মদ খাঁ ৩০, ত্রিশ হাজার টাকা দিয়াছেন। এই টাকা হইতে ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা হইবে।

(২) কয়লার খনির দুঃস্থ লোকদিগের সাহায্যার্থ অধ্যাপক টিণ্ডালের পত্নী ৫০ এবং স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী ৫০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় হাজার টাকা করিয়া দান করিয়াছেন।

জলে ডোবার আশ্চর্য্য চিকিৎসা—সঞ্জীবনী লিখিয়াছেন জলে ডুবিয়া সংজ্ঞাহীন হইলে রোগীর জিব টানিয়া বাহির করিলেই আরোগ্য হয়, সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার লেবোর্ড এই নূতন প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। হাতে পরিষ্কার নেকড়া জড়াইয়া জিব টানিয়া বাহির করিলে উদরস্থ জল সমুদয় বাহির হইয়া যাইবে এবং রোগী ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া আরোগ্য লাভ করিবে।

কালা ও বোবার মহাসভা—গত ২৫ এ জুলাই ইংলণ্ডে কালা ও বোবা ধর্ম্মপ্রচারকদিগের এক বিরাট সভা হইয়াছিল এবং আমেরিকা ও ইউরোপের নানা স্থান হইতে প্রতিনিধিগণ আসিয়া তাহাতে উপস্থিত হন। ইঁহারা ৩ দিন নীরবে কেবল অঙ্গুলি সঙ্কেত দ্বারা কথোপকথন করিয়া স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিয়াছেন।

ভারত গবর্ণমেণ্টের ঋণ—এই ঋণের পরিমাণ প্রায় ১০৫॥ কোটী টাকা, ইহার জন্য রাজকোষ হইতে প্রভূত সুদ দিতে হয়। গবর্ণমেণ্ট সুদের হার কমাইবার ব্যবস্থা করিয়া সুবুদ্ধির কার্য্য করিয়াছেন। কিন্তু যে সকল স্থায়ী দাতব্য ফণ্ড এই সুদে চলিতেছে, তাহার আয় কমিয়া অনুষ্ঠাতাদিগের অভীষ্ট কার্য্যের ব্যাঘাত না হয়, সে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য।

বিবী বেসাণ্টের পুনরাগমন—বিবী বেসাণ্ট অষ্ট্রেলিয়া দর্শন করিয়া আগামী নবেম্বর মাসে পুনরায় ভারতে পদার্পণ করিবেন।

রাণী হাটাসুর সিংহাসন—রাণী হাটাসু খৃষ্টের জন্মের ২৬০০ এবং মুসার জন্মের ২৯ বৎসর পূর্ব্বে মিসরে রাজত্ব করেন। তাহার সিংহাসনের পদগুলি স্বর্ণমণ্ডিত এবং পৃষ্ঠদেশ রৌপ্যখচিত। ইহা অত্যন্ত জীর্ণ হইলেও ব্রিটিষ মিউসিয়মে সম্প্রতি সমাদরে স্থাপিত হইয়াছে।

নব-রাজ কুমার—ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রপৌত্র ও ভারতের ভাবী সম্রাট ইতিমধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত লোকের দর্শন ও দর্শনী লাভ করিতেছেন। মহারাণী স্বয়ং তাঁহাকে ক্রোড়ে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক শুভাশীষ দান করিয়া কত সুখ অনুভব করিয়াছেন, তাহার সুখে আমরা সুখী। রাজপুরী আনন্দপূর্ণ, দলে দলে সম্ভ্রান্ত ও পদস্থ লোকেরা আসিয়া ধাত্রী ক্রোড়স্থ রাজশিশু দর্শনে আনন্দ প্রকাশ করিয়া যাইতেছে। চিরঞ্জীব রাজপুত্রঃ।

মহতের মৃত্যুৎসব—মৃত ফরাসী প্রেসিডেণ্ট কার্ণোর সমাধিযাত্রা দর্শনে কিরূপ লোক সমাগম হইয়াছিল, ইহাতেই বুঝাযায়—এক ব্যক্তি ২৫ হাজার টাকা দিয়া রাস্তার ধারে ৭টী জানালা ভাড়া লইয়াছিল, তথায় দর্শকদিগের দেখিবার সুবিধা হইবে বলিয়া। সে ব্যক্তি অন্ততঃ দ্বিগুণ টাকা লাভ করিয়াছে।

বৃহৎ পরিবার—ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লান্সডাউনের শাশুড়ী ঠাকুরাণীর ৮২

জন্মোৎসব হইয়াছে। ইহাঁর পুত্র পৌত্রাদির সংখ্যা ১০১ জন।

বাঙ্গালী বীর—বাবু সুরেশচন্দ্র বিশ্বাস কলিকাতার ইটালিনিবাসী। তিনি স্পেন হইতে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া ব্রেজিলের স্বাধীনতা সাধনের সহায়তা করিতে যান। তথায় এক সেনাধ্যক্ষের পদাভিষিক্ত হইয়া বিশেষ বীরত্বের পরিচয় দেন। ইনি জীবিত আছেন এবং আরও গৌরবের কার্য্য করিয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে পারিবেন। আমরা জগদীশ্বরের নিকট ইহাঁর দীর্ঘ জীবনের প্রার্থনা করি।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

"যদ্‌গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমো গুরুঃ॥"

ভগবদ্ভক্তি ও ভগবদুপাসনায় মানব মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, এ কথা অনেকে জানেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু ভগবানের প্রতিকৃতিরূপা, সন্তানের সাক্ষাতে সাক্ষাৎ ঈশ্বরী মাতৃদেবীর প্রতি ভক্তি ও উপাসনায় সন্তান যে মোক্ষলাভের অধিকারী হয়, সে কথা বোধ হয় আজিকার দিনে অনেকেই বুঝিতে পারেন না।—তাহা পারিলে, মাতৃভক্তির খনি, আর্য্যভূমি ভারতবর্ষ আজি ভক্তিহীন সন্তানদিগের জন্য মরুভূমিপ্রায় হইত না! তাহা হইলে মাতৃভক্তি অবহেলা করিয়া ভ্রান্ত মানব মনুষ্যত্বের উচ্চ সীমায় উঠিতে চাহিত না! তাহা হইতে ভারতলক্ষ্মীও ভারতকে অভিশাপ দিয়া অতল জলে ডুবিতেন না! যে দেশে সন্তানের হৃদয়ে মাতৃভক্তি আছে, সে দেশে স্বর্গের চিত্র আছে।—যে মানব প্রকৃত মুক্তির আকাঙ্ক্ষী, সে আগে মাতৃভক্ত হউক; সে যাহা চাহে তাহাই পাইবে।

মা সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা। মর জগতে যে সকল মহত্ত্ব—যে সকল দেবত্ব দুষ্প্রাপ্য, বহু সাধনা-ফলে কোনও মানব যাহাতে ক্বচিৎ সিদ্ধি লাভ করিয়া "নরদেবতা" আখ্যা পাইয়া থাকে, সেই অপার্থিব মহত্ত্ব, সেই অলৌকিক দেবত্ব, সংসারে মাতৃহৃদয়ে ও মাতৃচরিত্রে মিলে মানবশিশু যে রকম জড় ও চেতনের মধ্যবর্ত্তী হইয়া জগতে আইসে, তাহাতে মাতার ন্যায় অটল স্নেহময়ী, মাতার ন্যায় সহিষ্ণু, মাতার ন্যায় আত্মবিস্মৃতা ও আত্মত্যাগিনী দেবীকে জনয়িত্রী রূপে না পাইলে সে অসহায়ের জীবনধারণ বা মনুষ্যত্বলাভ অসম্ভব হইয়া উঠে। এই অনর্থ নিবারণের জন্য ভগবতী বিশ্বজননী নিজের আদর্শে মাতৃ-হৃদয় গঠন করেন। তাই

মাতৃমূর্ত্তি অভয়া, অপরাজিতা ও সর্ব্বংসহা মূর্ত্তি! এ জগতে এমন ক্লেশকর, এমন আয়াসসাধ্য কি কাজ আছে যে সন্তানের দুঃখ দূর করিবার জন্য, সন্তানের মঙ্গল-সাধনের জন্য মা তাহা করিতে বিমুখী হইয়াছেন? চন্দ্র সূর্য্য নিবিয়া যাইতে পারে, গ্রহ উপগ্রহ খসিয়া পড়িতে পারে, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণশক্তিও বিলুপ্ত হইতে পারে—কারণ এসকল বিপ্লবে বিশ্বসৃষ্টি রক্ষা করিতে সৃষ্টিকর্ত্তা স্বতন্ত্র উপায় বিধান করিবেন, কিন্তু ভগবানের প্রেমশক্তিরূপিণী জননীদেবী কোনও দিন সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গলানুষ্ঠানে বিরতা হইতে পারিবেন না—তাহা পারিলে বিশ্ব জগৎ ধ্বংস হইবে, সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভগবান্ সে দিন "নিরুপায়" হইবেন!

এ জগতে ভ্রাতা ভগিনী, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা প্রভৃতি সকলেই মানবের বিশেষ আত্মীয়, সকলেই স্নেহ, প্রীতি ও ভক্তি দিয়া থাকেন; কিন্তু মায়ের মত আপনা ভুলিয়া ভালবাসা ঢালিতে, মায়ের মত মর্ত্ত্যলোকের অতীত স্নেহ বিলাইতে, মায়ের মত ভাল বাসিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত সন্তানের উদর পূর্ণ হইলে নিজে শত উপবাসেও তৃপ্তা থাকিতে, মায়ের মত সন্তানের সুখে নিজের সকল দুঃখ উপেক্ষা করিতে, মায়ের মত সন্তানের উন্নতিতে নিজের সকল অভাব ভুলিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের মত বিপদ-মগ্ন সন্তানের উদ্ধার-কামনায়, বুক চিরিয়া রক্তধারায় দেব-পূজা করিতে, রোগকাতর প্রাণের সন্তানকে যমগ্রাস হইতে কাড়িয়া আনিতে, জগতে আর কাহার সাধ্য আছে? মায়ের স্থান অধিকার করিতে পারে, এমন কে কোথায় আছে?—জগতে এমনও দেখা যায়, সন্তানের গুরুতর দোষে পিতা তাহার উপরে বীত-স্নেহ হইয়াছেন; এমনও দেখা যায় সংসার-চক্র-নিপীড়িত ভ্রাতা ভগিনী-দিগের ভ্রাতৃপ্রেম বা ভগ্নী-স্নেহ-বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছে; এমনও দেখা যায় যে স্বার্থপরতাতেই হউক বা আর যাহাতেই হউক, স্বামী স্ত্রীর হৃদয় বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, এমনও দেখা যায় প্রাপ্ত বয়সে পুত্র কন্যা, ধন মান, বিদ্যা বুদ্ধি, সুখ সম্পদের মোহে পড়িয়া জীবনের দেবতা মাতা পিতাকে বিস্মৃতি-স্রোতে ভাসাইয়া দিয়াছে! কিন্তু মানবের এমন কোনও অবস্থা নাই, মানব-জগতে এমন কোনও অপরাধ নাই যে তাহা দ্বারা মাতৃ-স্নেহ পরাস্ত হইতে পারে—বা মাতৃ-হৃদয় বিচলিত হইতে পারে! আর্য্যদিগের জাতীয় ইতিহাস অথবা মহাকাব্য মহাভারত গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ধর্ম্মপ্রাণা গান্ধারীদেবী অধার্ম্মিক পুত্রকে "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ" আশী-র্ব্বাদ করিয়া বিপক্ষের জয় কামনা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধাবসানে

পুত্রগণ নিহত হইয়াছে দেখিয়া সেই গান্ধারীদেবীই বালিকার মত আকুল প্রাণে কাঁদিয়াছিলেন! "নরাধম সন্তান" বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না! আমাদের দেশে জনৈক কৃতঘ্ন সন্তান মাতার সহিত নিতান্ত পাশবাচরণ করিত, অধিক কি মা যাহাতে "জব্দ" হন, আনন্দের সহিত সেইরূপ কাজ করিত; কিন্তু সহসা সে দারুণ রোগে পড়িলে, মাতাই প্রাণপণে তাহার শুশ্রূষা করিয়াছেন এবং জগদীশ্বরের চরণে আকুল প্রাণে প্রার্থনা করিয়াছেন,—"ঠাকুর! আমার বাছা রাগের মাথায় আমার উপর অন্যায় ব্যবহার করিয়াছে, তুমি সেজন্য অপরাধ লইও না, আমার বাছাকে আরোগ্য কর।" এখানে কুসন্তান বলিয়াও মাতৃ-স্নেহ বাধা মানিল না।—মানিবে কেন? মাতৃ-স্নেহ অপরাজিত, মাতৃ-স্নেহ স্বর্গীয় পদার্থ! সূর্য্যের আলোক প্রতিভাত হইয়া চন্দ্রকে যেরূপ জ্যোতিষ্মান্ করে, বিশ্বজননীর প্রেমালোক প্রতিভাত হইয়া মাতৃহৃদয়কেও সেইরূপ প্রেমময় করে। তাই মাতৃহৃদয়ের উপমান পদার্থ জগতে মিলে না! ভগবতী বিশ্বজননীতেই উহার পূর্ণসত্তা বিদ্যমান। জ্ঞান ও কর্ম্মের সমবায়ে যেমন মনুষ্যত্বের পূর্ণতা, ভগবৎশক্তির নিম্ন স্তরে মাতৃ-শক্তি থাকাতে মানব-জগৎ প্রাণিজগতেরও সেইরূপ পূর্ণতা। মাতৃ-শক্তি জীবরক্ষার প্রধান সহায়; তাই ভগবানের ইচ্ছাক্রমে মাতৃহৃদয় দেবত্বে পূর্ণ। (ক্রমশঃ)

পুণ্য কীর্ত্তি।

একবার শিবপুর কোম্পানীর বাগানে কয়েকজন ইংরাজ পুরুষ রমণী ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহারা নানা স্থান দর্শন করিয়া এক লতামণ্ডপে বসিয়া বিশ্রাম করিতেছিলেন। হঠাৎ জঙ্গল হইতে একটা বিষধর সর্প ছুটিয়া আসিয়া একজন সাহেবের পা জড়াইয়া দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিল। নিকটস্থ কোনও রমণী ইহা দর্শন করিয়া তৎক্ষণাৎ সজোরে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সর্পের মস্তক দৃঢ়ভাবে ধরিয়া টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সাহেব আশু মৃত্যু গ্রাস হইতে রক্ষা পাইলেন। সংবাদ পত্রে এই ইংরাজ মহিলার পুণ্যকাহিনী পাঠ করিয়া মনে মনে কত ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলাম এবং এই কথাও মনে উদয় হইয়াছিল যে, এই ইংরাজ রমণী যেরূপ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, সাহস ও দয়াবৃত্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, এ দেশে এরূপ সাধু দৃষ্টান্ত অসম্ভব।

এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার যথেষ্ট কারণও আছে। একবার হরি-

দ্বারের মেলায় একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক গঙ্গাতে স্নান করিতে গিয়া অকস্মাৎ জলস্রোতে ভাসিয়া যায়। গঙ্গার উভয় তীর পরিপূর্ণ করিয়া লক্ষ লক্ষ হিন্দু সন্তান দণ্ডায়মান। যাঁহারা ধর্ম্মকে একমাত্র সার করিয়াছেন—এমন কি ধর্ম্মসাধনের অন্তরায় বলিয়া সংসার একবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন, ধর্ম্মের চিহ্নে যাঁহাদের সর্ব্বাঙ্গ সুশোভিত—সেইরূপ যোগী সন্ন্যাসী সাধু ভক্তগণই তীরভূমিতে শোভা বিস্তার করিতেছিলেন; কিন্তু সেই অসহায়া জলস্রোতে ভাসমানা হতভাগিনীকে উদ্ধার করিবার জন্য একটী হস্তও প্রসারিত হইল না। সেই সময় সেস্থানে সাহরণপুরের মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপস্থিত ছিলেন। তিনি বৃদ্ধাকে নক্ষত্র বেগে ভাসিয়া যাইতে দেখিয়া জলে ঝম্প প্রদান করিলেন এবং অনেক কষ্টে ভাঁটিতে বহু দূর গিয়া তাহাকে তীরে উঠাইলেন। লক্ষ লক্ষ স্বদেশীয় লোকের দ্বারা যে কার্য্য সম্পাদিত হইল না, একমাত্র সাহেবের দ্বারা তাহা হইল। এরূপ ঘটনা নিয়তই আমরা দেখিতে পাই। সেই জন্যই এদেশীয়দিগের সম্বন্ধে বিশেষ প্রত্যাশার চিহ্ন দেখা যায় না। কিন্তু শ্রীমতী কুমুদিনী ঘোষ সম্প্রতি যে সাধু দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সাধু কার্য্যের আদর্শস্থল শ্বেতদ্বীপ বাসিগণেরও অনুকরণীয়।

কুমারী কুমুদিনী ঘোষ ব্রাহ্ম বালিকা শিক্ষালয়ের শিক্ষয়িত্রী। তিনি যখন নলহাটীতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় একদিন একটী বালককে সঙ্গে করিয়া সুদূরে মাঠে ভ্রমণ করিতে যান। হঠাৎ একটা গোক্ষুর সর্প আসিয়া বালকের পদে দংশন করিল। কুমুদিনী তৎক্ষণাৎ স্বীয় বস্ত্রাঞ্চল ছিন্ন করিয়া ক্ষত স্থানের উর্দ্ধে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিলেন এবং ক্ষত স্থানে মুখ দিয়া বিষ চুষিয়া ফেলিলেন। তৎপরে অবশাঙ্গ বালককে পৃষ্ঠে বহন করিয়া প্রায় এক মাইল দূরে বাসায় প্রত্যাগমন করিলেন। বিষ চুষিয়া ফেলিয়া দেওয়ায় বালকের জীবন রক্ষা হইয়াছে।

সকলেই জানেন সর্পবিষ রক্তের সহিত মিশ্রিত না হইলে প্রাণনাশক হয় না। এমন কি যদি গলনালীতে ক্ষত না থাকে, তবে সর্পবিষ উদরস্থ করিলেও কোনও ক্ষতি হয় না। কিন্তু দাঁতের গোড়াতে যদি ঈষৎ ঘা থাকে এবং তাহাতে একটু বিষ লাগে, তবে আর নাই। এজন্য মুখে বিষ চুষিয়া ফেলা নিজের প্রাণহানিজনক কার্য্য। সুতরাং কুমারী কুমুদিনীর কার্য্যে একদিকে যেমন অসামান্য সংসাহস ও উপস্থিত বুদ্ধি প্রকাশ পাইয়াছে, অপর দিকে নিজের প্রাণ হানি করিয়া অপরের জীবনরক্ষা রূপ অতুলনীয় ধর্ম্ম ভাবের চিহ্নও লক্ষিত হইয়াছে। বাঙ্গালী দ্বারা এরূপ আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন হওয়ার কথা ইতিপূর্ব্বে আর শ্রুতিগোচর হয় নাই। শ্রীমতী কুমুদিনী এই অসামান্য কার্য্য সম্পাদন করিয়া বঙ্গরমণীগণের মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ।)

ভাদ্র।

যদিও চাস আবাদে সম্বন্ধে কৃষকের বার মাসই কাজ আছে; কিন্তু বর্ষের মধ্যে দুইবার ঐ কার্য্য বাহুল্য রূপে করিতে হয়। একবার মাঘমাসে, ও এক বার ভাদ্র মাসে। যে সকল ভূমিতে গ্রীষ্ম কালে ফসল হয়, মাঘমাসে সেই সকল ভূমিতে চাস আরম্ভ করিতে হয়; এবং যে সকল ভূমিতে শীতকালের শস্য জন্মে, ভাদ্র মাসে তাহাদের চাস আরম্ভ করিতে হয়। যে সকল ভূমিতে আশ্বিন ও কার্ত্তিক মাসে বপন বা রোপণ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল তে সার দিতে হয়। জন্তুসার ও জল সকল ফসলেই ব্যবহার করা যাইতে পারে। ভাদ্র মাসে নিরন্তর বৃষ্টি হয়। ঐ সময়ে রেড়ির তৈল, পচা গোবর বা অন্যবিধ সার যাহা সংগ্রহ করা সুবিধা হয়, জমিতে দিয়া লাঙ্গল দ্বারা মাটী উলট পালট করিতে হয়। বৃষ্টির জলে ঐ সকল সার মাটীর সহিত মিলিত ও গলিত হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরতা শক্তি প্রদান করে।

নারিকেল,—নারিকেল কেমন ফসল, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সেই নারিকেলের চারা এই মাসে প্রস্তুত করিতে হয়। অতএব যাঁহাদের নারিকেলের চারা তৈয়ার করিবার প্রয়োজন আছে, তাঁহারা এখন হইতে তৎবিষয়ে প্রস্তুত হউন। ভাদ্র মাসের জল না পাইলে সম্পূর্ণ পরিপক্ক হয় না। ঐরূপ পরিপক্ক নারিকেল গাছে থাকিলে, তাহা শুষ্ক হইয়া সময়ে সময়ে আপনিই বৃক্ষ হইতে পতিত হয়। তাহাকে 'গলন নারিকেল" কহে। চারা করিবার জন্য এই গলন নারিকেল সংগ্রহ করিতে হয়। যে স্থানে রৌদ্র লাগে না, সর্ব্বদা ছায়া থাকে, তাদৃশ স্থানে কাদা করিয়া গলন নারিকেল সকল বোঁটার দিক্ উপরে রাখিয়া ঈষৎ হেলাইয়া স্বার্দ্ধপ্রোথিত বা আধ-পোতা করিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে সেই ভূমিতে ও নারিকেলের গায় জল দিতে হয়। কিছু দিন পরে বোঁটার এক পাশ দিয়া নারিকেলের চারার অঙ্কুর বাহির হয়। কিন্তু প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে খড়ের গোছাদ্বারা জলের ছিটা দিতে হইবে।

কপী—কপী একপ্রকার উৎকৃষ্ট শাক, শীত কালে জন্মিয়া থাকে, সকলেই ব্যবহার করেন। উহা ত্রিবিধ—বাঁধা, ফুল ও ওলকোপি। এই মাসে উহাদের চারা প্রস্তুত করিতে হয়। সসার মৃত্তিকার টব্ পূর্ণ করিয়া তাহাতে ঐ তিন প্রকার কপির বীজ বপন

করিতে হয়। ঐ সকল টব্ দিনমানে ঘরের মধ্যে এবং রাত্রিকালে বাহিরে রাখিতে হয়। উহাতে কোন মতে বৃষ্টিবারি না লাগিতে পারে, এরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক। যে ভূমিতে এই সকল কপির চারা রোপণ করিতে হয়, তাহা দুই প্রকারে প্রস্তুত হইতে পারে। একপ্রকার এই, মাঘ মাসে শুষ্ক পুষ্করিণী, বিল, বা খালের তলভাগে যে মৃত্তিকা বা পলি পড়ে, তাহা তুলিয়া কপির জমিতে দিয়া আশ্বিন মাস পর্য্যন্ত তাহাতে পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয় এবং ঐ জমি এরূপ পরিষ্কার রাখিতে হয়, যেন তাহাতে একটা তৃণও না জন্মে। যিনি কপির চাস আবাদ করিবেন, তিনি যদি মাঘ মাসে ঐরূপে জমি তৈয়ার করিয়া না রাখিয়া থাকেন, তাঁহাকে এই ভাদ্র মাসে রেড়ির খৈল দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হইবে। আশ্বিন, বা কার্ত্তিক মাসে ঐ জমিতে কপির চারা রোপণ করিবার পূর্ব্বে চারা সকলকে আর একটী স্বতন্ত্র স্থানে কিছু দিনের জন্য রোপণ করিতে হইবে। পরে ঐ স্থান হইতে তুলিয়া পূর্ব্বোক্ত প্রস্তুতীকৃত ভূমিতে শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপণ করিতে হইবে। কপি চাসের অন্যান্য কথা আমরা যথাকালে বলিব।

লাউ,—লাউবীজ ৩।৪ দিন হুঁকার জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরে শিথিল মৃত্তিকায় রোপণ করিবে। লাউবীজের আবরণ অতিশয় কঠিন, এজন্য একবারে মাটীতে পুঁতিলে উহার অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। হুঁকার জলে ঐ আবরণ কিয়ৎ পরিমাণে ছিন্ন হইয়া যায়, তাহাতে শীঘ্র অঙ্কুর হয়। যে স্থানে লাউবীজ রোপণ করা যায়, তথাকার মৃত্তিকা সর্ব্বদা সরস রাখিতে হইবে। যদি লাউগাছ উঠিবার জন্য মাচা বাঁধা না যায়, তাহা হইলে উহার লতা যতদূর লতাইয়া যাইবে, ততদূর পর্য্যন্ত জমী শল ও পরিষ্কার রাখিবে। লাউ গাছের গোড়ায় মাচধোয়া জল দিবে এবং উহা শুষ্ক হইলেই পুনঃ পুনঃ খুঁড়িয়া দিবে। খনা বলিয়াছেন,—

"উঠান ভরা লাউ শশা।
খনা বলে লক্ষ্মীর বাসা॥
লাউ গাছে মাছের জল।
ধোনো মাটীতে বাড়ে ঝাল।

কার্ত্তিকে আবাদ,—আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে যে জমিতে আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ করিতে হইবে, এই মাসে সেই সকল ভূমিতে সার দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা চাস দিতে হয়। উপরি উক্ত ফসল সকলের রোপণের পূর্ব্বে ঐ সকল জমিতে ঘাস ও আগাছা না হয়, তৎপক্ষে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। ঘাস বা অন্য কোন আগাছা জন্মিতে দিলেই ভূমি তেজোহীন হইয়া যায়।

হলুদ ও আদা,—হলুদ ও আদার ভূমিতে শ্রাবণ মাসে দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। যদি অতি বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে শ্রাবণ মাসে ঐ দুইটী ফসলের

দাঁড়া বাঁধা না হইয়া থাকে, তবে এই মাসে বাঁধিয়া দিবে। হলুদ ও আদা পুঁতিবার সময় সারিবন্দী করিয়া পুঁতিবার উপদেশ আমরা পূর্ব্বেই দিয়াছি। ঐ শ্রেণীর উভয় পার্শ্ব হইতে কোদাইল দ্বারা মাটী উল্টাইয়া চারার গোড়ায় মাটী উচ্চ করিয়া দেওয়ার নাম "দাঁড়া বাঁধা।"

ওল,—ওল অতি উত্তম তরকারী। শুদ্ধ সুখাদ্য নহে, ধাতু বিশেষে বিশেষ উপকারী। যাঁহাদের অর্শ রোগ আছে, ওল তাঁহাদের পরম ঔষধ। কাঁচা ওল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আকারে কাটিয়া প্রত্যহ ২।৪ খানি খাইয়া ও নিয়মিতরূপে উহার তরকারী খাইয়া অনেকে অর্শ রোগের যাতনা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন, এরূপ শুনা যায়। ঐ ওল এই মাস হইতে খাইতে হয়। শ্রাবণেও উহা খাওয়া যায়; কিন্তু ভাদ্রীয় জল না পাইলে ওল সুস্বাদ হয় না এবং মুখ ধরে। যে স্থান হইতে ওল তোলা যায়, সেই গর্ত্তে ওলের সিকড় গুলি ও ছোট ছোট মুখী গুলি রাখিয়া এরূপে মাটী চাপা দিতে হয়, যেন তাহাতে জল প্রবেশ করিতে না পারে। ঐ শিকড় ও মুখী হইতে আগামী ভাদ্রে একটা বড় ওল জন্মিবে। মুখী পুঁতিবার সময় একটু গোবর দিলেও ওল বড় হয়।

বিরহিণী প্রকৃতি।

কাহাকে পাইবে ব'লে,
আশা পথ চেয়ে চেয়ে;
বিষাদে প্রকৃতি বালা,
রহিয়াছে দাঁড়াইয়ে;
তবু দেখা পাইল না তার। ১

বিরহ নিদাঘ তাপ,
মরমের প্রতি স্তরে
পশিয়ে দহিল অই—
সুকোমলা প্রকৃতিরে,
সহেনা অবলা প্রাণে আর ॥২

দিগন্ত নয়ন তার,
জলদ নয়নাসারে—
পূরিল হেরিল বিশ্ব
বেরিল, ঘোর আঁধারে—
বিরহের বিষাদ ছায়ায়। ৩

আর না পারিল বালা
চাপিয়া রাখিতে হিয়া,
শোকের অনন্তোচ্ছ্বাস—
উঠিতেছে উথলিয়া,
ছিন্ন ভিন্ন করিয়ে হৃদয়। ৪

প্রাবৃট-জলদ-নীর
প্রকৃতির আঁখি ধারা;
ঝরিতেছে, পড়িতেছে,
ভাসিতেছে চারু ধরা,
ভাসিছে আপনি সেই ধারে। ৫

বিষাদ-কাতর-কণ্ঠে
ডাকিতেছে ঘন ঘন ;
কাঁপে না পাইয়ে সাড়া
বিজলী-চমক হেন ;
সে কোথা ? প্রকৃতি খোঁজে যারে?৬

শোক-বিষাদিত কণ্ঠে
ডাকিতে ডাকিতে তার—
ফুরাইল, শুকাইল—
জলদ নয়নাসার।
তবু দহে বিরহ-জ্বালায়। ৭

আশ্বাসিতে কেউ বুঝি
বিরহ-বিধুর প্রাণে,
জ্বালিয়ে কনক বাতী
শারদ নৈশ গগনে ;
সম্বোধিয়ে কহিল বালায়। ৮

হে বালে ? আকুল প্রাণে—
দিগন্ত নয়ন মুছি,
কি ভাব ? বিকাশ আঁখি,
প্রিয় নিরখিবে যদি ;
প্রিয় দেখা পাইবে অচিরে। ৯

আশার আশ্বাস বাণী,
মরমে পশিল গিয়ে ;
সুচারু নয়ন মেলি
প্রকৃতি দেখিল চেয়ে,
মৃদু হাসি হাসিয়া অন্তরে। ১০

শারদ নৈশ গগনে
ইন্দু আসি প্রকৃতিরে
সাজাইল চারু স্বচ্ছ
বিচিত্র চারু অম্বরে,
উল্লাসে সাজিল সেই বালা। ১১

মনে আশা. প্রিয়তম
দেখা দিবে এইবার
কিন্তু কই ? কই সেই
হৃদয়-রতন তার ?
যার লাগি সহিছে এ জ্বালা ? ১২

না পাইয়ে তার দেখা
সে সাজ ফেলিল খুলে ;
ঘেরিল প্রকৃতি অঙ্গ,
বিষাদ কুয়াশা জালে।
পুনঃ সব ঘেরিল আঁধারে। ১৩

দিগন্ত নয়ন হ'তে
শিশির নয়ন-জল
টুপ্ টাপ্ পড়িতেছে—
ঝরিতেছে অবিরল,
বিরহ ছাড়ে না তবু তারে। ১৪

এ বিষাদ ছবি তার
জগজনে দেখাইতে
প্রকৃতি পাইবে লাজ.
তাই কি ভাবিয়ে চিতে
ব্যাকুলিত সহৃদয় রবি। ১৫

সুদীর্ঘ যামিনী কোলে
লুকাবারে প্রকৃতিরে,
উদিয়ে উদয়াচলে,
পশি দ্রুত অম্বু নীরে—
লুকাইছে আপনার ছবি। ১৬

যামিনী আপন কোলে
বিষাদিনী প্রকৃতিরে
যতনে ঢাকিয়ে রাখি
প্রবোধে কত কি ক'রে,
স্বপনেতে সে জনে দেখায়। ১৭

কিন্তু কই প্রকৃতির—
সে জন? যে জন তরে
দারুণ বিরহ শিখা
দহিছে হৃদয় স্তরে।
সেকি দেখা দিবে না তাহায়?১৮

প্রকৃতি-বালার হৃদে
নাই আর সে শকতি
প্রিয় অদর্শন ব্যথা
নিবে যে হৃদয় পাতি,
সহিবে যে সে দারুণ জ্বালা। ১৯

কোমলা অবলা প্রাণে—
এত কি সহিতে পারে,
যায় বুঝি যায় প্রাণ—
প্রকৃতির দেহ ছেড়ে
সঘনে কাঁপিছে তাই বালা।২০

প্রকৃতি! প্রকৃতি সতি!
প্রকৃতি গো! বল মোরে—
কে তব প্রাণের জন?
কোথা সে বসতি করে?
খুঁজে যদি দেখা পাই তার। ২১

সুধাইব তার ঠাঁই
প্রকৃতি তোমার তরে
মরিল, মরিল প্রাণে
দেখা কি দিবে না তারে?
সে কি দেখা পাবে না তোমার?২

কোকিল কাকুলি কণ্ঠে
মধুর মধুর তানে
কি যেন কহিল কথা
অভাগীর কাণে কাণে,
চাহিল প্রকৃতি সেই দিকে। ২৩

বিষাদিনী প্রকৃতির
আজিকে সহসা কেন
বিমল হাসির ছটা
বদনে নেহারি হেন?
আজি কি পেয়েছ সতী তাকে? ২৪

প্রকৃতি গো! বল বল!
যার তরে এত দিন
বিরহের অন্তর্দ্দাহে
হইয়াছে তনু ক্ষীণ,
সে কি দেখা দিয়েছে তোমারে?২৫

তাই কি সুচারু সাজে
সাজাইয়ে তনু খানি
প্রাণভরি প্রাণ ধনে
নয়নে হেরিছ ধনি!
প্রকৃতি কবে কি তাই মোরে?২৬

কবে কি? কবে কি ধনি!
কবে কি তাঁহার কাছে
প্রাণের কথাটি মম—
যে কথা মরমে আছে?
বলো তাঁরে কথাটি আমার! ২৭

কহিও তাঁহার ঠাঁই
"আমিও তোমার মত,
পাইতে তাঁহার দেখা
হয়েছি ব্যাকুল-চিত।
কবে দেখা পাইব তাঁহার?" ২৮

শ্রী শ।

ভারতের সে দিন কোথায়?

একদিন একখানি বিখ্যাত সাপ্তাহিক পত্র পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম, একস্থানে লিখিত আছে বাবু স্নরেশচন্দ্র বিশ্বাসের বীরত্বের কথা ; ইনি খ্রীষ্ট ধর্ম্মাবলম্বী এবং ভারতসন্তান হইয়া ব্রেজিলবাসী। ইনি যুদ্ধনৈপুণ্য ও অদম্য অধ্যবসায় গুণে নাকি একটী বাহিনীর লেফ্‌টেনাণ্ট পদে উন্নীত হইয়াছেন। ব্রেজিলের একটী ভয়াবহ যুদ্ধ উপস্থিত হওয়ায়, বাঙ্গালী বীর স্নরেশচন্দ্র গবর্ণমেন্টের পক্ষ হইয়া শত্রুর নিবিড় গোলাবর্ষণের মধ্যে সদর্পে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক বলিয়াছিলেন—"বীরপ্রসূ পবিত্র ভারত ভূমির সন্তান কিরূপে শত্রুর কামান হস্তগত করে দেখ।" স্নরেশ বাবু বাস্তবিক "বীরপ্রসূ পবিত্র ভারত ভূমির" উপযুক্ত সন্তান হইলেও হইতে পারেন, কিন্তু তাই বলিয়া কি আজও ভারতভূমি "বীরপ্রসূ?" এই কথাটী মনে উদয় হইবা মাত্র কি এক চিন্তা তাড়িতপ্রবাহ মত মস্তিষ্কে, শিরায় ও ধমনীতে প্রবাহিত হইল, অশ্রুসম্বরণ করা কঠিন হইয়া উঠিল। সাপ্তাহিক পত্রখানি রাখিয়া কর্ণেল টডের রাজস্থান লইয়া পাঠ করিতে বসিলাম, মনোবেগ তাহাতে আরও বর্দ্ধিত হইল মহাভারত লইয়া পাঠ করিলাম, সে চিন্তাবেগ থামিল না। অবশেষে শান্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবার জন্য গীতা পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। দ্বিতীয় অধ্যায় সাংখ্যযোগ পাঠ করিতে করিতে দেখিলাম ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন—"সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥" অন্য সময়ে এই "যুদ্ধ"কে "জীবন সংগ্রাম" মনে করিয়া তৃপ্তিলাভ করিয়াছি, কিন্তু অদ্য তাহা পারিলাম না। গীতা রাখিয়া নিদ্রার্থে শয়ন করিলাম, নিদ্রা আসিল না, পুনঃ পুনঃ মনে হইতে লাগিল "পবিত্র ভারতভূমি" আজও কি বীরপ্রসূ? যদি তাহাই হইবে, তবে একটী বা ততোধিক বড়জোর ২।৩টী * মাত্র ভারতসন্তান কোথায় পোষ্যপুত্ররূপে † যুদ্ধে সুশিক্ষিত হইয়াছেন বলিয়া ভারতবাসী এত আনন্দিত কেন? ভারত-মাতা কি ইহাতে আনন্দিত হইতে পারেন? কখনই নহে। রাজরাণী শত শত মাণিক হারাইয়া দাসত্বে জীবন যাপন করিয়া যদি শুনিতে পান যে কোথায় সুদূরদেশে কোনও বন্ধুর নিকট তাঁহার লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির একখণ্ড স্বর্ণ আছে, তাহা হইলে তাঁহার

* ১৩০১ সালের ২৭শে শ্রাবণের হিতবাদীতে আর ৩টী বাঙ্গালী সৈনিকের বিষয় লিখিত আছে।

† ইঁহারা ভারত-সন্তান হইলেও ভারতবাসী নহেন, তজ্জন্য পোষ্যপুত্র বলা হইয়াছে।

পূর্ব্ব কথা স্মরণে সুখ না হইয়া নির্ব্বাপিত শোকাগ্নিই জ্বলিয়া উঠে। হা হতভাগ্য ভারতভূমি! ২১১টী সন্তানের বীরাবদানে কি তোমার কলঙ্ক ধৌত হইতে পারে? একটি মাত্র প্রাপ্তবয়স্ক ভারত বীরের বীরত্ব কি তোমার এই গুরু অভাব পূরণ করিতে পারে? তুমি কি সেই কুরুক্ষেত্র সমরে অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী ব্যতিব্যস্তকারী বীর বালক অভিমন্যু-প্রসূ নও? যখন আল্লাউদ্দীনের পাশব অত্যাচারে চিতোর পুরী ছার খার হইবার উপক্রম হইয়াছিল, তখন যে দ্বাদশ বর্ষীয় বালক বীর শত্রু সৈন্য মধ্যে অতুল বিক্রম প্রকাশ করিয়াছিল, তুমি কি সেই বাদলের জন্মভূমি নও?—যখন মোগল আকবরের দুর্দ্ধর্ষ তেজে রাজস্থান নিস্তেজ হইতেছিল, তুমি কি সেই সময়ের চতুর্দ্দশ বর্ষীয় বীর বালক পুত্তের জননী নও? একাকী একলক্ষ্য নৃপতি-বিজেতা তোমারি তরুণবয়স্ক গাণ্ডীবীর জ্যা-নির্ঘোষ আজও তোমার হীনবীর্য্য সন্তানগণের কল্পনাকর্ণ বধির করিতেছে। যদিও ইহাঁরা কেহ বাঙ্গালী নহেন, তবুও তোমার সন্তান ত বটে। বাঙ্গালীত এখনকার সুসভ্য আর্য্য সন্তান, তোমার তখনকার অনার্য্য মৃন্ময় দ্রোণ-শিষ্য নিষাদপুত্র একলব্যকে স্মরণ কর, এমন কি তোমার তখনকার প্রত্যেক কিশোর, যুবক, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধকে স্মরণ কর, দেখিবে তোমার বীর সুরেশের বীরাবদান-আনন্দ কোথায় ভাসিয়া যাইবে? মনে হইবে "যাহা হারাইয়াছি, তাহা বুঝি আর পাইব না।" যে ভারত-বীরগণ এখন অক্ষয় স্বর্গ ভোগ করিতেছেন অথবা শ্বেতদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া অসাধারণ বলে বলীয়ান হইয়াছেন, আজও তোমার শত শত সন্তান তাহার একটীর স্থানও পূরণ করিতে পারিয়াছেন কি? একা পরশুরাম ২১ বার ক্ষত্রিয় রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় যদি এমন দিন কখনও আইসে যেদিন তেমার শত শত সন্তান সুরেশ বাবুর ন্যায় বীরত্ব যশোমুকুট মস্তকে ধারণ করিবেন, সেই দিন মনে করিব, "পবিত্র ভারতভূমি বীরপ্রসূ।" যে দিন তোমার রাজভক্ত সন্তানগণ স্বীয় প্রভুর জন্য সমর ক্ষেত্রে অকাতরে হৃদয় শোণিত প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবেন, সেই দিন জানিব তুমি "বীরপ্রসূ"—সেই দিন আমরা ঝালাবীর মান্নার শোক ভুলিতে পারিব। হা হতভাগিনী ভারত জননি! তুমি যেদিন বীরপ্রসূ ছিলে, তোমার সেদিন আজ কোথায়?

হায়! ভারতেব আজ সেদিন কোথায়? যে দিন পবিত্র ভারত বক্ষে মহারাজ রামচন্দ্র, ভীম, অর্জ্জুন, অভিমন্যু, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যে দিন ভারতভূমির বক্ষে বাপ্পা, সঙ্গ, পৃথু, সমর, রাজসিংহ, পুত্ত, দুর্গাদাস, শাহিদাস, রণজিৎ, শিবজী, জহরী বাই, লীলাবাই,

কর্ম্মদেবী প্রভৃতি বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন? ভারতসন্তান! আজ তুমি একটী কুক্কুরের আক্রমণ হইতেও আপনাকে রক্ষা করিতে অক্ষম, কিন্তু এমন একদিন ছিল যে দিন ভারতবাসী একটী প্রকাণ্ড বন্য হস্তীর ক্রোধবেগকে পিপীলিকার আক্রমণ মনে করিতেন, বন্য সিংহ ব্যাঘ্রের কর্ণাকর্ষণ করিয়া ক্রীড়া করিতেন। এ কথা যদি তুমি বিশ্বাস করিতে না চাও, তবে ব্রেজিলে ভারত বীরের বীরত্বে তুমি আনন্দে নৃত্য কর। কিন্তু বহুদিন পরে মৃত আত্মীয়ের কোনও নিদর্শন প্রাপ্ত হইলে যেমন পূর্ব্ব শোকস্মৃতিতে উত্তপ্ত অশ্রু নীরবে গণ্ডদেশ প্লাবিত করে, স্বরেশ বাবুর বীরাবদানে আজ আমাদেরও সেই দশা ঘটিয়াছে তাই পুনঃ পুনঃ মনে হইতেছে "ভারতের সে দিন কোথায়?" কু, রা। (ক্রমশঃ)

আদর্শ স্বামী।

হিন্দুশাস্ত্র মতে "সন্তুষ্টো ভার্য্যয়া ভর্ত্তা" যে স্বামী স্ত্রীতে সন্তুষ্ট এবং তাঁহাকে সহধর্ম্মিণী জানিয়া "সস্ত্রীকং ধর্ম্মমাচরেৎ" স্ত্রীর সহিত ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করেন এবং ভার্য্যাকে শ্রেষ্ঠতম সখা জানিয়া তাঁহার সহিত একহৃদয়, একমন ও একপ্রাণ হন, তিনিই উৎকৃষ্ট স্বামী। আদর্শ স্বামি-স্বন্ধে পাশ্চাত্য দেশের কয়েকটী জ্ঞানীর মত উদ্ধৃত করা যাইতেছে

১। ডাক্তার চার্লস পার্খরিষ্ট নামে এক ধর্ম্মাচার্য্য বলেন যে ব্যক্তি আপনার পরিবারের আচার্য্য নহেন, তিনি কখনও উৎকৃষ্ট স্বামী হইতে পারেন না। গৃহ যেমন প্রথম ধর্ম্মমন্দির, স্বামী সেইরূপ প্রথম আচার্য্য। স্বামীগৃহের প্রধান যাজক, ভার্য্যা প্রধানা যাজিকা। ঈশ্বর প্রীতি-স্বরূপ, তাঁহাকে ভালবাসা এবং তাঁহার সন্তান সকলকে ভালবাসা যদি ধর্ম্ম হয়, গৃহে সে ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত ও শিক্ষা অত্যাবশ্যক। স্বামী যদি এই ধর্ম্মের প্রচার না করিয়া প্রকৃত শিক্ষাদান করিতে পারেন, সন্তানেরা ধর্ম্মভাবে গঠিত হইবে এবং পরিবার যথার্থ সুখী পরিবার হইবে।

২। পামার কক্‌স নামে এক সুবিখ্যাত গ্রন্থকার বলেন—যে স্বামী সন্তানদিগের খেলার সঙ্গী হন, তিনি উত্তম স্বামী—যিনি স্ত্রীকে সর্ব্বদা সম্পূর্ণ বিশ্বাস-ভাজন করেন তিনি, আরও উত্তম। আদর্শ স্বামী স্ত্রীকে প্রাণ খুলিয়া সকল কথা বলেন এবং স্ত্রীর সহিত স্কন্ধে স্কন্ধে মিলিত হইয়া হস্তে হস্তে দৃঢ়বদ্ধ করিয়া এক গম্য স্থানে উপনীত হইবার জন্য অগ্রসর হন। আদর্শ বিবাহ দুইবাদ্যের একতান—দুইপ্রাণের একত্র সংমিশ্রণ।

৩। বিল নাই নামে এক সুরসিক

লেখক ও বক্তা বলেন—তিনিই স্বামী যাঁর অনুরাগ সর্ব্বপ্রথমে স্ত্রী ও সন্তানদিগের প্রতি এবং তৎপরে কার্য্য বা অন্য বিষয়ের প্রতি। এক ব্যক্তি কোন স্থানে অভিনয় করিবার জন্য ২০ হাজার টাকায় এক রাত্রির ফুরান চুক্তি করিয়া আসিয়াছিল। তার যোগে সংবাদ পাইল তাহার স্ত্রী ও চারিটী সন্তান পীড়িত, সে তখনি চুক্তি রহিত করিয়া প্রথম ট্রেণে স্বদেশ যাত্রা করিল। আমার মতে এই ব্যক্তি উৎকৃষ্ট স্বামী।

৪। পাপ-নিবারণী সভার সভাপতি আণ্টনি কমষ্টক বলেন—২২ বৎসর কাল আমি "পিতার দোষগুণ সন্তানে কিরূপ বর্ত্তে" তাহা অধ্যয়ন করিতেছি এবং তাহার শত শত দৃষ্টান্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছি। আমার এখন এই দৃঢ় বিশ্বাস যে মিতাচারী ও পবিত্র না হইলে কেহ উৎকৃষ্ট স্বামী বা পিতা হইতে পারে না। মিতাচারীর অর্থ লাল পাণি অর্থাৎ সুরার সংস্পর্শ হইতে দূরে থাকা—পবিত্র অর্থাৎ দেহকে সর্ব্বপ্রকারে সুস্থ ও পরিশুদ্ধ রাখা।

প্রার্থনা।*

জীবন, মরণ, বিভো! কারে আমি চাই—
তুমি তাই সুধিছ এখন?
আমারে জীবন দাও, মৃত্যু কাজ নাই,
চাই না এ অলস মরণ!

২

মরণ চাহি না কেন, কি বলিব হায়!
এ দেশে তো মরিছে সবাই,
কেহ সন্ধ্যা কালে—কেহ ভোরে চলে যায়,
আমি নয় অবেলায় যাই।

৩

ধনী, দীন, জ্ঞানী, মূর্খ, শমনের করে,
কোন্ কালে কে পেয়েছে ত্রাণ?—
আমারি কি মরিবার, এত ভয় করে,
আমারি কি আদরের প্রাণ?

"প্রবাসী পথিক আমি," হইবে ফিরিতে—
সে কথা কি ভুলে গেছে মন?
মায়ার সংসার ফেলে চাহি না যাইতে,
আমারি কি এতই বাঁধন?

ম'লে কি, সাধের ফুল যাইবে শুকিয়ে,
ছিঁড়িবে এ বীণা বাঁশী তার?
মায়ের নয়ন জল পড়িবে ঝরিয়ে,
ব্যথা পাবে, যাহারা আমার?

৬

কোন্ অণু কণা আমি, সেই সব তরে,
জগদীশ! চা'ব এ জীবন?—
তোমারি মঙ্গল ইচ্ছা অমৃত বিতরে,
তাই নাথ, হউক পূরণ।

* রোগ শয্যায় লিখিত।

৭

মোর ক্ষোভ—দয়াময়, জীবন থাকিতে
রহিয়াছি, মৃত জড়প্রায় ;
তোমার জগতে আসি কিছুই করিতে,
হতভাগা পারিল না হায় !

৮

আরো ক্ষোভ—এই তুচ্ছ জীবনের লাগি
এত চেষ্টা, এত আয়োজন ;
এত দয়া, এত স্নেহ, এত দুখভাগী,
এত বক্ষ সহিছে বেদন !

৯

তাই চাই—সংসারের শত নির্ম্মমতা,
আমি নাথ, সকলি সহিব ;
তুমি যার, প্রাণে তার কেন কাতরতা,
তব নামে বাঁচিয়া রহিব !

১০

সহস্র মরণে, হরি ! কার আসে ভয়
মৃত্যুঞ্জয় ! স্মরণে তোমায় ?—
কিন্তু এ যে "মহামৃত্যু" কভু নাহি সয়,
এ কি শাস্তি দিলে অভাগায় ?

১১

জীবন, মরণ, আমি কোন্‌টীরে চাই,
তাই যদি বুঝিছ এখন,
খুলে দাও মহা পাশ, খাটিবারে যাই !
কাজ নাই এ পোড়া মরণ।

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলি-রচয়িত্রী।

সতী ও শান্তি

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

কিরণ বলিলেন, দিদি, আপনি যা ব'ল্লেন তা সব ঠিক্। দাদা একবার ঐ রকম ব'লেছিলেন। আমারও ভূতে বিশ্বাস নাই তথাপি অনেক সময় ভয় হয়। আমি এর কারণ কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চি না। এর কারণ কি, দিদি? শান্তি বলিলেন, ছেলে বেলা হইতে যে কিছু কুসংস্কার অভ্যাস হইয়া যায়, তাহা ছাড়া বড় সোজা কথা নয়। একটা চারা গাছকে মারা যত সহজ, একটা বড় গাছকে মারা তত সহজ নয়। সহজ নয় বলিয়া যে তাহাকে একবারে সমূলে বিনাশ করা যাইতে পারে না, তাহা নয়। অস্ত্র দ্বারা কত প্রকাণ্ড শাল গাছ সমূলে নষ্ট হইয়াছে। যে চারা গাছ প্রকাণ্ড বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, তাহাকে বরং চারা অবস্থায় মারিয়া ফেলা উচিত। বরং যাহাতে তাহার বীজ একবারে অঙ্কুরিত হইতে না পারে, তাহার উপায় করিলে, চারা গাছকে মারিতে যে টুকু আয়াস স্বীকার করিতে হয়, তাহাও আর করিতে হয় না। কুসংস্কার যত অনিষ্টের মূল। মনে কর কুসংস্কার একটি নিমগাছ। নরম মাটীতে

ছোট একটি নিমের বীজ কোন রকমে পড়িল। মাটী নরম, পড়িবা মাত্র অঙ্কুরিত হইয়া চারা হইল, ক্রমশঃ রোদ্, শিশির, জল, বাতাস পাইয়া চারা বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। ক্রমশঃ বৃহৎ একটি বৃক্ষরূপে পরিণত হইল। সেই গাছের ডাল পালা শাখা প্রশাখা কাণ্ড প্রকাণ্ড এতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়িল, এত স্থান ঢাকিয়া ফেলিল, যে, তাহার নিম্নস্থ জমিতে আর কোন রকম গাছ হইতে পারে না। যদি কোন বীজ পড়িয়া অঙ্কুরিত হয়, সেই গাছের ছায়াতে তাহা আর বাড়িয়া উঠিতে পারে না। সেই প্রকাণ্ড নিমগাছের তলে যে কোন মেওয়া ফলের গাছ রোপণ করা যায়, তাহা আর বাড়তে পারে না। মানুষ যত যত্ন করুক, যত দিন পর্য্যন্ত সেই নিম্ব তরু সমূলে বিনাশ প্রাপ্ত না হইতেছে, নিম্ব তরুর তেজে যে মৃত্তিকা নিস্তেজ হইয়া গিয়াছে, যতদিন পর্য্যন্ত আবার তাহা সতেজ হইয়া না উঠিতেছে, ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের সাধ্য কি সেখানে মেওয়া ফলের গাছ জন্মায়। মানুষ যত যত্ন করুক, যত পরিশ্রম করুক, সব বৃথা হইবে। সেইরূপ সামান্য একটি কুসংস্কার বীজ মানুষের কোমল হৃদয় ক্ষেত্রে উপ্ত হইলে, তাহা কুলোকের সহবাসে, কুপ্রসঙ্গে, কুপুস্তক পাঠে, কুচিন্তাতে ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। ক্রমশঃ মনের তেজ, মনের স্বাস্থ্য একবারে নষ্ট হইয়া যায়। হৃদয় কোন রূপ সদ্ভাবের বীজ ধারণ করিতে সমর্থ হয় না, ধারণ করিতে সমর্থ হইলেও তাহা অঙ্কুরিত হয় না, অঙ্কুরিত হইলেও বর্দ্ধিত হয় না, বর্দ্ধিত হইলেও তেমন বিকসিত হয় না। সেই কারণে কোন রকম কুসংস্কার বীজ যাহাতে সন্তানের কোমল মনে একবারে উপ্ত হইতে না পারে, সে বিষয়ে আমাদের দেশের মেয়েদের বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত। "ঐ ভূত আস্‌চে, ঐ জুজু আস্‌চে" এ পাপ কথা মুখে আনা উচিত নয়। বালকবীর অভিমন্যু মাতার গর্ভে থাকিয়া নাকি যুদ্ধ বিদ্যা প্রভৃতি অনেক বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন, আজ সন্তান সন্ততিরা মায়ের কোলে থাকিয়া কুসংস্কার ও ভীরুতা শিক্ষা করিতেছে, এ লজ্জা রাখিবার স্থান আর কোথায়? তখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা সন্তানকে যুদ্ধ সাজে সজ্জিত করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে পাঠাইবার সময় বলিতেন, যাও বাছা, আশীর্ব্বাদ করি, তুমি দিগ্‌বিজয়ী হও। আর এখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা, ছেলে যদি একবার বাড়ীর বাহির হইয়াছে, অমনি তাড়াতাড়ি হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিবেন, "যেওনা, যেওনা, ভূতের বাতাস লাগ্‌বে"! তখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা বলিতেন, বাছা!

"যাও সিন্ধুনীরে ভূধর শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাতে বজ্রশিখা ধরে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।"

আর এখনকার মাতা ঠাকুরাণীরা বলিতেছেন,

"ওরে বাছা বের্‌যোকেতু
'মা বাপের পুণ্যি হেতু'
জনম লভিলি যদি
উদরে আমার।
আশীর্ব্বাদ করি বাপ্,
হও তুমি ঢোঁড়া সাপ্,
ধনে পুত্তুরে লক্ষ্মীলাভ
হউক তোমার।
তোর জন্যে বার বের্‌ত
করি আমি অবিরত;
আঁচল ছাড়া হইও নারে
অঞ্চলের ধন।
(ও তোর্) ষষ্ঠী পূজোর পরের দিনে,
রাঙা বৌ দেবো এনে,
হেলে দুলে তার সনে
খেলো যাদুধন।"

এই সময়ে মেয়ে মহলে ভারি একটা হাসির ধুম পড়িয়া গেল। কিছু ক্ষণ পরে একটি বৃদ্ধা বলিলেন, "ভালা মেয়ে ভালা, এত কথা জানে।" পাশের একটি মেয়ে বলিলেন, "আর সীতে, জানবে কেন্? 'কালীর আকর' যার পেটে আছে, সে না জানে কি? ঐ কথায় বলে, "বিদ্যেহীন পশু।" তা আমরা তাই। আর একটী স্ত্রীলোক বলিলেন, "ইনি যা যা ব'ল্লে, তার কোন্ কথা মিথ্যে গো সীতে, সব সত্যি।" গোলমাল থামিয়া গেলে পর, শান্তি বলিলেন, "আমাদের মেয়েদের এখন এইরূপ অবস্থা। এখন সে রামও নাই, সে অযোধ্যাও নাই। এখন আছে কেবল সেই রামায়ণ আর মহাভারত। সেই সকল জননীদের বড় বড় নাম শুনি, পড়ি, আর লাজে মরে যাই। তখন মনে হয়, আমরা কি? আমরা কি মানুষ! আমরা যদি মানুষ তবে যারা পশু, তারা কি!! "ভাল কত্তে পার্ব্বো না মন্দ ক'র্ব্বো, কি দিবি তুই বল্"। ছেলেদের ভাল কিছু শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যা কিছু সদ্‌গুণ, তা সব শিক্ষা দেওয়া দূরে থাক্, যেগুলি অসদ্‌গুণ, যে গুলি কুসংস্কার, যে গুলি কুশিক্ষা, যাতে ছেলে অধঃপাতে যাবে, যা'তে বংশের নাম ডুবে যাবে, মুখে চুণকালী প'ড়বে, যা'তে সমাজের অকল্যাণ হবে, দেশের সর্ব্বনাশ হবে, সে সব শিক্ষা দিতে আমাদের দেশের মেয়েরা বড় মজ্‌বুদ্। এমন্ সোণার চাঁদ মেয়ে আর কোনও দেশে পাওয়া যায় কি না সন্দেহ।

সরোজিনী বলিলেন, শান্তি, বাস্তবিক আমাদের দেশের মেয়েরা সোণার চাঁদ মেয়ে, অযত্নে "ম'র্‌চে" ধরেছে বৈত নয়। তাঁদের দোষ কি? ঐ সব সোণার চাঁদ মেয়েদের যদি মেজে ঘ'সে পরিস্কার করা যায়, এঁদের জ্যোতি দেখে কত জাতি লজ্জা পাবে। এ সোণার দেশে, অনেক সোণার চাঁদ মেয়ে এমন সুমার্জ্জিত হ'য়ে ছিলেন, যে, এখন যাঁহারা পশ্চিম দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ব'লে

থাকেন, "ঐ দেখ।" তাঁহারাও বলিবেন, "না, না, এসব জোনাকী, তাঁরা সব সোণার চাঁদ।" কোন্ দেশ গর্ব্ব ক'রে ব'লতে পারে, "এই দেখ আমাদের সাবিত্রী, এই দেখ আমাদের সীতা, এই দেখ আমাদের দময়ন্তী, এই দেখ আমাদের চিন্তা? কোন্ জাতি দম্ভ করে বলতে পারে এই দেখ আমাদের আত্রেয়ী, এই দেখ আমাদের খনা, এই দেখ আমাদের মৈত্রেয়ী, এই দেখ আমাদের গার্গী, এই দেখ আমাদের লীলাবতী, এই দেখ আমাদের সুনীতি? শাস্তি, আমাদের ছিল না কি? জানি না, কবে আবার তাঁরা ফিরে আস্‌বেন্, দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে! *

(ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৪ সংখ্যা ৯৫ পৃষ্ঠা পর)

খাম্বাজ। একতালা।

শ্রীবৎসচিন্তা।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

```
৩        +৩   ৩    ৩    ৩    ১৩
ধ        ম    ধ    ধ    ধ    ধ
নে।      রা-  জা-  র    র-   ম-

+৩  ৩   ।   ১৩  ৩   ৩   ৩ব   ৩   ৩   ১৩  ৩   ৩   ৩
নি  নি  সা' সা' ঋ'  সা' নি   নি  নি  সা  সা. নি  সা. সা.
যা- ও   হে  ত-  ব   জ-  ন-   ণী, রা- জা  র   সন্- ত-  তি,

১৩ব ৩   ৩   ৩    +৩  ৩   ৩    +৩  ৩   ৩   ৩    ১৩  ৩   ৩
নি  ধ   ধ   ম    প   প   সা'  নি  নি  ঋ'  সা'  সা' সা' নি
ক   ভ-  ব-  নে।  কে- ম   আ-   রা- জ   ভো- গে   স-  দা, ছি-

৩ব ১৩  ৩   ৩   ৩   ১।  ৩   ৩     ৩   ১৩ব ৩   ৩   ৩    +৩  ৩   ৩
নি  ধ   প   ম   গ   ম   ঋ   সা    সা' নি  ধ   প   প    ম   ম   ম
র   প্রি য়ে  আ-  মা- র   স-  নে।  লে  গু- ণ   ব   তী,  নি- বি  ড়

+৩  ৩   ৩   ৩   ১৩  ৩   ৩   ৩
সা  সা  ম   ম   গ   মা  প   ধ
প-  ই   বে  যা- ত   না, হ-  রি

১৩  ৩   ৩   ৩    +৩  ৩   ৩
নি  সা' সা. সা'  নি  নি  নি
ণ   ন-  য়-  না,  শ্বা- প- দ

৩   ১৩  ৩   ৩   ৩ব ১৩ব ৩
ঋ   ঋ'  সা' সা' নি  নি  ধপ
সং  কু- ল   নি- বি- ড়   ব-
```

* বলা বাহুল্য, যদিও লীলাবতী, খনা, গার্গী, আত্রেয়ী, সুনীতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া আর্য্যরমণীগণ বহুকাল হইল এ দেশ ছাড়িয়াছেন, তথাপি এ দুর্দ্দিনে ভারতের ঘরে ঘরে সাবিত্রীর অভাব নাই। যে দিন সাবিত্রী এদেশ ছাড়িবেন, সে দিন এ দেশ রসাতল যাইবে, তাহার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

লেখক।

ম গ ম প প ধ নি সা সা　　প ধ নি সা সা নি |
কা- ন- নে ক ষ্ট পা- বে অ- তি,　　হে জী- বি- তে- শ্ব রী, |

+ নি নি ঋ ঋ সা সা　　+ ঋ ঋ ঋ ঋ সা নি সা ॥
ন- য়- নে- র জল র-　　এ- ত দু- খ স- বে- না

নি সা নি ধপ ধ　　+ ম ম ধ ধ ধ নি নি নি সা
বে ন- য়- নে।　　ব- নে র দা- রু- ণ ক- ঠি ন

+ সা নি সা সা সা ঋ সা　　সা সা সা | + নি নি নি ঋ
প্রি য়ে হে ত- ব শ্রী- মু-　　মা- টি- তে, | পা- ই- বে ব্যা-

নি নি নি　　ঋ ঋ সা নি সা নি ধ
খ ন- লি ন,　　ত- না হাঁ- টি তে হাঁ টি-

+ প প ধ ম ম গ　　ধ + ম ম ম ম গ ম প
ব- ন প- র্য্য- ট- নে　　তে, তা- ই ব লি যাও জ- ন-

গ ম ঋ ঋ সা　　ধ নি সা সা নি নি ঋ ঋ
হ- বে ম- লি- ন,　　ক বা টী তে, দিন পে- লে সু

+ সা সা ম ম গ ম　　সা সা নি সা নি ধপ ধ
অ- নু- ভ- ব ক- রি,　　খী হ- ব মি ল- নে ॥

(ক্রমশঃ)

নখ।

বয়ঃক্রমানুসারে নখের বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। সদ্যঃপ্রসূত শিশুর নখমধ্যস্থ শোণিত কৃষ্ণবর্ণ, সুতরাং নখও ঈষৎ কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায়; পরে ক্রমে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার গুণে ঐ শোণিত লোহিতবর্ণে পরিবর্ত্তিত হইলে নখও ঈষৎ রক্তবর্ণ ধারণ করে। বয়োবৃদ্ধির সহিত নখগুলি স্থূল ও দৃঢ় হইতে থাকে। বৃদ্ধাবস্থায় নখের উপর শ্বেতবর্ণের সূত্রাকারবৎ চিহ্ন দৃষ্ট হয়। কেশের ন্যায় নখের জন্মভূমি মাংস, সুতরাং নখের জীবনী-শক্তি কেশের জীবনী-

শক্তির অনুরূপ। নখের অবস্থা দ্বারা শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থা প্রমাণিত হয়। ক্ষয়কাশ রোগে নখের আকার ও বর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়। নখের বর্ণ ও আকার পরীক্ষা করিয়া কোন কোন চিকিৎসক রোগ নির্ণয় কার্য্যে বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়া থাকেন স্বীকার করিয়াছেন। যাহার স্বাস্থ্য যত ভাল, তাহার নখ তত শীঘ্র বর্দ্ধিত হয়। সচরাচর এক সপ্তাহের মধ্যে ৩৯ ইঞ্চির এক সহস্র অংশ পরিমাণে নখ শীঘ্র বৃদ্ধি হয়। ডাক্তার ছফোর বলেন যে যদি আশৈশব নখ না কাটা হয়, তাহা হইলে ৬০ বৎসর বয়সের সময় নখ গুলি ৪ হাত লম্বা হইবার সম্ভাবনা। আনাম দেশের এক সম্প্রদায়ের লোকেরা দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুলির নখ আজন্ম রক্ষা করিয়া থাকে। দশ ইঞ্চি লম্বা হইলে তাহা নীচের দিকে বাঁকাইয়া দেওয়া হয় এবং এইরূপে প্রতি দশ ইঞ্চি পরিমাণের নখাংশ বক্রাকারে তিন চারি স্তরে রক্ষিত হয়। বহুকাল জ্বর রোগে প্রপীড়িত অথবা অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নখ নিষ্প্রভ হয়, এবং নখের উপর কিয়দংশ উচ্চ ও কিয়দংশ নিম্ন ভাব ধারণ করে। নখের উপর শ্বেত বর্ণের যে দাগ দেখা যায়, তাহার সহিত স্বাস্থ্যের কোনও সম্বন্ধ দেখা যায় না, এবং ঐ রূপ দাগ হইবার কারণ কি তাহা সবিশেষ বোধগম্য হয় না।

নরভুক্ অজাগর সর্প।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর ভাগে ট্রিনিডাড্ নামক একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। কয়েক মাস গত হইল এই দ্বীপের অন্তঃপাতী পোর্ট অব্ স্পেন্ নামক নগরের নিকটবর্ত্তী কোনও পর্ব্বত পার্শ্বে নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এনাকণ্ডা (Anacanda) জাতীয় একটী বৃহদাকার অজাগর সর্প দৃষ্ট হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ৪৭ ফিট অর্থাৎ কিঞ্চিদধিক ৩১ হাত, এবং ইহার শরীরের স্থূলতম অংশের ব্যাস আড়াই ফুট অর্থাৎ প্রায় দেড় হাত। নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহ হইতে দরিদ্র লোকেরা উক্ত বনের মধ্যে কাষ্ঠ আহরণ করিবার নিমিত্ত প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং জঙ্গলের পার্শ্বস্থ সুবিস্তীর্ণ প্রান্তরে রাখাল বালকগণ গো মেষাদি চরাইতে আসিত। উক্ত অজাগর সর্প মধ্যে মধ্যে মেষপালের মধ্যে দ্রুত বেগে উপস্থিত হইয়া একটী বা দুইটী মেষ মুখে করিয়া লইয়া জঙ্গল মধ্যে পলায়ন করিত। ক্রমে ইহার মাংস-লোলুপতা এতই বৃদ্ধি হইল যে মেষ ছাড়িয়া মেষপালক বালক গণকে আক্রমণ

করিতে লাগিল। একটী দুইটী করিয়া মেষপালক বালক বা বালিকা এই সর্প কর্ত্তৃক প্রায়ই নিহত হইতে লাগিল। পরিণতবয়স্ক বলবান্ মানুষকে ইহা ভক্ষণ করিতে সাহস করিত না বটে, কিন্তু পুচ্ছাঘাতে হনন করিত। গ্রামবাসী দরিদ্র কৃষকগণের পক্ষে বনে যাওয়া এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিল। পরিশেষে একদিন গ্রামবাসিগণ একত্রিত হইয়া ট্রিনিডাডের শাসনকর্ত্তার নিকট উপস্থিত হইল এবং এই ভয়ানক সর্পের অত্যাচার হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সবিনয়ে প্রার্থনা করিল। শাসনকর্ত্তা অনুসন্ধান করিয়া তাহাদিগের বর্ণিত বৃত্তান্ত সমস্তই সত্য জানিয়া সর্প নিধনে একদল আগ্নেয়াস্ত্রধারী সাহসী সৈন্য প্রেরণ করিলেন। ইহারা বহুসংখ্যক লোক নিযুক্ত করিয়া পর্ব্বতের উপরিভাগস্থ জঙ্গল কাটাইয়া অগ্রে উক্ত সর্পের বাসস্থান আবিষ্কার করিল। দেখাগেল যে একটী প্রকাণ্ড পর্ব্বতগুহা উহার বাসস্থান। ইহার একদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত করাইয়া ধূম উৎপাদন করা হইল। ধূমের তেজ সহ্য করিতে না পারিয়া সর্পরাজ গুহার উপর দিক্ দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। অমনই সৈন্যগণ অনতিদূর হইতে তাহার শরীরের উপর গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ দুই চারিটী গুলির আঘাত লাগিবা মাত্র উহা কুড়ি ফুট উচ্চ হইয়া দাঁড়াইয়া মুখ উত্তোলন পূর্ব্বক আক্রমণকারীদিগের প্রতি ধাবমান্ হইল। কিন্তু গুলির উপর গুলি উহার শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করাতে উহা আর দৌড়িতে সক্ষম হইল না; অচিরাৎ ভূপতিত হইয়া রোষে ও ক্ষোভে সজোরে মৃত্তিকার উপর পুচ্ছ আঘাত করিতে করিতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল। ইহার উদর বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে একটী হরিণশিশু এবং একটী মানব শিশুর কিয়দংশ অপরিপাক অবস্থায় পাওয়া গিয়াছিল।

মহাযজ্ঞ।

ইতিহাসে কত মহাযজ্ঞের কত কথা ঘোষিত হইতেছে। নরমেধ দ্বারা দেবপূজা তাহাও শুনিয়াছি। স্বর্গের জন্য, দেব সন্তোষের জন্য নরবলি, ইহাও শুনিয়াছি। শুনিলে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে, প্রাণ আতঙ্কে শিহরিয়া উঠে। প্রাণ খুলিয়া মুক্তকণ্ঠে বলি, এমন স্বর্গ চাহি না, এমন দেবসন্তোষ সাধন করিয়া স্বর্গের ঐশ্বর্য্য ও ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব চাহি না। কিন্তু পাঠিকে? কঠোরে কোমলতা আছে; বজ্রে কুসুম সুষমা আছে; গরলে অমৃত আছে। আর উত্তাল তরঙ্গময় সাগরে আতঙ্ক ও প্রমোদ উভয়ই আছে। আজ আইস ভগিনি!

একটী মহাযজ্ঞের মহান্ ভাব দর্শন করিতে যাই। মরজগতে অমরভাব দেখিবে, সুর সুন্দরীর সুরলীলায় মোহিত হইবে; যদি হৃদয় থাকে, জীবন থাকে, সেই সুন্দরীর ভস্মাবশেষ দেহে মাখিয়া কৃতার্থ হইবে; জরামরণশীল জগৎকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারিবে।

রাজপুতনার ভীলার পল্লীর এক ব্রাহ্মণ ভবন রুদ্ধদ্বার, তন্মধ্যে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতেছে। অগ্নিশিখা লক্ লক্ জিহ্বায় আকাশমণ্ডল স্পর্শ করিতেই যেন উঠিতেছে। কুণ্ডের নিকটে যজ্ঞ সামগ্রী স্তরে স্তরে সজ্জিত, ব্রাহ্মণ যজ্ঞীয়বেশে উপবিষ্ট; পার্শ্বে সুশাণিত তরবারি। ব্রাহ্মণ উদাত্ত গম্ভীরস্বরে মন্ত্র পাঠ করিতেছেন, পাঠ করিতে করিতে প্রশান্ত নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কেশরাজি চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। যজ্ঞশেষে বজ্রনির্ঘোষে যেন জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া, বায়ুকে প্রচালিত করিয়া, হোমাহুতি প্রদানে উদ্যত হইয়া পার্শ্বদেশে চাহিয়া কহিলেন, "বৎসে! প্রস্তুত হও। তুমি আমার—আমার বংশের—সর্ব্বোপরি ধর্ম্মের ও সতীত্বের মুখ উজ্জ্বল করিবার পাত্রী। আমি জানি, তুমি তজ্জন্য প্রস্তুত। আজ তোমার স্নেহময় পিতার, ধর্ম্মের, সতীদেবতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর। প্রফুল্ল বদনে হাসিতে হাসিতে অগ্রসর হও। এস তোমাকে একবার আলিঙ্গন করিয়া তোমার হৃদয়ে বল প্রদান করি। মা! তোমার জীবন রক্ষা করিতে পারিলাম না, তাহাতে আমার আর দুঃখ নাই, কেননা তুমি জানিতে পারিয়াছ, ভীষণ কাল সর্প তোমাকে, আমাকে, পবিত্র বংশকে, ধর্ম্মকে দংশন করিতে ফণা বিস্তার করিয়াছে। তুমি বুঝিয়াছ, যে স্বয়ং এ যজ্ঞের আহুতি স্বরূপ না হইলে তোমার ও আমার পরিত্রাণ নাই। ছার জীবন অপেক্ষা সতীত্ব মহামূল্য; তাহা তুমি জান। যাও, স্বর্গে যাও, ঐ দেখ কুলদেবতা, বংশের দেহ-মুক্তা জননীরা ও দেববালাগণ সহাস্য বদনে তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া লইবার জন্য দণ্ডায়মান। বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের বদনমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। বিষাদ নাই, বিরাগ নাই, আছে কেবল আনন্দ। ব্রাহ্মণ যেন আনন্দে ফুলিয়া উঠিতে লাগিলেন। আর ঘন ঘন পার্শ্বদেশে কুণ্ডের দিকে ও ঊর্দ্ধদেশে সূর্য্যমণ্ডলের প্রতি তাকাইতে লাগিলেন।

পার্শ্বে অপরিস্ফুটযৌবনা জ্যোতির্ম্ময়ী আলুলায়িতকুন্তলা রক্তাম্বর পরিধানা, বালিকা মূর্ত্তি! আ মরি মরি! কি মাধুরী। চন্দ্র কিরণ যেন আকৃতি ধরিয়া স্থিরভাবে সহাস্যমুখে দণ্ডায়মান। বালিকা হাস্যছটায় দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া কোমলস্বরে কহিল, পিতঃ! আজ জীবন সার্থক। সতীত্ব, ধর্ম্ম ও বংশ ও তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিব, ইহা অপেক্ষা আমার আর সুখ কি, সৌভাগ্য কি! প্রার্থ-

নাই বা কি! জানি পিতঃ! আমার উপর আমার সতীত্ব, আমার বংশ, আমার ধর্ম্ম নির্ভর করিতেছে। আমি জানি সতীদেবতা, কুলদেবতা আমার চিরসহায়। জানি বলিয়া, সেই দুরাচার, পামরের মুখের উপর তিরস্কার করিয়া আসিয়াছি। পিতঃ! জীবন ত্যাগভিন্ন তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণের আর অন্য উপায় নাই; তাই পিতঃ! জীবন আহুতি দিব বলিয়া সতীবেশে আসিয়াছি। সেই জন্য পিতঃ! এই যজ্ঞকুণ্ড, এই যজ্ঞদ্রব্য, ঐ তীক্ষ্ণধার অসি সাজাইয়াছি, আর বিলম্ব কেন? ঐ শুন দ্বার দেশে পুনঃ পুনঃ আঘাতের উপর আঘাতের শব্দ হইতেছে, ঐ শুন কোলাহল বাড়িতেছে। পিতঃ! আর কেন? বিলম্ব করিলে আমাকে আর রক্ষা করিতে পারিবে না।

পিতা একবার কন্যার দিকে চাহিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, মুহূর্ত্তে অসি গ্রহণ করিয়া কন্যার বক্ষঃস্থল হইতে সপ্তখণ্ড মাংস গ্রহণ করিয়া পাত্রান্তরে রাখিয়া দিলেন। সপ্তধারে কন্যার বক্ষোরক্তধারা ঝুঁঝিয়া পড়িতে লাগিল। পিতা কহিলেন বৎসে! অগ্রে তোমাকে আহুতি দিয়া পরে আপনাকে আহুতি দিতেছি। যাও,স্বর্গবাসিনী দেবকন্যা সকল অপেক্ষা করিতেছেন। বালা কোন কষ্ট প্রকাশ না করিয়া, হাস্য করিতে করিতে, আম্রশাখা ঘুরাইতে ঘুরাইতে, পিতা ও স্বর্গ পানে চাহিয়া জীবন আহুতি প্রদান করিল। ব্রাহ্মণ সেই সপ্ত মাংস খণ্ড মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে অগ্নি কুণ্ডে আহুতি দিলেন। অগ্নি প্রবল বর্দ্ধিতভাবে জ্বলিয়া উঠিল।

এমন সময়ে বাহিরের দ্বার ঘোর শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িল, সঙ্গে সঙ্গে জলস্রোতের ন্যায় জনস্রোতে ভবন ভরিয়া গেল। সর্ব্বাগ্রে মহার্ঘবেশধারী, মণিমুক্তা-বিভূষিত একটী যুবক। যুবক সেই অগ্নিকুণ্ড, সেই কুণ্ডমধ্যস্থা দগ্ধপ্রায়া বালিকা, সেই লোহিতনয়ন যজ্ঞীয় বেশধারী ব্রাহ্মণ, সেই যজ্ঞীয় দ্রব্য সম্ভার দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া পড়িল। ঘটনাক্ষেত্র পরম্পরাদর্শনে যুবক ভীত হইয়া কাঁপিতে লাগিল। মুখমণ্ডল শুষ্ক ও বাক্য রহিত হইল। জনসমূহও স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ব্রাহ্মণের অন্য দিকে দৃষ্টি নাই; কোন রূপ চাঞ্চল্য নাই; ব্রাহ্মণ আরক্ত নয়নে সূর্য্যের প্রতি স্থিরদৃষ্টে চাহিয়া জলগণ্ডুষহস্তে কহিলেন যে, "নরাধম আমার প্রাণ-প্রিয়তরা দুহিতার এই পরিণামের মূল, যদি দেব সত্য হয়, যদি ব্রাহ্মণবংশে ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম হইয়া থাকে, যদি ধর্ম্ম সত্য হন, যদি জগতে সতীত্বের ও পবিত্রতার আদর ও মহত্ত্ব থাকে,তবে সেই নরাধম ও তাহার বংশের কেহ যেন কখনও সুখশান্তি সম্ভোগ না করে।" এই বলিয়া জলগণ্ডুষ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিলেন এবং লম্ফ প্রদান করিয়া সেই অগ্নি কুণ্ডে আত্ম বিসর্জ্জন করিলেন

মহাযজ্ঞ শেষ হইল, আইস পাঠিকে! এই মহাযজ্ঞের মূলতত্ত্ব জানিতে কি তোমার ইচ্ছা হয় না? ইতিহাস অনুসন্ধান কর, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।

মারবরাধিপতি উদয় সিংহ সৈন্য-সামন্ত সঙ্গে দিল্লীহইতে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করিতেছেন। ভীলার পল্লীর তরুচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন সরোবরতীরে বিশ্রামার্থ উপস্থিত হইয়া চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করিতে করিতে দেখিলেন, এক অবিবাহিতা বালিকা জল কলস কক্ষে সৌন্দর্য্যে বনপ্রদেশ উজ্জ্বল করিয়া মৃদুমন্দপদে গমন করিতেছে। এরূপ লাবণ্যময়ী নারী কখনও তাঁহার নয়ন পথে পতিত হয় নাই, অধিক কি, এরূপ সুন্দরী জগতে বিদ্যমান আছে, ইহা তাঁহার বোধ ছিল না। তিনি এরূপ স্থানে এই বালিকাকে দেখিয়া উন্মত্তের ন্যায় অনিমেষ-নয়নে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। উদয় সিংহ যুবক, তাহে জঘন্য ইন্দ্রিয়-পরায়ণ। তাঁহার ধৈর্য্যলোপ হইল, উন্মত্তের ন্যায় কহিলেন, এই বালিকার অনুসরণ কর। ইহার পিতাকে গিয়া বল "মারবরপতি উদয় সিংহ এই বালিকার বিবাহার্থী, সে শীঘ্র যেন আমার নিকট প্রেরিত হয়"। অনুসন্ধানে প্রকাশ পাইল, বালিকা আর্য্যপন্থী নামক সম্প্রদায়ের প্রধান বেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণের কন্যা। ক্ষত্রিয় জাতি ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করিতে পারে না, সুতরাং যুবক, রূপোন্মত্ত উদয় সিংহ আপন অভিপ্রায় সিদ্ধির কোন উপায় না দেখিয়া দুঃখে, অধৈর্য্য ও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইলেন। এমন সময়ে দেখিলেন যে, সেই সুন্দরী পুনরায় কলস কক্ষে আগমন করিতেছেন। যুবক আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বালিকার নিকটবর্ত্তী হইয়া কহিলেন, "সুন্দরী! আমি মারবারাধিপতি উদয় সিংহ, তোমার অলৌকিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়াছি, আমাকে বিবাহ কর, রাজসিংহাসন, এই মণিমুক্তাখচিত রাজমুকুট, সমস্ত মারবার প্রদেশ, তোমার শতদল-নিন্দিত পদে অর্পিত হইল। আইস, দোলা প্রস্তুত, তোমাকে বিবাহ করি। সুন্দরী! শত শত দাসী তোমার সেবা করিবে,মণি মুক্তায় তোমার ভাণ্ডার পূর্ণ থাকিবে।" বালিকা রাজার দিকে না চাহিয়া ক্রোধে যেন আপন সৌন্দর্য্যকে আরো বর্দ্ধিত করিয়া কহিলেন, "মারবার! তোমাকে ধিক্, যে তুমি এমন পিশাচকে ক্রোড়ে স্থান দান করিয়াছ। যুবক! আমার চরণাঙ্গুলির তুলনায় রাজমুকুট, তোমার সিংহাসন, ও তুমিও অতি সামান্য; আমি ব্রাহ্মণ-কন্যা; ব্রহ্মতেজে আমার জন্ম। বংশের, ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানি,পার্থিব ঐশ্বর্য্যের সুখের লোভে বংশকে মলিন করিতে পারি না। যাও, দূর হও, ঐ জলন্ত নরক কুণ্ড তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে।" বালিকা এই বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেলেন। রাজা স্তম্ভিত; সৈন্য সামন্ত স্তম্ভিত। বনস্থলীও যেন স্তম্ভিত

হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক আরো অধৈর্য্য হইয়া আদেশ করিলেন, যাও এখনি গিয়া ঐ দর্পিতাকে বন্ধন করিয়া আন।

বালিকা গৃহে আসিয়া পিতাকে সমস্ত ঘটনা নিবেদন করিল। ব্রাহ্মণ নীরব হইয়া রহিলেন, চতুর্দ্দিক্ অন্ধকার দেখিলেন, নয়নজল দর দর ধারে বহিতে লাগিল, কহিলেন, "বৎসে এখন তুমি কি উপায় চিন্তা করিলে? আমি তো তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না। কিন্তু মা! তোমার জীবন হইতে যে বংশের পবিত্রতা, ধর্ম্মের মহত্ত্ব, ও সতীত্ব গরীয়ান্, তাহা ভুলিও না। এখন তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর। আমি তোমার পিতা, আমার কর্ত্তব্য তোমাকে রক্ষা করা, তাহা আমাদ্বারা হইল না।" এই বলিয়া কন্যার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

কন্যা হাস্যমুখে বলিলেন "পিতঃ! চিন্তা কি? অগ্নিকুণ্ড প্রস্তুত করুন। আমি জানি, এছার দেহ অগ্নিসাৎ ভিন্ন আমার পরিত্রাণের অন্য উপায় নাই।"

পাঠিকে! এই সেই মহাযজ্ঞ! মহাযজ্ঞে মহাবলি প্রদত্ত হইল। ইতিহাস জানে এই যজ্ঞের শেষ ফল কি?

যোগ-মাহাত্ম্য। *

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্‌যোগী ভবার্জুন॥

যোগী তপস্বীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কর্ম্মীদিগের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, অতএব হে অর্জ্জুন, তুমি যোগী হও।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমোমতঃ॥

শ্রদ্ধাবান্ ও অন্তরাত্মার সহিত মদ্গতচিত্ত হইয়া যে আমাকে ভজনা করে, সে সকল যোগীর মধ্যে শ্রেষ্ঠতম যোগী।

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে॥

যে সর্ব্বভূতে অবস্থিত আমাকে অভিন্নভাবে ভজনা করে, সে যোগী সকল অবস্থার মধ্যে থাকিয়াও আমাতে অবস্থিতি করে।

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুনঃ।
সুখং বা যদি বা দুঃখং সযোগী পরমোমতঃ॥

হে অর্জুন আপনার সহিত তুলনা করিয়া যে ব্যক্তি সর্ব্বজীবকে সমান দেখে এবং সুখ দুঃখে সমভাবাপন্ন, আমার মতে সেই পরম যোগী।

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ॥

যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত ব্যক্তি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া পরমাত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূত পরমাত্মায় অবস্থিত দর্শন করে।

* শ্রীমদ্ভগবৎগীতা অধ্যায়ের অভ্যাস যোগ হইতে গৃহীত।

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি।।

যে ব্যক্তি সর্ব্বত্র আমাকে দেখে এবং আমাতে সকল বস্তু অবলোকন করে, আমি তাহার বিনাশক হই না, সেও আমার বিনাশক অর্থাৎ বিশ্বাসঘাতী হয় না।

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমং।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষং।।

রজোবিহীন প্রশান্তচিত্ত নিষ্পাপ ব্রহ্মগতপ্রাণ যোগীকে সর্ব্বোত্তম সুখ অর্থাৎ ব্রহ্মসমাধিজনিত পরম সুখ আপনিই আশ্রয় করে।

যুঞ্জন্নেব সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শ মত্যন্তং সুখমশ্নুতে।।

মন সর্ব্বক্ষণ বশীভূত রাখিয়া বিগত-পাপ যোগী অনায়াসে ব্রহ্ম সংস্পর্শের যে অত্যন্ত সুখ, তাহা ভোগ করেন অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হন।

পুস্তকাদি প্রাপ্তি ও সমালোচনা।

১। তারা মা—পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন প্রণীত এবং বাবু জ্ঞানচন্দ্র চৌধুরী এম এ কর্ত্তৃক প্রকাশিত জগৎ-জননী সকল জীবের তারণকর্ত্রী যিনি, তিনিই তারা মা। গ্রন্থকার অতি উদার ভাবেই সকল ভক্ত প্রাণের সহিত মিলিত হইয়া সেই মার পূজা করিয়াছেন এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সকল ভক্তই প্রাণের সহিত ইহাতে যোগ দিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন। ইহাতে যে পূজা অনুষ্টিত হইয়াছে, তাহা আদ্যন্ত প্রাণের পূজা, সুতরাং সরলতা, বিশ্বাস ও ভক্তি প্রেমে পূর্ণ, বলা বাহুল্য। ইহার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা কবিতা সেই প্রাণের ভাষাতেই রচিত। গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা অধিক কথা কি বলিব? গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য "তারা মা'র আধ্যাত্মিক মহা পূজা ইহাদ্বারা জগৎময় প্রচারিত হউক।

২। কুম্ভমেলা—শ্রীমনোরঞ্জন গুহ প্রণীত—প্রয়াগতীর্থে গত মাঘ মাসে যে মহা মেলা হইয়াছিল, তাহার সুন্দর চিত্র ইহাতে অঙ্কিত হইয়াছে। যাঁহারা মেলায় উপস্থিত হইতে পারেন নাই, এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে তাঁহারা তাহার দৃশ্য কতক পরিমাণে হৃদয়ঙ্গম করিয়া তীর্থ যাত্রার ফলও কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করিতে পারিবেন। লেখকের সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না হইলেও তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ের সহিত হৃদয় যোগ করিয়া আমরা পরমানন্দ লাভ করিয়াছি। পুস্তকখানি ভক্তিরসপ্লুত লেখনী বিনিঃসৃত এবং সাধুভক্তি উদ্দীপনের বিশেষ সহায়।

৩। জীবনী-কোষ—শ্রীদ্বারকা নাথ বসু প্রণীত, মূল্য ১৲ টাকা। গ্রন্থকার অনেকগুলি ব্যবহারোপযোগী গ্রন্থ প্রচার

করিয়া প্রশংসিত হইয়াছেন। তাঁহার বর্ত্তমান গ্রন্থখানি সর্ব্বসাধারণের উপকারী বলিয়া বিশেষ আদরণীয় হইবে। পুরাণ, ইতিহাস ও কাব্য প্রভৃতিতে উল্লিখিত মহাত্মা এবং বর্ত্তমান কাল প্রসিদ্ধ নরনারীদিগের জীবন বৃত্তান্ত ইহাতে বর্ণিত আছে। বৃত্তান্ত সকল সংগ্রহে গ্রন্থকার যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার করিয়াছেন। এ গ্রন্থপাঠে স্থূলভাবে এদেশের পুরাণ, ইতিহাস ও ধর্ম্মশাস্ত্রের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। এরূপ গ্রন্থের উৎসাহ দান করা সর্ব্ব সাধারণের কর্ত্তব্য।

৪। বামাবোধীনীর বিশেষ আনন্দ, ক্রমে বঙ্গসাহিত্য সমাজে অধিকতর সংখ্যক সুলেখিকা আভির্ভূত হইয়া ইহার মুখোজ্জ্বল করিতেছেন। আমরা বঙ্গমহিলা রচিত যে তিন খানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ অল্পকাল মধ্যে দর্শন করিয়াছি, তাহার সবিস্তর সমালোচন না করিলে গ্রন্থকর্ত্রীদিগের প্রতি ন্যায়াচরণ করা হয় না। স্থানাভাবে এবার সে সম্বন্ধে মনোভিলাষ পূর্ণ করিতে না পারিয়া কেবল প্রাপ্তি মাত্র স্বীকার করিলাম ঃ—

(১) কাব্যকুসুমাঞ্জলি—শ্রীমতী মানকুমারী প্রণীত ও পণ্ডিত তারাকুমার কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রাকাশিত, মূল্য ১৲ টাকা।

(২) প্রতিধ্বনি—শ্রীমতী মৃণালিনী প্রণীত, ১নং হারিণ্টন ষ্ট্রীট হইতে শ্রীযুক্ত তারাগতি ভট্টাচার্য্য দ্বারা প্রকাশিত।

(৩) প্রেমলতা—স্নেহলতা রচয়িত্রী কর্ত্তৃক প্রণীত, মূল্য ১৷৹ মাত্র।

নূতন সংবাদ।

১। চীন ও জাপানের যুদ্ধে পিঙ্গিয়াঙ্গ নামক স্থানে জাপানীরা পরাভূত ও তাহাদের পাঁচ সহস্র সৈন্য নিহত হইয়াছে। চীনদিগের বিজয়ী সেনাপতির নাম ইয়ে, তাঁহার বর্ণনায় চীন সেনা অল্পমাত্র বিনষ্ট হইয়াছে। ইংরেজ রুষ প্রভৃতি জাতি নিরপেক্ষ হইয়া ইহাদের কাণ্ড দর্শন করিতেছেন। ইউরোপের ন্যায় আসিয়ায় শান্তি সংস্থাপনার্থ অন্তর্জ্জাতিক সভা সমিতি নাই, চীনজাপানীরা সতর্ক না হইলে পরস্পরের বিবাদে উৎসন্ন যাইবে

২। আমেরিকা প্রবাসী স্বামী বিবেকানন্দের সম্বর্দ্ধনার্থে কলিকাতার টাউনহলে এক মহাসভা হইয়াছিল, তাহাতে হিন্দুদিগের সকল শ্রেণীর লোক যোগ দিয়া দেশহিতৈষিতার পরিচয় দিয়াছেন। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন।

৩। নবাব মীর মহম্মদ আলি ৬০ হাজার টাকার ভূসম্পত্তি দান করিয়াছেন, তাহার আয়ে দরিদ্রদিগের জন্য বিদ্যালয় চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইবে। নবাব যথার্থই উন্নত-হৃদয় নবাব নামের যোগ্য

৪। স্থানান্তরে 'নথ' সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ প্রকটিত হইয়াছে, তাহাতে আনাম দেশ বাসীদিগের নথ রক্ষা প্রথার উল্লেখ আছে। আনামের রাজার নথ অধিক মূল্যবান্ সন্দেহ নাই, ইহা রক্ষার জন্য তাঁহার প্রধানা ৫টী মহিষীর একটি নিযুক্তা। তাঁহার স্ত্রীর সংখ্যা একশত।

৫। ফরিদপুর বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ খুব প্রবল। নব্য ভারত লিখিয়াছেন ফরিদপুরের মধ্যে অনাহারে ৯টী লোকের মৃত্যু হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ পীড়িতদিগের প্রাণ রক্ষার্থ সাধারণের সাহায্য দান নিতান্ত আবশ্যক।

৬। বামাবোধিনীর ৩০ জন্মোৎসব উপলক্ষে যাঁহারা পারিতোষিক রচনা লিখিয়াছিলেন, তাহাদিগের মধ্যে কেবল শ্রীমতী মানকুমারী বসুর "বিগত শত বর্ষে রমণী দিগের অবস্থা" পরীক্ষকদিগের মতে পারিতোষিক যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। তিনি ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা পারিতোষিক পাইবেন।

বামারচনা।

সঙ্গীত বাদ্য স্ত্রীলোকের পক্ষে আবশ্যক।

আমাদের দেশে অধিকাংশ ব্যক্তি কুলরমণীগণের সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষার বিদ্বেষী। তাঁহারা জানেন না যে এই দুটী রমণীকুলের কত উপকারক। প্রথমতঃ গীত বাদ্য দ্বারা আপনার মন প্রফুল্ল রাখা যায়। মানসিক যন্ত্রণায় হৃদয়াকাশে আনন্দরূপ চন্দ্রালোক বিতরণ করিতে সমর্থ হয়, ইহার মত এমন কি আছে? অতএব সঙ্গীত বাদ্য মানসিক যন্ত্রণা অন্তর্হিত করিবার এক মাত্র মহৌষধ। দ্বিতীয়তঃ সঙ্গীত বাদ্যে মনের প্রফুল্লতা বশতঃ স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এই দুটী উপকার ব্যতীত সঙ্গীত বাদ্য রমণী কুলের আর একটী প্রধান উপকার করে; সে উপকারটী স্বামীকে সৎপথে রাখা।

স্বামী বিষম বিষাদে মগ্ন হইলেও গীত বাদ্যদ্বারা স্ত্রী স্বামীকে সদানন্দে রাখিতে পারেন। আমাদের কুল-মহিলা দিগের জন্য যদি সঙ্গীত বাদ্য প্রচলিত থাকিত, তাহা হইলে প্রতিদিন এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া সর্ব্বস্বান্ত হইত না এবং তাহাদের অভাগিনী মাতা ও স্ত্রী হৃদয়ে দুর্ব্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করিতেন না। অনেক পুরুষ শুধু সঙ্গীত বাদ্যের বিমলানন্দ উপভোগের জন্য কুপথে গমন করিয়া থাকেন। পরিণামে অবস্থা ভয়ানক শোচনীয় হইয়া দাঁড়ায়। পুরুষ এরূপ কুপথে যায় কেন? কুলমহিলা দিগের সঙ্গীত বাদ্যের অভাব যে ইহার একটী প্রধান কারণ তাহা বোধহয় প্রকাশ্যে না হউক অন্তরে সকলে

স্বীকার করিবেন। যে সঙ্গীত বাদ্যের সুধারস আস্বাদনের জন্য অর্থ ব্যয় করিয়া পুরুষ কুপথগামী হইতে কুণ্ঠিত হয় না, যদি সেই সঙ্গীত বাদ্যের সুধারস গৃহে বসিয়া অস্বাদন করিতে পাইতেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতি নিয়ত এত পুরুষ কুপথগামী হইয়া নিজের নন্দন কাননরূপ সংসারে অশান্তিরূপ অগ্নি জ্বালিতেন না। অনেক স্ত্রীলোকে মনে করেন সঙ্গীত বাদ্য একটা লজ্জার বিষয়, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা নহে। যাঁহারা এরূপ করিয়া থাকেন তাঁহাদের ধারণা ভুল। সঙ্গীত বাদ্য পিতা মাতা, শ্বশুর শাশুড়ী ভাশুর ইত্যাদি সকলের কাছে করা যাইতে পারে। তবে কতগুলা অশ্লীল গান কণ্ঠস্থ করিয়া সেই গুলা গাওয়া অন্যায় ও ঘৃণাকর। ভগিনীগণ তোমরা গুরুজনের সম্মুখে বীণা বাজাইয়া ঈশ্বরের গুণ গান কর, তাহাতে কেহ নিন্দা করিবে না এবং সংসার সুখের হইবে। গীত বাদ্য যদি একটা লজ্জাকর কার্য্য হইবে, তাহা হইলে আর্য্য মহিলাগণ যত্নের সহিত গীতবাদ্য শিক্ষা করিতেন না। তাঁহারা কি নিলর্জ্জা ছিলেন? তাহা কখনই নয়। প্রাচীন আর্য্যমহিলাদিগের ন্যায় লজ্জাবতী রমণী আমাদের মধ্যে কয় জন? কি দুঃখের বিষয় এক সময় যে দেশের কুল মহিলাগণ যত্নের সহিত সঙ্গীত বাদ্য শিক্ষা করিয়াছিলেন, অধুনা সেই দেশের রমণীগণই এই মঙ্গলকর কার্য্যকে লজ্জাকর কার্য্য ভাবিয়া দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন। যে দিন আমাদের কুলমহিলাগণ প্রাচীন আর্য্য মহিলার ন্যায় বীণা বাজাইয়া গান গাহিতে শিখিবেন, সেই দিন হইতে পুরুষ আর কুপথগামী হইবে না; দম্পতিদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়া সংসার বিষময় হইবে না। সেই দিন হইতে আমরা সংসারে স্বর্গ লাভ করিব।

লেখিকা

নগেন্দ্র বালা মুস্তোফী।

৺অম্বিকা দেবজায়ার উদ্দেশে চিত্রপট।

আমার আঁধার ঘরে,
এ কে গো বিরাজ করে,
লক্ষ্মী-প্রতিমার মত এ কার প্রতিমা!
মাধুর্য্য সৌন্দর্য্যময়ী,
দয়াময়ী, স্নেহময়ী,
মানবীতে সম্ভবে কি এত মধুরিমা?
ভূতল পবিত্র করি,
বুঝি কোন দেবনারী,
খেলা করে চলে গেল আপন আবাসে।
আমরা কি লয়ে রব,
এই চিত্রপট তব,
পূজিব চিরজীবন অশ্রুনীরে ভেসে।
সুধু কি এ প্রতিমূর্ত্তি,
কত তব পুণ্যকীর্ত্তি,
কত স্নেহ কত দয়া জাগিছে হৃদয়ে!

সতী লক্ষ্মী তুমি দেবী,
আদর্শ জীবন লভি,
করিলে মানবী লীলা মরত আলয়ে।
মর্ত্ত্যেও দেবতা পতি,
লভেছিলে তুমি সতি,
কে বলে মানব তাঁরে তিনিও দেবতা।
শাঁপভ্রষ্ট দুজনায়,
জনমিলে এ ধরায়,
পালিলে সতীত্ব ধর্ম্ম অয়ি প্রতিব্রতা!
হরিনাম লয়ে মুখে,
জীবন ত্যজিলে সুখে,
অটল বিশ্বাস বুকে, নির্ভয় হৃদয়;
আপন পুণ্যের বলে,
কি আনন্দ মৃত্যুকালে,
শুভদিনে চলে গেলে অমর আলয়।
কৃতান্ত যন্ত্রণা দিতে,
পারে কি ও শরীরেতে,
মৃত্যুছায়া না পড়িল ও পবিত্র দেহে;
অপ্সরা মূরতি ধরি,
হাসি মুখে কায়া ছাড়ি,
গেলে চলি সুরনারী আপনার গেহে॥

শ্রীমতী সু—ঘোষ।
নওগাঁ।

স্বপন।

১

দেখিনু স্বপনে আর বসন্ত না হবে,
প্রকৃতির সে ক্ষমতা নাহিক এখন,
কু আশায় ধূমজালে আবৃত সে পথ,
দ্বারে আসি মিছে কথা বলে সর্ব্বজন।

২

জনপদ ছাড়ি আমি চলিনু সুদূরে,
দেখিলাম বনলতা কণ্টকে আবৃত,
কাঁটাগুলি লইনাম বাঁধিতে ললাটে,
বিজয়-মুকুট সম পরিলাম শিরে।

৩

কত যে শুনিনু আমি ঘৃণা কটু কথা
যুবক বালক আর বৃদ্ধের নিকট,
সভামাঝে সমস্বরে বলিলেক তারা
কাঁটার মুকুট মাথে বোকা সে নিশ্চয়।

৪

বলিতে লাগিল সবে নির্ব্বোধ বালিকা।
নিশায় দেখিনু এক স্বরগের দূত;
অধরে নাহিক ভাষা, উজ্জ্বল নয়ন;
নীরবে মধুরে হাঁসি দেখেন মুকুট।

৫

ক্রমে হস্ত পরিমিত হ'ন অগ্রসর
ছোঁবা মাত্র কণ্টক হইল পারিজাত,
সে ভাষা মুখের ভাষা কভু না সম্ভবে
বলিলেন "ধন্যা তুমি নারী ভাগ্যবতী।"*

শ্রীমতী সুশীলাবালা বসু।

* শেষচরণ অল্প পরিবর্ত্তিত। বা, বো, স।

*** পারিতোষিক রচনা—বাবু ব্রজমোহন দত্তের পারিতোষিক প্রবন্ধ গত শ্রাবণ মাসের সংখ্যায় বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৭ সংখ্যা	আশ্বিন ১৩০১—অক্টোবর ১৮৯৪।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

মূক বধির বিদ্যালয়—এই বিদ্যালয়ের শিক্ষক বাবু যামিনীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ১২ই সেপ্টেম্বর বিলাত যাত্রা করিয়াছেন। তিনি তথা হইতে মূক বধির এবং অন্ধদিগের সম্পূর্ণ শিক্ষাপ্রণালী শিক্ষা করিয়া আসিবেন। মূকবধির বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষগণ তাঁহার জন্য অনূ্যন ৬ হাজার টাকা ব্যয়ের ভার লইয়াছেন। দেশহিতৈষী নরনারীগণের এ সাধুকার্য্যে মুক্তহস্তে সাহায্য করা উচিত।

ইংলণ্ডেশ্বরীর বিদ্যাবত্তা—মহারাণী বিক্টোরিয়া ইউরোপীয় ১১টী ভাষায় ব্যুৎপন্ন, ইহার উপর হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। ভারতীয় কোনও ব্যক্তি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলে তিনি বিশুদ্ধ হিন্দীভাষায় আলাপ করিয়া থাকেন।

লণ্ডন দাতব্য—এক লণ্ডন সহরে ধনাঢ্য লোকের মৃত্যুর সময়ে সাধারণ হিতকর কার্য্যে দান প্রতি বৎসরে প্রায় ২কোটী টাকা। ইহাতেই তথায় এত দেশ-হিতকর অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। এ দেশের ধনাঢ্যদিগের অর্থ মোকর্দ্দমা ও পোষ্য-পুত্রে প্রায় নিঃশেষিত হয়।

লেডী ডফারিণ—ভারত-হিতৈ-ষিণী এই অশেষ গুণবতী রমণীর নাম আমাদের বিশেষ প্রিয়। ইনি কেবল দয়ার কার্য্যে প্রসিদ্ধ নন, বিদ্যাতেও সুবিখ্যাত। ইহাঁর রচিত কাব্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ অল্প দিনে নিঃশেষিত হইয়াছে, দ্বিতীয় সংস্করণ শীঘ্র প্রকাশিত হইবে।

স্ত্রী-বারিষ্টার—মিস্ মেল্‌বা এস টাইটস গত জুন মাসে নিউইয়র্কে আইন পরীক্ষা দিয়া এল এল বি উপাধি পাইয়াছেন। তাঁহার শ্রেণীতে ১০৫ জন পুরুষ ও ৫ জন স্ত্রীলোক ছিলেন, তিনি পরীক্ষায় ৪র্থ হইয়াছেন।

স্ত্রী ডাক্তার—কুমারী হ্যামিল্‌টন আফগানিস্থানের আমীরের জেনানা ডাক্তার হইয়া ভারতবর্ষ হইতে গিয়াছেন। তিনি যথায় যান, তাঁহার দেহরক্ষীরূপে ৬ জন সৈনিক গমন করিয়া থাকে।

স্ত্রী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠাত্রী—বিবী ফেঞ্চ সেলডন একবার আফ্রিকা ভ্রমণ করিয়া আসিয়াছেন, তথায় এক নব জাতি প্রতিষ্ঠার জন্য পুনরায় যাইবেন এই জন্য ইংলণ্ডে বন্দোবস্ত করিতেছেন। জাঞ্জিবারের উত্তরে একটী বাণিজ্য বন্দর করিবেন। ৩০০ মার্কিন শ্রমজীবী তথায় যাইতে প্রস্তত।

বাল্মীকি চরিত।

যে প্রসিদ্ধ দস্যু রত্নাকর পূজ্যবর দেবর্ষি নারদের মহামন্ত্রে দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া অমর কবি বাল্মীকি নামে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছেন, বর্ত্তমান প্রবন্ধের বাল্মীকি তিনি নহেন। ইনি দ্বাপর যুগের জনৈক ভক্তিমান্ বৈষ্ণব। ত্রেতা যুগের বাল্মীকির ন্যায় ইহাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রসিদ্ধি না থাকিলেও সসাগরা সদ্বীপা অবনীর অধীশ্বর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্টির ইহাঁকে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন, অধিক কি মহারাজ যুধিষ্টিরের জগদ্বিখ্যাত রাজসূয় যজ্ঞ উক্ত মহাত্মার আগমনেই সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

জাতিভেদ অথবা জাত্যভিমান থাকার দোষগুণ সম্বন্ধে আমরা এখানে কোন বিচার করিতেছি না, তবে বলিতে চাহি সর্ব্বেশ্বর জগদীশ্বরের নিকট "ভক্তের জাতিভেদ" নাই একথা সর্ব্ব সাধারণের স্বীকার্য্য এবং সেই হিসাবে ধরিলে নীচ জাতি বলিয়া কাহাকে অশ্রদ্ধা অথবা ঘৃণা করা অন্যায়। যাহাহউক এ প্রবন্ধের বাল্মীকি মহাশয় জাতিতে রোহিদাস অর্থাৎ মুচি ছিলেন। আমরা তাঁহাকে অশ্রদ্ধা ক র, তাহাতে তাঁহার ক্ষতি কি? যে শ্রীকৃষ্ণ হিন্দুজাতির নিকট পূর্ণব্রহ্মের অবতার, তিনি স্বয়ং এই ভক্তের অপ্রমেয় সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা করিয়া গিয়াছেন। যখন পৃথিবীস্থ যাবতীয় পরাক্রান্ত জাতি পরাস্ত হইয়া মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধার্ম্মিক প্রবর যুধিষ্টিরের আশ্রয় লইয়াছিলেন, সেই সময় তিনি মহাসমারোহে রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। সেই মহাযজ্ঞে সদাত্মা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র সকল শ্রেণীর লোকেই সমাগত হইয়াছিলেন, লক্ষ

লক্ষ বিদেশীয় নরপতি মহারাজের চরণপ্রান্তে মস্তক অবনত করিয়াছিলেন, মহাসমারোহে লক্ষ লক্ষ ব্রাহ্মণকে অপরিতোষ ভোজ্য দান, নানাবিধ যাগ যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। অনুষ্ঠেয় যাবতীয় ক্রিয়া সুসম্পন্ন হইলে যজ্ঞীয় শঙ্খ নিনাদ দ্বারা যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করা হইয়াছিল।

কিন্তু এই যজ্ঞের পরিসমাপ্তি কালে প্রথমে শঙ্খ ঘণ্টার স্বর বন্ধ হইয়াছিল, কোন চেষ্টাতেই কেহ তাহা বাজাইতে সক্ষম হইল না। এরূপ অমঙ্গল দর্শনে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা মহারাজ যুধিষ্ঠির নিতান্ত ভীত চকিত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেনঃ—

"শঙ্খ ঘণ্টা না বাজিল, ছিদ্র কি হইল ?"
কৃষ্ণ কহে "মহৎ ছিদ্র বৈষ্ণব না খাইল ;
যেহেতু অপূর্ণতায় শঙ্খ না বাজিল ;
শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতে বিধিহীন হৈল।"

যুধিষ্ঠির যজ্ঞের অপূর্ণতা শুনিয়া বসিয়া পড়িলেন, এত ধুমধাম এত ব্যয় ব্যসন করিয়া যজ্ঞ করিলেন, তাহা স বিফল হইল ভাবিয়া তাঁহার মাথা ঘুরিয়া গেল ! তিনি পূর্ব্বাপর সমুদায় চিন্তা করিলেন, অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ব্যগ্র-ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহাত্মন্ ! এই অসংখ্য অসংখ্য সদাচারী ব্রাহ্মণ, লক্ষ লক্ষ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, পরিতোষপূর্ব্বক ভোজ্য গ্রহণ করিলেন, ইহাঁদিগের মধ্যে কেহই কি বৈষ্ণব নহেন ?"

"কৃষ্ণ কহে নাহি, নাহি, শুদ্ধ ভক্ত যারা,
যজ্ঞেতে আসিয়া কেন খাইবেক তারা ?"

যুধিষ্ঠির অস্থির হইয়া পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "কৃষ্ণ তবে উপায় ?" তখন মহাপ্রাজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন, মহা-রাজ, তোমার এই নগরের মধ্য অতি পবিত্র, ভাগবত, শুদ্ধচেতা, পরম বৈষ্ণব রোহিদাস বাল্মীকি ; তুমি সযত্নে সেই মহাত্মাকে আহ্বান করিয়া সম্বর্দ্ধনা কর।

মহাত্মা যুধিষ্ঠির প্রসন্নমনে কৃষ্ণাদেশ পালনে প্রস্তুত হইলেন, মহানন্দে ভীমা-র্জ্জুনকে বাল্মীকি সন্নিকটে পাঠাইলেন ; তাঁহার সম্বর্দ্ধনা ও অভ্যর্থনাজন্য নগর পুন-র্ব্বার নব বেশে সজ্জিত হইতে লাগিল, যেন পুনরায় নব যজ্ঞের উদ্‌যোগ হইতেছে; অন্তঃ-পুরে পুনরায় রন্ধন ক্রিয়ারম্ভ হইল! আর মহারাজ চক্রবর্ত্তী ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির একজন নিতান্ত অপরিচিত গরীব মুচির অপেক্ষায় সোৎসুকনয়নে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। হায় হায় ! প্রাণসখা কৃষ্ণের প্রতি এত বিশ্বাস, এত ভক্তি না থাকিলে কি নির্ব্বাসিত যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইতে পারিতেন ? ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, চাতুর্ব্বর্ণ জাতি সমুহের শ্রেষ্ঠ হইয়া দিগ্‌দিগন্তরে প্রসিদ্ধ পরাক্রান্ত ভূপালগণের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা হইয়া ভক্ত-প্রবর যুধিষ্ঠির আজ কৃষ্ণের সামান্য অস্পৃশ্য চর্ম্মকারের সেবা সন্তুষ্টির জন্য ব্যাকুল, চিন্তিত, ও পরম আগ্রহান্বিত।

যাহাহউক এদিকে চর্ম্মকার পল্লীতে দরিদ্রতম বাল্মীকি মহোদয় গৃহে নিমী-

লিত-লোচনে ইষ্টদেবের চিন্তায় বাহ্যজ্ঞান শূন্য, এমন সময়ে বীরাগ্রগণ্য ভীমার্জ্জুন স্বদলবলে, তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হইলেন। রোহিদাসের সেই ভক্তি-পূর্ণ বিশাল বক্ষস্থল, জ্যোতির্ম্ময় মুখাবয়ব, চাক্‌চিক্যময় প্রশস্ত ললাট দর্শনে ভীমা-র্জ্জুনের মনে যুগপৎ ভক্তি ও আনন্দের উদয় হইল।—তাঁহাদিগের অবস্থানু-যায়ী বীর্য্য, পরাক্রম, খ্যাতি, যশ, গর্ব্ব, সকলই ভক্ত সন্দর্শনে অবনত ও অন্তর্হিত হইল। দুই ভ্রাতার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না, ভয়ে সবেগে বাল্মীকির পদদ্বয় লইয়া বক্ষে ধারণ করিলেন। চমকে ভগ্নধ্যান হইয়া বাল্মীকি মহোদয় সত্রস্তে নেত্রোন্মীলন করিলেন, দেখিলেন, মহা পরাক্রান্ত রাজানুজ, মধ্যম ও তৃতীয় পাণ্ডব, পদতলে পতিত। তিনি ভীত চকিত হইয়া কিছু উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, বালকের ন্যায় হাউ হাউ করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। বাল্মীকির সেই দীনভাব দেখিয়া ভীমার্জ্জুনও অশ্রু সংবরণ করিতে পারিলেন না। বহুক্ষণ অশ্রুলীলার পর ভীম মহাশয় কম্পিত-কলেবরে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা নিবেদন করিয়া কহিলেন, "হে বৈষ্ণবকুলতিলক! দেব-দুর্লভ আপনার পদ-রজোদানে ইন্দ্রপ্রস্থের রাজপুরী পবিত্র করিতে হইবে, অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক রাজধানীতে শুভাগমন করুন।" আহা! নিরক্ষর বাল্মীকি অত উচ্চ সাহিত্য উপলব্ধি করিতে পারিলেন না; তবে বুঝিলেন, যে তাঁহাকে রাজবাটী যাইতে হইবে। তখন ধীরে ধীরে বৈষ্ণবোচিত বিনয় সহকারে বলিলেন :—

"তবে যদি যাব আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি।
মো সমান যোগ্য কর্ম্ম করিবারে পারি॥
উচ্ছিষ্ট পাড়িব আর ঝাড়ু বাড়ু দিব।
পদ ধোয়াইতে মুঞি যোগ্য না হইব॥"

যাহাহউক, বাল্মীকি যাহাই বলুন, ভীমার্জ্জুন মহাসমারোহে তাঁহাকে রাজ-প্রাসাদে লইয়া গেলেন। মহারাজ যুধিষ্ঠির কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার অভ্যর্থনা ও সম্বর্দ্ধনা করিলেন, পরিতোষপূর্ব্বক তাঁহাকে ভোজন করাইলেন। ভক্তপ্রবর বাল্মীকি এ রহস্য কিছুই বুঝিলেন না। বিরক্ত হইয়া, "কৃষ্ণ কহ, কৃষ্ণ কহ" বলিতে বলিতে নেত্র নিমীলিত করিলেন। তাঁহাকে পুনরায় সমারোহে স্বধামে রাখিয়া আসা হইল। হরিধ্বনি করিয়া মহা-যজ্ঞ সম্পন্ন হইল। যজ্ঞীয় শঙ্খ যেন বাল্মী-কির সম্মান বৃদ্ধির জন্যই এতক্ষণ নীরব ছিল, এখন শঙ্খঘণ্টা উচ্চৈঃস্বরে বাজিয়া যজ্ঞের সম্পূর্ণতা ঘোষণা করিতে লাগিল। মহারাজা আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবে-চনা করিয়া, মনে মনে বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য চিন্তা করিতে লাগিলেন।

ফলতঃ এই বাল্মীকি চরিতে ভগ-বানের আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশিত। "শুদ্ধ ভক্তিতেই ভগবান্ বাধ্য," জাতি ধন বুদ্ধি বিদ্যা পদমর্য্যাদার অপেক্ষা নাই, এই বাল্মীকি তাহার অন্যতম জাজ্জ্বল্য

উদাহরণ। শ্রুতিপুরাণ, গীতা ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্রও এই তত্ত্ব ঘোষণা করিতেছেন, যথা—যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ। যে আমার ভক্ত, সেই আমার প্রিয়। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিপ্রিয়োমাধবঃ। ভগবান্ ভক্তিতে বদ্ধ, ভক্তিপ্রিয়।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৬ সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর।)

"নচাপত্যসমঃ স্নেহঃ" এ কথা প্রায় সকল জীব জন্তুর পক্ষেই খাটে। আমাদের গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগের মাতৃ-স্নেহ অনেকেই দেখিতে পান। আরও আশ্চর্য্য এই যে মাতৃ-প্রকৃতি-প্রাপ্ত হিংস্রজন্তুগণও স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে শাবকাদি পালন করে!—মানবশিশু তাহাদের ভক্ষ্য হইলেও তাহারা নিরাশ্রয় মানবশিশুকে পাইলে স্বীয় সন্তানবৎ প্রতিপালন করে; পুস্তকাদিলিখিত "ব্যাঘ্রপালিত মানুষ" এবং কলিকাতা দাসাশ্রমের "ভল্লুকপালিতা কন্যা" ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। যাহা হউক, মাতৃ-স্নেহ ইতর ও হিংস্র জন্তুর মনেও যখন এত প্রবল, তখন জীবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম, হৃদয়বিশিষ্ট মানবজাতির মাতৃ-স্নেহ যে অপরিসীম ও চিরস্থায়ী, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। সন্তান গর্ভস্থ হইলে সেই ভ্রূণের উপরেই মাতার স্নেহসঞ্চার হয়। গর্ভস্থ শিশু কিসে নিরাপদ থাকিবে, কিসে সুস্থ দেহে ভূমিষ্ঠ হইবে, ইহাই মাতার ভাবনা। স্নেহাতিশয়ে আনন্দ ও আগ্রহে মাতা প্রসবকাল পর্য্যন্ত গর্ভ-যন্ত্রণা সহ্য করেন; তাহার পরে নিদারুণ প্রসববেদনা—যে যন্ত্রণা ব্যক্ত করিতে মানবের সাধ্য নাই, যে যন্ত্রণার পরিণাম মৃত্যুও হইতে পারে, সেই দুঃসহ বেদনা সহিয়াই মাতা সন্তান প্রসব করেন। আবার সদ্যঃপ্রসূতা মাতা সন্তানের মুখ দেখিয়া এত আনন্দিতা হন, সন্তানের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় এত ব্যগ্র হন, যে নিজের মরণাধিক ক্লেশ উপেক্ষা করিয়া প্রাণের সন্তান হীনাঙ্গ হইয়াছে কিনা, তাহার শারীরিক ক্রিয়া সকল উপযুক্ত রূপে সম্পাদিত হইতেছে কিনা ইহাই মাতার প্রধান চিন্তনীয় হয়। সেই চেতনাবিশিষ্ট জড়বৎ শিশুটীকে "মানুষ" করা যে কি আয়াসসাধ্য কি শ্রমসাধ্য, তাহা মাতাই জানেন, আর পরম মাতাই জানেন। সেই অসহায় নিরাশ্রয় শিশুটী মাতার হৃদয়ের শোণিত, জীবনের আনন্দ, মমতার পুতলীরূপে পালিত হয়—তাহার সকল অভাব পূর্ণ হয়। একই মা তাহার ধাত্রী, দাসী ও মেথরাণী রূপে নিযুক্তা থাকেন। মল মূত্রে মাতার শরীর ডুবিয়া থাকে, স্তন্য

রূপে অজস্র শোণিত ব্যয় হইয়া শরীর কৃশ হইতে থাকে, তাহাতেও মা'র কত আনন্দ! শিশুর পীড়া হইলে মাতা রোগীর ন্যায় স্নানাহার ত্যাগ করেন, রোগীর ন্যায় ঔষধ পথ্য গ্রহণ করেন; শিশুর শরীর-পোষণ আশয়ে মাতা স্তন্যবৃদ্ধিকর আহার পানীয় গ্রহণ করেন এবং শিশুপালন অনুরোধে মাতাই ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা প্রভৃতি শারীরিক বৃত্তি সকলকে সংযত করেন। দাসত্বের মহত্ব, আত্মত্যাগের দেবত্ব মাতৃ-হৃদয়ে মাতৃ-ব্যবহারে সর্ব্বদাই দেখা যায়। এ জগতে সাধারণ মানব সুখপ্রার্থী; যে কেহ সুখের ক্ষতি করে, সাধারণ মানব তাহার হাত এড়াইতে পারিলেই বাঁচে। কিন্তু অলৌকিক—মাতৃ-চরিত্র ইহার বিপরীত। এ জগতে সন্তানের জন্য মা "সর্ব্বসুখহারা" বলিলেও অত্যুক্তি হয় না—দেহ শিশুর মল মূত্র বমনাদি লিপ্ত, আহার নিদ্রাদি হইতে বঞ্চিতা, রোগাদির জন্য সদাই শঙ্কিতা—এত দুঃখভাগিনী মা কেবল সন্তানেরই জন্য; কিন্তু সন্তান কর্ত্তৃক মাতৃ-হৃদয় এত নিপীড়িত হইলেও, মাতার বিরক্তি দূরে থাকুক, স্নেহ-সিন্ধু সহস্র স্রোতে উথলিয়া সেই সন্তানকে ডুবাইতে থাকে! আবার সন্তানের মধ্যে যেটী কাণা খোঁড়া প্রভৃতি বিকলাঙ্গ, অথবা পীড়িত, মূর্খ, বা দরিদ্র বলিয়া জন-সমাজে অবহেলনীয়—এক কথায় যে সন্তানটী হইতে মাতার সুখ, শান্তি, আশা প্রভৃতি সমূলে বিনষ্ট হই'। থাকে, সেই হতভাগ্য সন্তানটীই মা'র বড় যত্নের ধন—বড় আদরের জিনিস হয়! নিষ্ঠুর সংসার "অধম" দেখিয়া পাছে পদ-দলিত করে, এই ভয়ে মা সেই দুর্ভাগ্য জীবটীকে স্নেহের বুক দিয়া ঢাকিয়া রাখেন! এমন নিঃস্বার্থতা, এমন স্বর্গীয় প্রেম, জগৎ আর দেখিবে না! মাতৃ-হৃদয়ের উপমেয় পদার্থ জগতে আর মিলিবে না! এইজন্যই, মাতৃ-তত্ত্ব বুঝিয়া মাতৃভক্তিরূপ মহাসাগরে ডুবিয়া আর্য্য ঋষিগণ, হৃদয়ের পূর্ণ উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া গিয়াছেন,

"নাস্তি মাতৃ-সমা ছায়া
নাস্তি মাতৃ-সমা গতিঃ।
নাস্তি মাতৃ-সমং ত্রাণং
নাস্তি মাতৃ-সমা প্রিয়া॥"

"মাতার ন্যায় ছায়া আর নাই, মাতার ন্যায় আশ্রয় আর নাই, মাতার ন্যায় রক্ষা আর নাই, মাতার ন্যায় প্রিয় বস্তুও আর নাই!" আমরাও বুঝিতে পারি মায়ের মত ত্রিতাপজ্বালা-নাশিনী দেবতা আর নাই!

এ সংসারে সুখের দিনে যেমনই হউক, দুঃখের দিনে মহাপাপীও ভগবান্‌কে একবার মনে করে। সেই রকম সৌভাগ্যের সময়ে যাহাই হউক, দুর্ভাগ্যের সময়ে অতি বড় কৃতঘ্ন সন্তানও "মা" বলিয়া নিশ্বাস ছাড়ে। তাই রোগী রোগ-যাতনায়, শোকী শোক-যাতনায়, ভীরু বিভীষিকায়, সকল ব্যথিতেরাই ব্যথার সময়ে "মা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করে;

ভগবানকে ডাকিলে মহাপাপীর পাপের জ্বালা যেমন জুড়ায়, মা'কে ডাকিলে বড় দুঃখীর দুঃখের জ্বালাও সেইরকম জুড়াইয়া থাকে। মানব রোগী হউক, শোকী হউক, শিশু হউক, বৃদ্ধ হউক, ধনী হউক, দরিদ্র হউক, বড় ব্যথার সময়ে সে "মা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিবেই। কুসন্তান হইলেও সেই মাতৃ-স্মরণে তাহার আত্মা এক পলকের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করিবেই। তাই বলি-তেছি মা'র মত অমৃতময়ী দেবতা যেমন এ জগতে আর নাই, "মা" শব্দের মত অমৃতময় শব্দও সেইরূপ ভাষায় আর নাই! মানবশিশু জীবনের প্রথমে "মা" বলিতে শিখে, প্রাপ্ত বয়সে মাকে সম্বোধন ভিন্ন আত্ম-তৃপ্তির লালসাতেও প্রতিদিন অগণ্য বার "মা" মা" করে, মুমূর্ষু মানবও বুঝি তাহার শেষ নিশ্বাস "মা" বলিয়া ত্যাগ করে। কিন্তু এতবার ব্যবহৃত হইলেও "মা" শব্দ সন্তানের প্রাণে চির-নূতন! "মা" উচ্চারণ করিলেই সন্তান-হৃদয়ে নব বল, নবোৎসাহ, নব স্ফূর্ত্তি, নব-জীবনী সঞ্চারিত হয়! শুনিয়াছি অমৃত পান করিয়া কাহারও পরিতৃপ্তি জন্মে না—এ বিষয়ে সত্যতা জানিতে মানবের উপায় নাই, কিন্তু মা'কে ডাকিয়া ডাকিয়া সন্তানের পরিতৃপ্তি কখনও হয় না ইহা সকলেই বুঝিতে পারি। এ জগতে মাতৃ-স্নেহ যেমন অমৃত, মাতৃ-স্তন্য যেমন অমৃত, মাতৃ-ক্রোড় যেমন অমৃত, মার আদর যেমন অমৃত, 'মা' বলিয়া ডাকাও সেই রকম অমৃত! 'মা'বলিলেই সন্তানের বুকে অমৃত-স্রোত বহে! এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই হিন্দু-সম্প্রদায় জগদীশ্বরকে দুর্গা, কালী, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃমূর্ত্তিতে পূজা করিয়াছেন! এই অপূর্ব্ব রহস্য বুঝিয়াই সে দিন ব্রাহ্মসমাজে মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেন ভগবান্‌কে মাতৃরূপে উপাসনা করিয়াছেন! ভগবান্ বলিয়া ডাকিলে যাহার হৃদয় শুষ্ক থাকে, 'মা' বলিয়া ডাকিলে তাহার হৃদয়ও ভিজিয়া যায়! এই টুকুই ভগবানের কৌশল! তবে এ কথা কুসন্তানের জন্য নহে।

(ক্রমশঃ)

কলাবাগান।

আমাদের পরিচিত কোন বাবুর একটী কলাবাগান ছিল। বাবু জাতিতে কায়স্থ, বয়স পঞ্চাশের অধিক। কৌলীন্য আছে, বিলক্ষণ সুশিক্ষা আছে, ধার্ম্মিক বলিয়া সর্ব্বত্র যশঃ আছে। আমরা যত দূর জানি, ভগবদ্‌ভক্তিও অসাধারণ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তিনি কলাবাগানের পাইট্ জানি-তেন না। তাহাতেই তাঁহার সর্ব্বনাশ হইয়াছিল। বালক কালে পিতা মাতা

বর্ত্তমানে একবার বিবাহ হইয়াছিল। এই পত্নী পরমা সুন্দরী ও গুণবতী হইলেও তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে নিশাভ্রমণে বহির্গত পতির আগমন প্রতীক্ষায় অনিদ্রায় রজনী যাপন করিতে হইত, তজ্জন্য পত্নীর মনে একটু ব্যথা থাকিলেও তিনি কখনই পতির প্রতিকূলচারিণী হন নাই। যাহা হউক, বাবুজীর যৌবননদীতে ভাঁটা পড়িবার উপক্রম হইতেছে, এমন সময়ে তাঁহার পত্নীর লোকান্তর হইল। পত্নীর প্রতি স্নেহ, মমতা কি অনুরাগ যে কিছু কম ছিল, তাহা নহে। সুতরাং তাঁহার বিয়োগে অতিশয় কাতর হইলেন! হইলে কি হয়, এখনও ধন আছে, ধনাগমের উপায় আছে, বয়স আছে, বাসনা আছে।

বাবুজীর কলাবাগানে দ্বাদশটী মাত্র কলাগাছ ছিল। কিন্তু গাছ কয়টী খুব বড় বড়; একটী গাছের অসংখ্য বাস্না বা বাইল দ্বারা বাগানের অনেক স্থান ব্যাপ্ত হইয়াছিল। ঐ কলাবাগানে বাবুর এক ঘর ধোবা প্রজা বাস করিত। ধোবা ও ধোবানী ভিন্ন তাহাদিগের অন্য পরিজন ছিল না। বাবুজী কলাবাগানের কলা, মোচা, থোড়, পাত প্রভৃতি নিত্যই ভোগ করিতেন বটে; কিন্তু বাগানটী কেমন, তাহা প্রায়ই চক্ষে দেখিতেন না এবং তাহাতে কোন প্রকার কর্ষণের বা পাইটের প্রয়োজন আছে কি না, তাহাও ভাবিতেন না। কালে ভদ্রে কখনও যদি বাগানের কথা মনে পড়িত, একবার বেড়াইতে যাইতেন; কিন্তু ধোবা ধোবানীর সাক্ষাৎ প্রায়ই পাইতেন না—তাহারা কোথায় আপন কাজে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের সাক্ষাৎ না মিলিবার আর একটু কারণও ছিল। কলাগাছের বাইলগুলি শুষ্ক না হইলে বাবু তাহাকে বাসনা বলিতেন না, আমরাও বলি না। শুষ্ক বাসনাই পুড়াইতে হয়, এই ই তাঁহার ধারণা ছিল। কিন্তু ঐ ধোবা কাঁচা ও শুষ্ক উভয় প্রকার বাইলকেই বাসনা বলিত এবং ঐ উভয়বিধ বাসনাই ছেদ করিবার জন্য বাবুকে নিয়তই অনুরোধ করিত। আরও বলিত, "কাঁচা বাসনা পুড়াইয়া যে ক্ষার প্রস্তুত হয়, তদ্দ্বারা কাপড়ের ময়লা কি, গাত্রের ময়লাও ছাড়িয়া যায়। আর এই বাসনা সকল যত অধিক পরিমাণে ছেদ করা যাইবে, বাগানে মোচা কলা তত অধিক ফলিবে এবং মোচা কলা ভোগের সুখ ও বাড়িবে।" বাবুজীর, ছোট মুখে বড় কথা আদৌ ভাল লাগিত না। তিনি মনে করিতেন, ধোবা বেটা নিতান্ত স্বার্থপরায়ণ; আপনার ক্ষারের জন্য আমার সাধের কলাবাগান নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছে। ঢলঢলে কাঁচা বাসনা সকল নাকি ছেদ করা যায়? এই সকল বাসনা ছেদ করা আর আমার এক একটা অঙ্গ ছেদ করা উভয়ই সমান।" এইরূপ ভাবিয়া ধোবাকে কহিতেন, "শুন ধোবা, তুমি আমার বাগানের একটী বাসনাতেও হাত দিবে

না ; ঐ সকল আমার বড় সুখের সামগ্রী ; যদি আমার একটী বাসনা নষ্ট হয়, তোমাদের উভয়কেই বাগান হইতে তাড়াইয়া দিব।" ধোবা ধোবানী সেই জন্য বাবুকে প্রায় দেখা দিত না।

পত্নীবিয়োগে যখন বড় কাতর, তখন বাবুজী মহাশয় এক দিন বাগান বেড়াইতে গেলেন। পত্নীর সহিত একাদিক্রমে বিংশতিবর্ষ সংসার ধর্ম্ম করিয়াছেন। মনের কত সুখ দুঃখ, কত আশা ভরসা, কত ভাবের বিনিময় তাঁহার সহিত হইয়া গিয়াছে। এমন অনেক ক্ষতির অনুভব হইতে লাগিল, পত্নীর অভাবে চিরকালে যাহার আর পূরণ হইবে না। এমন সুখ অনেক মনে পড়িতে লাগিল, হয়ত এজন্মে আর তাহা পাইবেন না—ইত্যাদি নানাপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে বাগানে উপস্থিত হইলেন। অদ্য বাগানে যাইবামাত্র ধোবা ধোবানীর সাক্ষাৎ পাইলেন। ধোবাকে একটু আদর করিয়া নিকটে ডাকিলেন। বাগানের কলাগাছ গুলির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিলেন। আজ প্রায় সকল গাছেই ২।১টী শুষ্ক বাসনা দেখিতে পাইলেন। দেখিয়া দুঃখ হইল। ধোবার বাসনা ছেদের পরামর্শ আজ একটু মিষ্ট বোধ হইল। হইলে কি হইবে? যে কখনও বাসনার উপর অস্ত্রাঘাতের চেষ্টা করে নাই, বাসনা-ছেদ তাহার পক্ষে অসাধ্য বা দুঃসাধ্য ব্যাপার। ধোবা, বাবুর ভাব বুঝিয়া কহিল, "কলাগাছে যে সকল বাসনা শুষ্ক হইয়াছে, তাহা কাটিব কি? বাবু কহিলেন, "আজ না।" ধোবা মনে মনে কহিল, "তোমার কপালে অনেক দুঃখ আছে।" ধোবার মুখ হইতে বাসনাচ্ছেদের ব্যবস্থা বাহির না হইলে বাবুজী মহাশয় হয়ত আজ ২।৪টী বাসনা ছেদ করিতেন। কিন্তু একে ধোবার কথা তাঁহার আদৌ ভাল লাগিত না, তাহাতে আবার তাহাদের স্ত্রীপুরুষের অসঙ্গত নাম দুইটাতে তিনি হাড়ে চটিয়াছিলেন। ধোবার নাম "বৈরাগ্য" এবং ধোবানীর নাম "প্রজ্ঞা," সুতরাং তাহাদের কথা শুনিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না ; গম্ভীরভাবে গৃহে প্রস্থান করিলেন

এখন বাবুজীর বয়স প্রায় ত্রিষষ্টি বর্ষ। একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্তই হইয়াছে আর দার পরিগ্রহ করা হইবে না, কেননা ৩।৪টী পুত্র কন্যা ; তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূ অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই ঘর সংসার করিতে আসিয়াছেন এবং তিনি সমস্ত সাংসারিক কার্য্য নির্ব্বাহে সমর্থাও হইয়াছেন। গৃহিণীর অভাবে আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদির ভরণ পোষণ, অতিথি সেবা, নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য কলাপ ইত্যাদি কোনও বিষয়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু যিনি আজন্ম সকল বাসনার প্রশ্রয় দিয়া আসিয়াছেন,—কখনও ভুলিয়াও একটা বাসনার ছেদ সহ্য করেন নাই, কাম অর্থাৎ আত্মইন্দ্রিয়-সুখ-বাঞ্ছা সহসা পরিহার করা তাঁহার পক্ষে

অসাধ্য। বাবুজী মহাশয়ের দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের বাসনা প্রবল পবন-সন্ধুক্ষিত দাবানলবৎ জ্বলিয়া উঠিল। চারিদিকে পাত্রীর সন্ধান আরম্ভ হইল। কিন্তু সকল পাত্রীর বয়ঃক্রমই বাবুজীর অল্প বলিয়া বোধ হয়। হইতেও পারে, দ্বিতীয় পক্ষের সংসার, পাত্রী যত বড় হয়, ততই ভাল। বাবুজী ভাবিতে লাগিলেন, "আমাদের ঘরে অনূঢ়া কন্যার অধিক বয়স হইতে পারে না, আমি বিদ্যাসাগর মহাশয়ের শাস্ত্রানুসারে বিধবা বিবাহ করিলে আমার যোগ্যা পাত্রী পাইতে পারি। তদ্‌ভিন্ন আমি এ অবস্থায় সুখী হইতেও পারিব না। তবে সমাজ কিছু গোল করিতে পারে। তাহাতে আমার বিশেস ক্ষতি হইবে না। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই একটী বিবাহার্থিনী বিধবার সন্ধান পাইলেন। বাবুজী স্বচক্ষে তাঁহাকে দেখিলেন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন করিলেন। বিধবা রমণীর রূপলাবণ্য ও কথাবার্ত্তায় বাবুজী মুগ্ধ হইলেন। যথাকালে বিবাহাদি সম্পন্ন হইয়া গেল। কিন্তু এই সমাজবিরুদ্ধ কার্য্যানুষ্ঠান নিবন্ধন তাঁহাকে ঘরে ও বাহিরে একটু লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। যেমন সরোবরের গভীর জলে নিমগ্ন ব্যক্তি তীরস্থ আহ্বানকারীর বাক্য শুনিতে পায় না, তেমনি বাবুজী দ্বিতীয়া পত্নীর স্নেহ মমতায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, উপরি উক্ত লাঞ্ছনা গঞ্জনা তাঁহার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারে নাই। উভয়ের প্রতি গাঢ় আসক্তি ও মমতা জন্মিল। বাবুজীর প্রথমা পত্নীর বিয়োগ-জনিত সকল দুঃখ দূর হইল। কিন্তু নিরন্তর উপভোগ দ্বারা কামনার শান্তি না হইয়া ঘৃতাভিসিক্তিত বহ্নির ন্যায় তাহা বৃদ্ধি পায় এবং আত্ম সুখ কামনা কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া বিষয় ভোগ করা অপেক্ষা পরসুখ কামনা-পরিচালিত হইয়া উপভোগ করিলে অধিক আনন্দ হয়, ইহা তাঁহার একবারও মনে হইত না। সুতরাং কোন দিন কোন সুখের কামনা পূরণের ব্যাঘাত উপস্থিত হইলেই মন অশান্ত হইয়া উঠিত। এইরূপে প্রায় পঞ্চদশ বর্ষ কাটিয়া গেল।

এত দিনে বাবুজী মহাশয়ের কাল-চক্রদর্শন হইল। কালচক্রখানি ত্রিগুণাত্মক ও দ্বন্দ্বভাবরূপ অসংখ্য ব্যাসের সমষ্টি। ঐ সকল ব্যাসের উভয় প্রান্ত চক্রনেমি খর্ব্ব করিয়াছে। যে ব্যাসের এক প্রান্তে শীত, সেই ব্যাসের অন্য প্রান্তে উষ্ণ; যাহার এক প্রান্তে আলোক, তাহার অন্য প্রান্তে অন্ধকার; যাহার এক প্রান্তে সুখ, তাহার অন্য প্রান্তে দুঃখ; যাহার এক প্রান্তে আশা, তাহার অন্য প্রান্তে নৈরাশ্য; এইরূপ রাগ দ্বেষ, শুভাশুভ, শোকশান্তি, আসক্তিবৈরাগ্য, ভোগত্যাগ, কামপ্রেম, ইত্যাদি দ্বন্দ্বভাবে কালচক্রের নেমি আবৃত রহিয়াছে। এই চক্র ঘূর্ণায়মান। সুতরাং আজ যিনি যে সকল ভাব ভোগ করিতেছেন

চক্রের আবর্ত্তনে অবশ্যই তাহার বিপরীত ভাব সকল তাঁহাকে একদিন না একদিন ভোগ করিতেই হইবে। কাজেই আমাদের বাবুর বয়স গড়াইল, বার্দ্ধক্য আইল, ধন ফুরাইল, দারিদ্র্য দেখা দিল, ধনাগমের পথে কাঁটা পড়িল;—কাল-চক্রের ভীষণ ঘর্ষণে সব গেল; কিন্তু গেল না কেবল মনের সুখাশা। নব-প্রণয়িনীর নিকট পঞ্চদশ বর্ষ ব্যাপিয়া যে সকল সুখসম্ভোগ যেরূপে করিয়াছেন, এখনও ঠিক্ সেই আশা। বাবুজী আত্ম সুখাসক্ত ও বিলাসী ছিলেন বলিয়া যে তাঁহার শিক্ষা ও ধর্ম্ম ভাব এক কালেই নিৰ্জ্জীব হইয়াছিল, তাহা নহে। তিনি এক্ষণে পত্নীকে ধর্ম্মোপদেশ ও বিবিধ সময়োপযোগী উপদেশ দিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু ইহার মধ্যেও আত্মসুখ কামনা ছিল। কেননা তাঁহার উপদেশ দিবার তাৎপর্য্য এই যে পত্নী এক্ষণে তাঁহার অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া আপনার বিলাস লালসা একটু খর্ব্ব করুন্, নচেৎ ব্যয় সঙ্কুলান করিয়া উঠিতে পারেন না।

পত্নীর বিলাসলালসা এখনও বাবুজীর অপেক্ষা অধিক বলবতী ছিল; বিশে-ষতঃ পাকা ডালের যোড় কলম মজবুত্ হয় না। পত্নী, বাবুর মনের ভাব বুঝিয়া কহিলেন, "তোমার বয়স বাইট্ বর্ষ হইতে চলিল; এখনও তোমার এত কেন? আরও দেখিতেছি, তুমি আমার সুখের হিংসা কর; আমার ভাল খাওয়া পরা দেখিতে পার না। তোমার ইচ্ছা যে, আমি তোমার দুঃখে দুঃখিনী হইয়া সজিনার শাক খাইয়া ও নেকূড়া পরিয়া কাল কাটাই। কেন? তোমার জন্য এত করিব কেন? আমিত তোমার পত্নী নই,—তুমিও আমার পতি নও। যাঁহার সহিত প্রথম বিবাহ হইয়াছিল, এবং যাঁহাকে লইয়া প্রায় পাঁচ বৎসর ঘর করিয়াছি, তিনিই আমার প্রকৃত পতি। আমি কেবল সুখের জন্যই তোমাকে বিবাহ করিয়া-ছিলাম; তোমার যখন আর আমাকে সুখী করিবার ক্ষমতা নাই, তখন আমার জন্য প্রাণ কাঁদাইলে কি হইবে? এখনও যে তোমাকে যত্ন করি, সে আমার দয়া। এখন যত শীঘ্র তোমার মৃত্যু হয়, ততই আমার মঙ্গল; আমার যেরূপ রূপ আছে, আমি এখনও আর একবার বিবাহ করিতে পারি।" পত্নীর এই সকল কথা শুনিয়া বাবুজীর মস্তক ঘূর্ণিত হইল। অনেক ক্ষণ নীরবে রহিয়া কহিলেন,—

"বিধৌবামে বামঃ সুহৃদপি
সকামং প্রভবতি।"

বুঝিলাম, নিশ্চয়ই বিধি আমার প্রতি বাম হইয়াছেন, নতুবা তোমার ন্যায় সুহৃদ্ বাম হইবে কেন? ভাল! একটা কথা তোমায় জিজ্ঞাসা করি, আমি যে তোমার সুখের হিংসাকারী, ইহা কি তোমার বিশ্বাস? না রাগের কথা?" গৃহিণীর হৃদয় অতি সরল,

কিন্তু রাগ হইলে এক কালে আত্মহারা হইতেন। সেই আত্মহারা অবস্থাতেই ঐ সকল উক্তি করিয়াছিলেন। এক্ষণে কর্ত্তাকে নিতান্ত কাতর দেখিয়া হৃদয় গলিয়া গেল। কহিলেন,—"তুমি কয়-দিন ধরিয়া নানা প্রকার এলোমেলো কথা কহিয়া আমাকে জ্বালাতন করি-তেছ; এমন কি আমার সুখাভিলাষ ও বেশবিন্যাস দেখিয়া আমি যেন অন্য পুরুষাভিলাষিণী হইয়াছি, ভঙ্গীক্রমে তাহা বলিতেও ত্রুটি করিতেছ না। ঐ সকল কথা এক কালে বন্ধ করিবার জন্যই আমি ঐরূপ উক্তি করিয়াছি; নচেৎ এত মর্ম্মান্তিক ও এত নিষ্ঠুর বাক্য কি আমি তোমাকে বলিতে পারি? তোমার সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ দাঁড়া-ইয়াছে, তাহা কস্মিন্ কালে বিচ্ছিন্ন হইবার নহে।"

গৃহিণীর বাক্য শুনিয়া বাবুজী আর কোনও কথা কহিলেন না। কঠোর চিন্তার বেগে সে দিন সমস্ত নিশায় একবারও চক্ষু মুদিতে পারিলেন না। প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহিণীকে কহিলেন,—"প্রিয়ে, এত দিন তোমার সহিত খেলা খেলিলাম, তাহাতে একটী চাল্ ভুল হইয়াছিল; তাহাতেই এই বৃদ্ধ বয়সে এত দুঃখ পাইলাম; এক্ষণে সেই ভুল শুধ্‌রাইয়া পুনরায় নুতন খেলায় বসিব।" বলিয়াই বেগে প্রস্থান করি-লেন। গৃহিণীর উত্তর শুনিবার অপেক্ষা করিলেন না। একেবারে কলাবাগানে উপস্থিত। যাইবামাত্রই ধোবা ধোবানী সম্মুখে হাজির। আজ কলাগাছের অনেক বাসনাই শুষ্ক বলিয়া বোধ হইল। আজ বাবুজীর চক্ষে বাগানের অবস্থা অতীব শোচনীয় বোধ হইতে লাগিল। যেন সন্ধ্যাকালে শূন্য শ্মশানে পিশাচের "হো হো" শব্দ শুনিতে পাইলেন। ধোবাকে ডাকিয়া কহিলেন, "অহে, তুমি অনেক দিন হইতে ক্ষার করিবার জন্য আমার কলাবাগান হইতে বাসনাচ্ছেদের দরবার করিয়া আসিতেছ। আজ আমি দাঁড়াইয়া হুকুম্ দিতেছি, সকল গাছের সকল বাসনায় এক কালে অগুণ ধরাইয়া দাও।" ধোবা কহিল, "মহাশয়, বলেন কি? আমিত অনেক বাগানের বাসনা সংগ্রহ করিয়া থাকি, কখন কাহার মুখে এমন কথা শুনি নাই; বিশেষ আপনার মুখে একথা বড়ই অসম্ভব। কেননা আপনি কখন একটী শুষ্ক বাসনাও কাটিতে দেন নাই। আজ বাগানের (হৃদয়) সকল বাসনা এক কালে জ্বালা-ইতে আদেশ করিতেছেন, অথচ প্রত্যেক গাছেই (ইন্দ্রিয়) দুই চারিটী কাঁচা বাসনা আছে; শুষ্ক বাসনার আগুনে যে সে গুলিও পুড়িয়া যাইবে? আমি ধোবার ছেলে,—বাসনা পোড়া-নই আমার ব্যবসায়,—আমি কাঁচা শুক্‌না সকল বাসনাই পুড়াইতে পারি; কিন্তু কলাগাছের কাঁচা বাসনায় আগুণ দিলে তাহা হইতে যে অরুন্তুদ

ধূমোদ্গম হইবে, তাহার জ্বালা মানুষে সহিতে পারে না,—সে জ্বালা সহ্য করা কি আপনার ন্যায় ঘোর সকাম পুরুষের কার্য্য ?” বাবু কহিলেন, “কাঁচা বাসনা দাহের জ্বালা সহ্য করা আমার ন্যায় ‘ঘোর সকাম’ পুরুষেরই কার্য্য! কেননা আমি জানি, বাসনা পোষণে যে জ্বালা পাইতেছি,—বাসনা দাহনে সে জ্বালা পাইব না।” ধোবা, বাবুর কথা শুনিয়া একটু হাসিল,—সে হাসিতে সমস্ত কলাবাগান উদ্‌ভাসিত হইল। বাবুর দিকে বাম হস্তের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া ধোবানীকে ডাকিয়া কহিল,—“হে ধোবানি, দিনত আখের হুয়া,—বাস্‌না মে আগ্‌ লাগাও। কামনা সমুদ্রের বিলাস তরঙ্গে ভাসমান বঙ্গদেশের যে বাবু বৃদ্ধবয়সেও শুষ্ক বাসনার সহিত দুই চারিটী কাঁচা বাসনা পুড়াইতে পারেন, আমরা তাঁহার চরণ শিরে ধারণ করি।

বারমেসে।

(দ্বাদশ মাসিক কৃষি বিবরণ)

আমাদের অবলম্বিত নিয়মানুসারে ভাদ্র মাসের পত্রিকায় ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের বিবরণ প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু কোন গতিকে তাহা ঘটে নাই। এই জন্য এই আশ্বিনের সংখ্যায় আশ্বিন ও কার্ত্তিক একত্র প্রকাশিত হইল।

আশ্বিন।

বর্ষার আরম্ভ ও শেষ, সকল বর্ষে একরূপ হয়না। আরম্ভ, কোন বর্ষে অগ্রে ও কোন বর্ষে পরে হয়। ঐরূপ শেসও, কোন বর্ষে কিছু অগ্রে, কোন বর্ষে কিছু পরে হইয়া থাকে। যে বর্ষে বর্ষার শেষ, কিছু অগ্রে হইয়া যায়, সেই বর্ষে শীতলাকের যাবতীয় ফসলের বপন ও রোপন আশ্বিন মাসে করা যাইতে পারে, নহিলে কার্ত্তিক মাসের অপেক্ষা করিতে হয়। কপি, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, পালং, মূলা, চুকোপালং, গাজোর, বিট্‌ প্রভৃতির বপণ ও রোপণ করিতে হয়। কপি রোপণ করিবার ক্ষেত্র কিরূপ প্রস্তুত করিতে হয়, আমরা ভাদ্র মাসের বিবরণ মধ্যে যে কথা বলিয়াছি সেইরূপে প্রস্তুতীকৃত ক্ষেত্রে চারিদিকে দেড় হাত অন্তর কপির চারা রোপণ করিতে হয়। কপি ক্ষেত্রে প্রতি পক্ষে একবার জল সিঞ্চন করিতে হয় বেগুন, হরিদ্রা, কি আদার ভূমির ন্যায় যদি কপি ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধা হয়, তাহা হইলে দাঁড়ার পার্শ্ববর্ত্তী পিলি বা ছুলি সকলে জল সিঞ্চনের বেশ সুবিধা হয়। কপি ক্ষেত্রে

দাঁড়া বাঁধার রীতি সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। কোন কোন দেশের কৃষকগণ কপি ক্ষেত্রকে সমভূমি করিয়া থাকে। কিন্তু যে দিক হইতে জল সিঞ্চনের সুবিধা আছে, তাহার বিপরীত দিক্ অভিমুখে ঐ ভূমি ঢাল করিয়া থাকে, তাহাতে সিঞ্চিত জল সহজেই গড়াইয়া সকল ক্ষেত্র অভিষিক্ত করিতে পারে। জল সেকের পর "যো" হইলেই কোদাইল দ্বারা ক্ষেত্রের সমস্ত মৃত্তিকা খুঁড়িয়া দিতে হয়। মৃত্তিকার যে অবস্থায় তাহাতে রস থাকে, অথচ খননকালে লাঙ্গল বা কোদাইলে মাটী জড়াইয়া ধরে না, মাটীর সেই অবস্থাকে "যো" কহে। কপি গাছের যে সকল পত্র শুষ্ক বা পক্ক হয়, কিম্বা পচিয়া যায়, তাহা সর্ব্বদাই ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। এদেশে সচরাচর বাঁধা, ফুল ও ওল এই ত্রিবিধ কপির চাস আবাদ হয়। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত দুই প্রকার কপিরই অধিক পরিমাণে ব্যবহার হইয়া থাকে।

আলু,—মাঘের শেষে কিম্বা ফাল্গুণের প্রথমে আলুগাছের মূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে, তাহাই কৃষকেরা বীজের জন্য রাখিয়া থাকে। আলুর বীজ কিরূপে রাখিতে হয়, আমরা যথা সময়ে সে কথা বলিব। এক্ষণে আলু রোপণের কথা বলি বীজ আলু সংগ্রহ পূর্ব্বক শ্রেণীবদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ হস্ত অন্তরে এক একটী বীজ রোপণ করিতে হয়। এক শারি হইতে অন্য শারির অবকাশ যেন এক হাতের কম না হয়। যে দিন আলু রোপণ করা যায়, সেই দিন প্রত্যেক বীজের উপর জলের ছিটা দেওয়া আবশ্যক। যতদিন চারা বাহির না হয়, প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐরূপ জলের ছিটা দিতে হয়। রাজমিস্ত্রীগণ যেরূপ খড়ের আছাড় বাঁধিয়া আপনাদিগের কার্য্যবিশেষে জল ব্যবহার করে, আলুর বীজের উপর সেইরূপ খড়ের আছাড় দ্বারা জল দেওয়া উচিত। এদেশের কৃষকেরা একস্থানে এক একটী আলুর বীজ রোপণ করে কিন্তু এক একটী বীজের উপর যতগুলি চক্ষু থাকে, ততগুলি চারা বাহির হয়। আয়র্লণ্ডের কৃষকেরা যে সকল আলুর বীজ রোপণ করে, তাহা অপেক্ষাকৃত বড়। এজন্য তাহারা একস্থানে একটী আলু না পুঁতিয়া একটী আলুকে দুই, চারি, অথবা তদধিক খণ্ডে বিভক্ত করিয়া এক এক খণ্ড একস্থানে পোঁতে। ঐ খণ্ডে যতটী চক্ষু থাকে, ততটী চারা বাহির হয়। আলুর জমি প্রস্তুত করার কথা যথা কালে বলা যাইবে। স্থূলতঃ উহার জমি বারমেসে হওয়া উচিত। অর্থাৎ প্রায় বার মাসই উহাতে চাস দিতে হয়, অথচ আলু রোপণের পূর্ব্বে উহাতে কোন ফসল, কি আগাছা, তৃণ, ঘাস ইত্যাদি হইতে দেওয়া হয়না। হইতে দিলে জমির তেজঃক্ষয় হয়। ঐ জমির মাটী কাশির চিনির ন্যায় চূর্ণ ও শিথিল হওয়া আবশ্যক।

কৃষকেরা বলেন, আলু ক্ষেত্রের মাটী এমন শক্ত হইবে, যেন তাহাতে ভরন্ত (জলপূর্ণ) কলসী ফেলিলে না ভাঙ্গে। যাহাহউক, বীজ রোপণের ৫।৭ দিন পরেই এক একটী বীজ হইতে এক এক গোছা চারা বাহির হয়। ঐ সকল চারার মধ্যে যে গুলি সতেজ ও পুষ্ট, তাহা রাখিয়া দুর্ব্বল চারা গুলি মারিয়া দিতে হয়। তাহাতে অবশিষ্ট চারা-গুলি অধিকতর বলবান্ হয়। উভয় শারির মধ্যবর্ত্তী জমিতে পিলি কাটিয়া প্রতি সপ্তাহে এক একবার জল সেচিয়া দিতে হয়। জলসিঞ্চনকালে এরূপ সতর্ক হইতে হইবে, যেন আলুর চারায় জল না লাগে। চারায় জল লাগিলে চারা পচিয়া যাইতে পারে। পিলি কাটিবার সময় চূর্ণ মৃত্তিকা গাছের শারির গোড়ায় ধরাইয়া দাঁড়া বাঁধিয়া দিতে হয়। পিলিতে জলদিলে দাঁড়ার শুষ্ক মৃত্তিকা কর্ত্তৃক ঐ জল শোষিত হয়। তাহাতেই গাছের পুষ্টি হয়। এই জল-শোষণ কালে দাঁড়ার অনেক মাটী ঝরিয়া পিলিতে পড়ে। পিলির জল শুষ্ক হইয়া "যো" হইলেই মাটী খুঁড়িয়া এবং কতক মাটী দাঁড়ার ধরাইয়া দিবে। আশ্বিন বা কার্ত্তিক হইতে পৌষ বা মাঘ পর্য্যন্ত এইরূপ কার্য্য করিতে হইবে।

রাঙ্গাআলু।—গোবরের সারই রাঙ্গা-আলুর উপযুক্ত সার। রাঙ্গাআলুর জমিতে অধিক পরিমাণে ঐ সার দেওয়া আবশ্যক। ঐ আলুর লতার এক কি দেড় হাত পরিমাণে ডগা কাটিয়া তাহার মাঝ খানে মাটী চাপা দিয়া রোপন করিতে হয়। ঐরূপ ডগাকে বলয়াকারে জড়াইয়া কেবল অগ্র ভাগের ৫।৬ অঙ্গুলি মাত্র বাহিরে রাখিয়া সমস্ত বলয়টী মাটী চাপা দিলেও হয়। লতার যে অংশ মাটী চাপা পড়ে, তাহাতে যতগুলি পত্র কক্ষ থাকে, প্রত্যেক পত্র কক্ষ হইতে শিকড় নির্গত হয়। রাঙ্গাআলুর ক্ষেত্রে মধ্যে মধ্যে নিড়াইযা এবং খুঁড়িয়া দিতে হয়। কোন কোন স্থানে শ্রাবণ ভাদ্র মাসেও রাঙ্গাআলুর চাস আবাদ করিয়া থাকে।

পালংশাক,—শীত কালে যত প্রকার দেশীশাক জন্মিয়া থাকে, তন্মধ্যে পালং অতি সুখাদ্য। উহা শীতকালের বেগুন ও মূলার সহিত মিলাইয়া উত্তম তরকারী হয়। বিশেষতঃ উহার গোড়া ও শিষ্ বড়ই মিষ্ট। উহার বীজ অতি কঠিন, শীঘ্র অঙ্কুরিত হয় না। উহা একবারে ভূমিতে বপন করিলে অঙ্কুর হইতে অনেক বিলম্ব হয়। তন্মধ্যে কীট, পতঙ্গ ও ভেকে উহার অধিকাংশ নষ্ট করিয়া ফেলে। এজন্য ঐ বীজ ৪।৫ দিবস জলে ভিজাইয়া পরে একদিন নেকড়ার পোঁট্লায় টাঙ্গাইয়া রাখিয়া ক্ষেত্রে বপন করিতে হয়। এইরূপে বপন করার পরও যে কয় দিন উত্তমরূপে অঙ্কুর নির্গত না হয়, কলাপাতা, বা মান কচুর পাত দ্বারা ঢাকিয়া রাখিতে হয়। নচেৎ

পিপীলিকা এবং পূর্ব্বোক্ত কীট পতঙ্গে ঐ বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে। বপন অধিক না ঘন হয়। বপন বিরল হইলে গাছ গুলি বড় ও সতেজ হয় এবং জমি নিড়াইয়া দিবার সুবিধা হয়। যে কোন শাকের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ পালং ক্ষেত্রে ঘাস হইলে শাক ভাল হয়না এবং শাকে পোকা ধরে। এজন্য পালং ক্ষেত মধ্যে মধ্যে নিড়াইয়া পরিষ্কার করিয়া দিবে।

মূলা,—মূলার চাস আবাদ সম্বন্ধে খনার অনেক বচন আছে। যথা,—

"শতেক চাসে মূলা, তার অর্দ্ধেক তূলা।
তার অর্দ্ধেক ধান, বিনা চাসে পান॥
খনা বলে শুন শুন, শরতের শেষে মূলাবুন।
মূলার ভুই তলা, কুশরের (ইক্ষু) ভুঁই ধূলা॥

মূলার ভূমিতে অনেক চাস দিতে হয় এবং চাস দিয়া ঐ ক্ষেত্রের মৃত্তিকাকে তূলার ন্যায় কোমল ও শিথিল করিতে হয়। শরতের শেষে, অর্থাৎ আশ্বিন মাসে মূলার পুরাতন বীজ বপন করিতে হয়। মূলার বীজ যত পুরাতন হয়, ততই ভাল। নূতন বীজ কোন কার্য্যের নহে। প্রথম বপন খুব ঘন করিবে। পরে গাছ গুলি শাক খাই-বার উপযুক্ত হইলে মধ্যে মধ্যে শাক তুলিয়া খাইতে হয়। নূতন ও কোমল মূলার শাক ভাজা, সরিষা বাটার সহিত মিলিত হইলে উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হয়। মূলার শাক ভোজনে দ্বিবিধ উপাকার। প্রথম উৎকৃষ্ট শাক ভোজন, দ্বিতীয় কতক গুলি গাছ তুলিয়া ফেলায় মূলার ক্ষেত্রে বিরল হয়। তাহাতে অবশিষ্ট গাছ সতেজ হয় এবং স্থূল ও কোমল হয়। কোন কোন ক্ষেত্রের মূলা এমন কোমল ও সুস্বাদ হয় যে কাঁচা খাইতে বড় সুখ বোধ হয়। মূলা রন্ধন করিয়া বিবিধ উৎকৃষ্ট ব্যঞ্জন প্রস্তুত হয়।

চুকোপালং,—ইহা টক্‌, অধিক খাইতে ভাল লাগেনা। কিন্তু ইহা দ্বারা উৎকৃষ্ট চাট্‌নী প্রস্তুত হয়। যাঁহার ইচ্ছা হয়, তিনি পালং শাকের ক্ষেত্রের ন্যায় ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে অল্প পরিমাণে চুকো পালঙ্গের বীজ বপন করিয়া রাখিতে পারেন।

শিম্বী,—ইহা নানাবিধ। পটুলে, আল্‌তাবোল, দুধে, বাঘনখো ইত্যাদি। শীতকালের তরকারী, প্রথমে হাপোরে ইহার বীজ রোপণ করিতে হয়। চারা গুলি আধহাত তিন পোয়া পরিমাণের হইলে হাপোর হইতে তুলিয়া মাচার তলে, অথবা অন্য কোন বৃহৎ বৃক্ষের তলে রোপণ করিতে হয়। কিন্তু অন্য গাছের তলা অপেক্ষা মাচার তলায় রোপণ করিতে পারিলেই ভাল হয়। কেননা অন্য গাছের আওতায় শিম্বী-লতার অনিষ্ট হইতে পারে। মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া সার ও জল দেওয়া ভিন্ন শিমের অন্য কোন আবাদ নাই।

মাঠ কড়াই,—ইহার আর একটী নাম চিনের বাদাম। ছোলা, মটর,

কলায় ইত্যাদির ন্যায় ইহার ও প্রচুর ব্যবহার হইয়া থাকে, খাইতেও মন্দ নহে। কিন্তু উহা তৈলাক্ত, এজন্য অধিক খাইলে উদরের অসুখ হয়। এই উদ্ভিদের একটী প্রকৃতি আশ্চর্য্য। আশ্বিন মাসে উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে উহার বীজ বপন করিতে হয়। গাছে ফুল ধরিবামাত্র উহার শাখা সকল নম্র হইয়া মাটীতে ঝুলিয়া পড়ে এবং ফুল সহ মাটীর মধ্যে প্রবেশ করে। মাটীর মধ্যেই ফল জন্মে এবং পরিপক্ক হয়। এজন্য ঐ ফলের জমি অধিক পরিমাণে কর্ষিত ও মৃত্তিকা উত্তমরূপে চূর্ণীকৃত হওয়া আবশ্যক। নহিলে যথেষ্ট পরিমাণে ফসল জন্মে না। ক্ষেত্রের মৃত্তিকা যত শিথিল হইবে, মাঠ কড়াই তত অধিক পরিমাণে ফলিবে।

গুঁড়ি কচু,—কচু অনেক প্রকার। তন্মধ্যে কোন কোন কচু অতি সুখাদ্য তরকারী। যাঁহারা "বিশ্বকোষ" নামক বিস্তৃত অভিনব অভিধানের "ক" পর্য্যায় পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে কচু কত প্রকার এবং তাহার চাস আবাদ কিরূপ। যাঁহাদের পড়া ঘটে নাই, অনুরোধ করি, তাঁহারা একবার বিশ্বকোষের কচু পড়িবেন। এদেশে গুঁড়ি কচু ভিন্ন, অন্য কচুর আবাদ প্রায় হয় না। আমরা বৈশাখ মাসে তাহার চাস আবাদের কথা বলিয়াছি। এই মাস হইতে ঐ কচু তুলিতে ও খাইতে হয়।

মান কচু,—উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্য। মান কচু এক দিকে যেমন পুষ্টিকর, অন্য দিকে তেমনি লঘুপাক। মান কচুর চারায় কতক গুলি শিকড় ও গেঁড়ুর কিয়দংশশুদ্ধ এবং মাইজ পাতাটী ছাড়া আর সকল পাতা কাটিয়া চারাটি রোপণ করিতে হয়। মানকচু রোপণের অন্যূন এক পক্ষ পূর্ব্বে একহাত কি পাঁচ পোয়া পরিমাণে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণ সারমাটী দ্বারা পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। অপরার্দ্ধ শূন্য থাকিবে। যে মাটীর দ্বারা গর্ত্তের অর্দ্ধাংশ পূর্ণ করা হইয়াছে, সেই মাটীর উপর গর্ত্তের মধ্যে চারা পুঁতিতে হয়। যে টুকু ফাঁক থাকে, সে টুকু আপনি পূরিয়া যায় এবং ঐ অংশে অতি শীঘ্র কচু জন্মে। কচুর মুখ গর্ত্ত অতিক্রম করিয়া উঠিলে তখন উহার গোড়ায় ছাই ধরাইয়া দিতে হয়। ছাই যত উচ্চ করিয়া দিতে পারা যায়, কচু ততই বৃদ্ধি পায়। মান কচুর বৃদ্ধি উপরের দিকে এক বর্ষের মধ্যে যত খানি কচু জন্মে, তাহাই কোমল ও সুখাদ্য।

"কচু বলে যদি ছড়াস ছাই।
খনা বলে তার সংখ্যা নাই॥
নদীর ধারে পুঁতলে কচু।
কচু হয় তিন হাত উঁচু॥"

নদীর ধারে মান কচুর আবাদ করিলে খুব বড় বড় কচু হয়।

আশ্বিন মাসে যে কয়েকটী ফসলের

কথা বলা হইল, বাগানে বা ক্ষেত্রে তদ্ব্যতিরিক্ত পূর্ব্ব পূর্ব্বে মাসের যে সকল ফসল আছে, এই মাসে তাহাদেরও আবশ্যক মত পাইট করিয়া দিতেহয়।

কার্ত্তিক।

যো বাঁধা—জ্যৈষ্ঠমাসে কেবল আল-বালের কথা বলা গিয়াছে, যোবাঁধা, তাহার ঠিক্ বিপরীত ক্রিযা। অর্থাৎ সকলপ্রকার তরু লতার গোড়া খুঁড়িয়া চূর্ণ মৃত্তিকা দ্বারা মূলের চারিদিক্ উত্তমরূপে ঢাকিয়া দিতে হয়। তাহাতে ঐ চূর্ণ মৃত্তিকার ছিদ্র মধ্যে বায়ু ও উত্তাপের চলাচল হওয়ায় মূলস্থ মৃত্তিকা সকল কথঞ্চিৎ সরস থাকে ও তদ্দ্বারা উদ্ভিদ্-শরীরও সুস্থ থাকে। এরূপ না করিলে পরবর্ত্তী শীতে মূলস্থ মৃত্তিকা পাষাণবৎ কঠিন হইয়া যায়। তাহাকে কৃষকেরা "শিলিয়ে যাওয়া" বলে।

ওষধি,—ফল পাকিলেই যে সকল উদ্ভিদ মরিয়া যায়, তাহাদিগকে ওষধি কহে। এই মাসে প্রায় যাবতীয় ওষধির চাষ আবাদ হইয়া থাকে।

আলু, কপি, মূলা ইত্যাদির আবাদ যদি আশ্বিনমাসে না হইয়া থাকে, এই মাসে করা যাইতে পারে।

শাখা কলম,—যাঁহাদিগের ফুলের বাগান আছে, তাঁহাদিগকে গোলাব, করবী, জবা, বেল, মল্লিকা, যুঁথি, স্থলপদ্ম ইত্যাদি শাখা কলম এই মাসেই করিতে হয়। ঐ সকল পুষ্পের পরিপক্ক শাখা সকল অর্দ্ধহস্ত পরিমাণে ছেদন করিয়া একটা আটাল মৃত্তিকার চৌকা বা হাপোরে ঈষৎ হেলাইয়া পুঁতিতে হয়। কলমের যে মূলটি মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করিতে হইবে, সেই মূলটী ঠিক কলমের (লেখনীর) ন্যায় করিয়া কাটিতে হইবে এবং সেই মুখের ত্বক্ বা ছাল ছেঁচিয়া না যায়, কাটিবার সময় এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত। বেল, মল্লিকা, যাঁতি, যুঁথির, "দানা কলম"ও উত্তম হয়। তাহাও এই মাসে করা আবশ্যক। ঐ সকল তরুর দীর্ঘ ও পরিপক্ক শাখা সকল গাছ হইতে নোয়াইয়া গাছের একপার্শ্বে ঐ শাখার কিয়দংশ মাটী চাপা দিতে হয়। শাখাটী না নড়ে, এজন্য ২।১ খানি ইষ্টক বা প্রস্তর উহার উপর চাপা দিলে ভাল হয়। যে চৌকায় শাখা কলম রোপণের কথা হইল, রোপণের পর প্রত্যহই তাহাতে জলসিঞ্চন করিতে হয় এবং ঐ চৌকার মৃত্তিকার অল্প নিম্নেই বালুকা বা ইটের খোয়া দিতে হয়। তাহাতে সিঞ্চিত জল অধিকক্ষণ উপরে তিষ্ঠিতে পারে না, জল অধিকক্ষণ উপরে থাকিলে শাখা কলম পচিয়া যাইতে পারে। আবার প্রতিদিন জলসিঞ্চন না করিলে উঁই ধরিয়া শাখাকে বিনাশ করিয়া ফেলে। এই মাসে গোলাব গাছের মূলের চারি-দিকের মৃত্তিকা খুঁড়িয়া মূলে রাত্রের শিশির ও দিনের রৌদ্র খাওয়াইতে হয়। এইরূপে ১০।১৫ দিন রাখিয়া পরে পার্শ্বের খনিত মৃত্তিকা দ্বারা মূল উত্তম-

রূপে আচ্ছাদন করিতে হয়। এই ক্রিয়াটি বেশ চাতুর্য্য সহ করিতে পারিলে গোলাব ফুল খুব বড় বড় হয়।

এই মাসে ধনে, কার্পাস, তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, পলাণ্ডু, কাঁকুড়, উচ্ছে, পটোল মটোর, বরবরটী, ছোলা, সর্ষপ ইত্যাদি হরিত খন্দের চাস আবাদ করিতে হয়। বিলাতী কুমড়ার আবাদ এ মাসেও হইতে পারে।

ধনে,—যেমন তেমন জমি, একটু জলাল হইলেই তাহাতে যথেষ্ট পরিমাণে ধনে জন্মে। সুল্প, মেথি, কালজিরে, রাঁধুনী, মৌরি, এদেশে ভালরূপ জন্মে না; তবে উহাদিগের সুগন্ধি শাক খাইতে বড়ই মুখপ্রিয়। ঐ শাকের জন্য অতি অল্প পরিমাণে ঐ সকল দ্রব্যের আবাদ করা যাইতে পারে।

তরমুজ, ভুঁয়ে শশা, কাঁকুড়, এই তিনটি ফসল বালুকাময় পলিমাটীযুক্ত চড়া ভূমিতে উত্তমরূপে জন্মিয়া থাকে। তরমুজ মাটী চাপা দিলে খুব বড় হয়। চড়া ভূমিতে ঐ সকল ফসল করিবার সুযোগ যাঁহাদিগের নাই, তাঁহাদিগের ঐ সকল ফসলের ভূমিতে বালুকা মিশ্রিত করিয়া দেওয়া উচিত। বালুকা ঐ সকল ফসলের একটি সার স্বরূপ। যে সকল গুল্ম বা লতার ডাঁটা সবুজ ও সরস, সাধারণতঃ বালুকাময় ভূমিতে তাহারা উত্তমরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

উচ্ছে ও পটোল,—এই দুইটি ফসলের চাষ আবাদ প্রায় একই প্রকার এবং উপরি উক্ত প্রকার ভূমিতে ইহাদিগেরও আবাদ হইতে পারে ৩।৪ হাত অন্তরে উচ্ছের থানা দিবে, নহিলে পাইট করিতে ও উচ্ছে তুলিতে বড় কষ্ট হয়। এক এক থানায় উচ্ছের বীজ ৩।৪ টার অধিক রোপণ করা উচিত নহে। এক থানায় অধিক গাছ হইলে কোন গাছই সবল ও পুষ্ট হয় না। পটোলের গেঁড়ু সকল প্রথমে গোবরের সার মিশ্রিত অল্প জলে ভিজাইয়া রাখিতে হয়। তাহাতে ঐ সকল গেঁড়ুর মূল হইতে কল বাহির হয়। তখন উহাদিগকে ভূমিতে রোপণ করিতে হয়। পটোলের থানা ও বীজ রোপণের প্রণালী উচ্ছেরই মত। পুনঃ পুনঃ ভূমি নিড়াইয়াও খুঁড়িয়া দেওয়াই পটোলের প্রধান পাইট। আমরা পটোলের ভূমি সম্বন্ধে উপরে যে কথা বলিয়াছি, খনাও তাহাই বলিতেছেন।

> "শুনরে বাপু চাষার বেটা।
> মাটীর মধ্যে বেলে যেটা॥
> তাতে যদি বুনিস্ পটল।
> তাতেই তোর আশা সফল॥"

মটর, বরবটী, ছোলা, যাঁহাদিগের এই তিন ফসলের চাস আবাদ অধিক পরিমাণে করিবার সুযোগ নাই, তাঁহারা শুটি খাইবার জন্য আপন আপন উদ্যানে উহার কিছু কিছু আবাদ করিতে পারেন। কাঁচা মটরাদি নানাবিধ তরকারীর সহিত পাক করিয়াও খাওয়া যায়। এই সকল ফসলে জলের কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই;

জল পাইলে উহাদিগের অনিষ্ট হয়। উহারা হৈমন্তিক, হেমন্তের শিশির দ্বারাই পুষ্ট হইয়া থাকে। ফাঁকে ফাঁকে জমি খুঁড়িয়া দেওয়া ও ঘাস নিড়াইয়া দেওয়া ভিন্ন উহাদিগের অন্য পাইটনাই।

সর্ষপ ও তিসি,—এই দুই ফসলের প্রয়োজন সকলেই জানেন। আশ্বিনের শেষে, বা কার্ত্তিকের প্রথমে উহাদিগের বুনান হয়। নূতন ডাঙ্গা জমিতে, বিশেষতঃ ভিটা জমিতে সর্ষপ উত্তমরূপ হয়।

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।" সর্ষপের বপন ঘন এবং রাই নামক অপেক্ষাকৃত বড় সর্ষপের বপন বিরল হওয়া আবশ্যক। খনা বলেন —

"খনা বলে চাসার পো।
শরতের শেষে সরিষা রো।"

আশ্বিনের শেষ ভাগ। আমরাও পূর্ব্বে ঐ কথা বলিয়াছি। বর্ষার অগ্রপশ্চাতে কার্ত্তিকের প্রথমভাগেও সরিষার বপনাদ হইয়া আসিতেছে।

"সরিষা বলে কলাই মুগ।
বুনে বেড়াও চাপ্‌ড়ে বুক।"

এক ক্ষেত্রে এককালে সরিষা কলাই, কিম্বা সরিষা মুগ বপন করিলে এক খরচে ও এক শ্রমে দুইটী ফসল হওয়ায় কৃষকের বড় লাভ বোধ হয়। এই জন্য খনা তাহাদিগকে বুক চাপড়াইতে, অর্থাৎ আনন্দ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন।

আলু ও কপি—এই দুই ফসলের জমি খুঁড়িয়া দেওয়া ও আলুর ক্ষেত্রে সাত দিন অন্তর এবং কপির ক্ষেত্রে পনর দিন অন্তর জল সিঞ্চন ভিন্ন কার্ত্তিক মাসে উহাদিগের অন্য পাইট্ নাই। *

কতকগুলি সুমাতা।

সূক্ষ্মরূপে দেখিতে গেলে নৈতিক জীবনই মনুষ্যের যথার্থ জীবন বলা যাইতে পারে। নীতি বিনা যে জীবন, তাহা পশুজীবন বই আর কিছুই নহে। মানব যদি অপকর্ম্ম করে বা সাধ্য থাকিতে নিরপরাধ জন্তুর প্রাণ রক্ষা না করে, কর্ম্মক্ষম জ্ঞানবান্ ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে সর্ব্বোত্তম প্রাণী হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে, তবে মানব জীবনের মহত্ত্ব রহিল কোথায়? আধুনিক সমাজের দুরবস্থার কারণ কি? মূলে ঐ নীতির প্রতি অনাদর। আমাদের বালকদিগের দোষ দিব কি? জননীগণ তাহাদের নিকট এমন কিছু উচ্চ নীতির আদর্শ দেন না যাহা দেখিয়া

* পণ্ডিত শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত কৃষিশিক্ষা হইতে কার্ত্তিকের অধিকাংশ বিবরণ সংকলিত হইল। কাপাস ও পলাণ্ডুর চাষ আবাদের বিবরণ স্থানাভাব প্রযুক্ত এবারে দেওয়া হইল না, আগামী বারে হইবে।

তাহারা নীতিমান্ হইতে পারে। পশু অপেক্ষা তাহারা যে কারণে শ্রেষ্ঠ, সেই কারণটী উহাদের নিকট বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যা করা উচিত। উচ্চনীতিই যে "যথার্থ জীবন" "প্রাণকে তুচ্ছ করিয়া সত্যকে লাভ করিবে" এই উপদেশ পাইলে ও ইহার মত কার্য্য দেখিলে শিষ্য নিশ্চয়ই রত্ন হইবে। পূর্ব্বকার সুমাতাগণ শিশুকে প্রতি কার্য্যেই ঐ শিক্ষা দিতেন। ঐরূপ দুইটী রমণীর বিবরণ উপস্থিত করিতেছি।

২। কয়াধু। ইহাঁর বিষয় ইতি-পূর্ব্বে বামাবোধিনীতে সবিস্তর আলোচনা হইয়াছে। ইনি দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপুর মহিষী এবং ভক্তশ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদের জননী। সংক্ষেপে প্রহ্লাদের সহিত জননীর একদিনের বাক্যালাপের পরিচয় দিব। দুষ্ট দৈত্য হিরণ্যকশিপু যে সময় হরিনাম করা অপরাধে নিতান্ত নির্দ্দয়ভাবে প্রহ্লাদকে যন্ত্রণা দ্বারা নিষ্পেষিত করিতেছেন, সে সময় প্রহ্লাদ শরীরকে তুচ্ছ করিয়া নীরবে যন্ত্রণা সহ্য করিতেছিলেন। পরিশেষে কিছু-তেই দৈত্যরাজ তাহাকে জব্দ করিতে না পারিয়া আজ্ঞা করিলেন একবার অন্তঃপুরে উহার জননীর নিকট লইয়া যাও। দৈত্যানুচরগণ ধূলায় ধূষরিত ম্লান-মুখ প্রহ্লাদকে জননীর নিকট লইয়া গেলে কয়াধু প্রিয়পুত্রের তাদৃশ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইলেন। যে সকল অনুচর নিকটে ছিল, তাহা-দিগকে মৃদুবাক্যে কহিলেন "নির্জ্জনে যত্ন করিয়া না বুঝাইলে ইহার দুর্ম্মতি দূর হইবে না, অতএব তোমরা স্থানা-ন্তরিত হও।" তাহারা প্রস্থান করিলে কয়াধু সস্নেহে পুত্রকে ক্রোড়ে লইলেন এবং মধুরবাক্যে কহিলেন "বৎস! তোমার দিব্যজ্ঞানের উদয় হইয়াছে দেখিয়া আমি পরমানন্দিত হইয়াছি। শঙ্কর বিরিঞ্চি ইন্দ্র নারদ প্রভৃতি যাঁহার অনন্ত করুণার এক এক বিন্দু মাত্র প্রাপ্ত হইয়া সম্পদ্শালী ও কৃতার্থ হইয়াছেন, উহাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান ও সম্পদ। মহা-জনগণ যে জ্ঞান পাইয়া কৃতার্থ হন, সাধারণের সেই জ্ঞানই উপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য। ঐ শ্রেষ্ঠবিদ্যা গ্রন্থ পাঠ দ্বারা লাভ হইবে না—মনে মনে একান্ত যত্ন-পূর্ব্বক সাধুসঙ্গরূপ উপায়ে উহা উপা-র্জ্জন করা যায়। এ সংসারের সমস্তই বৃথা জলবুদ্বুদমাত্র। কি অপরিমেয় ধনরত্ন, উচ্চপদ মর্য্যাদা কি অসংখ্য দাস দাসী কি সুরম্য হর্ম্ম্য ও উপবনাদি এবং স্নেহময় পুত্র কলত্রাদি নিশ্চয়ই একদিন না একদিন দুরন্ত কাল উহা গ্রাস করিবেই। রে পুত্র! এমন কি এই যে তোমার লাবণ্যময় সুকুমার দেহ-যষ্টি, ইহাও কালের কবলিত রহিয়াছে। বৎস! এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর অনিত্য তুচ্ছ পদার্থের জন্য যে মূঢ় সময় ও শক্তি অপব্যয় করে, তাহাকে তুষাবঘাতীর সহিত তুলনা করিবে। যে হেতু তুষা-বঘাতী তুষ আঘাত করে মাত্র, তাহার

তণ্ডুল লাভ বিড়ম্বনা হয়। এইরূপ অনিত্যতার মধ্যে কদাচ যে সাধু ভাগ্যবান্ ধীর পুরুষের নিত্য জ্ঞান হয়, সেই ধন্য। সমস্ত সংসার মরণশীল, এই মহাকোলাহলের মধ্যে যে সেই সার নিত্যানন্দ চৈতন্যময় দয়াময়ের শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাতে বিহার করে, সেই সাধুই নমস্য।—তাত! বিঘ্ন বাধায় ভয় কি? তাহাতে অনিত্য শরীর বিনা অন্য কিছু ধ্বংস করিতে পারিবে না। তুমি নির্ভয় চিত্তে হরিনাম কর। বিপদ ভঞ্জন তাঁর একটী নাম, ঐ নামটী সাধন কর।" বিশ্বাসী জননীর সদুপদেশে বিশ্বাসী পুত্র দ্বিগুণ উৎসাহিতচিত্তে বিভুপদে প্রাণ দিতে সঙ্কল্প করিলেন।

৩। কৌশল্যা। রামায়ণ পাঠকালে রাম সীতা লক্ষ্মণের পরেই কৌশল্যা দেবীর চরিত্র আমাদের চক্ষে পড়ে। দুঃখের বিষয় রামায়ণে তাঁহার বিষয় অধিক জানিবার উপায় নাই। দশরথ নৃপতির মহিষীদিগের মধ্যে তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা ধর্ম্মপ্রাণা ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। সর্ব্বদাই ব্রত উপবাসাদিদ্বারা তিনি কুলদেবতার অর্চ্চনা করিতেন। যদিও কৌশল্যা পতিপ্রিয়া ছিলেন না, তথাচ একান্ত পতিপ্রাণা ছিলেন, পতি তাহার সর্ব্বনাশ করিলেও কথনও পতিনিন্দা করেন নাই। যখন রামচন্দ্রের রাজ্যলাভের পরিবর্ত্তে বনগমন করিতে হইবে, কৌশল্যা শুনিলেন, তখনও তিনি পতিনিন্দা করেন নাই। নিতান্ত অধীর হইয়া তিনি "হা বিধি এ কি করিলে? মন্দভাগিনীর সুখ তোমার সহ্য হইলনা। বুঝিয়াছি যে কখনও সুখভোগ করে নাই, তার সুখ বিধাতার সহ্য হয় না। রাজকুলে জন্মিয়া আমার মত হতভাগিনী অতি অল্পই আছে। প্রথমাবধি পতিবিমুখ। কল্য পুত্র রাজা হইবে, অদ্য তাহার বনবাস। দ্বাদশ বৎসরাবধি যে আশা করিয়াছি, অকস্মাৎ তায় বজ্রাঘাত! হা বিধি, হা দেব! নৃপতির দোষ কি, সকলি আমার দুরদৃষ্ট!" এইরূপ অবস্থায় কোন্ রমণী পতির দোষ না দিয়া থাকিতে পারেন? কৌশল্যার এইরূপ গুরুজননিষ্ঠা, এইরূপ উদার কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং সহগুণ হইতেই বোধ হয় রত্নাকর সদৃশ অশেষ গুণশালী বীরপুরুষ রামচন্দ্র মাতৃগুণে গুণবান্ হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের পক্ষে ধীরচিত্তে সপত্নী ও স্বামি নিগ্রহ সহ্যকরা অত্যন্ত গৌরবজনক সন্দেহ নাই। এক সময় কৌশল্যা যমযন্ত্রণা সদৃশ সপত্নীগণের বাক্য যন্ত্রণা এবং স্বামীর অবজ্ঞা সহ্য করিয়াছিলেন বলিয়াই কালে পুরুষোত্তমের জননী হইয়া ভাগ্যবতী ও চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। (ক্রমশঃ)

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৬ সংখ্যা ১৪৯ পৃষ্ঠার পর)

ঝিঁঝিঁট। একতালা।

নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় কৃত গীত পরিবর্ত্তিত।

+। ॥ । ॥ । । । । ॥
ম নি প প ম প ম গ গ
সে-দিন কে-মন-ভা-ব-লি-না- মন

+। ॥ । ॥ । ॥ ॥।
প প ধ ধ ধ নি সা˙
যে- দিন জী- বন যা- বে- রে।

+। ॥ । ॥ ॥ । ।
সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা. সা˙ ঋ˙ সা
বি- ষয়- ম- দে ম- ত্ত হ- য়ে

+। ॥ । ॥ । ॥ ॥।
নি নি ধ প ধ নি সা˙
তাঁ- রে ভু- লে আ- ছ- রে॥

+। ॥ ॥ । ॥ । । ॥
ধ নি প ধ নি নি নি নি
(১ম) জ্ঞা- ন শূ- ন্য বা- ক্য ছা- ড়া,
(২য়) তৃ- ণ শ- য্যা ভ- গ্ন বা- সে,
(৩য়) নী- লা- ম্বর আর বল-বে ক- ত,

+। । । । ॥ ॥ । । ॥
সা. সা˙ নি সা˙ ঋ˙ সা˙ সা˙ নি নি
(১ম) ছাঁ- বে- না লো-কে বল্ বে ম- ড়া,
(২য়) ল- য়ে যা- বে শ্ম-শা- ন বা- সে,
(৩য়) যে মু- খে খা- ও প- ক্কা- মৃ- ত,

+। । । ॥। । ॥ । ॥
সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ সা˙ ঋ˙ সা˙
(১ম) প- রি বা- রে দে- বে ছ- ড়া,
(২য়) ?- ঙ্গ র- সে পা- লং পো-সে,
(৩য়) সে মু- খে- তে দা- রা সু- ত,

+। ॥ । ॥ । ॥ ॥
নি নি ধ প ধ নি সা˙
(১ম) য- খন ল- য়ে যা- বে রে॥
(২য়) কে আর হে- সে শো- বে- রে॥
(৩য়) আ- গুণ জে- লে দে বে- রে॥

শিশু পালন।

সংসারে যতপ্রকার কার্য্য আছে, তন্মধ্যে শিশুপালনই পিতা মাতার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর, এই গুরু ভার মাতাকেই অধিকাংশ বহন করিতে হয়, তবে পিতার নামোল্লেখ করার কারণ এই যে পিতার সাহায্য পাইলে কার্য্যটী সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে এবং সময় সময় পিতার সাহায্যের বিশেষ আবশ্যকতাও হইয়া উঠে। এই সাহায্য কেবল অর্থ নহে, অর্থভিন্ন অন্যান্য সাহায্যেরও প্রয়োজন হইয়া থাকে। পিতাকে অনেক সময় অর্থোপার্জ্জন ও বৈষয়িক কার্য্যে ব্যস্ত থাকিতে হয়, আর মাতার গৃহকার্য্যের মধ্যে প্রধান অতিথি অভ্যাগত, আত্মীয় কুটুম্বগণের আহার প্রস্তুতি ও শিশুপালন। এই শিশুপালন করিতে হইলে সন্তান জন্মের পূর্ব্ব হইতেই পিতা মাতাকে সাবধান থাকিতে হয়। সন্তা-

নের সহিত পিতামাতার স্বাস্থ্য ও স্বভাবের অতি নিকট সম্বন্ধ, ইহাতে আর সন্দেহ কি? তবে বাল্যাবধি সুশিক্ষা ও সুনীতি দ্বারা শিশুর স্বভাব গঠিত হইলে দুশ্চরিত্র পিতামাতার সন্তানও সচ্চরিত্র হইতে পারে। * কিন্তু পিতা মাতার স্বাস্থ্যভঙ্গ জন্য সন্তানে যে দোষ সংঘটিত হয়, তাহা যুক্তি ও চেষ্টার অসাধ্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। রোগগ্রস্ত ব্যক্তি বর্গের পক্ষে পিতা মাতা হওয়া অপেক্ষা না হওয়াই জগতের পক্ষে মঙ্গল। যিনি যত প্রকার বিশ্বহিতকর ব্রতে ব্রতী হউন না কেন, শিশু সুপালনই উহার মধ্যে প্রধান, কেন না শিশুগণ ভবিষ্যৎ সংসার ক্ষেত্রের কর্মচারী, ইঁহাদিগকে নারী নরোচিত গুণে ভূষিত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতে পারিলে বিশ্বের কোন্ হিতসাধন করা না হইল? সুতরাং শিশুকে সুপালন করাই বিশ্বের মৌলিক হিতসাধন কার্য্য বলিয়া বোধ হয়। এই কথায় কেহ মনে করিবেন না যে আমি বলিতেছি, শিশুপালন ব্যতীত অন্য কোনরূপ বিশ্বহিতকর কার্য্যই নাই, তবে ইহাকে বিশ্বের মৌলিক হিত বলিতে চাহি কেন? মনুষ্য সমাজ লইয়া বিশ্বের ভাল মন্দ ঘটনা। জ্ঞানী যোগী ঋষিগণ, তৃণ ও পর্ব্বতকে সমান চক্ষে দেখুন, ঈশ্বর হস্তী ও পিপীলিকাকে একই মহান্ উদ্দেশ্য সৃষ্টি করুন, কিন্তু সাধারণ মনুষ্য আমরা মনুষ্য সমাজের নিকট ধর্ম্ম ও সদ্গুণাবলী চাই—যে ধর্ম্ম বিশ্বকে ধারণ করিয়াছে, † সেই ধর্ম্ম মনুষ্য সমাজের নিকট চাহি অর্থাৎ চাহি একটী ক্ষুদ্র জীব হইতে সর্ব্বজীবের প্রতি সুবিচার ও দয়া। মনুষ্যসমাজ ব্যতীত ইহা আমরা অন্য কোন পার্থিব জীবলোকের নিকট আশা করিতে পারি না. তাই মনুষ্য শিশুর সুপালন ও সুশিক্ষা দ্বারা আমরা বিশ্বের উন্নতি ও মনুষ্য-সমাজের উন্নতি কামনা করি। মনে করুন কোন ব্যক্তি আজীবন বিশ্বহিত ব্রত পালন করিয়া স্বর্গ গমন করিলেন, তাঁহার গুণাবলীও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী হইতে চলিয়া গেল, কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি সুপালন ও সুনীতি শিক্ষা দ্বারা নীরোগ হৃষ্ট পুষ্ট, বলিষ্ঠ, ধার্ম্মিক, সচ্চরিত্র, ও দয়ালু ২০।২৫টী শিশুকে সৎস্বভাবসম্পন্ন যুবক যুবতী করিয়া রাখিয়া যাইতে পারেন, তাহাহইলে ঐ যুবক যুবতীগণ দ্বারা সংসারের অনেক প্রকার হিত সাধিত হইতে পারে এবং তাঁহাদের শিক্ষকও পরলোক গমন

* পিতা মাতা অসচ্চরিত্র হইলে সন্তান সচ্চরিত্র হওয়া কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়, কেননা অসচ্চরিত্র পিতা মাতা হইতে শিশুকে বিচ্ছিন্ন করিয়া সুশিক্ষা ও সুনীতি শিক্ষা দিলে শিশু কালে সচ্চরিত্র হইতে পারে।

† ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
স্যাদ্ধারণপ্রযুক্তং স্যাৎ সধর্ম্ম ইতিনিশ্চয়ঃ॥
মহাভারত কর্ণপর্ব্ব, একোনসপ্ততিতমোধ্যায়—
৫৯ শ্লোক।

করিয়া ইহলোকের অপূর্ণ কার্য্য পূর্ণ করিতে থাকেন।

ঈশ্বরের বিশ্বহিতের জন্য যে এক নিগূঢ় মহান্ উদ্দেশ্য আছে, জনক জননীর হৃদয়ে অসীম সন্তান-বাৎসল্য নিহিত করিয়া তাঁহার সে উদ্দেশ্যের সফলতা সম্পাদন করিয়াছেন। এই শিশুপালন কার্য্য যে বিশ্বের হিতকর ও ঈশ্বরাভিপ্রেত ইহা বুঝিতে পারিয়া গৃহাশ্রমী জনক জননীগণকে জ্ঞানিগণ বার্দ্ধক্যে আধ্যাত্মিক উন্নতির চরম চেষ্টা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। * যখন সহমরণ প্রথার অসীম আদর ও গৌরব ছিল, তখনও শিশু সন্তানের জন্য জননী সহমৃতা না হইলেও ধর্ম্মের হানি বলিয়া পরিগণিত হইত না, তাই পরীক্ষিত-জননী উত্তরা স্বামিশোকে কাতর হইয়াও সহমরণ যাইতে পারেন নাই। অতএব শিশুকে সস্নেহে লালন পালন করা যেমন জননীর স্বভাবসিদ্ধ, তেমনি যাহা কিছু সৎকার্য্য তাহাই পুণ্য—যাহাতে বিশ্বপতির বিশাল বিশ্বের একবিন্দুও হিত করা হয়, তাহাই পুণ্য। যদিও আপন আপন সন্তানগণকে সর্ব্বতোভাবে সুন্দর করা জননীর ইচ্ছা, তবুও আমরা জানি না—বুঝি না যে কি করিলে সন্তান সর্ব্বপ্রকার সদ্গুণে ও স্বাস্থ্য সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইবে। আরও দুঃখের বিষয় এই যে আমরা গল্প উপন্যাস পড়িতে চাই, উল বুনিতে চাই, বেশ বিন্যাস করিতে যাই, আরও কত কি শিখিতে চেষ্টা করি। কিন্তু সংসারের গুরুতর কার্য্য যে শিশুপালন সেই শিশু-পালন কিসে ভাল হইতে পারে, তাহা শিক্ষা করি না বা শিক্ষা করিবার চেষ্টা করি না; সুতরাং "শিশুপালন" লেখা আজকাল আমাদের নিকট বিড়ম্বনা মাত্র। তবে শিশুপালন যে আমাদের শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক, ইহাই বলা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য এবং ইহারই আনুসঙ্গিক সামান্য সামান্য বিষয় দুই একটী লেখা যাইবে, কিন্তু তাহাও যে নির্ভুল একথা সাহস করিয়া বলিতে পারিতেছি না।

শিশুপালন গর্ভ হইতে আরম্ভ হওয়া উচিত, কেননা অঙ্কুরেই উহার মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি থাকিলে পরিণামফল মঙ্গল-জনক হয়। কোন কোন গর্ভিণীর গর্ভের প্রথম অবস্থায় অরুচি হয়, সেই সময় ক্ষুধা নিবারণার্থ তাঁহাদের মুখরোচক ঝাল লবণ সংযুক্ত অম্লরস খাওয়া উচিত নহে, উহাতে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়া সম্ভব। গর্ভিণীর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হইলে গর্ভ স্বাস্থ্যের দশাও তদ্রূপ হ দুধ মিছিরী সরবত লঘুপাক দ্রব্যাদি গর্ভের প্রথম করা অ নিমন্ত্রণ

...পালনে সুশি- ...হীন দাসসুত" কি হইতে পারে না?

---

* "গৃহস্থস্তু যদাপশ্যেৎ বলী পলিতমাত্মনঃ।
অপত্যস্যৈব চাপত্যং তদারণ্যং সমাশ্রয়েৎ॥"
মনু ।৬।২।

অর্শ রোগের রক্তস্রাব হইলে গরম জলে ফটকিরির গুঁড়া মিশাইয়া, সেই জলে শৌচ করিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

শূকরের রক্ত ও আফিং একত্রে অর্শের বলিতে লেপ দিলে বলি পতিত হয়।

বলিতে অত্যন্ত যন্ত্রণা থাকিলে হরিণের শৃঙ্গ শিলে ঘসিয়া লাগাইয়া দিলে অথবা গন্ধবিরজার ধূম তথায় দিলে বেদনার আশু শান্তি হয়।

জাঙ্গী হরীতকী চূর্ণ ।৵০ আনা, ১ তোলা মাখনসহ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে অর্শের যন্ত্রণার লাঘব হয়।

হরীতকীর আঁটির লম্বাদিকের দুই পার্শ্ব কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ কাটিবে, তৎপরে আঁটির লম্বা দিকেই একটী ছিদ্র করিয়া সেই ছিদ্র মধ্যে ৯ গুণ অর্থাৎ ৯ খেয়া ব-সূতা প্রবেশ করাইয়া কটীদেশে ধারণ করিলে অর্শরোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

সমালোচনা।

প্রতিধ্বনি,—আমরা অতিশয় আনন্দের সহিত এই সমালোচনা বামাবোধিনীতে প্রকাশ করিলাম; কারণ এই পুস্তকখানি কোন পঞ্চদশবর্ষীয়া বামার প্রণীত। প্রতিধ্বনি কবিতাময় পুস্তক, রচয়িত্রীর নাম শ্রীমতী মৃণালিনী, এই পুস্তক প্রণেত্রীকর্তৃক তাঁহার পিতৃদেবচরণে উৎসর্গীকৃত। সেই উৎসর্গ পত্র স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত। পুস্তকখানির কাগজ, মুদ্রাঙ্কন ও বাইণ্ডিং এত উৎকৃষ্ট যে, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত আর কোন বাঙ্গালা পুস্তকে তাদৃশ উৎকর্ষ দেখা যায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। পুস্তক খানিতে অষ্টষষ্টী বিভিন্ন কবিতা প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। রচয়িত্রীর ভূমিকাপাঠে জানা গেল, তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতে পঞ্চাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে যত কবিতা রচনা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশই এই পুস্তকে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রবন্ধের শেষে রচনার সন, মাস, এমন কি তারিখ পর্য্যন্ত লিখিত আছে।

এই পুস্তক খানি আমরা আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। অনেকে মনে করিতে পারেন, বামারচনার প্রশংসা করাই বামাবোধিনীর ব্যবসায়। নবশিক্ষিতা বঙ্গবালাগণের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ ঐ ব্যবসায় অবলম্বনে বামাবোধিনী কুণ্ঠিতা না হইলেও "প্রতিধ্বনির" প্রশংসা বাদে সে কথা কেহই বলিতে পারিবেন না। আমরা মুক্তকণ্ঠে অসঙ্কোচে বলিতেছি এত অল্প বয়সের রমণী—লেখনী হইতে এমন কবিত্বপূর্ণ এতগুলি সরল কবিতা আমরা

আদৌ দেখি নাই এবং ভরসা করি, প্রতিধ্বনির এই প্রশংসাবাদ অচির কাল মধ্যে বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইবে। বামাবোধিনীতে স্থানাভাব না হইলে আমাদিগের পাঠক পাঠিকার অবগতি জন্য অনেক কবিতা উদ্ধৃত করিতে পারিতাম। বাঙ্গালা কবিতা পাঠে যাঁহাদিগের অনুরাগ আছে, তাঁহাদিগের সকলকেই অনুরোধ করি, তাঁহারা "প্রতিধ্বনি" পাঠের কোন সুযোগ ত্যাগ না করেন। অন্ততঃ ফুল, পাখী, কখন বসন্ত এলো, ৺ সরোজিনী, ডেকেছি কেন, সুখের আশা, তখন ও এখন, বিষাদিনী, শেষ;—কোন গতিকে একখানা পুস্তক হাতে পড়িলে, এই কয়টী পড়িয়া লইবেন।

নূতন সংবাদ।

১। চীনজাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলিতেছে, কয়েক দিন হইল নিউব্যাঙ নামক স্থানে চীনেরা জাপানীদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল। তৎপরে কয়েকটী জলযুদ্ধ হইয়া চীনেরা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ইতিমধ্যে সন্ধির প্রস্তাব হইতেছে শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম।

২। ফরিদপুর দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ বেথুন বিদ্যালয়ের বালিকারা ৪৭৸৫ চাঁদা তুলিয়া আমাদিগের নিকট পাঠাইয়াছেন, উহা যথাস্থানে প্রেরিত হইল। বালিকাদিগের এ শুভানুষ্ঠান বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

৩। বহরমপুরের জলের কল স্থাপনার্থ যত টাকা ব্যয় হইবে, মহারাণী স্বর্ণময়ী স্বয়ং তাহা দিবেন। মহারাণীর রাজকীয় বদান্যতা চির-আদর্শ স্থল।

৪। গত জুনমাসে বিলাতে যে সিবিল সার্ব্বিস পরীক্ষা হয়, তাহার ফল বাহির হইয়াছে। বরাহনগরের বাবু শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র আলবিয়ন রাজকুমার ও জে ঘোষাল ও ভারতী সম্পাদিকা শ্রীমতী স্বর্ণ কুমারীর পুত্র জ্যোৎস্না ঘোষাল প্রশংসিতরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছেন।

৫। মদাগাস্কারের রাজ্ঞীর সহিত ফরাসীদিগের বিবাদ হেতু ইংরাজ বাণিজ্য অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বামারচনা।

প্রয়োজনীয় প্রার্থনা।

আমাদের হিন্দু সমাজে রমণীর পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা নাই। কন্যার পিতা, ভ্রাতা, খুড়া, জ্যেঠা, ইত্যাদি অভিভাবকগণ যাঁহাকে মনোনীত করিবেন, তাঁহাকেই কন্যা সম্প্রদান করাইবে। কেহ একবার দেখিবেন না যে, যাঁহার করে চির জীবনের জন্য একজন অবলার সুখ, আশা, ভরসা সমস্ত অর্পিত হইবে, যাঁহার অধীন হইয়া সেই দুঃখিনী অবলাকে অকূল সংসারসমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তিনি সেই অবলার মনোনীত হইলেন কিনা? এইত আমাদের সমাজের রীতি! পতি পত্নীর মনোনীত এবং পত্নী পতির [illegible]

মনোনীত এবং পত্নী পত্নিঅধ্যাপক হইবেন কিনা ... পত্নী শ্রীমতী কৃপাবাই তাহ ... আগই পরলোকগত হইয়াছেন। হয় ... না তরুদন্তের ন্যায় ইহাঁর কবিত্বশক্তি

রূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে থাকে। বিবাহ একটী কঠিন কার্য্য। বিবাহের পর হইতে মানবের নূতন জীবন আরম্ভ হয়। স্বামী স্ত্রীর দুইটী জীবন একটী জীবনে মিলিত করিয়া অতি সতর্কতার সহিত জীবন যাত্রানির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু দুইটী জীবন একত্র করিতে কয়জন জানেন? কয়জন পারেন? যিনি পারেন তিনিই ধন্য, তিনিই এই সংসারে স্বর্গসুখ লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছেন। মানবের দুটী জীবন একত্রে মিলিত করিয়া নিরাপদে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা বড় দুরূহ কার্য্য। এই দুরূহ কার্য্য সম্পাদনের জন্য দুইটী দ্রব্যের আবশ্যক—একটী প্রেম, অপরটী স্নেহ। সংসারে সুখ লাভের ইচ্ছা থাকিলে স্বামী ও স্ত্রী উভয়কে উভয়ের সহিত এই মহামূল্য রত্নস্বরূপ এই প্রেম স্নেহের বিনিময় করিতে হয়। কিন্তু এই পবিত্র রত্নের বিনিময় করিতে কয়জন জানেন? আর একটী কথা, এই অমূল্য রত্নদ্বয়ের বিনিময় করাও বড় সহজ কার্য্য নহে। স্বামী স্ত্রী হইলেই যে এরত্নের বিনিময় করিতে পারেন তাহা কখনই সম্ভব নয়। যদি তাহা পারিতেন তাহা হইলে প্রতি নিয়ত দম্পতিদিগের মনোমালিন্য ঘটিয়া স্ব স্ব জীবন ভার বোঝা বোধ হইত না। হৃদয় যাহার গুণে মোহিত হয়, তাহার সহিতই এই অমূল্য রত্নের বিনিময় করা যাইতে পারে। তাই বলিতেছি অগ্রে দেখা উচিত দম্পতিযুগল পরস্পর পরস্পরের প্রণয়ের উপযুক্ত কি না? কিন্তু এই উপযুক্ততা অনুপযুক্ততা নিরূপিত অতুল দুরূহ কার্য্য, একজনের যাহাকে বড়টী বিভিন্ন ভাব অপরের যে তাঁহাকে হইয়াছে। রচয়িত্রীর ভূমিকা? জানা গেল, তিনি দ্বাদশবর্ষ বয়স হইতে পাত্রীর অভিভাবকেরা যাঁহাকে উপযুক্ত পাত্র বিবেচনায় পাত্রীকে সম্প্রদান করিলেন, পাত্রীর হয় ত তাঁহাকে ভাল লাগিল না—সকলের অজ্ঞাতে হয়ত তাঁহার হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। তাই বলি প্রত্যেক লোকের রুচি বিভিন্ন প্রকার। হৃদয়ও এক প্রকার নয়। নিজের হৃদয় নিজে যেমন বুঝিতে পারা যায়; অপর সেরূপ বুঝিতে কোন মতেই সক্ষম নহেন। অতএব দম্পতিদ্বয় পরস্পরের প্রণয়ভাজন হইতে পারিবেন কি না, বিবাহের পূর্ব্বে সে পরীক্ষার ভার দম্পতিদিগের করেই ন্যস্ত হওয়া উচিত। এই কঠিন পরীক্ষার ভার দম্পতিদিগের উপর ন্যস্ত হয় না বলিয়া স্বামী স্ত্রীর অপ্রণয় ঘটিত মনোমালিন্যে কত সংসার অশান্তি অনলে পুড়িয়া ছারখার হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা কোথায়? স্বামী পত্নী নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইলে সংসারে ক্লেশ থাকিবে না— দম্পতি-যুগল পরস্পর পরস্পরে পবিত্র প্রণয়সুখ উপভোগ করিয়া জীবনকে চরিতার্থ জ্ঞান করিতে পারিবেন।

কিন্তু হায় এ পোড়া ভারতে—পোড়া সমাজে আরকি সে সুখের দিন উদয় হইবে যে দিন সাবিত্রী দময়ন্তী ভদ্রা ইত্যাদি আর্য্য মহিলাগণ স্বয়ং পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবার ক্ষমতা পাইয়াছিলেন? আমাদের হিন্দু সমাজে আর কি সে শুভ দিন হইবে? আমরা একান্ত মনে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তাঁহার কৃপায় যেন আমরা আবার সেই শুভদিন ফিরিয়া পাই। ভগবান্ যে দিন আমাদের এই প্রয়োজনীয় প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন সেই দিন হইতে আর দম্পতিদিগের মনোমালিন্যে সংসার বিষময় হইবে না।

নগেন্দ্রবালা মুস্তোফী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৮ সংখ্যা। কার্ত্তিক ১৩০১—নবেম্বর ১৮৯৪। ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রামমোহন রায় স্মরণার্থ সভা—গত ২৭শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ৬১ বার্ষিক স্মরণার্থ সভা যেমন কলিকাতায় মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে, সেইরূপ বোম্বাই, মান্দ্রাজ, লাহোর প্রভৃতি দূরস্থানে এবং বঙ্গদেশের অনেক প্রধান প্রধান নগরীতে সম্পন্ন হইয়াছে। রামমোহন রায় যেমন অসাধারণ মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি ভারতের স্ত্রী, পুরুষ, ভদ্র, ইতর সর্ব্বসাধারণের পরমহিতকারী বন্ধু ছিলেন, তাঁহার কোন স্থায়ী স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ সর্ব্বসাধারণের উদ্যোগ ও সহায়তা করা একান্ত বিধেয়। তাঁহার উদ্দেশে কলিকাতায় "রামমোহন রায় ক্লব" নামে একটী ধর্ম্মতত্ত্বালোচনী সভা এবং একটী পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা পরমাহ্লাদিত হইয়াছি।

জাতীয় মহাসমিতি—আগামী বড়দিনের সময় মান্দ্রাজে কন্‌গ্রেসের অধিবেশন হইবে, তাহার জন্য উৎসাহ সহকারে আয়োজন হইতেছে। কানাডার গবর্ণরকে সভাপতির আসন গ্রহণার্থে আহ্বান করা হইয়াছে। আমেরিকার কুমারী ফ্রানসিস্ উইলার্ড এল, এল, ডি এবং ইংলণ্ডের লেডী হেন্‌রী সমরসেট্ এই দুই সুপ্রসিদ্ধা মহিলার সমিতিতে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা।

স্ত্রীকবির মৃত্যু—মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক এম্ সত্যনাদনের পত্নী শ্রীমতী কৃপাবাই গত ৩রা আগষ্ট পরলোকগত হইয়াছেন। বঙ্গবালা তরুদত্তের ন্যায় ইঁহার কবিত্বশক্তি

এবং ইংরাজী সাহিত্যে বিলক্ষণ অধিকার ছিল। ইনি ইংরাজীতে "সগুণা" ও "কমলা" নামক দুইখানি উপখ্যান গ্রন্থ লিখিয়াছেন; সগুণা খৃষ্টীয় কলেজ মাগাজিনে মুদ্রিত হইয়াছে, কমলা শীঘ্রই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। এইরূপ গুণবতী রমণী ৩১ বৎসর বয়সে চলিয়া গেলেন, ইহা ভারতের বড়ই দুর্ভাগ্য।

সুখের মৃত্যু—কন্‌গ্রেসের উৎসাহী সভ্য রাজা রামপাল সিংহের মাতা ১২৫ বৎসর বয়সে কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন। এত বয়সেও তাঁহার কিছু মাত্র বুদ্ধিভ্রংশ হয় নাই।

দান—মহারাণী স্বর্ণময়ী হায়ার ট্রেণিং সভায় ৫০০ ও মূক বধির বিদ্যালয়ে ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

চীন জাপানী যুদ্ধ— উভয় পক্ষের বার বার জয় পরাজয় হইয়া প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে, তথাপি প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি খুব প্রবল। জাপানীরা একদিকে চীন রাজধানী পেকিন অধিকারে, অন্য দিকে চীনের প্রধান ধনাগার মৌকডেন নগর লুণ্ঠনে লোলুপ হইয়া অসংখ্য সৈন্য চালনা করিতেছে।

ভারত বিধবা — সেন্‌সসের গণনানুসারে, ভারতে বিধবা সংখ্যা আড়াই কোটি, তন্মধ্যে দশ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বাল-বিধবা সংখ্যা ৭০,০০০ হাজারের অধিক !!

ভগবৎ-কৃপা।

ভাগবত শব্দের অর্থ ভক্তিরস পাত্র ও ভক্তিরস শাস্ত্র। এই ভাগবত শাস্ত্রে বলিয়া থাকেন, ভক্তি লাভের তিনটি কারণ; প্রথমতঃ জীবের ভজন সাধন, দ্বিতীয়তঃ সাধু কৃপা, তৃতীয়তঃ ভগবৎ কৃপা। আমরা আজ এই প্রবন্ধে প্রথমোক্ত দুইটি পরিত্যাগ করিয়া কেবল তৃতীয়টি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বলিবার ইচ্ছা করিয়াছি।

আজ কাল শিক্ষিত সমাজে জ্ঞান বিজ্ঞান, ও বুদ্ধিক্ষমতার যেরূপ প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া থাকে, তাহাতে ভক্তিবাদের কথাবার্ত্তা প্রায়ই আকাশ কুসুমবৎ অলীক পদার্থরূপে অনাদৃত হইয়া থাকে, অথবা ঐন্দ্রজালিক পদার্থের ন্যায় ফুৎকারে উড়িয়া যায়। এরূপ ঘটনা যে কেবল আজ কালই হইতেছে, এমন নহে; ভগবদ্ভাব প্রাপ্তি সম্বন্ধে চিরকালই এই রূপ হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও উক্ত হইয়াছে,—

"মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ।"

সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কদাচিৎ কেহ ভগবৎ প্রাপ্তির জন্য যত্ন করেন এবং তাদৃশ যত্নশীল সহস্র ব্যক্তির মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ভগবৎ জ্ঞান লাভ

করেন। যাহা হউক, "ভগবৎ কৃপা" বলিয়া একটা পদার্থ আছে এবং তাহাতে বিশ্বাস হইবার উপযুক্ত ঘটনাবলী কখন কখন জীব-চরিত্রে দৃষ্ট হয়, অদ্য আমরা তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিব।

ভারতের দক্ষিণ প্রদেশে রঙ্গনাথ বলিয়া এক দেব বিগ্রহ আছেন। তাঁহার শ্রীমন্দিরের অদূরে বারমুখী নাম্নী এক পরমা সুন্দরী রমণী বাস করিতেন। তাঁহার অতুল ঐশ্বর্য্য এবং বহুসংখ্য উদ্যান ও পুষ্করিণী ছিল। আপনি বহুসংখ্যক সুন্দরী দাসী পরিবৃতা হইয়া পরম সুখে অট্টালিকায় বাস করিতেন। একদা মধ্যাহ্ন কালে তাঁহার বাস ভবনের অদূরবর্ত্তী এক কুসুমোদ্যানে কতকগুলি বৈষ্ণব সাধু উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা মধ্যাহ্ন তপনের প্রচণ্ড কিরণে পথভ্রমণ করিয়া নিতান্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন। উদ্যানের সুগন্ধি কুসুমযুক্ত ঘন পল্লবাচ্ছন্ন বৃক্ষচ্ছায়া ও সরোবরের শীতল জল উপভোগ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন। তাঁহারা তৃপ্তি জন্য আনন্দ কোলাহল পূর্ব্বক বিচরণ করিতে লাগিলেন। বারমুখী আপনার বাস-প্রকোষ্ঠের বাতায়নে উপবিষ্ট হইয়া সাধুগণকে দর্শন করিতে করিতে সহসা তাঁহার মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের আবির্ভাব হইল। আপন মনে বলিতে লাগিলেন,—

"দুষ্কর্ম্ম করি আমি অর্থ বানাইনু।
ধর্ম্মার্থে কখন কিছু ব্যয় না করিনু॥
তথাপিহ আরও অর্থপথ নিরক্ষিয়া।
নিজ দেহ পণ করি রত্নে সাজাইয়া॥
ছিছি মোরে ধিক্ ধিক্ যে অর্থ লাগিয়া।
পাপ পথে সদা ফিরি একান্ত করিয়া॥
সেই অর্থে ইহ(সাধুগণ)সব ফুৎকার করিয়া।
স্বজন বান্ধবগণ চরণে ঠেলিয়া॥
পরম পদার্থ সর্ব্ব লোকের সম্মত।
শ্রীকৃষ্ণ চরণ পদ্মে হইল আশ্রিত॥
অতএব ছিছি মুই ত্যজি হেন অর্থ।
দেহ পণ করিব নিতান্ত পরমার্থ॥"

পূর্ব্বকৃত দুষ্কৃতির স্মৃতি সহকারে এইরূপ চিন্তা করিয়া বারমুখী হঠাৎ গাত্রোত্থান করিলেন এবং একখানি থালা স্বর্ণ মুদ্রায় পূর্ণ করিয়া তৎসহ সাধুগণ সমীপে উপনীত হইলেন। সাধুগণ তাঁহার পূর্ণ যৌবন ও রত্নজড়িত আভরণ দ্বারা ভূষিতা কনকলতিকা-প্রতিমা মূর্ত্তি দর্শনে বিস্মিতা হইলেন এবং তিনি দেবী কি অপ্সরী তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে তাঁহাদিগের

"নিকটে যাইয়া বেশ্যা গদ গদ স্বরে।
কহে মো পাপীরে গোঁসাই কর অঙ্গীকারে॥
বহু অর্থ আছে মোর ভাণ্ডার ভরিয়া।
শ্যামল সুন্দরে দেহ ভোগ লাগাইয়া॥"

এই কথা শুনিয়া সাধুগণের মোহান্ত তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় তিনি অধোবদনা হইলেন। অবশেষে মোহান্ত পরিচয় পাইয়া কহিলেন,—

কৃষ্ণে যদি মতি তব এতাদৃশী হয়।
তবে ত কৃতার্থ তুমি চিন্তা কি আছয়॥

এক পরামর্শ আমি কহি যে তোমারে।
তোমার মানস পূর্ণ হইবে অচিরে॥
মোহরের থলি রঙ্গনাথের চরণে।
রাখিয়া শরণ লও গিয়া কায় মনে॥
অবশ্য করিবে দয়া ঠাকুর তোমারে।
বারমুখী বুঝিল উপেক্ষা কৈল মোরে॥"

সাধুগণের প্রত্যাখ্যানে বারমুখীর ক্রোধ হইল না, মনের নির্ব্বেদ শতগুণ বৃদ্ধি হইল। অশ্রুজলে বদন প্লাবিত করিয়া আপনাকে শত শত ধিক্কার প্রদান করিতে করিতে সেই মোহরের থলি মস্তকে করিয়া রঙ্গনাথের শ্রীমন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে মোহরের থালা রক্ষা করিয়া গললগ্নীকৃত-বাসা ও কৃতকরপুটা হইয়া শ্রীবদনের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন—দরবিগলিত অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। পূজারি ঠাকুর বারমুখীকে বেশ্যা জানিয়া তাঁহার অর্থ গ্রহণ করিলেন না। এখনও বারমুখীর ক্রোধ কি অভিমান হইল না; কেবল আপনাকে পাপিনী ও ভাগ্যহীনা বলিয়া আক্ষেপ ও ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বারমুখীর সেবা লালসা ও রোদন দেখিয়া এবং করুণ বিলাপ শুনিয়া পূজারি ঠাকুরের একটু দয়া হইল।

"চূড়া বানাইয়া দেও পশ্চাৎ কহিল॥"

বারমুখী ইহাতে পরম উৎসাহিনী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ঠাকুরের যে অঙ্গে যে গহনা সাজে, বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমস্ত রত্নাভরণ নির্ম্মাণ করাইলেন। সেই সকল আভরণ একখানি স্বর্ণ থালি পূর্ণ করিয়া আপনি মস্তকে ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় রঙ্গনাথের মন্দিরে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু পূজারি ঠাকুর অনেক বিবেচনা করিয়া সে আভরণ লইতে সাহস করিলেন না, বেশ্যার সামগ্রী দেব সেবার উপযোগী নহে বলিয়া পুনরায় প্রত্যাখ্যান করিলেন। বারমুখীর বদন শুষ্ক ও মলিন হইল, নয়নে অশ্রু বহিতে লাগিল। রোদন করিতে করিতে গৃহে গমন করিলেন এবং

"ঘরে গিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিল।
পরাণ ছাড়িব বলি প্রতিজ্ঞা করিল॥"

কিন্তু

"দয়াল হরি না বাছে উত্তম অধম।
যেই প্রীতি করে সেই হয় প্রিয়তম॥"

সেই রাত্রিতে পূজারি স্বপ্নে দেখিতেছেন যেন ঠাকুর ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়া ক্রোধভরে তাঁহাকে আদেশ করিতেছেন, "তুমি বারমুখীকে কল্য প্রাতে যত্নে আহ্বান করিবে এবং তাহাকে নিজহস্তে আমার অঙ্গে আভরণ পরাইতে দিবে। তাহাকে মন্ত্রশিষ্যা করিয়া আমার সেবায় নিযুক্ত করিবে, কদাচ তাহাকে ঘৃণা করিও না।" পূজারি ঠাকুর ভীতচিত্তে স্বপ্নাদিষ্ট আদেশ পালন করিলেন। বারমুখীর আনন্দের সীমা রহিল না। স্বহস্তে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আভরণ পরাইয়া দিয়া

"সর্ব্বস্ব লুটাইয়া কৈল মহা মহোৎসব।
বিষ ত্যজি পান কৈল কমল আসব॥

অতএব কি ব্রাহ্মণ চণ্ডাল দুরাচার।
শ্রীকৃষ্ণের স্থানে নাই জাতির বিচার॥"

বারমুখীর উদ্ধার দৈবাৎ হইল। এই জন্যই আমরা ইহাকে "ভগবৎ কৃপা" বলিলাম। জ্ঞান বিজ্ঞানশালী তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ প্রথমতঃ এরূপ ঘটনাকেই মিথ্যা বলিবেন। আর যদি দয়া করিয়া সত্য মনে করেন, তবে ইহার কার্য্য কারণ সম্বন্ধে যে কি মন্তব্য প্রকাশ করিবেন, তাহা তাঁহারাই জানেন।

গোয়েণ্ডেলাইন।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে লণ্ডনের অন্তর্গত মেল্টেন্‌হাম নগরে গোয়েণ্ডেলাইন জন্মগ্রহণ করেন। গোয়েণ্ডেলাইনের পিতা, শ্রুজবেরীর আরল ইংলণ্ডের প্রধান রাজমন্ত্রী ছিলেন। তাঁহার মাতাও জনৈক লর্ডের দুহিতা। এই সম্ভ্রান্ত ধনবানের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া গোয়েণ্ডেলাইন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার পিতা মাতা ঐশ্বর্য্যে এবং সম্ভ্রমে ইংলণ্ডের প্রধান ব্যক্তি হইলেও ধর্ম্মকেই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চতর স্থান প্রদান করিতেন, পার্থিব সুখৈশ্বর্য্য তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রবণ প্রকৃতিকে কিছুমাত্রও বিচলিত করিতে পারে নাই।

গোয়েণ্ডেলাইনের জন্মগ্রহণের পর তদীয় পিতা মাতা বিশিষ্টরূপে তাঁহাকে ধর্ম্মপথের পথিক করিবার জন্য নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করিলেন। শিশু গোয়েণ্ডেলাইন 'বাবা' 'মা' ইত্যাদি কথা বলিবার পূর্ব্বে যাহাতে পরমেশ্বরের নামে মুখ পবিত্র করিতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার পিতা মাতার ঐকান্তিক আগ্রহ এবং এই অভিপ্রায়ে সর্ব্বদা তাঁহাকে ঈশ্বরের নাম শুনাইতেন। পিতা মাতার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল। তাঁহাদের স্নেহের দুহিতা গোয়েণ্ডেলাইন সর্ব্বপ্রথমে পরমেশ্বরের নাম বলিতে আরম্ভ করিলেন। যখন গোয়েণ্ডেলাইন কথা বলিতে শিখিলেন, তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে করপুটে স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দিলেন। গোয়েণ্ডেলাইনের চরিত্রের বিশেষত্ব শৈশব হইতেই প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তিনি ভিক্ষুক দেখিলেই দান করিবার জন্য ব্যগ্র হইতেন। কাহাকেও কিছু দিতে পারিলে তিনি যেমন আনন্দ লাভ করিতেন, বহুমূল্য বসন ভূষণ ও সুমিষ্ট আহারেও তাঁহার তেমন আনন্দ হইত না।

ক্রমে তিনি জ্ঞানে ও ধর্ম্মে বিভূষিত হইয়া যৌবন সীমায় পদার্পণ করিলেন। ধনী কন্যাগণ যৌবন সমাগমে যেরূপ বিলাস-সুখ এবং কাম্য বস্তুর অপর্য্যাপ্ত সম্ভোগে মত্ত হইয়া অসারভাবে জীবন অতিবাহিত করিয়া থাকেন, সাত্ত্বিক

ভাবাপন্ন গোয়েগুেলাইনের ভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তিনি আপাত-মনোরম বিলাসিতা বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মার্থে—নরসেবায় জীবন উৎসর্গ করিলেন। প্রভু পরমেশ্বরের সেবা, তাঁহার সন্তানগণের পরিচর্য্যা ভিন্ন জগতে গোয়েগুেলাইনের অন্য কার্য্য রহিল না। তাঁহার সমগ্র দেহমন ধর্ম্মের জন্য সমর্পণ করিলেন। তিনি স্বীয় জনক জননীর সন্নিধানে বাস করিয়া সমস্ত দিবস সাধু কার্য্যে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। যে দিন তিনি কোন দরিদ্রকে দান কিম্বা রোগীর সেবা করিতে পারিতেন না, সে দিন বৃথায় গেল বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। তিনি স্বীয় পদমর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া স্বহস্তে রোগীদিগের সেবা করিতে আরম্ভ করিলেন। বাসস্থানের নিকটবর্ত্তী অসহায় রোগীদিগের মাতা হইয়া তিনি সেবার ভার গ্রহণ করিলেন। তাহার সেবা শুশ্রূষা এবং সপ্রেম ব্যবহারে সকলে এরূপ প্রীত হইল যে, তিনি নিকটে উপস্থিত থাকিলেই রোগী আরাম বোধ করিত।

১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে রোমের প্রিন্স মার্ক এণ্টনী বর্ঘীসের সহিত গোয়েগুেলাইনের বিবাহ হয়। প্রিন্স মার্ক এণ্টনীও গোয়েগুলাইনের সমুদয় শুভ কার্য্যের সহচর হইয়াছিলেন। সুতরাং এই বিবাহে অতি শুভ ফলই উৎপন্ন হইয়াছিল। বিবাহের পর তিনি স্বামীর সঙ্গে রোমে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় নানাবিধ জনহিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

এ সময় রোমে ভয়ঙ্কর বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। সহস্র সহস্র নরনারী বিসূচিকার করালগ্রাসে নিপতিত হইয়া ইহলোক ত্যাগ করিতে লাগিল। নগর, পল্লীতে, হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইল। গৃহে গৃহে রোগী, শুশ্রূষা করিবার লোক নাই, চিকিৎসা করিবার বৈদ্য নাই। অশুশ্রূষায়, অচিকিৎসায় স্বীয় স্বীয় শয্যাতে কত লোক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। সমাধি করিবার লোকের অভাবে অনেক মৃতদেহ কবরস্থ হইল না; সে সকল মৃতদেহের দুর্গন্ধে নগর পল্লিকে নরকময় করিয়া তুলিল। সোণার রোম শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল। এই ঘোর দুর্দ্দশার দিনে, স্বর্গ হইতে অবতীর্ণা দেবীর ন্যায় গোয়েগুেলাইন সেবা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি কয়েকজন সহচরী সমভিব্যাহারে স্বীয় জীবনের মমতা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গৃহে ভ্রমণ পূর্ব্বক রোগীকে ঔষধ পথ্য দান করিতে লাগিলেন। তিনি দিবারাত্র অক্লান্ত পরিশ্রমে ক্ষিপ্রহস্তে ঐ সকল কার্য্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেবা শুশ্রূষায় এবং ঔষধ পথ্যে শত শত লোক মৃত্যুর গ্রাস হইতে রক্ষা পাইতে লাগিল।

এ সময় হইতে গোয়েগুেলাইন অনাথ ও রুগ্নদিগের পালনার্থে একটী মূল সমিতি এবং তাহার অনেক শাখা সমিতি

স্থাপন করিলেন। চিকিৎসালয়, অনাথ-নিবাসও স্থাপিত হইল। তিনি সমুদয় কার্য্যের ভার নিজ মস্তকে লইয়া সুন্দর-রূপে নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

তিনি দরিদ্রদিগের ধনরক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য রোমনগরে একটী সেভিংস্ ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন। দরিদ্র শ্রমজীবিগণ দুই চারিটি করিয়া পয়সা সংস্থান করিবার স্থান প্রাপ্ত হইল। ইহাদ্বারা দরিদ্রগণের বিশেষ উপকার হইয়াছিল। দরিদ্রবালক বালিকাদিগকে শিক্ষা দান এবং দুর্নীতি হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এইরূপে গোয়েণ্ডেলাইন যাবতীয় হিতকর অনুষ্ঠান সম্পন্ন করিতে লাগিলেন। রোগীর পার্শ্বে, দরিদ্রের কুটীরে, দুর্নীতিপরায়ণের শিক্ষালয়ে, চিকিৎসালয়ের তত্ত্বাবধায়কতায়, শোকার্ত্তের সান্ত্বনার স্থলে, ক্ষুধার্ত্তের অন্নসত্রে সর্ব্বত্র বিরাজিত সেই দেবী গোয়েণ্ডেলাইন। তিনি রোমের জননীরূপে অনাথ উপায়হীনদিগকে লালনপালন করিতে লাগিলেন। তিনি যতদিন পৃথিবীতে জীবিত ছিলেন, প্রাণপণে জনসমাজের হিতকার্য্যসাধন করিয়াছেন। আলস্য, বিলাসিতা, সুখভোগেচ্ছা কখনও তাঁহার পবিত্র হৃদয়কে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তিনি ধনে মানে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও অতি সামান্য ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন। তাঁহার ধনবল, জনবল, গরিবের উপকারার্থে নিয়োজিত হইত। তিনি যথার্থই বিপন্ন মানবের বান্ধব ছিলেন। এই মূর্ত্তিমতী দয়া-স্বরূপিণী, বিশ্বহিতৈষিণী, সর্ব্বলোক-জননী গোয়েণ্ডেলাইন ১৮৪০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে অক্টোবর মানবলীলা সংবরণ করেন।

মেঘ।

আজ অনেক দিন পরে আবার গগনে মেঘের নিবিড় ঘটা! বাল্যকালে মেঘ দেখিলে—মেঘে বিজলি দেখিলে—মেঘের গুরু গম্ভীর শব্দ শ্রবণ করিলে প্রাণে বড় আতঙ্ক উপস্থিত হইত, মার ক্রোড়ে—মা'র বক্ষে মস্তকটী না লুকাইলে, মা'য়ের অঞ্চলে চক্ষু না ঢাকিলে আর নিরাতঙ্ক হইতে পারিতাম না। মা তুমি ধন্য! অদ্যকার এই মেঘে আমার আর ভয় নাই, তোমার ক্রোড়েও একটু স্থান নাই, যদি থাকিত তাহা হইলে এই সংসার তাপে তাপিত হইয়া যখন ছটফট্ করি, তখন কি একবার কোলে লও না? তাই বলি মা তুমি ধন্য! কেন না তোমার ক্রোড়ের সহিত আমার সেই মেঘের ভয়টাও অপসারিত করিয়াছ, তাই আজ নির্ভয় হৃদয়ে সুপরিচিত আত্মীয় সমূহের ন্যায় গগন-

বিহারী "ধূম জ্যোতিঃ মরুতাং সন্নিপাত" বিজলী-মালী মেঘের সহিত আলাপ করিতে ইচ্ছা হইতেছে।

হে অনন্ত আকাশ! মনুষ্যের এই শান্ত—ক্ষুদ্র হৃদয়টা যেন তোমারই ছায়া লইয়া গঠিত। সত্য তোমার তলে গ্রহ উপগ্রহাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডল আবির্ভূত এবং ঘনঘটা ও বিজলী ছটা বিভাসিত হইয়া থাকে, কিন্তু মনুষ্যের ক্ষুদ্র হৃদয়াকাশে সদ্‌গুণাবলীই জ্যোতিষ্কমণ্ডল; আকাঙ্ক্ষা ও আশাই, আবর্ত্ত, পুষ্করাদি মেঘ।

হে জলধর! তুমি প্রকৃতির বিশাল রাজ্যের একটী অনন্ত সৌন্দর্য্যের ব্যাঘাত জন্মাইয়া যেমন সুনীল আকাশকে সমাচ্ছন্ন করিয়াছ—যেমন বায়ু বিতাড়িত হইয়া শত শত খণ্ড হইতেছ, তথাপি অপসারিত হইতেছ না, তেমনি আমাদের হৃদয়াকাশে—নির্ম্মল হৃদয়াকাশে কত বৃথা চিন্তারাশি—অসার কল্পনা রাশি আসিয়া নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে, একটী অপসারিত হইতে না হইতেই আর একটী আসিয়া পড়িতেছে, আশাও একটী পূর্ণ হইতে না হইতেই আর একটীর অঙ্কুরোদ্গম হইতেছে, একটী পূর্ণাশার নেশা ছুটিতে না ছুটিতে আরটী আসিয়া হৃদয় ব্যাপিয়া ফেলিতেছে। যদি সমুদ্র-তরঙ্গের বিরাম থাকে, তথাপি আশার ও চিন্তার বিরাম নাই। বায়ু-বিতাড়িত হইয়া তুমি কতবার ছিন্ন ভিন্ন হইতেছ, তবুও সুনীল আকাশের নির্ম্মলতা টুকু কলুষিত করিতে ছাড়িতেছ না, আশাও কতবার নৈরাশ্য-বায়ু বিতাড়িত হইয়া চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু আবার প্রাবৃট কালীন গগনের ন্যায় হৃদয়াকাশ সমাচ্ছন্ন করিয়া উহার নির্ম্মলত্ব বিনষ্ট করিতেছে। তাই তোমার সহিত আমার ন্যায় সাধারণ মনুষ্যগণের অসার চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাকে তুলনা করিতে ইচ্ছা হয়। জলদ! এই যেমন তুমি ভরপুর হইয়া সদর্পে গগন আবৃত করিয়াছ অমনি বায়ু আসিয়া বিতাড়িত করিতেছে, বায়ুকে তুমি যদি কষ্টে স্বষ্টে কোন মতে পরাস্ত করিতে পার তবে বড়জোর জল হইয়া গলিয়া যাইবে, অতএব তোমার ভদ্রস্থতা কৈ? তেমনি মনুষ্যের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ভদ্রস্থতা নাই, হয়ত উড়িয়া গেল, পূর্ণ হইল না, যদি পূর্ণ হইল ত তৃপ্ত হইল না—প্রাণের পিপাসা মিটিল না। মেঘশূন্য আকাশ যেমন নয়নের তৃপ্তি-সাধক, আশা ও আকাঙ্ক্ষা রহিত হৃদয়ও তেমনি সংসারের উত্ত্যক্ত প্রাণের শান্তিদায়ক। মেঘে যেমন ঝটিকার ঝঞ্ঝাবাত, পৃথিবী প্লাবনকারী ঝমঝমে মুষলধারে বৃষ্টি, কড় কড় শব্দ, বৃহৎ বৃহৎ করকাপাত ও বজ্রের অনল সমস্তই সম্ভবে, তেমনি আশা ও আকাঙ্ক্ষাপূর্ণ হৃদয়ে, ক্রোধের গুরু গর্জ্জন, বজ্রানলের ন্যায় কঠিন অপ্রিয় বচনাবলী দ্বারা লোকদিগকে দগ্ধ করিয়া মারা, প্রলয় কালীন ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় মারামারি কাটাকাটি করিয়া লোকের জীবন-মূল উৎপাটন

করা, ও হিংসা দ্বেষানলে ধরাদাহন করা সবই সম্ভবে। কেননা আকাঙ্ক্ষা হইতে আশার উৎপত্তি, আশা হইতে লোভ, মোহ, ক্রোধাদির উৎপত্তি। এটী আরও একটু ভাল করিয়া বুঝাইতে হইলে কিঞ্চিৎ উদাহরণের আবশ্যক। এই ধরুন সরিকী স্বত্ব লইয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায়, যাতায় যাতায়, খুড়া ভ্রাতুষ্পুত্রে কলহ বিবাদ হয় কেন? উভয় পক্ষের মনের ভাব এই যে 'আমি ধনী হইব ও সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিব।' অনন্তর সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করিবার জন্য আশা আসিয়া কার্য্যারম্ভ করে। সেই আশা চাহে কি? সমধিক লাভবান্ হইতে। সুতরাং মেঘ! তোমাতে যেমন ঝড় বৃষ্টি করকাদি সবই সম্ভবে, আশা ও আকাঙ্ক্ষায় তেমনি হিংসা দ্বেষ সবই সম্ভবে।

জলদ! মূলে তোমার গুণ আছে, যতই দোষ থাক্ মূলে তোমার গুণ,— জগতের পুষ্টিবর্দ্ধন করা। আশা ও আকাঙ্ক্ষার মূলেও যে গুণ আছে তাহা জগতের হিতসাধক। মনুষ্যগণ আকাঙ্ক্ষার অনলে পুড়িয়া—নিরাশার তাড়না খাইয়া—আশার নেসায় পাগল হইয়াও জগতের হিত এক পক্ষে করিতেছে বলিতে হইবে। নিরবচ্ছিন্ন যাহাতে জগতের অহিত হয় এমন বস্তু বোধ হয় ঈশ্বরের সৃষ্টিতে নাই। 'আমিত্ব' সৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর 'আমাকে' রক্ষা করিতেছেন, এই 'আমিত্ব'ই যুবতীর কুলমান, লালন পালন দ্বারা শিশুগণের জীবন, সেবা শুশ্রূষাদ্বারা স্থবির ও রোগিগণের জীবন রক্ষা করিতেছে, কেননা "আমার ভার্য্যা, ভগ্নী, কন্যা, পুত্র, পিতা, মাতা" এ সমস্তের মূলে 'আমিত্ব' নিহিত, 'আমিত্ব' সিঞ্চিত। যদি কেহ বলেন যে নিঃস্বার্থ পরোপকারী, জিতেন্দ্রিয় বিশ্ব প্রেমিকগণ দ্বারা এই সকল কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে, কিন্তু আমরা বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা উক্ত শ্রেণীর লোক সংখ্যা এত অল্প যে শতকরা একজনও মিলে না। যে সময় তপস্বী ঋষিগণের কুটীরে তপোবন সকল জনপদ ছিল— যে সময়ে যোগের ও বেদের প্রতি লোক সমধিক অনুরাগী ছিলেন—যে সময়ে পূর্ণগর্ভা কোশল-রাজমহিষী একটি উক্ত প্রকার মহাত্মার আশ্রয় লাভ করিয়া নিরাপদে ছিলেন, সে সময়ের কথা বলিতেছি না,—যে দিন প্রজাপতিগণ সর্ব্বলোক পিতামহের "দার পরিগ্রহ কর" এই বাক্য লঙ্ঘন করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন এবং মহাত্মা নারদ সেই বাক্য লঙ্ঘন করায় জন্মান্তর গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং দাসীর গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন * সে দিনের কথা বলি-

* ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ দেখ। শ্রীমদ্ভাগবতেও যখন মহামুনি ব্যাসদেবকে দেবর্ষি নারদ তাঁহার পূর্ব্বজন্ম বিবরণ বলিতেছেন, তখন দাসীর গর্ভে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়া প্রকটিত আছে। অনাবশ্যক হইলেও উহার একটী মাত্র শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

অহং পুরাতীত ভবেঽভবং মুনে,
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চ ন বেদবাদিনাং।
১ স্কন্দ। ৫ অধ্যায়। ১৩ শ্লোক।

তেছি না, বলিতেছি এই উনবিংশ শতাব্দীর কথা যে শতকরায় উক্তরূপ লোক একটি মিলাও সন্দেহস্থল। সুতরাং একটি "অহঙ্কারী" অর্থাৎ "আমিত্ব" পূর্ণ মনুষ্য দ্বারা যখন ২০১২৫ টী পরিবার 'আমিত্ব" রজ্জুতে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে, তখন অত অল্প সংখ্যক সাধু সাধ্বীগণ দ্বারা যদি এই সকল কার্য্য সুন্দররূপে চলিত, তাহা হইলে পিতৃ মাতৃ ও আত্মীয় বিহীন বালক বালিকাগণ মৃত্যু-মুখে পতিত বা দুরবস্থাগ্রস্ত হয় কেন? কেনইবা আশ্রয়হীন অভাগিনীগণ বিপথ-গামিনী হয়? অপত্যবিহীন বৃদ্ধ বৃদ্ধা-গণ এক বিন্দু জলের জন্য এক মুষ্টি অন্নের জন্য যষ্টি সাহায্যে পথে পথে ফিরে কেন? কেনইবা নিরাশ্রয় রোগি-গণ বিষ্ঠা মূত্র লিপ্ত দেহে এক ফোঁটা জলের জন্য শুষ্কতালু হইয়া জীবন হারায়? অতএব মেঘ! তুমি যেমন নীল আকাশে থাকিয়া জগতের হিত অহিত সাধন করিতেছ, হৃদয়াকাশে তেমনি আশা ও আকাঙ্ক্ষা আছে। তোমাতে বজ্রের অনল আছে, আবার সুশীতল সলিলও আছে; আশা ও আকাঙ্ক্ষায় ষড়্রিপুর দৌরাত্ম্য আছে, আবার সুস্নিগ্ধ স্নেহাদিও আছে। পিতা মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, স্বামী প্রভৃতির স্নেহই গৃহবন্ধন, গৃহ বন্ধনই আশা ও আকাঙ্ক্ষার জনক। আশা ও আকা-ঙ্ক্ষার গুণ থাকিলেও জলধর! অদ্য যেমন তোমার নিকট বিদায় চাহিতেছি, উহাদের নিকট কবে বিদায় চাহিব বলিতে পার?

কু, রা।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৭ সংখ্যা ১৬৭ পৃষ্ঠার পর।)

সন্তানের শরীর বিকাশ মাতৃ কর্তৃক সাধিত হয় একথা সকলেই জানেন। কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয় যে সন্তানের হৃদয়ের বিকাশও মাতৃ কর্তৃক সাধিত হয়। ভালবাসা মানব-হৃদয়ের সর্ব্বপ্রধানা বৃত্তি। এই বৃত্তি পূর্ণমাত্রায় সম্প্রসারিত হওয়াকেই "মানব-হৃদয়ের উন্নতি" বলা যায় এবং হৃদয়ের উন্ন-তিকেই "মনুষ্যত্বের প্রধান সহায়" বলা যায়। মাতা হইতেই সন্তানের সেই ভালবাসা-বৃত্তি পরিস্ফুট হয়। মা'র বুকভরা স্নেহ পাইতে পাইতে শিশু সহজেই মা'কে ভাল বাসিতে আরম্ভ করে। ইহাই হৃদয়ের প্রথম কার্য্য। শিশু যখন জড় ও চেতনের সন্ধিস্থলে, যখন জাগতিক ব্যাপার তাহার সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞেয়, যখন আহার, রোদন মাত্র তাহার সম্বল, সেই অজ্ঞানতা-কোয়াসা ভেদ করিয়া সে শিশু-হৃদয় মা'কেই চিনিতে পারে! সেই ক্ষুদ্র শিশু যখন মায়ের জন্য কান্না ধরে, তখন অপর কেহ তাহাকে সহজে শান্ত করিতে পারে

না।—সে কান্না সে আকুলতা যে কেবল স্তন্যের লোভে নহে, প্রধানতঃ মা'কে পাইবার জন্যই শিশুর প্রাণ এমন অধীর হইয়া থাকে, তাহাও বুঝিতে পারা যায়। আমাদিগের পাঠক পাঠিকাদিগের মধ্যে অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, রোদন-পরায়ণ শিশু অনেক সময়ে স্তন পান না করিতেই, মাতৃক্রোড়ে যাইবা-মাত্র শান্ত হয়।—কত সময়ে মাতার পদশব্দ শুনিয়াও রোদনে নিবৃত্ত হইয়া প্রীতি প্রফুল্লনেত্রে মাতার আগমন-পথ চাহিয়া থাকে! এমন প্রাণভরা ভালবাসা যে দুধ খাইবার জন্য, এমন কথা কেহ কখনই বলিও না। শিশুর এই ভালবাসা স্বর্গের ভালবাসা, এই ভালবাসা প্রথম ভালবাসা, এই ভালবাসা সহজ ভাল-বাসা। এই ভালবাসার অমর শক্তিতে মা'কে পাইলে ক্ষুদ্র শিশুর বুকে আনন্দ ধরে না; মা'র মুখে একটু হাসি দেখিলে শিশুর আনন্দ লহরী উঠিতে থাকে; মা'র স্নেহপূর্ণ চুম্বন ও মধুমাখা আদর পাইলে তাহার প্রাণ পুলকে গলিয়া যায়! পর-প্রহার-ত্রাসিত শিশু এবং পতন বা পশ্বাদি ভয়-ভীত শিশু যখন অভয়া-রূপিণী মা'কে জড়াইয়া ধরে, যখন ঠোঁট ফুলাইতে ফুলাইতে ছল ছল চক্ষে মাতৃ-মুখ-পানে চাহিতে থাকে, তখন তাহার সে উচ্ছ্বসিত প্রেমের স্রোতে বিশ্বজগৎ ডুবিয়া যায়, মানব-বুদ্ধি দিশাহারা হইয়া যায়, মানব-প্রাণ পাগল হইয়া যায়। অধম আমরা সে স্বর্গীয় প্রেমের মর্ম্ম বুঝিতেও পারি না, বুঝাইতেও পারি না। একদিন যদি শিশুর মত হৃদয়খানি পাই, একদিন যদি শিশুর মত বিশ্বজগৎ ভুলিয়া আমার মা'কে ভাল বাসিতে পারি, তাহাহইলেই আমার মানবজন্ম সার্থক হয়!

এ জগতে শিশুই মায়ের অমৃতময় প্রাণে অনুপ্রাণিত। মায়ের সর্ব্বস্বধন শিশু, শিশুরও সর্ব্বস্বধন মা। মানব সময়ে মহাত্মা হইয়া জগৎকে আপনার করিতে পারেন, পরিণত জীবনে প্রেমিক যীশু বা প্রেমিক চৈতন্য হইতে পারেন, প্রেমিক হাউয়ার্ড বা প্রেমিক বিদ্যাসাগর হইতে পারেন, উন্নতিশীল মানবজীবনে কিছুই অসম্ভব নহে—কিন্তু যে হৃদয়-বিস্তৃতির জন্য তিনি নরদেহে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, সে হৃদয় তাঁহার মাতৃহস্তেই প্রথম বিকশিত হয়! যিনি মানব-চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন, তিনি দেখিয়া থাকিবেন, যে ব্যক্তি শৈশবে মাতার (অথবা মাতার ন্যায় সহৃদয়া স্নেহময়ী কাহারও) স্নেহের ছায়ায় পালিত হইতে না পারে, তাহার প্রকৃতি অনেক দিন পর্য্যন্ত কঠোর রহে; হৃদ-য়ের কোমলতা সাধিত হইতে বিলম্ব হয়।* তাই বলিতেছি সন্তানের শরী-রের মত হৃদয়েরও প্রথম বিকাশ মাতৃ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়।

* ইহা সাধারণের প্রতি প্রযোজ্য; ব্যক্তি বিশেষের পক্ষে অন্যথা হইতে পারে।

প্রঃ লেঃ।

এইরূপে যে মাতা সন্তানকে গর্ভে ধারণ, লালনপালন, হৃদয়-বৃত্তি পরিস্ফুটন ও মঙ্গলাশয়ে যাবজ্জীবন আত্মোৎসর্জ্জন করেন, তিনি যে সন্তানের পরম দেবতা একথা বলা বাহুল্য মাত্র! এই পরম দেবতাকে বিশুদ্ধ ভক্তিভাবে পূজা করিতে পারিলে সন্তানের দেহ ও জীবন সার্থক হয় এবং আত্মার দেবত্ব লাভ হয়। ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত মূর্খ, পাপী পুণ্যবান, পুরুষ রমণী মাতৃপূজায় সকলেই অধিকারী, এবং এ জগতে **মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি।**

মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, যে শিশু-হৃদয়ে শৈশব কালোচিত ভালবাসাকে প্রকৃত "মাতৃভক্তি" বলা যায় না। শিশুর ভালবাসা হৃদয়পূর্ণ উচ্ছ্বাস-ভরা ভালবাসা হইলেও উহার স্থায়িত্বের প্রতি বিশ্বাস রাখা যায় না; কারণ শৈশবে প্রায় সকল শিশুই মাতার একান্ত অনুরক্ত হয়, কিন্তু প্রাপ্তবয়সে মাতার নিকটে কতজন দারুণ কৃতঘ্নতা প্রদর্শন করিয়াও থাকে। মাতৃ-ভক্তি দূরে থাকুক, মাতার প্রতি সন্তানের যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য, কুসন্তানেরা তাহাও পালন করে না। সেইজন্য অজ্ঞান শিশুর ভালবাসাকে "ভক্তি" বলা সঙ্গত হয় না। সন্তান জ্ঞানপ্রাপ্ত হইয়া মাতার শ্রেষ্ঠতা বুঝিয়া মাতাকে সম্মানপূর্ণ যে অনুরাগ দান করেন, তাহাকেই প্রকৃত "মাতৃভক্তি" বলা যায়। এই ভক্তিভাব স্থায়ীভাব। মাতা ইহ জগতে থাকুন আর পরজগতে থাকুন, ভক্তিমান্ পুত্র বা ভক্তিমতী কন্যা চিরদিনই মাতৃভক্তি অনুশীলন করেন; অবস্থার দাসত্ব, বা ঘটনার দাসত্বে তাঁহাদিগের মাতৃভক্তি কখনই ভ্রষ্ট হয় না। এই স্থায়িত্ব, বিশুদ্ধ মাতৃ-ভক্তির এক প্রধান লক্ষণ।

আমরা বলিতেছি মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। মুক্তির অর্থ আমরা, দেহাবসানে আত্মার স্বর্গবাস, পারলৌকিক সুখ সম্পত্তি লাভ, সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্ব্বাণ প্রাপ্ত বলিয়াই জানি, মৃত্যুর পরে এ রকম মুক্তি যে পুণ্যবান্ পুণ্যবতীদিগের সম্ভব, এ বিষয়ে অনেকেই বিশ্বাসী। কিন্তু মঙ্গলময় জগদীশ্বরের কৃপায় "মুক্তি" কেবল পর-লোক-বিষয়ীভূত ও মৃত ব্যক্তিদিগের প্রাপ্য নহে; মুক্তি ইহলোকেও মিলে এবং জীবিত ব্যক্তিগণও তাহাতে অধিকারী হইতে পারেন। এই ইহলৌকিক মুক্তির অর্থ পাপ কলুষাদি হইতে মুক্ত হওয়া। মানবের আত্মা বিমল, পুণ্যময়, সত্যস্বরূপ ঈশ্বরের অংশ বিশেষ। কিন্তু নির্ম্মল দর্পণেও হাই দিলে যেমন মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে না, আমাদের আত্মাও সেই রকম পাপ মলিনতায় অপরিষ্কৃত হইয়া গেলে তাহার মধ্যে ঐশিক জ্যোতিঃ অনুভব করিতে পারা যায় না। আয়নায় মুখ দেখিতে হইলে আয়না মাজিয়া ঘষিয়া লইলেই মুখ দেখা

যায়, আত্মার ঈশ্বরত্ব প্রকাশিত করিতে হইলে সমস্ত পাপ মলিনতা হইতে মুক্ত হইতে হয়; মলিনতা হইতে মুক্ত হওয়াই নর জগতের মুক্তি। ভারতীয় ঋষিগণও বহু শতাব্দী পূর্ব্বে এ কথা বলিয়া গিয়াছেন, পাঠক পাঠিকাদিগের অবগতির জন্যে হিন্দুশাস্ত্র হইতে কয়টী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

"মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বরূপেণ অবস্থিতিঃ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত, ২ স্কন্ধ, ১০অ, ৬শ্লোক)

অর্থাৎ আত্মার অন্যরূপ পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বরূপে অবস্থিতি করাই মুক্তি।

"বিচারাদিত্যবিদ্যাস্তো,
মোক্ষো ইত্যভিধীয়তে॥"
(যোগবাশিষ্ঠ ৭০ সর্গ, ১শ্লোক)

বিচারাদিদ্বারা অবিদ্যা * নাশ হইলে তাহাকেই মোক্ষ (মুক্তি) কহে। ইত্যাদি।

মুক্তির বিষয়ে এই সকল তত্ত্ব আলোচনা করিলে, পাপ কলুষ দি হইতে মুক্তি লাভ করাই যে আধ্যাত্মিক মুক্তি, এ কথা সহজে উপলব্ধ হয়। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতেও সন্তান ইহ জগতে এই মুক্তি লাভ করেন; কিন্তু সে কথা বলিবার আগে আমাদের একটু "বিজ্ঞাপন" আবশ্যক হইতেছে। কারণ আমরা যদি (মুক্তির বিষয়ে) পারলৌকিক মুক্তিই খাড়া রাখিতাম, তাহা হইলে আমরাও সহজে প্রবন্ধ শেষ করিতাম, পাঠক পাঠিকাগণও বিনাশ্রমে (না হয় অল্প শ্রমে) আমাদিগের কথায় অনুমোদন করিতেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু আমরা যখন প্রত্যক্ষীভূত ইহলৌকিক মুক্তি আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখন প্রবন্ধ সহজে শেষ হইবে, এমন দুরাশা করি না। এই জন্য পাঠক পাঠিকাদিগের নিকটে আমরা অপেক্ষাকৃত অধিক, ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রার্থনা করি।

বারমেসে।

অগ্রহায়ণ।

যে সকল শস্যের চাস আবাদ কার্ত্তিক মাসে করিতে হয়, যদি কোন গতিকে তাহা না ঘটিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই সকল চাস আবাদ এই অগ্রহায়ণ মাসে করিলেও হয়।

শাক, সব্‌জি,—কার্ত্তিক মাসে যে সকল শাকাদির চাস আবাদ করা হয়, তাহাদের গোড়া খোঁড়া ও আবশ্যক মত সপ্তাহে সপ্তাহে জল সিঞ্চন ভিন্ন এ মাসে আর কোন কার্য্য নাই।

---

* অবিদ্যার অর্থ অজ্ঞানতা, এজগতে অজ্ঞানতাই মানবের সকল পাপের মূল। হিতাহিতবিচার করিতে শিখিলে অজ্ঞানতা দূর হয়, তখন মুক্তি লাভ সহজ-সাধ্য। হিন্দুশাস্ত্রে অবিদ্যার বিস্তৃত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু বুঝিয়া দেখিলে, তমঃ, মোহ, মহামোহ, তামিস্র ও অন্ধতামিস্র এই পাঁচ রকম "অবিদ্যা" কেবল অজ্ঞানতার নামান্তর।

প্রঃ লেঃ।

আলু,—আলুর ক্ষেত্রে দাঁড়া বাঁধা। এ মাসে আলুর অন্য কোন কার্য্য নাই।

লঙ্কা,—অনেক কৃষক এই মাসে লঙ্কার পাকা চারা ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া থাকে; কিন্তু তাহাতে ফল মোটে হয় না, কেবল পণ্ডশ্রম মাত্র হইয়া থাকে। খনা বলিয়াছেন,

"ভাদ্র কি আশ্বিনে না রুয়ে ঝাল।
যে চাসা ঘুমায়ে কাটায় কাল॥
পরেতে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ মাসে।
বুড়ো গাছ ক্ষেতে পুঁতিয়ে আসে॥
সে গাছ মরিবে ধরিয়া ওলা।
পূরিতে হবে না ঝালের গোলা॥"

এই প্রবাদেই দৃষ্ট হইতেছে যে, ভাদ্র আশ্বিনই ঝাল রোপণের প্রশস্ত সময়। অগ্রহায়ণ মাসে ঝাল রোপণ করা দূরে থাকুক, এই মাস হইতে লঙ্কা ফলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মাসের প্রথম পনর দিনের মধ্যে যত লঙ্কা ফলিবে, তাহা তুলিয়া ফেলিতে হয়। তুলিয়া না ফেলিলে লঙ্কায় কিছুমাত্র ঝাল হয় না।

আমন ধান্য,—আমন ধানের যত দূর পুষ্টি ও পরিপাক হইতে পারে, তাহা এই মাসের মধ্যেই হইয়া থাকে; সুতরাং অগ্রহায়ণ মাসই ধান্য ছেদনের প্রশস্ত কাল। খনার বচন,

"এক আমন ধান।
তিন শাওনে পান॥"

পানের সম্পূর্ণ পরিপাক হইতে তিন শ্রাবণ আবশ্যক হয়।

আমনে পৌটি, পৌষে ছেউটি।
মাঘে নাড়া, ফাল্গুনে ফাঁড়া॥"

অগ্রহায়ণ মাসে ধান কাটিতে পারিলে ষোলআনা ফসল মিলে, পৌষমাসে কাটিলে ছেউটী, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রে ধান পাওয়া যায় না, মাঘ মাসে কাটিলে ধান কিছুই পাওয়া যায় না, কিন্তু যথেষ্ট নাড়া-খড় বা বিচালী পাওয়া যায় এবং ফাল্গুন মাসে কাটিলে না ধান, না খড়, কিছুই পাওয়া যায় না।

কাঁটাল,—যে বার অগ্রহায়ণ মাসে বৃষ্টি হয়, সেবার অপরিমিত কাঁটাল জন্মে। তাহার অন্যথায় কাঁটাল ভাল হয় না। খনা,—

যদি না হয় অগ্রহায়ণে বৃষ্টি।
তবে না হয়, কাঁটালের সৃষ্টি॥"

পৌষ।

আলু,—এই মাসের প্রথম সপ্তাহ হইতেই আলু তুলিতে আরম্ভ করিবে। ঘরামীরা বাখারির যে সোমাজ কাঠী দিয়া বাঁধন তোলে, সেইরূপ একটী দ্বারা গোড়ার মাটী খুঁড়িয়া আলু তুলিতে হয়। পাছে আলুর গাছের শিকড়াদি কাটিয়া যায়, এজন্য এদেশের কৃষকেরা আলু তুলিতে কোনরূপ অস্ত্র ব্যবহার করেন না। কিন্তু বর্দ্ধমান ও হুগলী জিলার কৃষকগণ কোদাইল দ্বারা আলু তুলিয়া থাকেন। মটরের ন্যায় ছোট ছোট আলুগুলি রাখিয়া প্রথম বারে সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিতে হয়। আলু তোলার পর গাছগুলি ঈষৎ হেলাইয়া

গোড়ায় মাটী ধরাইতে হয়। প্রথম আলু তোলার ৩।৪ দিন পরে জল সিঞ্চন করিবে। আলু তোলার পর গাছ গুলির একটু তেজ বৃদ্ধি হয়, তখন প্রতি পত্র-কক্ষে, অর্থাৎ পাতার গোড়াতেও আলু ফলিতে আরম্ভ করে।

কপি,—এই মাস হইতে কপিও তুলিতে ও খাইতে আরম্ভ করিবে। কোন কোন স্থানে অগ্রহায়ণ মাস হইতেই কপি ভোজন আরম্ভ হয়। ফুলকপি, তদপেক্ষা পূর্ব্বেও প্রস্তুত হয়। পাটনা অঞ্চল হইতে এদেশে যথেষ্ট পরিমাণে ফুলকপির আমদানী হইয়া থাকে।

খনা কোন বচনে অগ্রহায়ণ মাসে ধান্য ছেদনের উপদেশ দিয়াছেন। অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণে সে বচন ধৃত হইয়াছে। আবার অন্য বচনে পৌষ মাসে ধান্য ছেদনের প্রাধান্য প্রকাশ করিয়াছেন। খনাকে অযথাবাদিনী বলিয়া উড়াইয়া দিবার যো নাই। সুতরাং ঐ বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের একটা মীমাংসা করা আবশ্যক। আমরা পূর্ব্বে কোন স্থানে উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ষারম্ভের অগ্রপশ্চাৎ হেতু কোনবার ধান্যাদি ফসল কিছু অগ্রে, কোনবার কিছু পরে জন্মিয়া থাকে। তদনুসারে খনার দুইটী কথাই সত্য। একটী বচন অগ্রহায়ণ মাসের বিবরণে প্রকাশ করিয়াছি; আর একটী এই,—

"হলে ফুল কাট শণ।
পাট পাকিলে লাভ দ্বিগুণ॥
পৌষের মধ্যে ধানে লাভা।
খনা বলে দুগুণের বোঝা॥"

পৌষ মাসের মধ্যে ধান্য কাটিলে দ্বিগুণ লাভ হয়।

তামাক,—এই মাসে তামাক কাটিতে হয়। এই মাসে কাটিয়া হালা ও ছালা না বাঁধিলে তামাক নষ্ট হইয়া যায়। খনা,—

"খনা বলে শুন শুন।
শরতের শেসে মূলা বুন॥
তামাক বুন গুঁড়িয়ে মাটী।
বীজ পুঁত গুটি গুটি॥
ঘন রূপে পুঁতনা।
পৌষের অধিক রেখোনা॥

এইবচনে তামাক চাস সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় কথা কয়টী আছে।

আশ্বিন কার্ত্তিক মাসের উপ্ত ও রোপিত যে সকল ফসল তোমার ক্ষেত্রে আছে, আবশ্যক মতে তাহাদের পাইট্ ভিন্ন এ মাসে আর কোন কাজ নাই।

স্বর-সাধন প্রণালী।

(৩৫৭ সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর)

রাগ ভৈরব।

ব ব ব
ঠাট। সা ঋ গ ম প ধ নি সা

চৌতাল। ধ্রুপদ *

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বর-লিপি।

অস্থায়ী

৪। । ১। । | +। ব ব ।ব
মগ মগ ম প | প নি ধ ধপ
নি- রা- | ধা- র,
(সঙ্গত) ধা ধা

০।ব । ৩। । ০। ব। ৪'ব।
পধ পম পম গ ঋ ঋ ম
জ- গ- দা-
দিন্ তা তেটেকতা কদেতা তেটেকেটে

১। । | +॥ ০। ।ব ৩। ব
গ ম | গ গ ঋ গ ঋ
ধা- | র, বি- ধা-
গদিঘেনে।

৩। ০। । ৪॥ব ১॥ব | +॥ব
সা সা সা .নি .ধ | .ধ
তা, জ- গ- ত- পা- | তা,

০। । ৩। । ০। ।
সা সা সা সা সা মগমগ
গ- তি মু- ক্তি- দা- তা,

৪। । ১।ব ।ব | +। ব ।
ম প ধপ ধপ | পধম ম প
নি- তা নি- য়ন্ | তা, নি-

০। ৩। ব। ০॥ ||
গ ম গ ঋ সা
রা- কা- র

অন্তরা।

৪॥ ১॥ +॥ ০। । ৩'ব ।ব ০। ।
প প ম নিধ সা' সা'
স- র্ব্ব ব্যা- পী, জ-

৪॥ ১।ব ৺ ৺ | +॥ব
সা০ নিসা০ সা০ সা০ | ধ
ন ব- ন্দি- ত, | নি-

---

* চৌতাল ধ্রুপদের তাল। একতালার ন্যায় ইহারও মাত্রা সমষ্টি বার, এবং ইহা দুই দুই মাত্রা-বিশিষ্ট ছয়টী পদে বিভক্ত; তন্মধ্যে দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে ফাঁক, এবং প্রথম, তৃতীয়, পঞ্চম ও ষষ্ঠ পদে চারিটী তালি; এইজন্য ইহার নাম চৌতাল। ঠেকা যথা,—

÷॥ । | ০। । | ৩৺ ৺ ৺৺ | ০৺ ৺ । | ৪৺ ৺ । ৺ | ১৺ ৺ ৺ ৺ |
ধ ধা | দিন্ তা | তে টে কতা | ক দে তা | তে টে কে টে | গ দি ঘে নে। |

ধ্রুপদ গানই হিন্দুদিগের উন্নত ভদ্রসমাজে চলিত ছিল। ইহার রচনা বিস্তৃত, এবং চারি অংশ বা কলিতে বিভক্ত। ঐ কলিকে গায়কেরা তুক্ বলিয়া থাকে। যথা, অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ। প্রত্যেক তুকই তালের চারি ফেরে পর্য্যাপ্ত। কিন্তু গায়কদিগের স্বেচ্ছাচারিতা বশতঃ কখন কখন তালের তিন পাঁচ বা ততোধিক ফেরেও কোন কোন তুক্ নিষ্পন্ন হইতে দেখা যায়। চৌতাল, ধামার, সুরফক্তা, ঝাঁপতাল, তেওট, আড়াচৌতাল, রূপক, ঢিমেতেতালা, সওয়ারী এই সকল তালেই ধ্রুপদ গাওয়া হয়।

সা নি সা সা গ ঋ ঋ সা | মগ পম ম গ ঋ ঋ
শ্চ- ল, অ- দ্বি- তী- | শর- ণ্য স- র্ব্ব- স্ব-

সা নি নি ধ ধ প | প ম | সা | নি ধ সা গ ঋ সা
য়, নি- র্ম্ম- ল, | স- র্ব্ব | ধা- ধা- র।

আভোগ।

নি ধ সা সা ঋ সা নি নি ধ | সা সা নি সা ঋ সা
শ্রে- ষ্ঠ প- র- ব্র- | জী- ব পা- ল- ক,

ধপ নি ধ | ধপ পম ম প ঋ | ম নি ধ ধ সা সা | ধ
হ্ম- | সা- রা- ৎ সা- | প- র- ম ব- রে- | ণ্য

সা
র।

সা নি সা গ ঋ ঋ সা সা ঋ নি ধপ
প- র- মে-

সঞ্চারী।

সা ধ ধ প ধ প ধ ধ
স- র্ব্বা শ্র য়, নি-

নি ধ প নি ধ ধপ প ম প ম
স্ব- র, জ্ঞা ন স্ব-

ধ ধ প | পম নি ধ সা
রা- ম- য়, | নি- স্তা- র

গ ঋ সা | সা নি ধ সা
রূ- প, | অ- বি- না-

নি সা নি ধ পম | প মগঋ
কা- র- ণ, | স- র্ব্ব-

ঋ সা নি ধ প | পধ মগ ঋ
শ, নি র্ব্বি | কা-

সা
র।

(ক্রমশঃ)

মা ও ছেলে।

মায়ের কোলে ছেলের খেলা,
দেখ্‌লে জুড়ায় প্রাণ,
ভালবাসি চাঁদের হাসি
তাও কি এর সমান?

যখন ছেলে মায়ের কোলে
চোক্ পানে চোক্ চেয়ে,
আপন ভাবে বিভোর হয়ে
থাকে অবাক্ হয়ে;

চায় চায় চায় চোক্ না সরায়
পলক নাহি পড়ে,
মায়ের হৃদি স্নেহের নদী
সুধীর মূর্ত্তি ধরে।

সেই ধীরতা চোকের কোণে
বারেক্ যদি দেখে,
দেখ্‌তে চায় তা শতবার সে
ভুল্‌তে নারে তাকে।

আবার যখন চোকের পলক
ফেলে ক্ষণেক পরে,
চাঁদের ছেলে চাঁদবদনে
চাঁদের হাসি ধরে;

ভাবের সনে চাঁদবদনে
হাসির লহর দেখে,
থেকে থেকে মেঘের কোলে
চাঁদটি লুকায় দুখে।

হাসির ছটায় জগৎ মাতায়
হাসির বাহার কত,
হাসির সনে ভাবের রাশি
ফুটিয়া উঠে তত।

ভাব দেখে ভাবময়ী মায়ের
ভয় ভাবনা ছোটে,
ভাব-তরঙ্গে স্নেহের নদী
আপনি উথ্‌লে উঠে।

তনয় যবে মৃদুল রবে
সহজ সরল বোলে.
'মা' তোর কোলে যাব' বলে
ঝাঁপ খেয়ে যায় কোলে,

উঠিয়ে কোলে জড়িয়ে গলে
বলে মায়ের কাছে,
দে 'মা' আমায় চাঁদ ধরে দে'
অই আকাশে আছে।

দেখ্‌দেখি চাঁদ কেমন ভাব
মোর দিকেতেই আসে,
ধরে দেমা ভাইয়ের সনে
খেল্‌ব ঘরে ব'সে।

প্রাণজুড়ান আধ ফুটন
শিশুর মধুর বাণী—
শুন্‌তে পেয়ে নেচে উঠ্‌ল
মায়ের পরাণ খানি।

স্নেহের ভরে সোহাগ করে
অমিয়ময় মুখে,
চুমটি খেয়ে ধীরে ধীরে
বল্‌ছে মাতা তাকে—

ওরে বাছা ননীর পুতুল
অমিয় মোর বল,
অবোধ ছেলে চাঁদটি নিয়ে
কি হবে তোর ফল?

চাঁদ কিরে কেউ ধরতে পারে
শূন্যেতে তার বাসা,
চাঁদ ধরা সাধ ছেড়ে দে বাপ
অইটি বৃথা আশা।

মায়ের কথা শুনে ছেলে
বলছে সোহাগ ভরে,
না দিলে, অই চাঁদের মত
একটি চাঁদ দেও গড়ে।

মায়ের গড়া চাঁদটি নিয়ে
ভাইয়ের হাতে দিব,
ভাইয়ের সনে 'মিলে জুলে'
চাঁদ নিয়ে খেলিব।

তোমরা দে'খো চাঁদের খেলা
চাঁদের বাহার কত.
তাই বলি মা গড়ে দে চাঁদ
একটি, চাঁদের মত।

সোহাগভরে চুমু খেয়ে মা
শিশুর মধুর মুখে,
তাও কি বাছা হয় কখনো
বলছে তনয়টিকে,—

চাঁদ ধরিতে চাঁদ গড়িতে
মানুষ কখন পারে ?
অবোধ ছেলে বোঝনা তা ?
বুঝ্‌বে কদিন পরে।

মায়ের কথা শুনে ছেলে
অমনি বলছে তাঁকে—
অই চাঁদ কে গড়ছে মা
বলে দেও আমাকে—

ছেলের মুখে গভীর ভাবের
মৃদুল কথা শুনে—
সুখের সিন্ধু উথ্‌লে উথ লে
উঠছে মায়ের মনে।

বল্‌ছে মাতা "শোন বাছাধন
স্থাবর জঙ্গম আদি
অনল পবন গহন কানন
ভূধর সাগর নদী—

তোমায় আমায় জীব সমুদায়
গড়িয়াছেন যিনি,
অই যে দেখ আকাশে চাঁদ
তাও গড়েছেন তিনি।

সেই কারিকর ভিন্ন ইহা
কেউ গড়িতে নারে,
কও যদি তার নিকটে সে
গড়লে গড়তে পারে।

কুতূহলে তনয় অমনি
বল্‌ছে মায়ের কাছে,—
তাই যদি হয় তবে বল
ভাবনা কি আর আছে ?

কারিকরের নাম কি গো মা
কোন্‌ খানে সে থাকে—
বলে দে মা চাঁদ গড়িয়ে
দিতে বলব তাকে।

স্নেহের ভরে আলিঙ্গিয়ে
চুমটি খেয়ে মুখে,
সোহাগ ক'রে তনয়েরে
বলছে মাতা সুখে ;—

তিনিই বাছা দয়ার সাগর
"দয়াময়" তাঁর নাম,
এ সংসারে হেথায় হোথায়
সব ঠাঁই তাঁর ধাম।

তাঁর বাড়ীতে আমরা থাকি
তিনিই সবার গতি,
আয় বাছা আয় তাঁর চরণে
করি মোরা নতি।

শ্রী শ।

আমেরিকার আশ্চর্য্য পক্ষী।

আমেরিকার গ্রীষ্মমণ্ডলে পক্ষিজাতির যেরূপ বংশবৃদ্ধি ও উন্নতি, এরূপ আর কোথাও দেখা যায় না। তথায় তাহাদিগের বাসের জন্য বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের জঙ্গল আছে, আহারের জন্য জলা ও মাঠে অসংখ্য ক্ষুদ্র ও বৃহদাকার কীট পতঙ্গের অভাব নাই। আর সে সকল স্থানে মানুষের সমাগম কম, এই জন্য তাহাদিগের মৃত্যুর আশঙ্কাও কম।

১। বৃহৎ জাতীয় পক্ষীর মধ্যে টৌকান বিশেষ প্রসিদ্ধ। ইহাদের চঞ্চু অতি বৃহৎ ও ধারাল, তাহা দ্বারা কখনও কখনও জাহাজ ফুটা করিয়া আরোহী-দিগকে বিপন্ন করে। এই ঠোঁট

হাল্কা ও সছিদ্র না হইলে ইহারা উড়িতে পারিত না, তথাপি চঞ্চুর ভরে উড়িবার সময় ইহাদিগকে মাথা গুঁজিয়া যাইতে হয়। এই জন্য উড়িবার সময় ইহাদিগকে বিশ্রী দেখায়। ঠোঁট কিন্তু দেখিতে বড় সুন্দর, উপরের ঠোঁটে ঘোরাল লালের উপর হরিদ্রাবর্ণের রেখা, নীচের ঠোঁট নীল। মৃত্যুর পর ইহা বিবর্ণ হইয়া যায়। টৌকান যখন উচ্চ বৃক্ষের মস্তকে বসে, ব্যাধেরা তখন বিষাক্ত বাণ বা গুলি দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করিয়া মারে। ইহার মত কোলাহল ও বিবাদ-কারী পক্ষী আর নাই। সায়ংকালে পরিষ্কার আকাশে উড়িতে উড়িতে বিকট শব্দ করে, বর্ষাকালে চীৎকার বেশী শুনা যায়। গায়েনার এক কৃষিক্ষেত্রে টৌকান সর্ব্বেসর্ব্বা হইয়া সকল পক্ষী ও চতুষ্পদের উপর রাজত্ব করিত। ইহাকে সকলে ভয় করে। কোন স্থানে কোনও খাদ্যদ্রব্য লইয়া অপর জন্তুরা কোলাহল করিতেছে, এমন সময় টৌকানের আগমন হইলে সকলে চুপ করিয়া সরিয়া যায়। তাহার আহার অগ্রে, তাহার ভুক্তাবশেষ মাত্র অন্যের প্রাপ্য। তবে কুকুরের কাছে টৌকান জব্দ হইয়া থাকে। টৌকান আহার লুকিয়া লুফিয়া খায়, জলপানের সময় ঠোঁট ডুবাইয়া জল শুষিয়া লয়, পরে বার বার মাথা ঘুরাইয়া জলপান করে। ইহার জিহ্বা লম্বা, সরু ও পালকের মত দুদিকে ধারাল। ইহারা চঞ্চুর আঘাতে বৃক্ষে কোটর করিয়া তন্মধ্যে বাস করে। কখনও কখনও ভো গাছের মধ্যেও বাসা ঠিক্ করিয়া লয়।

২। আমেরিকার (হমিংবার্ড) গুণ গুণ পক্ষী সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ও সুন্দর। ইহারা এত ক্ষুদ্র যে ইহাদিগের পাখার পালক না থাকিলে ইহাদিগকে পতঙ্গ বলা যাইত। ইহারা ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়িতে থাকে। মৌমাছির ন্যায় গুণ গুণ শব্দ করে বলিয়া ইহাদিগের নাম হমিং বা গুণগুণ। ইহাদিগের দাম্পত্য প্রণয় ও বাসা নির্ম্মাণ প্রণালী আশ্চর্য্য।

৩। কটিঙ্গা নামে আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা সৌন্দর্য্যে দ্বিতীয় স্থানীয়। আমেরিকার নির্জ্জন, নিবিড় ও সজল বনে ইহারা বাস করে এবং ফল ও বীজ খায়। ইহারা লাল, বেগুনে, নীল নানা বর্ণের। দুঃখের বিষয় ইহারা গানশক্তি-বিহীন।

৪। কাম্পানিরো—ইহারা বরফের ন্যায় শুভ্র। ঘণ্টারবের ন্যায় শব্দ করিয়া শ্রোতাদিগকে চমৎকৃত করে। ইহারা প্রাতে, মধ্যাহ্নে, রাত্রে, সকল সময়ে সঙ্গীতালাপ করে। ইহারা থামিয়া থামিয়া শব্দ করে। ইহাদের গানে অনেক কালোয়াতও মোহিত হইয়াছেন।

৫। রূপকোলা—গায়েনা পাহাড়ের পাটলবর্ণের একজাতীয় মোরগ। ইহারা অতি নির্জ্জন বনে থাকে। ইহারা আশ্চর্য্য নৃত্যাভিনয় করে। রিচার্ড সোমবর্গ একজন প্রামাণিক পর্য্যটক, তিনি স্বচক্ষে

ইহাদিগের কাণ্ড দেখিয়া এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—

"একটা মসৃণ পাথরের উপর এক-দল পক্ষীর নৃত্য দেখিলাম। বৃক্ষশাখায় প্রায় ২০টী দর্শক উপবিষ্ট। প্রথমে একটা মোরগ আসরে নামিয়া নৃত্য আরম্ভ করিল। সে ময়ূরের মত পাখা ও পুচ্ছ বিস্তার করিয়া নাচিতে লাগিল। নাচিতে নাচিতে একবার ভূমি আঁচড়ায়, এক-বার ঊর্দ্ধে উল্লম্ফন করে, নানা অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করিতে লাগিল। যখন সে ক্লান্ত হইল, তখন সরিয়া গিয়া আর একটীকে আসর দিল। এইরূপে পর্য্যায়-ক্রমে এক একটী নাচিতে লাগিল। পুরুষেরাই নর্ত্তক, পক্ষিণীরা এক দৃষ্টিতে দর্শন করে ও উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া বাহবা দেয়। নৃত্যের সময় অভিনেতা ও দর্শকেরা আমোদে মাতিয়া আত্মবিস্মৃত হয়, শিকারীরা সুযোগ পাইয়া সেই সময় বিষাক্তবাণে তাহাদিগকে বধ করে। ইহাদের পালক বহু মূল্যে বিক্রীত হয়।

৬। বাল্টীমোর বা তন্তুবায় পক্ষী। ইহারা টিউলিপ গাছের শাখায় আশ্চর্য্য বাসা বাঁধে। তাঁতীরা টানা ও পড়েন দুইভাবে সূতা দিয়া যেমন কাপড় বুনিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপে বাসা বয়ন করে। পক্ষী লম্বে লম্বে এক একটী কুটা রাখে, পক্ষিণী উল্‌টা বাগে আড়া আড়ি করিয়া অন্য কুটা সাজায়, এইরূপে ক্রমে জালের মত বুনিতে থাকে। বাসা বাঁধার কার্য্য যত শেষ হইতে থাকে, তত তাহাদের প্রণয় ও আনন্দ যেন গাঢ়ভাব ধারণ করে। বাসানির্ম্মাণে অনেক কৌশল প্রকাশিত হয়। বড় গরমে শাবকদের কষ্ট হইবে বলিয়া মধ্যে মধ্যে বায়ুর পথ রাখে। লাউসিয়ানাতে উত্তর পূর্ব্বের শীতলবায়ু স্বাস্থ্যকর, তাহার জন্য বাসা বিশেষভাবে ঝুলাইয়া দেয়। পেনসিলভিনিয়া ও নিউইয়র্কে দক্ষিণ-বায়ু উপাদেয়, এজন্য সেখানকার পক্ষীরা বাসার দক্ষিণদিক্ খোলা রাখে। কোমল শাবকদের সুখকর হইবে বলিয়া পশম ও তুলা বিছাইয়া বাসা নরম করে। এই পক্ষীদের চলন সুন্দর, গান সুন্দর। ইহারা ভ্রমণকারী, শীতকালে মেক্সিকো প্রভৃতি উষ্ণতর দেশে গিয়া বিষুব (চৈত্র) সংক্রান্তির পর যুক্তরাজ্যে ফিরিয়া আসে।

৭। কাসিক বা ঝুঁটিধারী পক্ষী—ইহারা আমাদের দেশের বাবুইয়ের মত তালগাছের উচ্চডগায় বা যেখানে বোল্‌তা প্রভৃতির বাসা আছে, এমত গাছে বাসা বাঁধে। বাসা ৪ ফিটের অধিক লম্বা হয়। ইহারা বিড়াল ও সর্প প্রভৃতিকে বড় ভয় করে। ইহারা অত্যন্ত সামাজিক। এক একটী গাছে ইহাদের শত শত বাসা ঝুলিতে দেখা যায়। গাছের একদিকে কতকগুলি পক্ষী বাসা বাঁধিতেছে, অন্যদিকে অন্যদল, কোনও বিবাদ বিসম্বাদ নাই। এ বড় সুখের দৃশ্য!

ধ্বনি বা শব্দবিজ্ঞান।

(৩৫৪ সংখ্যা ৭৫ পৃষ্ঠার পর)

মনে কর দুইটী দণ্ডের উপর একটী ফাঁপা নল রাখা হইয়াছে। ঐ নলের একটী মুখ ক্রমে সরু হইয়া ছুঁচল হইয়াছে। ঐ ছুঁচল মুখের সম্মুখে একটী বাতি জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন ঐ নলের অপর মুখের দিকে দুই খানি পুস্তক লইয়া যদি আঘাত করা যায়, তবে আঘাত বল চতুর্দ্দিকেই প্রসৃত হইবে। নলের ভিতরে যে পরমাণু শ্রেণী আছে, তাহাতেও ঐ বল প্রসৃত হইবে। যদি অল্প বলে আঘাত করা যায়, তবে বাতির শিখা কম্পিত হইতে থাকিবে। আর যদি সজোরে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে ঐ বাতি নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। যে স্থানে আঘাত করা যাইতেছে, যদি তাহার চতুর্দ্দিকে এই-রূপ নল ও বাতি সাজান যায়, এবং উপযুক্ত বলের সহিত দুইখানি পুস্তক উপরি উপরি আঘাত করিয়া শব্দ করা যায়, তাহা হইলে সমকালেই সব কয়েকটি বাতি নিবিয়া যাইবে। এখন অনায়াসে প্রতীয়মান হইতেছে যে, যে আঘাতে শব্দ উৎপন্ন হইতেছে,ঐ আঘাত-বল চতুর্দ্দিকেই বায়বীয় পরমাণু শ্রেণীতে প্রসৃত হইতেছে। আরও প্রতীয়মান হইবে যে, ঐ শব্দ সহজে যেরূপ শ্রবণ-গোচর হয়, নলের ছুঁচল মুখে কাণ রাখিলে, তদপেক্ষা অনেক অধিক শুনিতে পাওয়া যাইবে। নলের মধ্যস্থিত ভিন্ন ভিন্ন পরমাণু শ্রেণীর বেগ একত্র হইয়া ঐ ছুঁচল মুখ দিয়া বহির্গত হইতেছে বলিয়া ঐ শব্দ অধিক শোনা যায়। পাশাপাশি বা উপর্য্যুপরি দুইটী গৃহ এরূপ অবস্থিত আছে যে, এক গৃহের শব্দ অপর গৃহে শোনা যায় না। দেওয়া-লের মধ্য দিয়া যদি একটী শূন্যগর্ভ বা ফাঁপা নল চালান যায়, এবং নলের এক মুখে একজন কথা কহে ও অপর মুখে একজন কাণ দিয়া থাকে, তাহা হইলে ঐ কথা গুলি অনায়াসেই শোনা যাইবে।

নলের যে মুখে পুস্তকের আঘাত করা হইতেছে, যদি ঐ মুখে নীলবর্ণের কাগজ পোড়াইয়া ধোঁয়া করা যায়, এবং যদি অবিলম্বে পুস্তকদ্বয়ের দৃঢ় আঘাতে শব্দ উৎপন্ন করা যায়, তাহা হইলে বাতির শিখা পূর্ব্ববৎ নিবিয়া যাইবে, কিন্তু ঐ ধোঁয়া ছুঁচল মুখ দিয়া বাহির হইবে না। ইহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে বন্দুক হইতে গুলি যেরূপ ছুটিয়া বাহির হয়, বায়বীয় পরমাণু সেরূপ চালিত হইয়া বাতি নিবাইতেছে না। কিন্তু পুস্তক-দ্বয়ের আঘাত বেগ ক্রমে পূর্ব্বোক্ত গোলক শ্রেণীর ন্যায় পরমাণু শ্রেণীর একটীর পর আর একটীতে, তাহার পর আর একটীতে, প্রসৃত হইয়া বাতির শিখায়

উপস্থিত হইয়া উহাকে নির্ব্বাণ করিতেছে। আঘাত বেগ প্রসৃত হইবার সময়ে প্রত্যেক পরমাণু যে কিছুমাত্র চালিতে হয় না এরূপ নহে। আমরা গোলা শ্রেণীতে আঘাত বেগ প্রসারের বর্ণন সময়ে দেখাইয়াছি যে, প্রত্যেক গোলা পরবর্ত্তী গোলার উপর চাপিয়া পড়ে এবং উহা হইতে প্রতিঘাত পাইয়া ফিরিয়া আইসে। সুতরাং প্রত্যেক গোলাই কিছু দূর যাতায়াত করিয়া থাকে। এইরূপ পরমাণু শ্রেণীতে যখন আঘাত বল প্রসৃত হয়, তখন প্রত্যেক পরমাণুর এই গতির আয়তির উপর ধ্বনির স্থূলতা ও মৃদুতা নির্ভর করে। কোন বস্তুতে আঘাত করিলে ঐ আঘাত বল প্রসারের আশ্রয়ীভূত পরমাণু যদি অধিক দূর ব্যাপিয়া যাতায়াত করে, তবে ধ্বনি স্থূল হইবে, এবং যদি অল্পদূর মাত্র ব্যাপিয়া যাতায়াত করে, তবে ধ্বনি মৃদু হইবে। আর পরমাণুর এই গতির সময়ের আধিক্য ও স্বল্পতার উপর ধ্বনির নীচতা ও উচ্চতা নির্ভর করে অর্থাৎ প্রত্যেক পরমাণুর যাতায়াতে যদি অধিক সময় লাগে, তবে ধ্বনি নীচ হইবে, আর যদি অল্প সময়ে উহার যাতায়াত সম্পন্ন হয়, তবে ধ্বনি উচ্চ হইবে।

(ক্রমশঃ)

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৫ সংখ্যা ১১৪ পৃষ্টার পর)

প্লীহা ও যকৃৎ—প্রত্যহ ২।৩টী পিপুল পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে, অথবা হরিদ্রা চূর্ণ ৬ রতি ঘৃতকুমারীর রসের সহিত, কিম্বা পেঁপের আটা ২০ ফোঁটা অল্প চিনির সহিত সেবন করিলে, অথবা তাল জটা ভস্ম, পুরাতন গুড়ের সহিত সেবন করিলে প্লীহা ও যকৃৎ রোগের শান্তি হয়। চিতার মূল জলে পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে, ইহা ৩ বটিকা পাকা কলার ভিতর করিয়া সেবন করাইলে প্লীহার শান্তি হয়। ছয় মাসের বেশী নয় এরূপ নৈ বাছুরের চোনা অল্পমাত্রায় ১০।১৫ দিন প্রাতে পান করিলে প্লীহা প্রশমিত হয়।

অজীর্ণ ও উদরাময়।—সৈন্ধবলবণ, হরীতকী, পিপুল ও চিতামূলের ছাল ইহাদের সমভাগ চূর্ণ একত্র মিশ্রিত করিয়া ৵০ আনা মাত্রায় উষ্ণ জলের সহিত, অথবা পাতি বা কাগজি লেবুর রস চিনির সহিত, কিম্বা ।০ আনা যোয়ান ও ।০ আনা লবণ জলসহ সেবন করিলে মন্দাগ্নি ও পেট-ফাঁপা প্রভৃতি নিবারিত হয়।

হিঙ্গ, মরিচ পিপুল, শুঁট ও সৈন্ধবলবণ একত্রে পেষণ করিয়া পেটে প্রলেপ

দিয়া নিদ্রা যাইলে সর্ব্বপ্রকার অজীর্ণ নিবারিত হয়।

আধ ছটাক পরিমাণ গোঁড়া লেবুর রসে একটী গেঁটে বা ঘিঁচি কড়ি দিয়া পূর্ব্বরাত্রে রাখিতে হইবে, পরদিন প্রাতে তাহাতে অল্প পরিমাণ ইক্ষু চিনি দিয়া সেবন করিলে তিন চারি দিনের মধ্যে মন্দাগ্নি ভাল হয়।

যোয়ান ১ তোলা, মুতা ১ তোলা, এই উভয়কে থেঁতো করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে ছাঁক ও শীতল হইলে ৪ তোলা পরিমাণ ২ বারে সেব্য।

শুন্ঠীচূর্ণ ৫ ভাগ, পিপ্পলীচূর্ণ ৪ ভাগ, কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ৩ ভাগ, যবানী চূর্ণ ২ ভাগ, বিটলবণ ১ ভাগ, হরীতকী ১৫ ভাগ— মোটে ৩০ ভাগ, একত্র করিয়া, জলদ্বারা মর্দ্দন তৎপরে কুলের ন্যায় বটী করিয়া দিবসে দুই বটী দুই সন্ধ্যায় সেব্য। ইহা সেবনে অজীর্ণ রোগ সত্বর আরোগ্য হয়।

উদরে শূলনি থাকিলে, ৫ ফোঁটা পরিমাণে "অয়েল পিপারমেণ্ট" জলসহ ২।৩ বার সেবন করিলে পেট কামড়ানি নিবারণ হয়।

অতি প্রত্যূষে যোয়ান, মুতা, মরিচ, লবণ, এই সকল দ্রব্য অল্প পরিমাণে যোগ করিয়া চর্ব্বণ পূর্ব্বক কর্পূরাদি দ্বারা সুবাসিত সুশীতল বারি পান করিলে গ্রহণী ও অজীর্ণ রোগীর অসীম উপকার দর্শে।

অপক্ক বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড় বা মিছরির গুঁড়া সহ পাঁচ সাত দিন সেবন করিলে গ্রহণী ও অতিসার রোগের উপকার দর্শে।

এক আনাভর সৈন্ধবলবণ ১০টী গোল মরিচের সহিত চিবাইয়া খাইলে পেট কামড়ানি ভাল হয়।

খাঁটী মুড়া মাখন এক ছটাক ও মিছরি একত্রে মিশাইয়া খাইলে, একদিনে পেট গরম ভাল হয়। ঔষধটী খাইয়া ২।৩ ঘণ্টা জল খাওয়া বন্ধ করিবে।

কিছু পুরাতন তেঁতুল ভিজান জল দেড় ছটাক মিছরির গুঁড়ার সহিত খাইলে পেট গরম সারে ও বদ্ধমল দাস্তদ্বারা বাহির হইয়া শরীর সুস্থ হয়।

শর্দ্দি—খুব হোতকুঁতে শর্দ্দি হইলে, রাত্রে শয়নকালে হস্তের ও পায়ের তালুতে সরিষার তৈল মালিস করিয়া ঘুমাইলে শর্দ্দি ভাল হয়।

আহারের পর মুখ ধুইয়া সেই মুখে জল না খাইয়া একটী ডাবের জল এক নিশ্বাসে যত পার খাইবে, পরে ২।৩ ঘণ্টা জল খাইবে না, একদিনে শর্দ্দি ভাল হইবে।

মৃত্যু কালীন উক্তি।

মৃত্যু সংসারাসক্ত ও পাপবিকৃত লোকের পক্ষে ভয়ঙ্কর, কিন্তু ঈশ্বরানুরাগী ধর্ম্মনিষ্ঠ সাধুদিগের নিকট অতি সহজ ও স্বাভাবিক। এ দেশের অনেক বিশ্বাসী হিন্দু স্বয়ং গঙ্গাতীরস্থ হইবার ব্যবস্থা করিয়াছেন এবং নাম ডাকিতে ডাকিতে মরিয়াছেন। ইহা আমাদের চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ। শুনিতে পাই চূড়ামণি দত্ত নামে কলিকাতার এক প্রচীন ধনাঢ্য হিন্দু "চল লো চূড়ো যম জিনিতে" এই বাজনা বাজাইতে বলিয়া তাহা গাহিতে গাহিতে গঙ্গাতীরে গিয়া সজ্ঞানে প্রাণত্যাগ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ কতকগুলি নরনারী শেষ পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য বিশ্বাসের পরিচয় দিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহাও আমরা দেখিয়াছি। নিম্নে কতকগুলি প্রসিদ্ধ লোকের মৃত্যুকালীন উক্তি প্রকটিত হইল, ইহাদ্বারা তাঁহাদের প্রকৃতি ও মনের ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

ফরাসিরাজ চতুর্দ্দশ লুই মৃত্যু কালে তাঁহার চতুঃপার্শ্বস্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে বলেন "তোমরা কেন অশ্রুপাত কর? তোমরা কি ভাবিয়াছিলে আমি চিরজীবী হইয়া থাকিব?" কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া পুনরায় বলিলেন "আমি মৃত্যুকে ইহা অপেক্ষা কঠিন মনে করিয়াছিলাম।"

ডাক্তার হান্টার মৃত্যুশয্যায় মৃত্যু-যন্ত্রণা এত কম দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া বলিয়াছিলেন "আমার যদি কলম ধরিবার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে মরা যে কিরূপ সহজ এবং সুখজনক তাহা লিখিয়া যাইতাম।"

ভূতপূর্ব্ব কেণ্টারবারির (Arch Bishop) প্রধান ধর্ম্মাধ্যক্ষ মৃত্যুযন্ত্রণার একটু হ্রাস হইলে শান্তভাবে বলিলেন "যাহা-হউক মরাটা কিছুই নয়।"

সক্রেটিসের মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা হইলে এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট গিয়া বলিল "এথেনিয়ানেরা আপনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।" ইহাকে সক্রেটিস সহাস্যে উত্তর করিলেন "প্রকৃতি তাহা-দিগকে এই দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।"

কবিবর অলিভার গোল্ড্স্মিথের অন্তিমকালে তাঁহার নাড়ার উত্তাপ অত্যন্ত অধিক দেখিয়া তাঁহার ডাক্তার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার মনে কি কোন দারুণ চিন্তা আছে?" তিনি উত্তর করিলেন "হাঁ ঋণের চিন্তা।"

ডাক্তার জন্সনের মুমূর্ষু অবস্থায় ডেবিড গ্যারিক তাঁহার নিকট তাঁহার সুশোভন অট্টালিকা দেখাইয়া তাঁহার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে লাগিলেন, তাহাতে জন্সন্ বলিলেন "হায় ডেবিড! এই সকলের জন্যই ত মৃত্যু এত ভয়ানক বোধ হয়।"

জন ওয়েস্লিকে এক মহিলা জিজ্ঞাসা

করেন "আচ্ছা, বলুন দেখি আপনি যদি জানিতেন যে কাল দুপর রাত্রির সময় আপনাকে মরিতে হইবে, তাহা হইলে আপনি মধ্যবর্ত্তী সময়টা কিরূপে ব্যয় করেন?" তিনি উত্তর করিলেন "ঠাকুরুণ! তাতে কি? এখনও যেরূপে সময় ক্ষেপণ করিবার ইচ্ছা করি, তখনও সেইরূপে করিতাম। আজ রাত্রে ও কল্য প্রাতে পাঁচটার সময় গ্লাষ্টারে ধর্ম্ম-প্রচারার্থ যাইব, তৎপরে অশ্বারোহণে টিউকেসবারিতে গিয়া প্রচার করিব এবং সন্ধ্যাকালে সামাজিক সম্মিলনে একত্র হইব। তৎপরে বন্ধুবর মার্টিনের বাড়ীতে যাইব। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত আহার ও কথোপকথন করিব এবং তাঁহার পরিবারদিগের সহিত সচরাচর যেমন উপাসনা করি, সেইরূপ করিব। পরে ১০টার সময় শয্যায় গিয়া স্বর্গীয় পিতার হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিব। বিশ্রামের পর জাগ্রত হইয়া দেখিব স্বর্গের জ্যোতির মধ্যে উপস্থিত হইয়াছি।"

আমেরিকার সেনাপতি ষ্টোনওয়াল জ্যাকসনকে যখন বলা হইল যে আপনি আর দুই ঘণ্টা মাত্র বাঁচিবেন, তিনি বলিলেন "ভাল, তাহাই হউক, এপি-হিল্‌কে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আজ্ঞা কর, পদাতিকদিগকে দ্রুতবেগে সম্মুখে আসিতে বল। মেজার হক্সকে বল——" এই সময়ে তাঁহার বিবর্ণ মুখে অপূর্ব্ব মধুর হাস্য দেখা দিল এবং তিনি নিশ্চিন্ত ও স্বচ্ছন্দভাবে বলিলেন "এখন—এখন তবে আমরা (ভব) নদী পার হইয়া তরুচ্ছায়াতে গিয়া বিশ্রাম করি।"

নূতন সংবাদ।

১। দুইটী নরপতির আসন্ন মৃত্যু ভাবিয়া সভ্য জগৎ বিশেষতঃ আমাদিগের ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট ঘোর চিন্তাকুল। একজন রুসীয় সম্রাট, আর একজন কাবুলের আমীর। রুসীয় সম্রাট আলেকজাণ্ডার বড় শান্তিপ্রিয়, বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার বিয়োগে রুসীয়েরা চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত করিবে এই আশঙ্কা। আমীর আবদুর রহমন ইংরাজবন্ধু, তিনি থাকাতে ইংরাজের রুসীয় ভীতি কম আছে, তাঁহার মৃত্যু হইলে আফগান গোলযোগ এবং রুসীয় গোলযোগে ইংরাজকে ব্যতিব্যস্ত হইবে হইবে। আমরা সংবাদ পাইলাম রুসীয় সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে, আমীর সুস্থ হইতেছেন।

২। চিন জাপান যুদ্ধে জাপানীরা ক্রমশঃ বিজয়ী ও প্রবল হইতেছে এবং চিনেরা হীনবল হইতেছে। জাপানীরা ইয়া-লু নদীর দক্ষিণ তীর অধিকার করিয়াছে এবং কোরিয়া হস্তগত করিয়া

তাহার শাসনের ব্যবস্থা করিতেছে। চিন বন্দী সকল জাপানে দলে দলে নীত হইতেছে, ইহাতে জাপানীরা মহোল্লাস করিতেছে! ইংরাজেরা উভয় দলের মধ্যে সন্ধির প্রস্তাব করিতেছেন, ঈশ্বরেচ্ছায় তাঁহাদের চেষ্টা সফল হউক।

৩। গুইকুমারের মহারাজা সুরা দমনের চেষ্টা করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইতেছেন। তথায় ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইয়াছে রাজমন্ত্রীর অনুমতি ভিন্ন আর নূতন মদ্যালয় খোলা হইবে না এবং ৫.৬ টী গৃহস্থ কোন পল্লীতে মদ্যালয়ের বিরোধী হইলে তথা হইতে তাহা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

৪। প্রসিদ্ধ বঙ্গীয় লেখক পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্নের মৃত্যু সংবাদে আমরা সন্তাপিত হইলাম।

৫। সমুদ্রের গভীর তলে মৃতদেহ নাকি বিকৃত হয় না।

৬। ৩৬ কোটী ৭০ লক্ষ লোক মহারাণী বিক্টোরিয়ার প্রজা, এত প্রজা পৃথিবীর আর কোনও রাজার নাই।

৭। লর্ড ও লেডী এলগিন গত ২৪শে অক্টোবর সিমলা পরিত্যাগ করিয়া সদলে পঞ্জাব যাত্রা করিয়াছেন। তথায় রাজদরবার হইবে।

৮। আগামী নবেম্বরে ইংলণ্ডেশ্বরীর দৌহিত্রী হেস্মণ রাজকুমারী আলিকসের সহিত রুসীয় যুবরাজের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইবে। রুসীয় সম্রাটের সাঙ্ঘাতিক পীড়াজন্য বিবাহ কার্য্য শীঘ্র সমাধা হইবার উদ্যোগ হইয়াছিল, শুনিতেছি তাহা সমাধা হয় নাই।

৯। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে ২৭৫টী মহিলা ধর্ম্মযাজিকা, ২৫০০ চিকিৎসা ব্যবসায়িনী, ৬০০০ স্ত্রীলোক ডাক বিভাগে কর্ম্ম করেন। ১৮৮০ সাল হইতে স্ত্রীকারীকরেরা ২৫০০ পেটেণ্ট লইয়াছেন, এক এক শিল্প বিষয়ে তাঁহারাই উদ্ভাবিকা।

বামারচনা।

বৈদ্যনাথ কুষ্ঠাশ্রম, কলিকাতা অনাথাশ্রম, ও দাসাশ্রম স্থাপয়িতৃগণের প্রতি।

১

স্বর্গের দেবতা ভাই তোরা কি সকলে?
মানব দুর্গতি হেরি,
আসিলি স্বরগ ছাড়ি,
দূরিতে দুঃখীর দুঃখ নামিলি ভূতলে?

২

পথে পথে কেঁদে কেঁদে কুষ্ঠ রোগী যত।
তাদের বারতা পেয়ে,
আসিলি মরতে ধেয়ে,
ঘুচাতে তাদের দুঃখ চেষ্টা অবিরত?

দেখিয়া তাদের মরি কষ্ট অগণন,
করিলি এ ব্রত সার,
লইলি এদের ভার,
এদের রোদনে হায় গলে গেল মন।

৪

ইহাদের দুঃখ তাই ঘুচাবার তরে,
তোদের কতই যত্ন;
সংসারের সার রত্ন
হয়ে জন্মেছিলি তোরা সংসার ভিতরে।

৫

অনাথ দরিদ্র কত কাঁদে অসহায়!
হায় এই স্বার্থ ভরা,
সংসারে রয়েছি মোরা;
দুঃখী তাপী দেখে কভু গলে না হৃদয়।

৬

কারু কাছে তারা কভু পায় না আশ্রয়!
ক্ষুধায় আকুল প্রাণ!
যন্ত্রণায় আন্‌চান!
কেহ তাহাদের পানে ফিরে নাহি চায়!

৭

পথে পথে কেঁদে ফেরে রোগী দুঃখী কত;
সদা করে হায় হায়!
কেহ নাহি ফিরে চায়।
করে না যতন কেহ এমনি জগৎ!

৮

চিরদিন সংসারের এই রীতি হায়!
সম্পদে সহায় যোটে,
সুখের লহরী ছোটে,
বিপদ দেখিলে সবে পায় দ'লে যায়!

কি মহান্ উচ্চ ভাব তোদের অন্তরে
সংসারে যা মেলা ভার;
দৃষ্টান্ত দেখালে তার,
দেবতাও আছে মরি অসুরের পুরে।

১০

বড়ই কঠিন ব্রত করিয়া গ্রহণ,
বিভুর আদেশ মত
খাটিতেছ অবিরত,
স্বার্থ সুখ ভোগ সব দিয়া বিসর্জ্জন!

১১

আমি সাথে যোগ দিই বড় সাধ মনে;
তোদের চরণ তলে
বসে ভাই বোন্ মিলে
শিখিরে তোদের ব্রত। শিখিব কেমনে?

১২

নরকের কীট মোরা নিয়ত নরকে
আছিরে আমরা পড়ি,
অবলা দুর্ব্বলা নারী,
আমরা স্বরগে যাব? কে রবে নরকে?

১৩

পারিব না-পারিব না-নাহি সে শকতি
বিরলে বসিয়া ভাই,
মাগিব বিভুর ঠাঁই
তোদের মঙ্গল সুখ অনন্ত উন্নতি।

১৪

ভগিনীর আশীর্ব্বাদ কররে গ্রহণ,
লভ শান্তি ভক্তি প্রীতি,
বিভু পদে থাক্ মতি,
কর সদা জগতের দুর্গতি মোচন।

শ্রীমোক্ষদা সুন্দরী—কাকিনীয়া

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।*

"ভর্ত্তুশ্চিত্তানুগামিন্যা দেবারাধনশীলয়া।
গার্হস্থ্যধর্ম্মরতয়া ভর্ত্তা সেব্য কুলস্ত্রিয়া।"

ধর্ম্ম-প্রাণ হিন্দুগণের গৃহাশ্রম যে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ, ইহা সংসার-বিরাগী আর্য্য ঋষিগণও স্বীকার করিয়াছেন। নিম্নলিখিত শ্লোকটী ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ—

"যস্মাৎ ত্রয়োহপ্যাশ্রমিণো জ্ঞানেনান্নেন চান্বহম্।
গৃহস্থেনৈব ধার্য্যন্তে তস্মাজ্জ্যেষ্ঠাশ্রমো গৃহী॥"

কিন্তু এই গৃহাশ্রমে নারীই পুরুষের প্রধান সহায়, সুতরাং গার্হস্থ্যধর্ম্মে নারীর অধিকার পুরুষের সহিত সমভাবেই বিস্তৃত। সেইজন্য স্ত্রীর গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা নিতান্ত আবশ্যক, না করিলে বানরের হস্তে বহুমূল্য হীরক প্রদান করিলে তাহা যেরূপ ব্যবহৃত হয়, গৃহধর্ম্মে অনভিজ্ঞা রমণীর হস্তেও পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সেইরূপ ব্যবহৃত হয়। অতএব গার্হস্থ্যধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করা ও উহা পালন করা রমণীর জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত। এই গার্হস্থ্যধর্ম্ম শিক্ষা শৈশবে পিতৃগৃহে আরম্ভ হওয়া আবশ্যক। কেননা হিন্দু নারীর পক্ষে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করা বিলাসের কুসুম শয্যা নহে—সখের পুতুল সাজান নহে—সোহাগের গোলাপটী নহে—অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার লীলা-ক্ষেত্র নহে—বসন ভূষণের জন্য স্বামীকে লাঞ্ছনা খাওয়ান নহে এবং বাসনা পূরণের চাতুর্য্যও নহে। উহা হিন্দু শাস্ত্রোক্ত এই কয়েকটি উপদেশের উপর নির্ভর করিতেছে—

সুব্রতা প্রাতরুত্থায় রাত্রিবাসো বিহায় চ।
লোকেশং প্রণমেৎ কান্তং পুণ্যশ্লোকাংশ্চ সর্ব্বশঃ॥
গোময়েন চ তোয়েন সংস্কুর্য্যাৎ প্রাঙ্গণং ততঃ।
সুস্নাতা শুদ্ধবেশা চ প্রবিশেৎ সুরমন্দিরম্॥
শ্রীহরিং পূজয়িত্বাথ ভক্ত্যা পত্যুর্হিতার্থিনী।
পাকযজ্ঞং সুনির্বর্ত্ত্য ভোজয়েৎ স্বজনাতিথীন্॥
পতি পুত্রাতিথীন ভৃত্যাননন্যান্ পরিজনাংস্তথা।
তর্পয়িত্বান্নপানাদ্যৈঃ স্বয়ং ভুঙ্‌ক্তে সুখং সতী॥"

এই সারগর্ভ উপদেশ কয়েকটীর উপর স্বধর্ম্মের ভিত্তি স্থাপন করিয়া—প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, পরিণামদর্শিতা ও আশুভাবগ্রাহিতাশক্তি পরিচালনা করিয়া মার্জ্জিত বুদ্ধি সাহায্যে প্রেম, ত্যাগ, ক্ষমা, সত্য ধৃতি ও অলোভ দ্বারা হিন্দুনারীকে গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে; তাঁহাকে পারিবারিক সুখের জন্য—সাধারণের হিতের জন্য—সর্ব্ব প্রকার আশ্রমীর জন্য গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইবে কেননা—

"যথা বায়ুং সমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বজন্তবঃ।
তথা গৃহস্থমাশ্রিত্য বর্ত্তন্তে সর্ব্বআশ্রমাঃ॥"

গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইলে তাহাতে যে কর্ম্ম গুলি প্রয়োজনীয় সেগুলি সুচারুরূপে ও সুশৃঙ্খলে যাহাতে সম্পন্ন হয় তাহাতে শিক্ষিত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। হিন্দুরমণীগণ যদি গৃহকার্য্যে অশিক্ষিতা হইয়া বিএ এমএ উপাধি প্রাপ্ত হয়েন—যদি ব্যাস, বাল্মীকি, মনু, পরাশর, বশিষ্ঠ, কালিদাস, ভবভূতি, হোমর, সেকস্‌পিয়র, বায়রণ, শেলি, স্কট,

* পারিতোষিক রচনা-বিদ্যানন্দকাটী নিবাসিনী শ্রীমতী কুমুদিনী রায় লিখিত।

পোপ ও মিল্টন প্রভৃতির গ্রন্থগুলি জলের মত আবৃত্তি ও ব্যাখ্যা করিতে পারেন— জ্যামিতির অনুশীলনীগুলি এক মিনিটের মধ্যে কসিয়া দিতে পারেন—যদি অঙ্ক শাস্ত্রে লীলাবতী ও জ্যোতিষে খনার ন্যায় জ্ঞান লাভ করেন এবং বররুচি, গ্যালিলীয়, নিউটন প্রভৃতিকে পরাস্ত করিতে পারেন—অদ্ভুত বিজ্ঞান রহস্য গুলি জ্ঞানায়ত্ত করিতে পারেন—যদি সঙ্গীত বিদ্যাদিতে দেবী সরস্বতীকে পরাভূত করিতে পারেন, আর গৃহধর্ম্ম কর্ম্মের কোন ধার না ধারেন, (বঙ্গীয় ভগিনীগণ! ক্ষমা করিবেন) তাহা হইলে তবুও আমরা তাঁহাদের শিক্ষার অপূর্ণতা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে কুণ্ঠিত হইব না। গৃহকর্ম্মে সুশিক্ষিতা না হইলে গৃহধর্ম্ম পালন করা বড়ই কঠিন। সুতরাং শৈশব হইতেই হিন্দু-নারীগণের ঈশ্বর ভক্তির সহিত সুনীতি ও গৃহকার্য্য শিক্ষা করা উচিত। হিন্দুনারী যে কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহা ঈশ্বরকে সমর্পণ করিবেন। ঈশ্বরের প্রীতি সাধনার্থে তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্মে রত এই কথাটী স্মরণে রাখিবেন, তাহা হইলে তিনি সংসারের কঠোর কর্ত্তব্য-গুলিও পালন করিয়া ন্যায় পথে বিচরণ করিতে পারিবেন। কর্ত্তব্য কার্য্যগুলি অতি নীরস হইলেও উহা ঈশ্বরেচ্ছা মনে করিয়া উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করা রমণীর কর্ত্তব্য। এইরূপে দুর্ব্বল ও কোমলহৃদয়া রমণীগণ ঈশ্বরকে স্মরণ পূর্ব্বক হৃদয়ে বল আনয়ন করিয়া কর্ত্তব্যের উর্ব্বর ভূমিতে বিচরণ করিতে সক্ষম হইবেন। আমার অন্তর্জগতের ও বহির্জগতের কার্য্য গুলি ঈশ্বর সমস্তই দেখিতে পাইতেছেন, সর্ব্বদা মনে এইরূপ ভাব থাকিলে, অন্যায় কার্য্য করিতে কোন মতে লোকের সাহস হইতে পারে না (অবশ্যই বিশ্বাসী ঈশ্বর ভক্ত ব্যক্তিগণের)। গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালন করিতে হইলে আপনাকে উত্তমরূপে গঠন করা আবশ্যক, আত্মগঠন না করিলে এই ধর্ম্ম উত্তমরূপে আচরিত হইতে পারেনা। সর্ব্বদা সংযতেন্দ্রিয় হইয়া ক্রোধ, আলস্য, বিলাসিতা, অসহিষ্ণুতা ও স্বার্থপরতা পরিহার করিবে। লেখা পড়া শিক্ষাদ্বারা মনকে সমুন্নত করিবে, সংসারের আয় ব্যয় ও অন্যান্য হিসাব রাখিয়া কার্য্য করা, বালক বালিকাদিগকে পাঠাভ্যাস করানও ইহাতে চলিতে পারে, সুতরাং লেখা পড়া ও শিল্প কার্য্যাদি শিক্ষা করিলে অনেক সময় নিজের ও সংসারের উপকার হইতে পারে। যেমন ইচ্ছা না থাকিলেও কঠোর কর্ত্তব্য গুলি পালন করা উচিত, তেমনি সেই ইচ্ছাকেও বিবেক দ্বারা সৎপথে পরিচালিত করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। মনের অসৎ প্রবৃত্তি গুলি উন্মূলিত না করিতে পারিলে আপনাকে বশে আনিয়াছ মনে করিও না, কারণ মনের অসৎ প্রবৃত্তি নিচয় ছিদ্র পাইলেই কার্য্যের সহিত যোগ দিতে ছাড়িবে না। সর্ব্বভূতে দয়া করাই

ধর্ম্ম ; সর্ব্ব জীবের প্রতি সদ্ভাব রক্ষা করাই স্নেহ ; সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন করাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ। অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র ও আত্মীয় স্বজনগণের সুখ সাধন করাই হিন্দু-রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম। গৃহে অন্নের অভাব হইলেও অতিথি অভ্যাগতের প্রতি আদর যত্ন করা কর্ত্তব্য, কেননা—

"তৃণানি ভূমিরুদকং বাক্‌চতুর্থীচ সুনৃতা।
এতান্যপি সতাং গেহে নোচ্ছিদ্যন্তে কদাচন॥"

যখন অতিথি অভ্যাগত, পতি পুত্র, কুটুম্ব, পরিজনগণের তৃপ্তি সাধন করাই রমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইল, তখন গৃহকর্ম্মে বিশেষতঃ পাক কার্য্যটীতে তাঁহাকে সুদক্ষা ও নিরলসা হওয়া চাই, নতুবা কখনই তিনি গার্হস্থ্যধর্ম্ম পালনে সক্ষম হইতে পারিবেন না, কেননা আহার, সুনৃত বচন ও সদ্ব্যবহার দ্বারাই সর্ব্ব জীবের তৃপ্তি সাধন হইয়া থাকে। কিন্তু নিজে পাক করিতে না জানিলে বা না করিলে হয় ত আহারে কাহারও তৃপ্তি লাভ নাও হইতে পারে, সে জন্য পাকের ভারটা রমণীগণ নিজে নিজে বহন করিলে ভাল হয়। কোন পরিবারের মধ্যে ঠাকুর বা বামুনদিদির উপর পাকের ভার দিলে অনেক সময় গার্হস্থ্যধর্ম্মের অসুবিধা হইয়া থাকে। ঠাকুর বা বামুন দিদি বেতন লইয়া পাক কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন সুতরাং বেতনটার উপর যত যত্ন থাকিবে, রসুইটার প্রতি ততটা যত্ন থাকা সম্ভব নহে, কেননা তাঁহাদের রসুই করার মুখ্য উদ্দেশ্য হইতেছে বেতন পাওয়া। "ঠাকুর বা বামুনদিদি ভাল রসুই করেন না" একথা আমরা অনেক পরিবারের মুখে শুনিয়া থাকি, এবং কোন কোন গৃহিণী সে কারণ বাবুর জন্য নিজে পৃথক্ রসুই করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার গার্হস্থ্যধর্ম্ম সম্যক্ পালন করা হয় না, কারণ আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রমণীগণের গার্হস্থ্যধর্ম্ম পারিবারিক সুখের জন্য—অতিথি অভ্যাগত ও কুটুম্বদিগের জন্য। একদিন কোন গৃহস্থের বাটীতে একটী দুঃখিনী রমণী তাহার ক্ষুধা-কাতরা বালিকার জন্য একমুষ্টি অন্ন প্রার্থনা করায় গৃহিণী "ঠাকুর, ঠাকুর" করিয়া ডাকিতে থাকিলে ঠাকুর রসুই ঘর হইতে উত্তর প্রদান করিলেন। গৃহিণী বলিলেন, "ঐ বালিকাটীকে চারিটী ভাত দাও।" ঠাকুর বলিলেন, "এখন ভাত কোথা পাব, এক জনের মাত্র ভাত আছে, সুতরাং ভাত দেওয়া হইবে না।" গৃহিণী নীরব। আমি গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করিলাম 'যদি একজনের ভাত আছে তবে তাহা হইতে এক মুঠা ভাত এই বালিকাটিকে দেওয়া হইল না কেন? যাঁহার ভাত তাঁহার কম হইলে ঠাকুর আর চারিটী ভাত চড়াইলেও ত পারিতেন।" গৃহিণী বলিলেন "ঠাকুরকে তাহা বলিতে আমার সাহস হয় না, অতিথি অভ্যাগতের ভাত রাঁধিতে বলিলে, ঠাকুর

চটিয়া বলেন যে "আমার ৪৲ টাকা বেতনে এত গুলি লোকের ভাত রাঁধাই ঠকা, তাহাতে আবার উপরি লোকের ভাত রাঁধিতে হইলে এ কার্য্য আমাকে ত্যাগ করিতে হইবে।" এখন একবার ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে গৃহিণী যদি নিজে ভাল রসুই করিতে জানিতেন ও নিজে রসুই করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পতি পুত্র শ্বশুর শ্বাশুড়ী ও অন্যান্য আত্মীয় পরিজনগণকে মন্দ রান্না খাইতে হইত না; দুঃখিনী বালিকাটীও একমুষ্টি অন্ন ভিক্ষাকরিতে আসিয়া হতাশচিত্তে তাঁহার দ্বারা হইতে ফিরিয়া যাইত না। একারণে রসুই কার্য্যের ভার গৃহিণী নিজে লইলে বড়ই সুখের হয়। এখন ২০৲ টাকা বেতনের কেরাণী যিনি তাঁহার স্ত্রীরও একটী রসুয়ে নহিলে চলে না, কিন্তু হিন্দু মহিলা মহানুভবা দ্রৌপদী দেবী সম্রাজ্ঞী হইয়াও পাক কার্য্যে সুনিপুণা ছিলেন এবং পাক কার্য্যকে তিনি নীচকার্য্য মনে না করিয়া যত্নের ও উৎসাহের সহিত সম্পন্ন করিতেন। কথিত আছে যতক্ষণ দ্রৌপদী দেবী আহার না করিতেন, ততক্ষণ গৃহের অন্ন ব্যঞ্জন অক্ষয় থাকিত। আমরা স্থূল বুদ্ধিতে ইহাতে তাঁহার মিতব্যয়িতা ও সর্ব্বশেষে আহার করা এই তাৎপর্য্যটী গ্রহণ করিতে পারি, অর্থাৎ আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে কোন অভ্যাগত আসিলে তাঁহার নিজের অন্ন গুলি তাঁহাকে প্রদান করিয়া পুনর্ব্বার রসুই করিতেন এবং আহারের নির্দ্দিষ্ট সময় অতীত হইয়া গেলে নিজে আহার করিতেন ও তাঁহার আহারের পর আর অন্ন ব্যঞ্জন থাকিত না। বনে অবস্থান কালেও দ্রৌপদী উৎকৃষ্টরূপে সুন্দর গৃহধর্ম্ম পালন করিয়াছেন, বনবাসী পাণ্ডবালয়ে দুর্ব্বাসার সশিষ্যে ভোজনের বিষয় হিন্দু স্ত্রী পুরুষ মাত্রেই অবগত আছেন সুতরাং তাহা বলা বাহুল্য। মহাভারত পাঠে আরও জানা যায় যে ইন্দ্রপ্রস্থে অবস্থান কালে যদিও ...ল কুণ্ডলধারী যুবা সূদগণ পরম যতনে উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত করিত, কিন্তু দ্রৌপদী দেবী তখনও সকলের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ করিয়া সর্ব্বশেষে আহার করিতেন। আমাদের পূর্ব্বোক্ত গৃহিণীটী যদি বাবুর সহিত দশটার সময় আহার না করিতেন, তাহাহইলে ঐ দুঃখিনী বালিকাকে নিজের ভক্ষ্য অন্ন হইতেও কিছু অন্ন দিতে পারিতেন। ধিক্ আমাদের বিলাসিতায়—ধিক্ আমাদের সুখে—ততোধিক ধিক্ এখনকার ইংরেজ অনুকারী বাবুদের; তাঁহারা যত পারেন ইংরেজের গুণগুলি ত্যাগ করিয়া দোষগুলির অনুকরণ করিয়া সাহেব হউন, কিন্তু "স্ত্রিয়ঃ শ্রিয়শ্চ গেহেষু ন বিশেষোঽস্তি কশ্চন" এই সম্মানটুকু আর্য্য ঋষিগণ আমাদের যে গুণের আদর করিয়া দিয়া গিয়াছেন, সেই গুণের মাথা যে বাবুরা খাইতে বসিয়াছেন, ইহাই আমাদের বিশেষ দুঃখ। (ক্রমশঃ)

# বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৫৯ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ ১৩০১—ডিসেম্বর ১৮৯৪। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রুক্মাবাই—বোম্বাই-খ্যাত রুক্মাবাই স্কটলণ্ডের মেডিকাল কলেজ হইতে ডিপ্লোমা পাইয়া এম ডি উপাধির জন্য বেলজিয়ম যাইতেছেন। ইনি বোম্বাইয়েই চিকিৎসারম্ভ করিবেন।

কনগ্রেস—আগামী বড় দিনের সময় মান্দ্রাজ নগরে কনগ্রেসের দশম অধিবেশন হইবে। পার্লেমেণ্টের সভ্য মেঃ আলফ্রেড ওয়েব সভাপতি মনোনীত হইয়াছেন। দুই হাজার টাকা দিয়া এক প্রকাণ্ড স্থান ভাড়া লওয়া হইয়াছে, তথায় সভামণ্ডপ নির্ম্মিত হইবে। মান্দ্রাজ প্রদেশের সর্ব্বসাধারণ কন্গ্রেসের সুসিদ্ধির জন্য উৎসাহ সহকারে অর্থদান ও পরিশ্রম করিতেছেন।

বাবা নানক—গত নবেম্বরে শিখ ধর্ম্মের সংস্থাপক গুরু নানকের স্মরণার্থ ৪৫১ সাংবৎসরিক মেলা রাওলপিণ্ডীতে হইয়াছিল। তাহাতে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য বাবা ক্ষেম সিং এক সুন্দর বক্তৃতা করিয়া শিখদিগের প্রতি অনুগ্রহের জন্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টকে ধন্যবাদ দিয়াছেন।

দাতব্য—(১) সাক্সনির রাণী নিজব্যয়ে ৪টী চিকিৎসক নিযুক্ত করিয়াছেন, তাহারা পীড়িত গরিব লোকদিগকে দাতব্যে চিকিৎসা করেন। (২) দ্বারভাঙ্গার গঙ্গাপ্রসাদ বাহাদুর উক্ত নগরে এক দাতব্য চিকিৎসালয়ের জন্য ১২০০০ টাকা দিয়াছেন।

অধিকাঙ্গী—পৃথিবীতে ৬ অঙ্গুলিবিশিষ্ট লোকের সংখ্যা ২১৭৩ এবং সপ্তাঙ্গুলিবিশিষ্ট ৫৩১ জন।

স্ত্রী-পরীক্ষার্থিনী—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিনীর

সংখ্যা ৫৯, তন্মধ্যে ৩৪ জন খৃষ্টান, ২৩ জন পারসী এবং ২টী মাত্র হিন্দু। গত বৎসরে ৬৪ জন পরীক্ষার্থিনীর মধ্যে ৩৬ জন খৃষ্টান, ২৩ জন পারসী, ১ জন য়িহুদি এবং ৪ জন হিন্দু ছিল।

লেডী ডফারিণ ফণ্ড—আমাদের রাজপৌত্রবধূ ইয়র্কের ডচেস ডফারিণ ফণ্ডের বিলাতী শাখার প্রতিপোষিকা হইতে স্বীকৃত হইয়াছেন। এই কমিটীর সম্পাদিকা স্বয়ং লেডী ডফারিণ এবং কুমারী এডিথ হিথারবেগ তাঁহার সহকারিণী।

বিদেশী রমণী দিগের কার্য্য—(১) প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞ পিলের পৌত্রী কুমারী হেলেন পিল পিয়ারী সাহেবের দৃষ্টান্তে উত্তর হিমসাগর ভ্রমণে যাত্রা করিয়াছেন। (২) তুরুস্কের ৩টী যুবতী ফরাসী বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিকাল উপাধি লাভের জন্য আসিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে একজন এক পাশার কন্যা। (৩) শ্রীমতী চিকা সাকুরাই একজন বিদুষী জাপান রমণী। ইনি জাপানের সুরাপান নিবারণী স্ত্রী সভার প্রতিনিধি হইয়া চিকাগো বিশ্ব-প্রদর্শনীতে আসিয়াছিলেন। ইনি টোকিওতে দেশীয় স্ত্রীলোক দিগের প্রথম ইংরাজী শিক্ষালয় স্থাপন করেন, তাহাতে তথায় স্ত্রীশিক্ষার যুগান্তর হইয়াছে। (৪) রোমের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক হমোনিমের কন্যা লাব্রিওলা রোমীয় বিশ্ববিদালয় হইতে ডি এল উপাধি পাইয়াছেন। (৫) লেডী সমারসেট গত বৎসরে ১১৫টী সভা ও ২৭টী সমিতি অধিবেশনের সম্পাদকতা করিয়াছেন, ৮০০০ মাইল ভ্রমণ করিয়াছেন এবং ২০টী দেশে প্রায় ২লক্ষ লোকের নিকট বক্তৃতা করিয়াছেন।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীগণের অবস্থা।*

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ।"

বিগত শতাব্দী উন্নতির শতাব্দী। ভারতীয় আর্য্যগণের রাজত্ব অবসান হইলে ভারতের চক্ষে যে এক গাঢ় নিদ্রা আসিয়াছিল—যে গাঢ় নিদ্রার ফলে ভারত মৃত কি জীবিত তাহা বুঝিতে পারা যাইত না, সেই গাঢ় নিদ্রা বিগত শতাব্দীতেই ভাঙিয়াছে। আর্য্য রাজত্বের পরে ভারতে রাজাও ছিল—হিন্দু, তুর্ক, পাঠান, মোগল কত জাতিই রাজত্ব করিল; ভারতে ধার্ম্মিকও ছিল—চৈতন্য নিত্যানন্দ, নানক ছিলেন; ভারতে স্বদেশভক্ত বীরও ছিল, রাজপুত, মারহাট্টা, শিখ প্রভৃতির কথা কে না জানে?—বাঙ্গালাতেও প্রতাপাদিত্য ছিল, রাজা সীতারাম ছিল, মোহন লাল ছিল,—শুধু পুরুষ কেন, সে দিনও ঝান্সিতে লক্ষ্মী বাই ছিল; ভারতে কবিও ছিল—বিদ্যাপতি, জয়দেব, জ্ঞানদাস, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ছিল; ভারতের ধনও ছিল—ভারতের ধনেই তাজ মহল, ময়ূরাসন হইয়াছিল, ভারতের ধনেই

* বামাবোধিনীর ৩০ সাংবৎসরিক পারিতোষিক রচনা - শ্রীমতী মান কুমারী বসু লিখিত।

জগৎ শেঠ, উমিচাঁদ প্রাধান্য করিয়াছিল; তাই বলিতেছি ভারতের সবই ছিল, কেবল একটী জিনিস ছিল না, সেই একটী জিনিস ছিল না বলিয়াই আমাদের মনে হয়, ভারত এত দিন ঘুমাইয়াছিল।—ভারতে ছিল না কি?—ছিল সবই, কেবল ভারতীয় সমাজে "সম্পূর্ণতা" ছিল না। যে সমাজে স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির জীবন সুশিক্ষাপ্রাপ্ত, নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে উপযুক্তরূপে গঠিত, জগতে সেই সমাজই সম্পূর্ণ। এই হিসাবে ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল; তাই আমরা বলিতেছি, ভারত এতদিন ঘুমাইয়া ছিল।

আর্য্য ভারতের পরে, গত পূর্ব্ব শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারত রমণীর জাতীয় উন্নতি কিছুই ছিল না। রাজস্থানে মহাপ্রাণা রমণীগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন সত্য, ভারত খুঁজিলে আরও দুই একটী—অহল্যা বাই, তারা বাই, রাণী ভবানী প্রভৃতি রমণী রত্ন মিলিত সত্য, কিন্তু তাঁহাদের উন্নতি শ্রেণীবিশেষের বা ব্যক্তিবিশেষের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল—তাহাকে ভারত মহিলার জাতীয় উন্নতি বলিতে পারি না; উন্নতির পথ সাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল না। মানবজীবনের উদ্দেশ্য সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি, রমণীজীবনের উদ্দেশ্যও সেই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি—একথা আর্য্যভারতের লোক ভিন্ন এদেশে বড় কেহ বুঝিত না। বহু শতাব্দীর পরে বিগত শতাব্দীতে সেই কথা অনেকে বুঝিয়াছে, ঘুমন্ত ভারতের ঘুম ভাঙ্গিয়াছে। সে ঘুম কেমন করিয়া ভাঙ্গিল, সেই কথাই আমাদিগের আলোচ্য। আমরা সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের চরণে আত্মোৎসর্গ করিয়া আমাদিগের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ক্ষমতার যতটুকু সাধ্য, সেই কাজে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার উপরে অনুগ্রহ করিয়া আমার পাঠিকা ভগিনীকে, অনেকগুলা নীরস পুরাতন কথা শুনিতেও হইবে।

জগতে প্রায় সকল সভ্য জাতির সমাজে দেখা যায় যে পুরুষজাতি বহির্ভাগ ও স্ত্রীজাতি অন্তর্ভাগরূপে অবস্থিত। * শারীরবিজ্ঞানবিদ্ অথবা সমাজনীতিজ্ঞ পণ্ডিতেরাও স্ত্রী পুরুষের এইরূপ পার্থক্য অনুমোদন করেন। এইজন্য পুরুষজাতি স্ত্রীজাতির রক্ষক ও অভিভাবক স্বরূপ। সুতরাং পুরুষজাতির উন্নতি না হইলে স্ত্রীজাতির উন্নতি একরূপ অসম্ভব। সমাজের শীর্ষভাগ রাজা। (১) তাই যে সমাজে রাজা লোক শিক্ষার ও প্রজাগণের উন্নতির সহায়, সাধারণ পুরুষগণ সুশিক্ষিত ও উন্নতচেতা, সেই সমাজেই স্ত্রীজাতির

* স্ত্রীজাতি যে সমাজে অন্তর্ভাগ ও পুরুষজাতি বহির্ভাগরূপে অবস্থিত, সেই সমাজই প্রকৃত উন্নত সমাজ। যে সমাজে ইহার অন্যথা, সভ্য বলিয়া গণিত হইলেও সে সমাজকে "উন্নত সমাজ" বলা যায় না, প্রকৃত পক্ষে তাহা বিকৃত সমাজ।

(১) যে দেশে একজন ব্যক্তি রাজা নহে, সে দেশের রাজশক্তিই 'রাজা' স্থানীয়।

প্রকৃত উন্নতি হইতে দেখা যায়। ভারতীয় আর্য্যগণ ও বর্ত্তমান সমুদয় সভ্যজাতির সামাজিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে এ কথার সত্যতা অধিকতর স্পষ্টীকৃত হয়। আর্য্যভারতের শাসনকর্ত্তাদিগের যখন লোক শিক্ষা ও জনসাধারণের উন্নতি এক প্রধান কর্ত্তব্যরূপে পরিগণিত ছিল, দেশীয় পুরুষগণ অনেকেই উন্নতচেতা ও সুশিক্ষিত ছিলেন, তখনই ভারতমহিলাদিগের অবস্থা প্রকৃত উন্নত হইয়াছিল। আমরা এখন যেমন বিদেশীয় রমণীগণের উন্নতাবস্থার পরিচয় পাইয়া চমৎকৃত হইয়া থাকি, আর্য্য ভারতের মহিলাকুলের উন্নতির বিষয় আলোচনা করিলেও সেইরূপ চমৎকৃত ও আনন্দিত হইতে পারি। উপযুক্তরূপে বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্মার্জ্জন; নারীজীবনের উপযোগী সুশিক্ষা লাভ অর্থাৎ যাহাতে রমণী-হৃদয়ের স্বাভাবিক শক্তি ও ভাব সকল ক্রমশঃ পরিস্ফুট হয়, পবিত্রতা ও কোমলতা পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই সকল সুশিক্ষা লাভ; মাতা পিতার সুকন্যা, ভ্রাতা ভগ্নীর সুভগ্নী, স্বামীর সুভার্য্যা, শ্বশুর কুলের সুবধূ, পুত্র কন্যার সুমাতা, গৃহধর্ম্মে সুগৃহিণী, সমাজের সাধুতা ও মঙ্গলবর্দ্ধিনী, উপযুক্ত কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষগণের সুদক্ষা সহকারিণী, স্বাধীনচিন্তা ও আত্মসংযমে সক্ষমা—যে সকল বিষয় নারীজাতির পূর্ণোন্নতির পরিচায়ক, তাঁহাদিগের তাহার কিছুরই অভাব ছিল না। ভারতীয় সুলভা, বিশ্ববারা, ভারতীয় অনসূয়া মৈত্রেয়ী, ভারতীয় গৌতমী গার্গী, ভারতীয় সীতা সাবিত্রী, ভারতীয় শৈব্যা মদালসা, ভারতীয় খনা, লীলাবতী প্রভৃতি ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কালক্রমে ভারতবর্ষে যখন ধর্ম্মবিপ্লবের সহিত শিক্ষাবিপ্লব ও রাষ্ট্রবিপ্লব হইতে লাগিল, সমাজের কর্ত্তৃপক্ষ পুরুষগণ ক্রমশঃ অশাসিত-চরিত্র হইতে লাগিলেন, ভারতরমণীগণের অবস্থাও তখন ক্রমশঃ 'হীনতর' হইয়া উঠিল। এইরূপে বৌদ্ধধর্ম্মের অবসান সময়ে, বৌদ্ধধর্ম্মের 'নীরস বৈরাগ্য' ত্যাগ করিয়া ভারতবাসিগণ যখন দলে দলে ভোগবিলাসিতার আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিলেন,—বলিতে বুক ফাটিয়া যায়—তখন ভারতমহিলাদিগের আধ্যাত্মিক সম্মান গৌরব এতদূর বিনষ্ট হইয়াছিল যে পুরুষদিগের অনেকেই তাঁহাদিগকে খেলানা বা বিলাসের জিনিস মাত্র মনে করিতেন! পরবর্ত্তী সময়ে রাজস্থানের ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভবা রমণীগণ অনেকটা সুশিক্ষা, গৌরব ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ভারতের অন্যান্য রাজগণ অর্থাৎ নন্দ বংশ, মৌর্য্যবংশ, পালবংশ ও সেন বংশের রাজগণ ভারতরমণীদিগের অবস্থার উন্নতির জন্য যে বিশেষ কোনও চেষ্টা করিয়াছেন, তাহার কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায় না। বরং মৌর্য্যবংশীয় রাজত্ব স্থাপয়িতা পণ্ডিতবর চাণক্য, জনসমাজে সাধারণ নারীচরিত্র অতি ঘৃণিত ভাবে চিত্রিত করিয়া তাহাদিগকে অপ-

দগ্ধ করিয়া গিয়াছেন; আবার সেন বংশীয় রাজা বল্লাল সেন কৌলীন্য প্রথা প্রবর্ত্তন করায়, বহুবিবাহের বিস্তৃতি হেতু বঙ্গবাসিনীদিগের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এইরূপে হিন্দুরাজগণের সময়েই ভারতমহিলাগণের অবস্থার অবনতি সাধিত হয়।

ইহার পরে মুসলমানগণের রাজত্ব। মুসলমান রাজগণও পর্য্যায়ক্রমে ভারতের সিংহাসন ভোগ দখল করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে দেশীয় প্রজাগণের সুশিক্ষা ও রমণীগণের উন্নতির সহায়তা করিতে ইচ্ছুক, এ রকম লোক বড় কেহ ছিলেন না; বরং মুসলমানদিগের শাসন সময়ে ভারতরমণীদিগের 'অবরোধ প্রথা' প্রচলিত হয়। মহম্মদ অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তক। কথিত আছে, তিনি নিজে স্ত্রীদিগের প্রতি সর্ব্বদা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন, তাই ভার্য্যাদিগের কাহারও দোষের শাস্তিস্বরূপ 'পর্দা নসীন' করেন। এইজন্য মহম্মদের শিষ্য সেবকদিগের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়। যাঁহারা প্রাচীন পুরাণ ইতিহাসের সহিত পরিচিত আছেন, তাঁহারা জানেন যে আর্য্যভারত হইতে পরবর্ত্তী সময় পর্য্যন্ত, ভারতমহিলাগণ অন্তঃপুরবাসিনী হইলেও প্রয়োজনানুসারে সভামধ্যবর্ত্তিনী বা রাজপথচারিণীও হইতে পারিতেন। কিন্তু মুসলমানদিগের দৃষ্টান্তে ভারতের অনেক স্থানেই অবরোধ প্রথা বদ্ধমূল হয়; অবরোধ প্রথার প্রবর্ত্তনেই স্ত্রী চরিত্র নিতান্ত 'লঘু' বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মে এবং স্ত্রী জাতির সুশিক্ষার বিশেষ অন্তরায় হয়।

এতদ্ভিন্ন, মুসলমান রাজত্ব কালে যে সকল ভোগ বিলাসী দুষ্ক্রিয়াসক্ত মুসলমানগণ রাজা বা রাজপুরুষপদ লাভ করিতেন, তাঁহাদিগের অনেকে এরূপ দুর্বৃত্ত নরপিশাচ ছিলেন, যে কোনও রূপ গুণবতী মহিলার বিষয় জানিতে পারিলেই তাঁহাকে, তাঁহারা আত্মসাৎ করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কারণে ভারত মহিলাগণের অভিভাবকেরা, নিজ নিজ পরিবারস্থা রমণীগণকে রূপ গুণের অতীত করিয়া রাখিতে চাহিতেন। ইহাতে ভারতমহিলাদিগের অবস্থা যে কিরূপ অধঃপতিত হইয়াছিল, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহা কতক দূর বুঝিতে পারেন, সন্দেহ নাই।

"বিগত শতাব্দীতে ভারত মহিলা গণের অবস্থা"র বিষয় আলোচনা করিতে, এতকালের পুরাতন ঘটনার উল্লেখ করিতে হইল, ইহার তাৎপর্য্য এই যে উল্লিখিত ঘটনাবলীই পরবর্ত্তী সময়ে, মহিলাগণের অবস্থা গঠনের মূল। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতমহিলাদিগের সাধারণতঃ যে অবস্থা হইয়াছিল, উল্লিখিত ঘটনা সমূহও তাহার কারণ স্বরূপ।

এতদ্ভিন্ন, আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে সমাজে রাজা লোকশিক্ষার সহায়, ও সাধারণ পুরুষগণ সুশিক্ষাপ্রাপ্ত ও উন্নতচেতা, সেই সমাজেই স্ত্রীজাতির প্রকৃত

উন্নতি হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতবর্ষ ইংরাজরাজের নবাধিকৃত রাজ্য; ভারতের রাজকীয় কার্য্য সকল তখনও সুশৃঙ্খলরূপে চলিতেছিল না; কোনও বন্দোবস্তই এখনকার মত "উপযুক্ত" ছিলনা; তাহার উপরে ঠগী, বর্গী, চোর, ডাকাইত এবং অন্যান্য বিদ্রোহীদিগের বড়ই উপদ্রব ছিল। এই সকল কারণে বৃটিশরাজ তখন পর্য্যন্ত লোক শিক্ষা বিষয়ে মনোযোগ করিতে পারেন নাই। এদিকে, দেশের পুরুষ জাতির সাধারণতঃ উচ্চতর শিক্ষা ছিল না, কারণ এদেশের অনেক পুরুষ আর্য্য ভাষা সংস্কৃত ছাড়িয়া আরবী ও পারসী শিক্ষা করিতেন, আর্য্যগণের মহতী শিক্ষা গ্রহণ করিতে অনেকেই অশক্ত ছিলেন; আরবী ও পারসী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিয়া ভারতীয় হিন্দু জাতির জীবন গঠিত হইত না। বোধ হয় বলা বাহুল্য যে, যে পাশ্চাত্য শিক্ষা এখনকার দিনে মনুষ্যত্ব লাভের উচ্চতর উপায় বলিয়া পরিগণিত, সে পাশ্চাত্য শিক্ষা তখন এ দেশে প্রচলিত ছিল না। এই সকল কারণে পুরুষেরা স্ত্রীজাতির জাতীয় অবস্থা উন্নত করিবার জন্যও কোনও চেষ্টা করিতেন না। দিনের পরে দিন যাইতেছিল, ভারত রমণী একই অবস্থায় অবস্থিত ছিল; তাহাদের অবস্থার যে কখনও পরিবর্ত্তন হইবে, একথা কেহই জানিত না। তখন পুরুষ জাতির জীবন যেমন সহজ ভাবে গঠিত হইত, তাঁহাদের পালিতা ও রক্ষিতা স্ত্রীজাতির জীবনও তদধিক সহজ ভাবে গঠিত হইত। সাধারণ স্ত্রীজাতির অবস্থা আলোচনা করিলে এ বিষয়ে আমরা অনেক দূর বুঝিতে পারিব, এই জন্য তাঁহাদিগের ব্যক্তিগত অবস্থা, পারিবারিক অবস্থা, এবং সামাজিক অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি। এই খানে বলা আবশ্যক যে এক শতাব্দীতে চারিযুগ ধরিলে, প্রত্যেক ২৫ বৎসর এক এক যুগ গণনা করিতে হয়। আমরা ১২০১ সাল হইতে ১২২৫ সাল পর্য্যন্ত প্রথম যুগ, ১২২৬ সাল হইতে ১২৫০ সাল পর্য্যন্ত দ্বিতীয় যুগ, ১২৫১ সাল হইতে ১২৭৫ সাল পর্য্যন্ত তৃতীয় যুগ, ১২৭৬ সাল হইতে ১৩০০ সাল পর্য্যন্ত চতুর্থ যুগ গণনা করিয়া ভারত মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। এস্থলে, প্রথম যুগে ভারতমহিলাগণের যে অবস্থা ছিল তাহাই প্রথম আলোচ্য।

(ক্রমশঃ)

বিপদে সম্পদ।

দৈত্যরাজ বলিকে লইয়া বামনদেবের যে লীলাখেলা, পুরাণে বর্ণিত আছে, তাহা বিপদ কি সম্পদ? ঐ ঘটনাকে কেহ বলিরাজার বিপদ, কেহ বা সম্পদ কহিয়া

থাকেন। উভয় পক্ষই সত্যবাদী। কেননা লোকে স্বস্ব রুচি ও স্বভাব অনুসারেই লৌকিক ঘটনাবলীর বিচার করিয়া থাকেন। যাঁহারা বহির্মুখ, লৌকিক ভোগসুখই যাঁহাদিগের চরম লক্ষ্য, তাঁহারা ঐ ঘটনাকে বলিরাজার বিপদ মনে করিয়া থাকেন। আর যাঁহারা পরমার্থ-পরায়ণ, অন্তর্মুখ, তাঁহাদিগের চক্ষে ঐ ঘটনা পরম সম্পদ। মহারাজ বলি ও তৎ মহিষী শ্রীমতী বৃন্দা দেবী ঐ ঘটনাকে কি ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, ভক্তমাল গ্রন্থ হইতে আমরা তাহা সংকলন করিলাম; বামাবোধিনীর পাঠক ও পাঠিকাগণ স্ব স্ব প্রকৃতি ও বুদ্ধি বিবেচনা অনুসারে উহার তাৎপর্য্য বুঝিবেন।

মহাভক্ত শ্রীমান্ প্রহ্লাদ মহাশয়ের পৌত্র শ্রীমান্ বলি মহারাজ রাজ্যের সুশাসন, সুশৃঙ্খলা, দয়া, দাক্ষিণ্য, প্রজাবাৎসল্য প্রভৃতি গুণগ্রামে ত্রিলোকবিখ্যাত ও জগতের মধ্যে অদ্বিতীয় যশস্বী হইয়াছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে ঈর্ষ্যাকাতর হইয়া বলির রাজ্যশ্রী কৌশলে হরণ করিবার জন্য শ্রী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করেন। দেবগণের চিরসহায় ভগবান্, ইন্দ্রের প্রার্থনার বশবর্ত্তী হইয়া এক অপূর্ব্ব ভুবনপাবনী লীলার অবতারণা করিলেন। দেবকার্য্য ছল মাত্র, অমানুষী লীলা বিস্তার দ্বারা জীব চরিতার্থ করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য। বলি ছলিবার জন্য অলৌকিক ব্রাহ্মণবটুরূপে কশ্যপ গৃহে অবতীর্ণ হইলেন।

এদিকে বলিরাজা মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিয়া ভূরি দান করিতেছেন। বটু ব্রাহ্মণরূপী ভগবান্ বলির যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত হইলেন। শ্রী অঙ্গের তেজঃপুঞ্জে সূর্য্যালোকও স্তিমিত হইয়া গেল। বলি মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চকিত ও চমৎকৃত হইয়া নির্নিমিষলোচনে তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। এইরূপে কিয়ৎকাল অতীত হইলে বলি প্রকৃতিস্থ হইলেন এবং গলগ্নীকৃতবাসে বামনদেবকে রত্নময় উচ্চাসনে বসাইলেন। অনন্তর কৃতাঞ্জলিপুটে মৃদুমধুরভাবে কহিতে লাগিলেন, "কি অভিলাষে এবং কোন্ প্রয়োজন সিদ্ধির উদ্দেশে এ দাসের ভবনে আপনার শুভাগমন হইয়াছে?" বামনদেব কহিলেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, কিঞ্চিৎ ভিক্ষালাভের আশায় আসিয়াছি। যদি দানের প্রতিজ্ঞা করেন, তবে ব্যক্ত করি। নচেৎ বৃথা বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন কি?" রাজা কহিলেন, "যে অর্থ চাহিবেন, তাহাই দিব।"

বামনের লোকাতীত সৌন্দর্য্য দর্শনে তাঁহাকে লোকাতীত পুরুষ বলিয়া বুঝিতে কাহারই কষ্ট হয় না। গুরু শুক্রাচার্য্য সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা পরমযোগী তিনি অনায়াসেই বুঝিলেন যে, বিষ্ণু ছদ্মবেশে আসিয়াছেন। তিনি বলিকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন,—'তুমি আপন দোষে আপনার অনিষ্ট করিলে, এ ত মনুষ্য নহে, তোমার বিপক্ষের পক্ষ হইয়া স্বয়ং ভগবান্ তোমার সর্ব্বনাশ করিতে আসিয়াছেন।'

'রাজা বলে গোঁসাই যে আপনে কহিলে।
ছদ্মরূপে বিষ্ণু আইলা যাচ্ঞার ছলে॥
তবেত ইহার পর ভাগ্য কি আছয়।
যাহা চাহে তাহা দিব সেই ধন্য হয়॥'

রাজা গুরুকে উপরি উক্ত বাক্য কহিয়া পুনরায় বটুকে কহিলেন, "আপনি স্পষ্ট করিয়া বলুন, কি ভিক্ষা চাহেন।" বামনদেব কহিলেন, "আমি ব্রাহ্মণ, এজন্য আমার পাদ পরিমিত 'ত্রিপাদ' ভূমি ভিক্ষা করি।" যজমানের পরম হিতৈষী গুরুপুরোহিত শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নয়নভঙ্গীদ্বারা রাজাকে প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করিতে উপদেশ দিতে লাগিলেন; কিন্তু রাজা তাহা দেখিয়াও দেখিলেন না। তিনি বামন দেবকে পুনঃ পুনঃ ক্ষুদ্র প্রার্থনা পরিহার পূর্ব্বক ধন-রত্ন গ্রাম ঐশ্বর্য্যাদি প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। বামন দেবের একই প্রার্থনা। রাজা অগত্যা প্রার্থী ব্রাহ্মণের ইচ্ছানুসারে ত্রিপাদ ভূমি দানে স্বীকৃত হইলেন। রাজার এইরূপ ব্যবহারে শুক্রাচার্য্য অতিশয় কোপান্বিত হইয়া রাজাকে যারপর নাই গালি দিলেন। শুক্রাচার্য্যের গালি ও তিরস্কার শুনিয়া হাসিতে হাসিতে,——

'রাজা কহে বিষ্ণু যদি প্রতিগ্রহ করে।
তাহার অধিক ভাগ্য কি আছে সংসারে?
নতুবা ও যদি হয় তেজস্বী ব্রাহ্মণ।
প্রতিশ্রুত হয়ে পুনঃ অন্যথা করণ॥
নরকের দ্বার সেই অযশঃ ভুবনে।
জীয়ন্তে মরণ তুল্য ধিক্কার জীবনে॥'

শুক্রাচার্য্য অর্থনীতি-বেত্তৃগণের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ পুরুষ। 'শুক্রনীতি' নামে অর্থশাস্ত্র অদ্যাপি প্রচলিত আছে, বিষয়িগণের তাহা অনেক কাজে লাগে। রাজার ভাব দর্শনে শুক্রাচার্য্য পুনরায় তাঁকে উপদেশ দিলেন যে, অর্থের রক্ষণে মিথ্যা কথা বা অধর্ম্মাচরণে কোন দোষ হয় না, অতএব আমার বাক্য অগ্রাহ্য করিলে, অচিরে রাজ্যশ্রীভ্রষ্ট হইবে। গুরুর এই কঠোর অভিসম্পাতে রাজা ও রাণী দৃক্‌পাতও করিলেন না। বিশেষতঃ রাণী বৃন্দাবলী দূর হইতে শুক্রাচার্য্যের ঐ সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অতিশয় দুঃখিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। শত শত দাসী-পরিবৃতা থাকিলেও স্বহস্তে জলপাত্র লইয়া যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়া সহর্ষক্রোধবচনে কহিলেন,—

'মহারাজ শ্রীচরণ শীঘ্র ধৌত কর।
সাধুর সম্মত নিজ মঙ্গল আচর॥
মুনি ঠাকুরের শাপে যে হয় হউক।
রাজ্য, শ্রী, অর্থ যায়, বরঞ্চ যাউক॥
প্রতিকূল মুনিবাক্য সব তেয়াগিয়া।
যাহা আছে তাহা দেহ সৌভাগ্য মানিয়া॥
এ হেন ভাগ্যের সীমা সাধুর দুর্ল্লভ।
আজ সে তোমার অগ্রে সংপ্রতি সুলভ॥
অতএব অতি শীঘ্র শ্রীচরণ আগে।
সমর্পণ কর ধন প্রাণ যাহা মাগে॥
এত বলি বৃন্দাবলী জল ঢালে পদে।
মহারাজ বলিরাজ প্রক্ষালে আমোদে॥
দুখানি সুন্দর পদ প্রক্ষালন করি।
হৃদয়ে ধরয়ে পুনঃ চক্ষে বহে বারি॥

শ্রীচরণ ধৌত জল মস্তকে ধরিল।
জনম সফল কৃতকৃতার্থ মানিল॥
যে চরণ রজঃ শিব অদ্যাপি যতনে।
মস্তকে ধারণ করি শিব করি মানে॥
বারি ঝারি কুশ তিন তুলসী লইয়া।
ত্রিপাদ ধরণী দানে উদ্‌যুক্ত হইলা॥"

ব্রাহ্মণকে অঙ্গীকৃত দান করিতে রাজা ও রাণীর এতাদৃশ উদ্যম দেখিয়া শুক্রাচার্য্য পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু গোবিন্দচরণাসক্ত রাজা ও রাণী কোন রূপেই অভীপ্সিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন না। তখন শুক্রাচার্য্য উপায়ান্তর না দেখিয়া অণিমা সিদ্ধির প্রভাবে সূক্ষ্মতম মক্ষিকারূপ ধারণ পূর্ব্বক ঝারির নলে প্রবেশ করিলেন। তাহাতে দানের সংকল্পকালে জল পতিত না হওয়ায় দানের ব্যাঘাত হইতে লাগিল। বামন দেবের ইঙ্গিত মতে রাজা নলমধ্যে এক কুশা প্রবেশ করাইলেন। তাহাতে শুক্রাচার্য্যের চক্ষু বিদ্ধ হইয়া গেল। তিনি সেই হইতে কাণা। অনন্তর বিধিমতে ত্রিপাদভূমি বামন দেবকে দত্ত হইল। এই ঘটনায় প্রভুর তিনটী কার্য্য সাধিত হইল, দেব কার্য্য-সাধন, বলিকে কৃতার্থকরণ এবং ভুবন-পাবনী লীলা বিস্তার।

ত্রিপাদ ভূমি গ্রহণ কালে বামন দেব ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি পরিগ্রহ পূর্ব্বক এক পাদে পৃথিবী, এক পাদে স্বর্গাদি ব্যাপিলেন; তৃতীয় পাদের উপযুক্ত স্থান রহিল না। তখন বলিলেন, "বলিরাজ, তুমি প্রতিশ্রুত দানে অসমর্থ হওয়ায় আমার দণ্ডার্হ হইলে।" ভগবানের এই উক্তির পর নাগপাশ বলিকে বন্ধন করিল।

"মহারাজ প্রেমাবেশে আনন্দিত হৈলা॥
প্রভুর যে গূঢ়াশয় কে বুঝিতে পারে।
কোন্ ছলে অনুগ্রহ নিগ্রহ বা কারে॥
ব্রহ্মা শিব ইন্দ্র আদি যত দেব গণ।
নারদ প্রহ্লাদ আদি করয়ে স্তবন॥
বলিরাজ কহে কিছু অপূর্ব্ব কথন।
তাহা কিছু কহি শুন কর্ণের শোধন॥
বলিরাজ কহে প্রভু দয়ার সাগর।
তুমি সে শরণ্য প্রভু জগৎ ভিতর॥
মুই হেন মূঢ় পাপী অধম অগ্রাহ্য।
পর-দ্রোহকারী নীচ সতের অভুজ্য॥
এ হেন পামর জনে এত কৃপা কৈলা।
ভজন সাধন কিছু হেতু না গণিলা॥
তোমার কৃপায় কোনরূপে নহি পাত্র।
প্রহ্লাদের পৌত্র এক হেতু দেখি মাত্র॥
তোমার আশয় প্রভু অতি সে গভীর।
বুঝিতে আছয়ে কোন্ জন হেন ধীর॥
পুরন্দর পক্ষ হয়ে ছলিতে আমারে।
তাহারে অনর্থ দিয়া অর্থ দিলা মোরে॥
দেবরাজ মূর্খ ইহা বুঝিতে নারিলা।
ক্ষুদ্র অর্থ সাধনে তোমারে পাঠাইলা॥
তোমা হেন ধন নাহি চিনিল বর্ব্বর।
কাঞ্চন বেচিয়া নিল সুতুচ্ছ কঙ্কর॥
সাধুর অগ্রাহ্য রাজ্য অনিত্য অসার।
সেই তুচ্ছ ধন হেতু হারাইল সার॥
তুমিত দুর্লভ ধন সারাৎসার বস্তু।
না চিনিল মূঢ় মন্দমতি বস্তুতস্তু॥

বড় কৃপা কৈলে মোরে মায়া ফাঁস হতে।
মুক্ত করি দিলে নিজ চরণ অমৃতে ॥
ব্রহ্মা আদি দেবগণ বলির বচন।
শুনিয়া প্রশংসা করে আনন্দিত মন ॥
ইন্দ্র দেব বাক্য শুনি সলজ্জ হইলা।
বলিরাজে ধন্য মানি আপনে নিন্দিলা ॥"

প্রভু যদিও বলির চরিত্র দর্শনে অন্তরে পরিতুষ্ট হইলেন, কিন্তু বাহ্যে নিষ্ঠুরের ন্যায় বাক্য কহিলেন। সেই নিষ্ঠুর বাক্য দ্বারা বলিরাজার ভগবদ্‌ভক্তি অগ্নি পরিশুদ্ধ কলধৌতবৎ শত গুণ উজ্জ্বল হইয়া প্রকাশ পাইল। প্রভু কহিলেন,—

"হাঁরে রে দুর্ম্মতি মোর তৃতীয় চরণ।
কোথায় রাখিব কহ শীঘ্র দেহ স্থান ॥
বলি বলে শ্রীচরণ রাখিবার যোগ্য।
আমার মস্তক এই স্থান হয় দীর্ঘ ॥
ইহাতে রাখহ পদ-কমল সুন্দর।
বাক্যবন্ধ হইতে মুই হইনু অবসর ॥
তোমার জগৎ এই শরীর তোমার।
তোমার চরণে সঁপিলাম সে নির্দ্ধার ॥
তুমি প্রভু তুমি বিভু তুমি জগন্নাথ।
বিশেষতঃ হও তুমি অনাথের নাথ ॥
যেই ইচ্ছা কর তুমি শরণ লইনু।
আত্মনিবেদন এবে চরণে করিনু ॥
বলির সৌভাগ্য কিবা কহনে না যায়।
জগন্মঙ্গল পদ ধরিলা মাথায় ॥"

বলিরাজের এই অপার সৌভাগ্য দর্শনে "জয় জয়, ধন্য ধন্য, নমোনমঃ" শব্দে ত্রিভুবন মুখরিত হইল। প্রভু বলিকে বন্ধনমুক্ত করিয়া আলিঙ্গন করিলেন এবং গদ গদ মৃদু মধুর স্বরে কহিলেন,—

"তুমি মোর প্রিয় আমি তোমার বিক্রীত।
হইলাম নিত্যবদ্ধ পরাণ সহিত ॥"

এই বলিয়া পাতালপুরে মণিমন্দিরে বলিকে প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনি চির-কালের জন্য বলির স্বামী হইয়া রহিলেন। এই "বলিভূমি" কাহার কাহার মতে দক্ষিণ আমেরিকার "বলি-ভিয়া।" যাহাহউক যেখানে অহৈতুকী ভক্তি, সেই খানেই ভগবানের এইরূপ লীলা। ঐরূপ ভক্তিব্যতিরেকে তৎ-প্রাপ্তির অন্য উপায় নাই। গীতাতে স্পষ্টাক্ষরেই উক্ত হইয়াছে,—

"মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
সগুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে।
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন নচেজ্যয়া।
শক্য এবম্বিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা।
ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ ॥"

বেদাধ্যয়ন, তপস্যা, দান যজ্ঞ ইত্যাদি কিছুই ভগবৎপ্রাপ্তির হেতু নহে; কেবল অব্যভিচারী, অনন্যা বা অহৈতুকীভক্তি দ্বারাই তাঁহাকে লাভ করা যায়।

কুমারী ওয়েষ্টন্।

কুমারী আগ্নিস্ ওয়েষ্টন্ নাবিকদিগের পরম বন্ধু। পোর্ট্‌সমাউথ্, ডিভনপোর্ট প্রভৃতি, বন্দরে ইঁহার নাম প্রত্যেক লোকের নিকট পরিচিত; ইনি ধর্ম্ম-প্রচার ও মাদক সেবন নিবারণ ব্রতে প্রায় ২১ বৎসর কাল ব্রতী আছেন। ইঁহারই যত্নে একজন সামান্য নৌ-সৈনিক নিউইয়র্কের মেডিকেল মিসনের অধ্যক্ষ হইয়াছেন, তাঁহার নাম জর্জ্জ ডোকণ্ট। ইহার পর এই গুণবতী রমণীর সাহায্যে আরো অনেক হতভাগা সৈনিক সুখসৌভাগ্য ও উন্নতজীবনের অধিকারী হইয়াছে। ইনি "Royal Naval Temperance Society." রাজকীয় নাবিক মাদক নিবারণী সভার সৃষ্টিকর্ত্রী। এই সভার শাখা ইংলণ্ডেশ্বরীর অধীনস্থ প্রত্যেক অর্ণবপোতে প্রতিষ্ঠিত আছে; "Ashore and Afloat" স্থলে ও জলে নামক মাসিক পত্রিকা এই সভার মুখপাত্র। কুমারী ওয়েষ্টনের এক জীবনসহচরী এই পত্রিকার সম্পাদিকা। গতবর্ষে ইহার চারি লক্ষাধিক খণ্ড প্রচারিত হইয়াছে এতদ্ভিন্ন কুমারী ওয়েষ্টন পুরুষদিগের জন্য এবং বালকদিগের জন্য এক একখানি স্বতন্ত্র মাসিক পত্রিকা প্রচার করিয়া থাকেন। কুমারী যে সকল নাবিককে মদ ছাড়াইয়াছেন, তাহারা মিতাচারিতার আশ্চর্য্য ফল জীবনে প্রদর্শন করিতেছে। ইহারা এক এক জন যে কার্য্য করিতে পারে, দুইজন মাতাল নাবিক তাহা পারে না।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৮ সংখ্যা ২০৫ পৃষ্ঠার পর)

মানব হৃদয়ে সৎ ও অসৎ এই দুই প্রকার বৃত্তি আছে। সৎবৃত্তির কার্য্য পুণ্য, অসৎ বৃত্তির কার্য্য পাপ। যিনি অসৎবৃত্তিদিগকে সংযত করিয়া সৎবৃত্তি-দিগকে পরিচালনা করেন, তাঁহাকে আমরা সাধু বা সাধ্বী বলিয়া থাকি, আর যিনি সৎবৃত্তিদিগকে সংযত করিয়া অসৎ-বৃত্তিদিগকে পরিচালনা করেন, তাঁহাকে আমরা পাপাত্মা বা পাপীয়সী বলি। সৎবৃত্তির অনুশীলনেই মানব সৎকার্য্য করেন, আর অসৎবৃত্তির অনুশীলনেই মানব অসৎ কার্য্য করেন। সাধুতা লাভ করা মনুষ্যজীবনের যে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য, একথা কে না জানেন? এই সাধুতা লাভ করিতে হইলে অসৎবৃত্তিদিগকে সংযত রাখা এবং সৎবৃত্তি বা দেব-বৃত্তিদিগকে সম্প্রসারিত করা মানবের অবশ্য কর্ত্তব্য। সৎবৃত্তির সম্প্রসারণেই মানবের মুক্তি লাভ হয়।

ভক্তি-বৃত্তি মানবের সর্ব্বপ্রধানা দেব-

বৃত্তি। এই বৃত্তির উদয়ে মানবের পশুত্ব দূর হয়, এই বৃত্তির বর্দ্ধনে মানবের মনুষ্যত্ব বিকশিত হয়, এই বৃত্তির পূর্ণ বিকাশে মানবের দেবত্ব লাভ হয়। উৎপত্তি, বর্দ্ধন ও পূর্ণ বিকাশ, ভক্তির এই তিন অবস্থা। ইহাকে আমরা প্রথমাবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা ও তৃতীয় অবস্থা বলিতেছি এবং হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভক্তি হইতে এই সকল অবস্থার লক্ষণ সংগ্রহ করিতেছি, ভরসা করি পাঠক পাঠিকাগণ ইহাতে বিষয়টী সহজে বুঝিতে পারিবেন।

হিন্দু শাস্ত্রে বলে।—

"পূজ্যেষ্বনুরাগো ভক্তিঃ।" (অমরসিংহ)

পূজনীয়ের প্রতি যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তি। আমরা ইহাকে ভক্তির প্রথম অবস্থা বলিতেছি। পূজনীয় ব্যক্তির উপরে অনুরাগই এই অবস্থার লক্ষণ। অন্যত্র "অত্যন্তানুরক্তিরীশ্বরে ভক্তিঃ।"

(শাণ্ডিল্য সূত্র।)

ঈশ্বরে অতিশয় অনুরাগই ভক্তি। শ্লোকটী ঈশ্বরভক্তি বিষয়ক হইলেও ভক্তিমাত্রেরই লক্ষণপ্রকাশক। সকল প্রকার ভক্তিরই দ্বিতীয় অবস্থা এই রকম অর্থাৎ ভক্তিভাজনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ হইয়া থাকে। অন্যত্র

"যতোশ্চিত্তাত্মনোরৈক্যং ভক্তিযোগ উদাহৃতঃ।"

পরমাত্মার সহিত যদ্দারা মনের একতা সাধিত হয়, তাহাই ভক্তি যোগ। ইহাই ভক্তির তৃতীয় অবস্থা। ভক্তিভাজনের সহিত মনের একতা সাধনই এ ভক্তির লক্ষণ। ভক্তিভাজন স্বয়ং জগদীশ্বর হউন বা অন্য কেহ হউন, তাহাতে ভক্তির কোনও ব্যত্যয় হয় না। ভক্তিই বরং ভক্তিভাজন মানবকে দেবতা স্থানীয় করিয়া থাকে।

ভক্তি-বৃত্তির ক্রিয়াকে উপাসনা কহে। ভক্তিভাব মনে, উপাসনা কার্য্যে। উপাসনা কর্ম্ম-স্থানীয়, ভক্তি জ্ঞানস্থানীয়। উপাসনা যোগে ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। ভক্তিবৃত্তির ক্রম বিকাশের সহিত উপাসনাও ক্রমবিকাশ লাভ করে। তাহা ক্রমে বলিতেছি।

ভক্তিবৃত্তি মনুষ্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপ্রবৃত্তি। ইহার মধ্যে পার্থিব ভক্তি বিষয়ে মাতৃ-ভক্তিই শ্রেষ্ঠতমা। ভক্তির প্রথম অবস্থা পূজনীয়ের প্রতি অনুরাগ —এই অনুরাগের কারণ পূজনীয়ের শ্রেষ্ঠতা। অতএব বয়সের শ্রেষ্ঠতা, সম্পর্কের শ্রেষ্ঠতা, গুণের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি শ্রেষ্ঠতাই ভক্তির অবলম্বনীয়। পরকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিশ্বাস হইলে ভক্তির উদয় হয়। ইহাই ভক্তির প্রথম অবস্থা। ভক্তির প্রথম অবস্থাতেই মানবের আত্মাভিমান খর্ব্ব ও গুণানুরাগ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। সন্তানের পক্ষে মাতাই সংসারের শ্রেষ্ঠতমা, তাই মাতার মাতৃত্ব বুঝিতে পারিলে তাঁহার প্রতি ভক্তি হওয়া সন্তানের স্বাভাবিক। এই মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে সন্তানের কেবল আত্মাভিমান খর্ব্বও গুণানুরাগ বর্দ্ধিত হয় না; সন্তানের সর্ব্বপ্রকার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ও আত্মার সদ্গুণ সমূহ

পরিবর্দ্ধিত হয়। এ জগতে মাতা সন্তানের দেবতা; সন্তান মাতার তুলনায় জীবাণু মাত্র; সন্তানের আবার আত্মশ্লাঘার কি আছে? সন্তান জানেন তিনি মাতৃ-শোণিতে গঠিত, মাতৃহস্তে পালিত, এবং মাতৃ-স্নেহে জীবিত। প্রাপ্তবয়সে তাঁহার স্বাস্থ্য, রূপ, বিদ্যা, বুদ্ধি, সুখ, সম্পত্তি, খ্যাতি, কীর্ত্তি, আত্মীয়, বন্ধু, সবই মিলিতে পারে, কিন্তু এ সৌভাগ্যের আধার যে দেহ ও জীবন, তাহা তো মাতৃ-করুণায় সঞ্জীবিত রহিয়াছে! নিরাশ্রয় শৈশবে যদি মাতৃ-স্নেহের এক বিন্দু অভাব হইত, মাতার প্রাণপণ যত্নের একবিন্দু ত্রুটি হইত, তবে সন্তান কেমনে রক্ষা পাইত? তাই বলিতেছি যে মা'কে মনে করিলেই লোকে আপনার ওজন বুঝিতে পারে—আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিতে পারে। আপনার ক্ষুদ্রত্ব জানিতে পারা মানবের এক মহা সৌভাগ্য। কারণ সসীম মানব অসীম সুখ-প্রার্থী হইলেই তাহার হৃদয়ে অহঙ্কার প্রবেশ করিতে পারে। অহঙ্কার অর্থে কেবল বড় ই নহে, অহঙ্কারের প্রকৃত অর্থ আপনাকে বিশ্বজগতের কেন্দ্র করিয়া "আমি আমি" করিয়া বেড়া'ন। এই রকম অহঙ্কারই মানবের কুবৃত্তির মূল ও কুবৃত্তিই পাপের মূল। লোভ, ক্রোধ হিংসা, পক্ষপাতিতা, অজিতেন্দ্রিয়তা, স্বার্থপরতা প্রভৃতি কুবৃত্তি হইতে চৌর্য্য, বিবাদ, অসত্য, ব্যভিচার, হত্যা প্রভৃতি মহাপাতক ঘটনা হইয়া থাকে। এই সকল কুবৃত্তির মূলানুসন্ধান করিলে জানা যায় যে এক মাত্র অহঙ্কারই ইহাদিগের উৎপত্তি স্থান। এইজন্য শাস্ত্রে লিখিত আছে "নাহঙ্কারাৎ পরো-রিপুঃ" অর্থাৎ অহঙ্কার হইতে প্রবল শত্রু আর নাই! এই দুর্দ্দান্ত শত্রুকে যিনি পরাস্ত করিতে চাহেন; তিনি অপ-রাজিতা অভয়া মাতৃদেবীর শরণাপন্ন হইবেন!—যে মায়ের নিকটে সন্তানকে যমেও ছুঁইতে পারে না, সেই মায়ের কাছে সন্তানকে অহঙ্কার রাক্ষস গিলিবে কি করিয়া? তাই মায়ের কাছে দাঁড়া-ইলে সন্তানের সকল অহঙ্কার চূর্ণ হয়, হৃদয় প্রকৃত বিনীত হয়। মানব যতই ক্ষমতাপন্ন হউন না কেন, বিশ্বস্রষ্টার চক্ষে তিনি সৃষ্ট পদার্থ ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন; আর সন্তান যতই গৌরবান্বিত হউন না কেন, তাঁহার মায়ের কাছে তিনি সেই "কোলের ছেলে" সেই আদরের "যাদুমণি" ব্যতীত অন্য কিছুই নহেন! মহাত্মা জর্জ্জ ওয়া-সিংটন যখন আমেরিকার স্বাধীনতার পতাকা উড়াইয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহার মহতী কীর্ত্তি গগন প্রতিধ্বনিত করি-তেছিল, যখন স্বদেশীয়গণ কৃতজ্ঞচিত্তে প্রাণের প্রাণে সেই কীর্ত্তিমানের পূজা করিতেছিল, তখন সকলে বিস্মিত হইলেও এক জনের প্রাণে ওয়াসিংটনের "শৈশব" জাগিতেছিল, একজন—তিনি ওয়া-সিংটনকে হাতে গড়িয়া "মানুষ" করি-য়াছিলেন, আপনার রক্তে বাঁচাইয়া রাখি-য়াছিলেন, তাই এখনও তিনি, ওয়া-

সিংটনের মা, মেরী ওয়াসিংটন, গৌরবান্বিত পুত্রকে শিশুর মত দেখিতেছিলেন!—পুত্রের অমানুষিক কীর্ত্তি শুনিয়া সংবাদদাতা মহাত্মা মার্কুইস্ ডি লেফেট্‌কে তিনিই বলিয়াছিলেন, "আমার জর্জ্জি খুব ভাল ছেলে, সে এ রকম কাজ করিবে তার আর আশ্চর্য্য কি?" এরকম কথা সহানুভূতির অল্পতা বা সন্তানের মহত্ত্ব অবোধ্য বলিয়া নহে—ইহা মাতৃভাবের সহজোক্তি। মা' সন্তানকে যে দিন প্রথম পাইয়াছিলেন, সে দিন সন্তান নিরাশ্রয়, অসহায়। মা'র প্রাণে সে দিন চিরদিনই জাগরূক থাকে। তাই জগতের কাছে তাহার কৃতিত্ব অলৌকিক হইলেও মায়ের প্রাণে কেবল সন্তানত্বই বিদ্যমান! তাই মাতৃভক্ত সন্তানের প্রকৃতি অহঙ্কারশূন্য ও বিনীত হয়। মাতৃভক্ত সন্তান কোনও অবস্থাতেই নিজের সন্তানত্ব ভুলিতে পারেন না, তাই "আমার জন্য জগৎ" মনে না করিয়া "জগতের জন্য আমি" মনে করেন। ইহাই নিরহঙ্কার ও বিনয়ের প্রকৃত লক্ষণ।

মাতৃ-ভক্তির প্রথম অবস্থায় অথবা মাতৃ-ভক্তির উদ্রেক মাত্রে মানবের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়। কৃতজ্ঞতা যে মহত্ত্বের পরিচায়ক একথা বলা বাহুল্য; কৃতজ্ঞতার জন্য উপকৃত উপকারীকে দেবভাবে দেখে; কৃতজ্ঞতার জন্যই মানবের জাতীয় ভালবাসা রক্ষা হয়, কৃতজ্ঞতার জন্যই মানব ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র হইলেও ভগবানকে ভালবাসিতে পারে। এসংসারে সন্তান মাতার নিকটেই সর্ব্বাপেক্ষা ঋণী, তাই মা'কে মনে করিলেই সন্তানের কৃতজ্ঞতা উছলিত হইতে থাকে।—যে ব্যক্তি অকৃতজ্ঞ, সে মানব কুলের কলঙ্ক। গৃহপালিত পশুদিগের মধ্যেও অনেক সময়ে, কৃতজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। অকৃতজ্ঞ যে, সে পশুরও অধম। কিন্তু কৃতজ্ঞতা পরীক্ষার সর্ব্বোচ্চ স্থান মাতা। যিনি মাতৃ-ভক্তি করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা বৃত্তি অবশ্য পরিস্ফুট হইয়াছে। মাতা যে সন্তানের কি পরমদেবতা তাহা কৃতজ্ঞ সন্তান ব্যতীত অপরে বুঝিতে পারে না এবং কৃতজ্ঞ সন্তান ব্যতীত কেহ মাতাকে ভক্তি করিতেও পারে না। তাই বলিতেছি মাতৃভক্তির প্রথম অবস্থাতেই সন্তানের কৃতজ্ঞতা-বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্দ্ধনে মানব-হৃদয়ের মহত্ত্ব সাধিত হয়।

মাতৃ-ভক্তির প্রথম অবস্থায়, সন্তানের হৃদয় যখন অহঙ্কারের অতীত, বিনীত ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হয়, তখন সন্তান মাতাকে সম্মাননা, মাতৃ-চরণ-বন্দনা, মাতার পদধূলি গ্রহণ, মাতার আশীর্ব্বাদেই উন্নতি-আশা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকেন। এই কার্য্য গুলিই প্রথম মাতৃ-উপাসনা। এইরূপ মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের সন্তানত্ব পরিস্ফুট হয়, পশুবৃত্তি সকল সংযত হয়। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনার প্রথম অবস্থায় সন্তান এইরূপ উন্নতি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

ইহার পরে ভক্তির দ্বিতীয় অবস্থা। ভক্তির এ অবস্থার লক্ষণ ভক্তিভাজনের প্রতি অতিশয় অনুরাগ। মাতৃ-ভক্তির এই অবস্থায় সন্তানের হৃদয় মাতাতে অধিকতর অনুরক্ত হয়। সন্তান যতই মাতার মহত্ত্ব বুঝিতে পারেন, ততই মাতার উপরে তাঁহার অনুরাগ বৰ্দ্ধিত হয়। এই মাতৃভক্তির প্রবলতায় সন্তানের সহৃদয়তা লাভ হইয়া থাকে। সহৃদয়তার অর্থ হৃদয়ের বিস্তৃতি ও কোমলতা। ইহা মাতৃভক্ত সন্তানগণ সকলেই পাইয়া থাকেন। মাতৃভক্ত সন্তান, খ্যাতনামা বিদ্যাসাগর মহাশয় হউন আর নগণ্য পেঁচো চাঁড়ালই হউন, সহৃদয়তা তাহাতে আছেই। সহৃদয়তা মাতৃ-ভক্তির স্বাভাবিক নিয়ম। এই সহৃদয়তা লাভ মানবজীবনে বড় লাভ। সহৃদয়তা হইতেই লোকে মহত্ত্বের গৌরব বুঝিতে পারে, পর-হৃদয়ের তত্ত্ব বুঝিতে পারে; সহৃদয়তা হইতেই লোকে ভালবাসা, দয়া, সহানুভূতি, ক্ষমা, গুণানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণে অভ্যস্ত হইতে পারে। সহৃদয়তা উৰ্ব্বর ক্ষেত্র, এখানে মনুষ্যত্বের বীজ বপন করিতে পারিলে তাহা নিষ্ফল হয় না। সহৃদয় ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তিদিগের পরিচালনায় যদি মহাপাপী হইয়াও থাকে, তথাপি সুশিক্ষা ও সাধু দৃষ্টান্তদ্বারা তাহাকে সৎপথে আনা যায়। জগাই মাধাই মহাপাতকী হইলেও নিত্যানন্দ প্রভু তাহাদিগকে নবজীবন দিয়াছিলেন কি করিয়া? চিন্তা করিয়া দেখিলে স্পষ্ট প্রতীতি হয়—নিত্যানন্দ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন তাদৃশ মহাপাপীদিগেরও হৃদয় ছিল বলিয়া। যদি নিত্যানন্দের মহত্ত্ব তাহারা না বুঝিত, যদি সাধুতা তাহাদের ধারণা না হইত, তবে নিত্যানন্দের সাধ্য কি যে তাহাদিগকে হরিভক্ত করেন! তাই বলিতেছি, মানবের সহৃদয়তাই সকল মহত্ত্বের মূল। মাতৃভক্তি অনুশীলনে সন্তানের এই সহৃদয়তা লাভ হয়। সন্তান মাতাকে যতই ভক্তি করিতে থাকেন, ভক্তি বৃত্তির সম্প্রসারণে ততই হৃদয় বিস্তৃত হইতে থাকে, মাতৃভক্তির মধুরতা যতই আস্বাদন করিতে থাকেন, এই সহৃদয়তার জন্য মাতৃভক্ত সন্তানের মনে মাতৃসুখ কামনা প্রবল হয়—মাতাকে সুখী করিতে পারিলেই সন্তান কৃতার্থ হইয়া থাকেন। এইজন্য মাতৃসেবা, মাতৃ-আজ্ঞা পালন ও মাতার প্রিয় কার্য্য করা সন্তানের জীবনব্রত হইয়া থাকে। ভক্তির এই কার্য্যগুলি মাতৃভক্তির দ্বিতীয় অবস্থার অন্তর্গত উপাসনা বলা যায়। এই মাতৃউপাসনায় অর্থাৎ মাতৃসেবা, মাতৃ-আজ্ঞা পালনাদি হইতে সন্তানের কর্ত্তব্য পালন, সেবাপরায়ণতা ও আত্মত্যাগ অভ্যাস হয়। মাতৃউপাসনায় সন্তান মুক্তি পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

(ক্রমশঃ)

বারমেসে।

পৌষ।

এই মাসের প্রথমে আলু প্রথম ভাঙ্গিতে হয়; অর্থাৎ খাইবার জন্য গোলআলু পৌষ মাসের প্রথম হইতে আরম্ভ করিতে হয়। প্রথম আলু তোলার পরই গাছগুলিকে ঈষৎ হেলাইয়া গোড়ায় মাটী ধরাইয়া দিতে হয়। ইহাতে গাছের বহির্ভাগের কিয়দংশ মাটী চাপা পড়ে। এই অবস্থায় ৩।৪ দিন থাকিলে আলুর ক্ষেত্রে জল সিঞ্চন করিতে হয়। ঐ সিঞ্চনের পর গাছের অপেক্ষাকৃত তেজো-বৃদ্ধি হয়। তখন আলু গাছের মূলে এবং মৃত্তিকাবৃত অংশের প্রত্যেক পত্রকক্ষে আলু জন্মিতে থাকে। যে সকল আলু পত্রকক্ষে জন্মে, তাহা ক্ষুদ্র হয় বটে; কিন্তু ঐ আলু হইতে উৎকৃষ্ট বীজ প্রস্তুত হয় তাহাকে দোভাঙ্গা বীজ কহে। ইহার মূল্যও অনেক অধিক। প্রতি মণ ১০৲ দশ টাকা হইতে কখন কখন ২০।২৫ টাকা মূল্যেও বিক্রীত হয়। যে বার বিশেষ পোকা ধরিয়া আলুর বীজ নষ্ট হইয়া যায়, সে বার ৪০৲ টাকা মূল্যেও বীজের মণ বিক্রয় হইয়া থাকে। তাহা কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা পরে বলিতেছি।

আমাদের দেশে ফসলের বীজ উৎ-পাদন, বীজরক্ষা ও বীজ বিক্রয় স্বতন্ত্র ব্যবসায় নহে; কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকায় উহা একটী স্বতন্ত্র ও প্রধান ব্যবসায়। তত্তদ্দেশের কৃষিশাস্ত্রবিৎ কৃষকেরা বিশেষ যত্নসহকারে বীজের উৎপাদন ও রক্ষা করিয়া থাকেন। বীজের উৎকর্ষ সম্পাদন বিষয়ে তাঁহারা কিরূপ যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহা শ্রবণ করিলে আমাদিগকে বিস্মিত হইতে হয়। বিলাতে 'চিভেলিয়ান' নামে বিখ্যাত এক প্রকার গম আছে, তাহার তুল্য উৎকৃষ্ট গম বিলাতে আর নাই। ডাক্তার চিভেলিয়ার ঐ গম বীজের সৃষ্টি করেন। তিনি কোন গমের ক্ষেত্রে একটী মাত্র উৎকৃষ্ট শীষ্ পাইয়াছিলেন। ঐ শীষের গমগুলি, ক্ষেত্রস্থ অন্য শীষের গম অপেক্ষা বৃহৎ ও পুষ্ট ছিল। ডাক্তার সাহেব ঐ শীষটীকে আনিয়া উহার গমগুলিকে আপন উদ্যানে বপন করেন। তাহা হইতে প্রথম বর্ষে ঐরূপ উৎকৃষ্ট গম শীষের পরিমাণের শতগুণ অধিক জান্মল। পর বৎসর ঐ বীজে তাহার শতগুণ জন্মিল। এইরূপে কয়েক বর্ষব্যাপ যত্ন ও অধ্যবসায়ে গমের একটী উৎকৃষ্ট জাতি সৃষ্ট হইয়া ডাক্তার সাহেবের নামকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে।

প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে ব্যান্‌হাম নামক একজন বিলাতীয় কৃষক আপনার আবাদে গম কাটা দেখিতেছিলেন। গম-

ক্ষেত্রের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ একটী শীষ তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। তিনি সেই শীষ্‌টী তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ পূর্ব্বক গৃহে লইয়া গেলেন। সেই বড় বড় ও পরিপুষ্ট গমগুলি একটী ক্ষুদ্র স্থানে বপন করিলেন। তাহাহইতে যে গম জন্মিল, তিনি তাহা বাছাই করিয়া পুনরায় বপন করিলেন। এইরূপে ৩।৪ বৎসরের মধ্যে একখানি ক্ষেত্রের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট গম বীজ প্রস্তুত হইল। ঐ গম অন্যান্য গম অপেক্ষা বড় ও ধারাল শূঁয়া বিশিষ্ট। ঐ শূঁয়া এরূপ ধারাল যে, তাহাতে পাখী বসিতে পারে না। এইরূপে গমের যে জাতি প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা পরীক্ষা দ্বারা উৎকৃষ্ট গুণবিশিষ্ট গম বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, এবং তাহাতে পক্ষীর উপদ্রব এককালে কমিয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশে বীজের বাছুনি ও তাহার রক্ষা বিষয়ে একেবারে যত্ন নাই, এরূপ নহে; তবে তদ্বিষয়ে যেরূপ যত্ন ও উদ্যোগ করা আবশ্যক, তাহা হয় না। অথচ কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে ঐ ব্যাপার একটী প্রধান ঘটনা।

পৌষ মাসে আলুগাছের পত্রকক্ষে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলু জন্মে, তাহা যত্নপূর্ব্বক রাখা হয়। ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে ঐ সকল আলু এবং মূলদেশে যে সকল আলু জন্মে, তাহার শেষ ভাঙ্গার কালে অর্থাৎ ফাল্গুন মাসের শেষ ভাগে বা মাঘ মাসের প্রথমে যখন সমস্ত আলু নিঃশেষ করিয়া তোলা হয়, তখন সেই আলুর মধ্যে যে গুলি ছোট ছোট, সে গুলিকেও বীজের মধ্যে রাখা হয়। যে আলুগুলি মাটীর বাহিরে পত্র কক্ষে জন্মে, তাহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বীজ। তাহাতে অনেক চক্ষু থাকে। তাহার রং প্রায় পত্রের ন্যায় হরিৎবর্ণ হয়। যে বীজের চক্ষু যত অধিক, তাহা হইতে তত বেশী অঙ্কুর নির্গত হয়। ঐ উভয় বিধ বীজ আলু কৃষকেরা বেত বা বাঁশের ঝুড়ী পূর্ণ করিয়া যে ঘরে রন্ধন ও অনাচার হয় না, সে ঘরের আড়ায় শিকা করিয়া ঝুলাইয়া কিম্বা বাঁশের মাচায় রাখে। এত যত্নে রাখিলেও উহার কতক অংশ শুকাইয়া বা পচিয়া নষ্ট হইয়া যায়। যাঁহারা আহারার্থ এককালে কিছু অধিক আলু সংগ্রহ করিয়া রাখেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, বর্ষার শেষ ভাগে সেই আলুর অধিকাংশ হইতে ফল বা অঙ্কুর নির্গত হয়। ঐ বীজ আলুরও ঐরূপ ফল বাহির হয়। তাহাতে বীজত্বের কোন হানি হয় না। কৃষকেরা যথা সময়ে ঐ বীজ ভূমিতে রোপণ করে। রোপণকালে অনেক বীজ আলুর ঐ অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া যায়। মাটীতে রোপণের পর পুনরায় সেই সঙ্গে চক্ষু হইতে অঙ্কুর বাহির হয়। এই সকল বীজকে কৃষকেরা ঝাড়াবীজ কহে।

আলুর বীজ সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিয়াই আলুর বীজের উপসংহার করা হইবে। এদেশের কৃষকেরা যে প্রণালীতে

আলুর বীজ প্রস্তুত ও রক্ষা করিয়া থাকেন, আমরা উপরে তাহাই বিবৃত করিলাম। কিন্তু আলুর বীজ প্রস্তুত করিবার জন্য দেশের কৃষকগণ যে পরিমাণে যত্ন ও কষ্ট স্বীকার করিয়া থাকে অথবা ঐ বীজ ক্রয় করিবার জন্য যত অধিক পরিমাণে অর্থ ব্যয় করিতে বাধ্য হয়, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রমবিজৃম্ভিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না; কারণ খাইবার জন্য যে বড় বড় ও পরিপুষ্ট আলু বাজারে বিক্রয় হয়, তাহা সুলভ মূল্যে ক্রয় করিয়া ও তাহাকে ৩।৪ খণ্ডে বিভক্ত করিয়া যথাকালে ক্ষেত্রে রোপণ করিলেই উৎকৃষ্ট বীজের কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। বিহার, আসাম, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানের কৃষকগণ ঐরূপে আলুর আবাদ করিয়া বিশিষ্টরূপে লাভবান্ হইতেছে। আলু একটা আস্ত রোপণ করা অপেক্ষা কাটিয়া রোপণ করায় উভয়তঃ লাভ আছে। প্রথমতঃ একটা আলুতে অনেক চক্ষু থাকাতে এককালে অনেক ফল বাহির হয়। ঐ সকল ফলের ২।৪ টাকে বিশিষ্টরূপে বলবান্ করিবার জন্য বাকী সমস্ত ফলগুলি নষ্ট করিতে হয়। ইহাতে বীজাংশে যেমন ক্ষতি, আবাদাংশেও তেমনি ক্ষতি হইয়া থাকে; কারণ যে সকল ফল নষ্ট করিতে হয়, তদ্দ্বারা বীজের অনেক শক্তি ক্ষয় হইয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ, বীজ আলু কাটিয়া রোপণ করিলে, এক এক খণ্ডে অল্পসংখ্য চক্ষু থাকায়, অঙ্কুর বা ফলও অল্পসংখ্য নির্গত হয় এবং তাহা নৈসর্গিক নিয়মে বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে। অল্পমূল্যে খাইবার আলু ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা যে, বীজের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার কথা লিখিত হইল, তাহার সত্যতা সম্বন্ধে এই প্রবন্ধলেখক প্রধান সাক্ষী। তিনি তাঁহার নিজের কৃষিক্ষেত্রে ঐরূপে আলু ও তাহার খণ্ড সকল বীজরূপে ব্যবহার করিয়া বিশেষ ফল পাইয়াছেন। অতএব এ দেশে যাঁহারা আলুর চাস আবাদ করিয়া থাকেন, আমরা ভরসা করি, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে ঐরূপ বীজ ব্যবহার করিবেন, তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্ষতি হইবে না। অধিকন্তু, আলুর বীজ তৈয়ারি অথবা তাহা ক্রয় করার ঝঞ্চাট হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন।

কার্ত্তিক মাসের বামাবোধিনীতে পৌষমাসের কৃষি বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে। তাহাতে তামাকের পাইট্ করিবার উপদেশ আছে। ঐ পাইট্ কিরূপ, এস্থলে তাহা বিবৃত করা যাইবে।

দোআঁশ মাটীর সমতল ক্ষেত্রে তামাকের চাস হইয়া থাকে। মাঘ মাস হইতে ভাদ্র আশ্বিন পর্য্যন্ত প্রায় ৮।৯ মাস কাল ভূমিতে পলি কিম্বা বোদ মাটী, অথবা গোবর, সোরা, লবণ, তৃণপত্রজাত সার, কিম্বা নীলের শিটি ইহার যে কোন ২।১টী সার দিয়া অনবরত চাস দ্বারা মাটীকে ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া রাখে। তাহার পর আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসে তামাকের চারা ভূমিতে রোপণ করে।

তামাকের চারা ভূমিতে এরূপ ভাবে রোপিত হইয়া থাকে যে, তাহাতে আবশ্যকমত লাঙ্গল চলিতে পারে। পৌষমাসে তামাকের ক্ষেত্রে সোজা সুঞ্জি, কোণা কোণি, ও আড়ভাবে নানা প্রকার লাঙ্গল দিতে হয় এবং অতি সাবধানে বারম্বার এরূপে ক্ষেত্র নিড়াইয়া দিতে হয় যেন তাহাতে একটীও তৃণ জন্মিতে না পারে। তামাকের ক্ষেত্রে যত দিন রস থাকে, ততদিন পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দিতে হয়। তামাকের গাছে ১০।১২টী পত্র হইলেই তাহার অগ্রভাগ এবং নিম্ন দেশস্থ ৩।৪টী পাতা ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। পত্রকক্ষে যে সকল পত্রমুকুল, বা কুসুম-মুকুল নির্গত হয়, তাহা প্রতি সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিতে হয়। যখন তামাকের পত্র ও মুকুল ভাঙ্গার কার্য্য চলিতে থাকে, তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গলের সীতা অর্থাৎ দাগ গুলি বুজাইয়া সমস্ত ভূমি সমান করিয়া দিতে হয়। তামাক পত্রের বৃদ্ধি-সম্ভাবনা থাকিতে থাকিতে যদি ভূমির মৃত্তিকা শুষ্ক হইয়া যায় এবং বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে ক্ষেত্রের অবস্থা বুঝিয়া ২।১ বার জল সিঞ্চন করিতে হয়। পত্রের রং কালো হইলে এবং পত্রের বৃদ্ধি স্তব্ধ বা রহিত হইলে, তখন ক্ষেত্রে কিছুমাত্র জলের প্রয়োজন থাকে না। তখন সমস্ত ক্ষেত্রে একবার এরূপে নিড়াইয়া দিতে হইবে যেন প্রত্যেক গাছের মূল শিকড়টী বাদে আর সমস্ত পাশ শিকড় কাটিয়া যায়। তাহাতে তামাকের পাতা উত্তম রূপে প্রস্তুত হয়। ইহাকেই তামাকের পাইট্ কহে। বর্ষের গতিকে এই পাইট্ করিতে কখন অল্পকাল, কখন অধিককাল আবশ্যক হইয়া থাকে।

তামাকের চাস, পাইট্ ও তামাক প্রস্তুতীকরণ, এই তিনটী বিষয়েই অনেক কার্য্য এবং কার্য্যগুলি বেশ জটিল কুটিল। পাইট্ ও প্রস্তুতী করণ এই দুইটী কার্য্যে অগ্রহায়ণের শেষ হইতে ফাল্গুনের শেষ পর্য্যন্ত আবশ্যক হয়। ঐ দুইটী কার্য্যের মধ্যে প্রথমটী পৌষ মাসে বলিলাম, দ্বিতীয়টী মাঘ মাসে বলিব।

রুষের জারের মৃত্যু উপলক্ষে।

ধন মান কিছুই না রবে।
কালের কবল হ'তে রক্ষা নাই কোন মতে,
সকলেই কালের অধীন,—
রাজা প্রজা ধনী দুঃখী দীন।

এ সংসার রঙ্গালয় হয় কত অভিনয়
বারেক না ভাবে মূঢ় মন—
যবনিকা হইবে পতন।
প্রভুত্ব সম্পদ বল যাবে সব রসাতল

কাল-চর্ব্বণেতে হবে চূর,
প্রমাণত রয়েছে প্রচুর।
মায়াতে জড়িত নর নশ্বর যে কলেবর
নিরন্তর হেরিছে নয়নে,
তবু ভোর সুখের স্বপনে।
এই যে রুষের জার' প্রবল প্রতাপ যার
অর্দ্ধেক ধরণীশ্বর যিনি!
ভেবে দেখ কোথা আজ তিনি?
লক্ষ লক্ষ সেনাগণে থাকিত যাহার সনে
প্রহরীস্বরূপ হায় হায়!
সে বীরত্ব রহিল কোথায়?
সে শরীর ধূলিসাৎ হইল যে অকস্মাৎ
বজ্রপাত 'জারিণার' * শিরে,
কার সাধ্য বারে নিয়তিরে?
শোকেতে মগন সবে চিরদিন নাহি রবে
আবার মাতিবে রাজ্য মদে,
দেখিয়াও শিখেনা বিপদে।
পদের গৌরব করি পরিণাম নাহি স্মরি
অভিমানে স্ফীত যেই জন,
কেবা ভ্রান্ত তাহার মতন?
এদশা দেখেও যার অসার যে এ সংসার
হেন জ্ঞান নাহয় উদয়,
ধিক্ ধিক্ ধিক্ সে হৃদয়!
বিষয় বাসনানল দহিতেছে অবিরল
তবুও চেতনাশূন্য সবে,
দিব্য জ্ঞান হবে আর কবে?
ষড়্‌রিপু-মহাবল কালকূট-হলাহল
পিয়াইছে সংসার-মদিরা,
সাধে কিগো হয় দীপ্তশিরা!

অধোগতি দিনে দিনে পরমার্থ চিন্তা বিনে
পাপেতে মলিন সদা মন,
করিতেছে কুপথে গমন।
জাগাইতে মূঢ় জীব সাধিতে অশেষ শিব
বিধি করেছেন ভগবান,
শমন থাকিবে বিদ্যমান,—
গুরু হয়ে দিবে শিক্ষা; 'মৃত্যুমন্ত্রে'লও দীক্ষা,
উপেক্ষা না কর জীবগণ,
কেন—শেষে করিবে ক্রন্দন?
রাজৈশ্বর্য্য পদমান সব হবে তিরোধান
ভূরি ভূরি রয়েছে প্রমাণ,
না হারাও নিজ পরিত্রাণ।
বিবেক বৈরাগ্য ব্রত পালন কর নিয়ত
সংসারের অনিত্যতা হেরি,
শুভ কাজে নাহি কর দেরি?
লাভ হবে ধর্ম্ম ধন, কর ব্রত উদ্‌যাপন,
আলস্যে না কাটাও সময়,
পলে পলে আয়ু হয় ক্ষয়।
কালে কি করিবে তার বাসনা নিবেছে যার
হইয়াছে বৈরাগ্য উদয়,
সেকি মোহে বদ্ধ কভু রয়?
শোনে সে বিবেক বাণী দিব্যজ্ঞানে মহাজ্ঞানী
মহাভাবে সদা নিমগন,
ভেঙ্গে গেছে মোহের স্বপন।
জীবন্মুক্ত জীব হয়ে নিত্য চিদানন্দালয়ে,
মাতোয়ারা নিত্য মহোৎসবে
দীনভাগ্যে সে দিন কি হবে?
কোথা রাজ-সিংহাসন দারাসুত পরিজন
দাস দাসী পারিষদ-গণ,
সব ফাঁকি মুদিলে নয়ন!

শ্রীচ—

* রুসিয়ার সম্রাট "জার," সম্রাজ্ঞী "জারিণা" এবং যুবরাজ "জারউইচ" বলিয়া বিখ্যাত।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

বিষ দোষ।

হুড়হুড়ের মূল, ৮৷১০টী গোলমরিচ সহ জলে পিষিয়া সেবন করাইলে সর্প বিষ নষ্ট হয়। ইহা সেবনের কিছুকাল পরে দষ্ট ব্যক্তিকে ফটকিরির জল পান করিতে দিবে। যদি তাহাতে বমি হয়, তাহা হইলে বিষের হ্রাস হয় নাই বুঝিতে হইবে; এবং পুনরায় ঐ মূল পূর্ব্ববৎ সেবন করাইতে হইবে। সর্প বিষের ইহা উৎকৃষ্ট প্রতি-বিষ।

সর্প বা উন্মত্ত শৃগালাদিতে দংশন করিলে, তৎক্ষণাৎ যদি অস্ত্রদ্বারা চিরিয়া দষ্ট স্থান হইতে রক্ত শোষণ করা যায়, তাহা হইলে অনেক স্থলেই ঔষধ প্রয়োগের আবশ্যকতা হয় না।

বিশুদ্ধ মুলতানি বনাত একটুকি কাঁঠালী কলার সহিত ভক্ষণ করিলে, অথবা প্রত্যহ কিছুদিন ধুতুরার মূল ২৷১ রতি পরিমাণে সেবন করিলে, উন্মত্ত শৃগালে ও কুক্কুর দংশনজনিত দোষ নিবারণ হয়। কলাইয়ের ডাল, মৎস্য ও শাক খাইতে নিষেধ।

আমরুল বাটিয়া খাইলে ছুঁচার বিষ যায়। মৌমাছি কামড়ান স্থানে কৃষ্ণ তুলসি পত্রের রস ও মধুর লেপ দিলে যন্ত্রণা নিবারণ হয়।

দষ্ট স্থানে পুনঃ পুনঃ তারপিন তৈল বা পাথরিয়া কয়লা লাগাইয়া দিলে, বৃশ্চিক, ভীমরুল, বোলতা ও মৌমাছির দংশনজনিত জ্বালা সত্বর নিবৃত্ত হয়। কর্পূরের ঘ্রাণ লইলেও বিষের জ্বালা নিবারণ হয়। ভিমরুল বা বৃশ্চিক দংশন স্থানে কাল কচুর আঠা মাখাইয়া দিলে, অথবা বকুল বিচি বাটিয়া দিলে তৎক্ষণাৎ জ্বালা নিবারণ হয়।

মাকড়সার গরলে কাঁচকলার আটা প্রত্যহ ৩৷৪ বার লাগাইলে ২৷৩ দিনে উপকার দর্শে।

কাঁচা হরিদ্রা, দুগ্ধে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলে গরল আরোগ্য হয়।

সর্পদষ্ট স্থানে কাষ্টকি উত্তমরূপে ঘসিয়া দিলে অত্যন্ত উপকার হয়। দষ্ট ব্যক্তিকে লঙ্কাপাতা খাওয়াইলেও উপকার হয়।

পুনর্নবা, প্রিয়ঙ্গু, টগরবৃক্ষ, শ্বেতবৃহতী, কুষ্মাণ্ড ও অপরাজিতা, ইহাদের মূল জলের সহিত বাটিয়া ঘৃত মিশাইতে হইবেক। যে ব্যক্তি সর্প দংশনে অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহার অঙ্গে লেপন করিয়া দিলে, সে ব্যক্তি নিশ্চয় আরোগ্য লাভ করে। সর্পে দংশন করিবামাত্র উষ্ণ ঘৃত পান করিলে কিম্বা দংশনের কিঞ্চিৎ উর্দ্ধভাগে তাগা বাঁধিলে আর বিষ বৃদ্ধি পাইতে পারে না।

কেলে কড়ার পাতা হুকার জলে বাটিয়া গরলের উপর মর্দ্দন করিলে ভয়ঙ্কর গরল রোগ হইলেও আরোগ্য হয়।

হিঙ্গু জলের সহিত গুলিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলেও বৃশ্চিক বিষ নষ্ট হয়।

পাথুরিয়া কলিচূণ চিতে সাপে চাটা স্থানে লাগাইয়া দিলে, বিষ উঠিয়া যায়।

শ্বেত করবীর শিকড় ৵০ আনা, শ্বেত জবাফুলের শিকড় ৵০ আনা ইসার মূল ৵০ আনা একত্রে বাটিয়া কাঁচা দুগ্ধের সহিত মিশাইয়া খাইলে, সাপে কাঁটা আরোগ্য হয়।

শ্বেত অপরাজিতার মূল ও দেধানের মূল একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য গ্রহণ করিলে কালদষ্ট ব্যক্তিও জীবিত হইয়া থাকে।

(রাখাল শশার মূল, শ্বেত পুনর্ণবা, কাকুঁড়লতার মূল, তালমূলী অথবা আপাঙ্গের মূল তণ্ডুলোদকের (চলুণির) সহিত ভক্ষণ করিলে সর্প বিষ বিনষ্ট হয়)

আকনাদির মূল তাহার রসে পেষণ করিয়া পান করিলে, কালকূট বিষ বিনষ্ট হয়।

অপরাজিতার মূল ঘৃতের সহিত পান করিলে চর্ম্মগত বিষ, দুগ্ধের সহিত পান করিলে রক্তগত বিষ, কুড় চূর্ণের সহিত পান করিলে মাংসগত বিষ, হরিদ্রার সহিত পান করিলে অস্থিগত বিষ, কাকোলীর সহিত পান করিলে মেদগত বিষ, পিপ্পলীর সহিত পান করিলে মজ্জাগত বিষ, এবং চাণ্ডালী (লতা বিশেষ) মূল চূর্ণের সহিত পান করিলে শুক্রগত বিষ নষ্ট হয়।

(শ্বেত আকন্দের মূল কিম্বা রক্তচিতার মূল ও ইন্দ্র গোপ কীট একত্র পেষণ করিয়া সর্প দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।)

আফুলা কাঁটা নটে গাছের শিকড়, বাসি হুঁকার জল ও হলুদ একত্র বাটিয়া গরলে লাগাইলে তিন দিবসে রোগ ভাল হয়।

৪ তোলা প্রমাণ তেঁতুল ও গৃহের ঝুল পুরাতন ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া এক সপ্তাহ লেহন করিলে ইন্দুরের বিষ নষ্ট করে।

সর্ষপ, কুঙ্কুম, তক্র ও ঘৃত, সমভাগে লইয়া পান করিলে তৎক্ষণাৎ মুষিক-দংশন-জনিত জ্বালা নিবারণ হইয়া থাকে।

ঘৃতকুমারীর পত্র সৈন্ধবলবণের সহিত পেষণ করিয়া উত্তপ্ত করত উন্মত্ত কুক্কুরে দষ্ট স্থানে বন্ধন করিয়া দিনত্রয় রাখিয়া দিবে, তাহাতে বিষপীড়া নিবারণ হয়।

গুড়, তৈল, ও আকন্দের দুগ্ধ একত্র পেষণ করিয়া দংশন স্থানে লেপন করিলে কুক্কুর দংশন জন্য বিষপীড়া নিবারণ হয়।

রক্ত নটিয়ার মূল ও তুলসীর মূল, চাউলের জলের সহিত পান করিলে কীট-দংশন জনিত বিষ দূর হয়।

করঞ্জাবীজ, শ্বেত সর্ষপ ও তিল একত্র

পেষণ করিয়া দষ্ট স্থানে প্রলেপ দিলে কীট দংশন জনিত বিষ দূর হয়।

নিম্ববৃক্ষের ও শমীবৃক্ষের ছাল একত্রে উষ্ণোদকের সহিত পেষণ করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে, ব্যাঘ্রাদির নখ ও দন্তবিষ নিবারিক হয়।

বৈইচ গাছের ছাল অর্দ্ধতোলা, তেলাকুচায় শিকড় অর্দ্ধ তোলা, একসঙ্গে বাটিয়া খেপা শিয়ালে কামড়ান রোগীকে খাওয়াইলে রোগী আরাম হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৮ সংখ্যা ২০৯ পৃষ্ঠার পর)

আলেয়া—আড়াঠেকা। *

গীতসার সংগ্রহ। নবীনচন্দ্র দত্ত কৃত গীত ও স্বরলিপি।

। ১। । +। । ৩। ৺
প প ধ সা ঋ ধ প
এ- স প্রাণ গৌ- রী, কে- ম

৺ ০। । ১। । +। ৺ ৺
ম গ ঋ ঋ গ প ম প
নে ছি লে মা- গো, মা- য়ে রি

৩। । ০। । ১। । +।
গ ঋ সা সা সা ম ম
পা- স রি উ- ত্তা- পে ঘে-

। ৩। । ০। । ১॥ +। । ৩।
প প ধ ধ সা ঋ ঋ সা নি
মে- ছে উ- মা, আ- হা- ম- রি ম-

। ০। । ১। । +। । ৩।
ধনি প প প ধ সা ঋ ধ
রি । এ স প্রাণ গৌ- রী, অ-

* অর্দ্ধ শব্দের বিকৃতি আড়। অর্দ্ধ দ্বি শব্দের অপভ্রংশে আড়াই হয়, সেই আড়াই হইতে আড়া হইয়াছে। যেখানে দুই মাত্রা ক্রমে প্রস্বন হইয়া পদ বিভাগ হয়, তথায় প্রত্যেক পদের প্রথম মাত্রা ত্যাগে দ্বিতীয় মাত্রায় তালি দিলে, তাহাকে আড়ে তালি দেওয়া কহে। কাওয়ালীর গান আড় করিয়া গাইলে আড়াঠেকার উদ্ভব হয়, অতএব আড়ারও মাত্রা সমষ্টি কাওয়ালীর ন্যায় ১৬টী হ্রস্ব বা ৮টী দীর্ঘ। মধ্যমানের এক ফের মধ্যে আড়া ছন্দের দুই ফের পাওয়া যায়। কাওয়ালীর সহিত ঢিমে তেতালার যে সম্বন্ধ, আড়ার সহিত মধ্যমানেরও সেই সম্বন্ধ। মধ্যমানের মাত্রা সমষ্টি ১৬টী দীর্ঘ কিম্বা ৩২টী হ্রস্ব মাত্রা। (গী, সু, সা,)। আড়া-ঠেকার ঠেকা যথা,—

৺ ১৺৺ । +। ৺ ৺ ৩৺৺ । ০।
ধিন তা ধিন্ ধিন্ তা ধিন ধিন্ তা তিন

। ।১। । ।। +।। । ।৩। । ।। ০।।
বা, তা ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ তা ধিন্ ধিন্ তা তিন

(ক্রমশঃ)

৺	৺	•।	।	১।	।	+।	৺	৺	৩।	।	০।
প	ম	গ	ঋ	ঋ	গ	প	ম	প	গ	ঋ	সা
স-	হ্য	শ-	রৎ	কা-	লে	হ-	ন	ত্রি	পু-	রা-	রি।

	।	১।	৺	৺	+।	।	৩।	।০।
	প	প	ধ	সা˙	ঋ.	সা˙	সা˙	সা.
(১ম বার)	শ্রা-	ন্তা	হ-	য়ে-	ছে	ত-	ন-	য়া,
(২য় বার)	কো-	থা	গে-	লে	গি-	রি	নি-	র্দ্দয়,
(৩য় বার)	কি	ক-	রি-	ব	পা-	গল	জা-	মাই,
(৪র্থ বার)	এ-	কি	সয়	মা-	য়ে-	র	প্রা-	ণে,

	।	১।	।	+।	।	৩।	। ০।
	ধ	নি	সা˙	ঋ০	সা˙	নি	ধ নিপ
(১ম)	ব্য-	জন	ক-	র	বি-	জ-	য়া,
(২য়)	ক্ষু-	ধারি	হ-	য়ে-	ছে	স-	ময়,
(৩য়)	অলং-	কার	দি-	যে	ছেন	ছা	ই,
(৪র্থ)	ক-	ন্যা	দে-	ওয়া	নি-	গু	ণে,

।	১॥	+।	।	৩।	।•।	।	১॥	+।	।	৩।	। •।
প	প	ম	ম	প	ধ	সা˙	ঋ˙	ঋ˙	সা˙	নি	ধ নিপ
আ-	ন	আ-	ন-	জ-	য়া,	আ-	ন	কো	লে	ক-	রি।
যা	তো-	মার	সা-	ধ্য	হয়,	আ-	ন	ত্ব	রা	ক-	রি।
ব-	স-	নের	বি-	ষয়	নাই,	এ-	ম-	ন	ভি-	খা-	রি।
কে-	বল	দি-	লাম	তোমা	ধনে,	কু-	লীন	দে	খে	ভা-	রি।

পারিবারিক সঙ্গীত।

সাধুচরিত।

চৈতন্য।

কীর্ত্তন।

প্রেমিক সন্ন্যাসী তিনি প্রেমের মহাজন। আচণ্ডালে নাম সুধা করেন বিতরণ। (প্রেম রসে বিভোর হয়ে হে)

বলিছে শ্রীমুখ দিয়া, নামে রুচি জীবে দয়া, দুই বাহু পসারিয়া করে আলিঙ্গন। (হরি বলে কোল দেয়রে, প্রেমে পাগল হয়ে) (ভেদাভেদ নাই তাররে, উচ্চ নীচ বলে) নাহি কোন শাস্ত্র বিধি, নাম মন্ত্র যপ যদি, পার হবে ভবনদী নামের গুণ এমন। (নাম যপে তরে গেলরে, মহাপাপী সবে) মধুরভাবে মধুর নব অনুরাগে চিদানন্দ রসপানে সদানন্দ মন। (প্রেম যোগের যোগিরাজ হে, ভক্ত শ্রীচৈতন্য)

কা, ঘোষ।

রাজা রামমোহন রায়।*

বাহার—মধ্যমান ঠেকা।

জানিনে কে ভূলোকে এসেছিলে, হে।

নইলে এতগুণ কি একাধারে, মনুষ্যে হইতে পারে, বিদ্যাতে সর্ব্বত্র পূজ্য কি জম্বু জলধি পারে;—পুরাণে শুনি একবার, হয়েছিল বেদউদ্ধার, কর্‌লে তার তত্ত্ব বিস্তার, এ কোন্ অবতারের লীলে।

ছিল জগৎ অন্ধকারে, উজ্জ্বল করিলে তারে, ব্রহ্মনামে ধরাধামে মাতিলে মাতাইলে;—হ'লে জ্ঞান কল্পতরু, উর্ব্বর করিলে মরু, ধন্য তুমি জগৎ-গুরু, প্রণমি সবে মিলে।

কি হিন্দু কি মুসলমান, কি বৌদ্ধ, কি খ্রীষ্টান, চরম ধরম তত্ত্ব বিচারে হারাইলে;—তোমার, নাম রাজা রাম মোহন রায়, চির দিন রবে ধরায়, বিলালে জ্ঞান ধন সর্ব্বত্র, পাত্র না-বিচারিলে।

শ্রীবিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

* সাংবৎসরিক উৎসব উপলক্ষে রচিত।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(৩৫৮ সংখ্যা-২২৪ পৃষ্ঠার পর)

রমণীগণের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, সংসারের কার্য্যকলাপ যাহাতে সুশৃঙ্খল হয় তাহার ব্যবস্থা করা। অবস্থা যাঁহার যেরূপই হউক না কেন, নারী যদি গৃহ কর্ম্মে সুশিক্ষিতা ও ধর্ম্মপরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে বন্য কুটীরও গৃহস্থ আলয় হইয়া উঠে এবং সেই জন্যই বোধ হয় "ন গৃহম্ গৃহমুচ্যতে গৃহিণী গৃহমুচ্যতে।" এই বাক্যের সৃষ্টি হইয়া থাকিবে। গৃহের জিনিষ পত্রাদি সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কাররূপে রক্ষা করা, যখন যে জিনিস আবশ্যক হয় তখন তাহা ঠিক স্থানে প্রাপ্ত হওয়া, গৃহপ্রাঙ্গন সুপরিষ্কৃত রাখা এবং প্রাতে ছড়াঝাঁট দেওয়া যাহাতে হয় তাহা করা বিশেষ আবশ্যক, কেন না সমস্ত দিবস ও রাত্রির প্রস্রাব, এঁটো ও বালক বালিকাগণের মলত্যাগাদির স্থান হইতে যে দুর্গন্ধ জন্মে, টাট্‌কা গোময় জলে উঠান প্রাঙ্গণ আস্তাকুঁড় ও পথাদিতে ছড়া দিলে সেই দুর্গন্ধ সকল বিনষ্ট হয়, (কিন্তু এখন আর গৃহিণীগণ এ সকল কার্য্যে মনোযোগ করেন না, বাবুদের বাবুগিরির ঢেউ অন্তঃপুরে লাগিয়াছে, তাই স্ত্রীগণের বাবুগিরি, বিলাসিতা, সৌখীনতা ও শ্রমকাতরতা দর্শন করিলে প্রাণে এক প্রকার হতাশার ছায়া পড়িয়া ক্ষোভ কালিমায় হৃদয় কলুষিত এবং জীবনটাকে অবসন্ন ও নিরুৎসাহ করিয়া ফেলে।) সন্ধ্যার সময় ঝি এক একটী আলো সকল ঘরে দিয়া গেল, আলো দিতে বিলম্ব হইলে 'ঝি! আলো দিয়া যা' এই চিৎকার গৃহিণীর চরম চেষ্টা হওয়া উচিত নহে, সন্ধ্যা হইলে ঘরে ঘরে প্রদীপ জ্বালা,

গন্ধক ও ধূনার ধূঁয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। গৃহে যদি মশক, আশুর্লা, চামচিকা প্রভৃতি থাকে, তাহা হইলে আলো ও ধোঁয়ায় তাহারা উত্ত্যক্ত হইয়া বাহির হইয়া যায় এবং গৃহের দূষিত বায়ু বিনষ্ট হয়। গৃহে রসুয়ে ও চাকর চাকরাণী রাখাই দোষের, একথা আমরা আবশ্যই বলিতেছি না; আপনার ন্যায্য খরচ চালাইয়া আত্মীয় স্বজনের ভরণ পোষণে কোনও কষ্ট না দিয়া, অতিথি ও দীন কাঙ্গালীকে তাহাদের প্রার্থিত এক মুষ্টি অন্ন প্রদান করিয়া, পারেন ত চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখুন, কিন্তু তাহারা স্ব স্ব কর্ত্তব্যে যদি অবহেলা ও অযত্ন করে, কিম্বা ফাঁকি দিবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে নিজেই গৃহকার্য্যাদি করা ভাল। অবশ্য অন্যান্য স্ত্রী পরিজনগণ গৃহ-কার্য্যে আপনার সাহায্য করিবেন। আর যদি গৃহধর্ম্ম পালনোপযোগী ব্যয় কুলাইয়া চাকর চাকরাণী ও রসুয়ে রাখিতে পারেন ও তাহারা আপনার ও পরিজনগণের মনোনীত হয়, তাহা হইলেও বসিয়া শুইয়া তাস খেলিয়া গল্প করিয়া বৃথা সময় নষ্ট করা নিতান্ত অনুচিত। বডি, কামীজ, সেমীজ, কম্ফর্টার তোয়ালে, গামোছা, দোপাট্টা, বিছানার চাদর, কার্পেটের জুতা, লেপ, তোষক গদি, উপাধান ও তাহার আবরণ এবং ছেলেদের পোষাক প্রভৃতি প্রস্তুত করা শিক্ষা করিয়া সেলাইয়ের কল, সুচি ও কাঁটা দ্বারা প্রস্তুত করিলে সংসারের অনেক খরচ বাঁচিয়া যায়। ঈশ্বর না করুন, রমণী বিধবা হইয়া দুরবস্থায় পড়িলে অর্থের নিতান্ত অভাব হইয়া পড়ে, সেই সময় নানাবিধ শিল্প কার্য্য দ্বারা রমণীগণ স্বচ্ছন্দে নিজ জীবিকার উপায় করিতে পারেন, একার্য্য অনিন্দিত ও হিন্দুশাস্ত্রানুমোদিত।* যাঁহারা রসুয়ে নহিলে জীবন ধারণ করিতে অসমর্থ অথবা প্রভূত অর্থ আছে বলিয়া রন্ধনের কষ্ট লইতে অস্বীকৃত, তাঁহাদের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা খাদ্য দ্রব্যাদির তত্ত্বাবধান করেন। বিড়ালে খাওয়া, কুক্কুরে খাওয়া, † কাকে ঠোকরান, মনুষ্যশূন্য ঘরে অধিকক্ষণ আলগা থাকা, খাদ্যের তাপ বাহির হইতে না পারিয়া ঢাকুনি ঘামিয়া পড়া জিনিষ, ডেয়ো পিপীলিকা লাগা ও অপরিষ্কার খাদ্য কি আত্মীয় পরিবার, কি অতিথি, কি চাকর চাকরাণী কাহাকেও খাইতে দেওয়া উচিত নহে। বিশুদ্ধ জল ও বায়ু মনুষ্যের জীবনের ও স্বাস্থ্যের বিশেষ প্রয়োজনীয়, সুতরাং ব্যবহারের জলটা যাহাতে সুপরিষ্কৃত হয়, তাহার চেষ্টা করা বিশেষ আবশ্যক। জল বিশুদ্ধ করার কয়েকটী সহজ উপায় আছে। (১) উচ্চ ছাদে পরিষ্কার গামলা বা জালা পাতিয়া রাখিলে যে বৃষ্টির জল

* "বিধায় প্রোষিতে বৃত্তিং জীবেচ্ছিল্পৈরমাশ্রিতা।
প্রোষিতে ত্ববিধায়ৈব জীবেচ্ছিল্পৈরগর্হিত ::।।"

† পূর্ব্বে কুক্কুর ঘরে গেলে হিন্দুগণ হাঁড়ি ও জলের কলসী ফেলিয়া দিতেন, কিন্তু অধুনা বিলাতী কুক্কুর গৃহস্থের একটী সখের বস্তু হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

পতিত হয় তাহা, বিশুদ্ধ জল। বৃষ্টি-কালে প্রাঙ্গণে চারিখানি খুঁটি পুঁতিয়া তাহাতে এক খানি কাপড় টাঙ্গাইয়া সেই কাপড়ের ঠিক মধ্যস্থলে একটী নুড়ি রাখিয়া দিবে এবং তাহার নীচে উচ্চ একখানি জলচৌকি বা টুলের উপর খড়ের বিড়া পাতিয়া তদুপরি কলসী বা গামলা বসাইয়া দিলে বিশুদ্ধ পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। কিন্তু এই জল অধিক দিন রাখিয়া ব্যবহার করা যায় না, কারণ অধিক দিন হইলে পোকা জন্মে। জলে প্রথম যখন পোকা জন্মে তখন সেগুলি এত ক্ষুদ্র যে চক্ষুর অগোচর—অণুবীক্ষণ ব্যতীত দেখা যায় না। সকল গৃহস্থের বাড়ীতে অণুবীক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু তবুও ঐ পোকা দেখিবার একটী সহজ উপায় আছে, সে উপায়টী এই,—নির্ব্বাত বা অল্প বায়ু যুক্ত স্থানে একটী পরিষ্কার কাচের গ্লাসে এক গ্লাস জল ঢালিয়া টেবিলের উপর অথবা কোন উচ্চ ও আলোক যুক্ত স্থানে রাখিয়া দিলে যখন জলটা বেশ স্থির হইবে, সেই সময় যদি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থ ঐ জলের উপর নীচে ভাসিয়া ভাসিয়া নড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে জানা যায় পোকা জলে জন্মিয়াছে। যদিও ঐ ক্ষুদ্র পোকা গুলি জলের ময়লার ন্যায় দেখায়, তথাপি বুঝিতে হইবে যে পাত্রস্থ জল স্থির হইলে ময়লা জলের নীচে পড়া সম্ভব, নীচে উপর নড়িয়া বেড়াইবে কেন? যখন জানা যাইবে যে জলে ঐরূপ পোকা জন্মিয়াছে তখন স্নান, পান ও রন্ধই করিবার জন্য আর সে জল ব্যবহার করিবে না। (২) জলে ফট্‌কিরি দিলে জল পরিষ্কার হয় এবং নিম্মলা ঘসিয়া দিলেও জল পরিষ্কার হয়। (৩) ফিল্টার—ফিল্টার ক্রয় করিবার সুবিধা না হইলে বাটীতে কাঠের বা বাঁশের ফ্রেমে জল ফিল্টার করিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিরূপে ইহাতে জল বিশুদ্ধ করা হয়, তাহা বোধ হয় এখন অনেক গৃহস্থই জানেন সুতরাং তাহা লেখা বাহুল্য। গৃহিণীর লেখা পড়া শিক্ষা করা আবশ্যক এ কথা আমরা পুর্ব্বেই বলিয়াছি, অত-এব নভেল নাটকের পরিবর্ত্তে 'শরীর পালন' 'স্বাস্থ্যরক্ষা' 'ধাত্রীশিক্ষা' এবং এ শ্রেণীর অন্যান্য পুস্তক গুলি মনো-যোগের সহিত গৃহিণীর পাঠ করিয়া যাহাতে পারিবারিক স্বাস্থ্য রক্ষা হয়, তাহার যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন ও ধাত্রীশিক্ষা লিখিত ঔষধ গুলি আনাইয়া গৃহে রাখিবেন। এইরূপে যাহা কিছু সংসারে আবশ্যকে লাগে, তাহা যত্নে সংগ্রহ করিবেন এবং যত্নের সহিত ও হৃষ্টান্তঃকরণে গৃহকার্য্য গুলি সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবেন এবং আয়োচিত ব্যয় করিবেন, হিন্দু শাস্ত্রকারগণও ইহাই রমণীর কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিয়া গিয়া-ছেন—যথা "সদা প্রহৃষ্টয়া ভাব্যং গৃহ-কার্য্যেষু দক্ষয়া। সুসংস্কৃতোপস্করয়া ব্যয়েচামুক্তহস্তয়া॥"

ঈশ্বরের নীচেই স্বামী রমণীগণের আরাধ্য ও প্রিয় হওয়া কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যধর্ম্ম-পালনের প্রধান সহায় স্বামী। স্ত্রী ও স্বামী উভয় মিলনের মহান উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। সেই ধর্ম্মচর্য্যার জন্য পবিত্র বিবাহ বন্ধন আবশ্যক। হিন্দুর বিবাহ যে কেবল মাত্র ধর্ম্মমূলক, তাহা "কুমার সম্ভব কাব্যে সপ্তম সর্গের 'বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ-বৎসে! বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী। শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্ত বিচারয়েতি॥" এই শ্লোকটী পাঠে জানা যায় এবং অন্যান্য প্রমাণও আছে কিন্তু তাহা উদ্ধৃত করিলে প্রবন্ধ বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। যাহাহউক "নারায়ণাৎ পরং কান্তং ধ্যায়তে সততং সতী। তদাজ্ঞা রহিতং কর্ম্ম নৈব কুর্য্যাৎ কদাচন॥" এই কথাটী স্মরণে রাখিয়া সর্ব্বদা স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা রমণীর কর্ত্তব্য। যে গৃহে স্বামী স্ত্রীতে সদ্ভাব নাই, সে গৃহ ত শ্মশানহইতেও ভীষণ, তাহাতে আবার গার্হস্থ্য ধর্ম্ম কিসের? পতি যদি অসচ্চরিত্র হয়েন তাহা হইলে তাঁহাকে ঘৃণা করা কখনও কর্ত্তব্য নহে, তাঁহাকে জগৎ ঘৃণা করে করুক, কিন্তু স্বামী কোন অবস্থায় পত্নীরঘৃণার পাত্র নহেন; অসচ্চরিত্র পতিকে সচ্চরিত্র করাই সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য, কেন না "সংস্মরন্তমপিপ্রেতং বিষমেষেক পাতিনম্। ভার্য্যৈবাস্বেতি ভর্ত্তারং সততং যা পতিব্রতা॥" ব্যালগ্রাহী যথা ব্যালং বিলাদুদ্ধরতে বলাৎ। তদ্বদ্ভর্ত্তারমাদায়-তেনৈব সহ মোদতে॥" স্বামীকে ভোজ্য, ভক্ষ্য, পেয়, সরল ব্যবহার, অকপট প্রণয় ও সুমিষ্ট বচন দ্বারা সর্ব্বদা সন্তুষ্ট করিবে এবং ঈশ্বরের নিকট তাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিবে; স্বামীর সুখ, নিজের সুখ, স্বামীর দুঃখ নিজের দুঃখ, স্বামীর নিন্দা নিজের নিন্দা ও স্বামীর মঙ্গল নিজের মঙ্গল বলিয়া মনে করিবে। নিজের জন্য পতিকে কখন কায়মনো-বাক্যেও ক্লেশ প্রদান করিবে না; পতি যাহাতে লোকসমাজে নিন্দনীয় হয়েন, তেমন কার্য্যে পতিকে নিযুক্ত করিবে না; পতির সৎকার্য্যের সহকারিণী হইবে; অকারণে সর্ব্বদা নিজের নিকট আবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার সমুচিত চিন্তাশীলতা ও কর্ত্তব্যপরায়ণাতর ব্যাঘাত জন্মাইবে না; নিজে সর্ব্বদাই পতিধ্যান, পতি জ্ঞান, পতি ভালবাসা হৃদয়ে জাগরুক রাখিবে; কিন্তু পতি যাহাতে স্বীয় কর্ত্তব্যগুলি যত-নের সহিত পালন করিয়া অবসর মত তোমাকে ভাল বাসেন তাহার চেষ্টা করিবে। বিখ্যাত শ্রদ্ধেয় কবি বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার "রাজা ও রাণী" তে এবিষয়ে দুইটী স্ত্রী চরিত্র অতি সুন্দর অঙ্কিত করিয়াছেন, ঐ দুই স্ত্রী চরিত্র হিন্দু রমণীগণের অবশ্য অনুকরণীয়। ইলা একস্থলে কুমারকে বলিতেছেন—"আমি দিবানিশি তোমায় ভালবাসিব, তুমি অবসর মত বাসিও; আমি সারা নিশি তোমার লাগিয়া হেথায় বসিয়া রহিব, তুমি অবসর মতে আসিও।" হেথায় বসিয়া থাকার অর্থ হৃদয় সর্ব্বক্ষণ

তবধ্যানে নিমগ্ন থাকিবে। এইরূপ পতিভক্তিই—প্রকৃত পতিভক্তি, ইহাই প্রকৃত পতিব্রতার ধর্ম্ম। পুরুষের সংসারে অনেক কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিয়া—দশদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সংসার পথে বিচরণ করিলে, "দশ দশা" বহিবার জন্য মস্তক পাতিয়া থাকিলে তবে ত পৌরুষ! কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে সর্ব্বদা রমণীর অঞ্চল ধরিয়া বসিয়া থাকিলে, চিন্তাকে স্বাধীনভাবে চারিদিকে বিচরণ করিতে না দিলে, বিশ্বে প্রেম বিস্তৃত করিতে না দিলে তিনিত স্ত্রৈণ নামে অভিহিত হইবেনই। আরও তাঁহার মাতাকে পুত্রপ্রসবিনী না বলিয়া মাংস-পিণ্ড প্রসবিনী অথবা বন্ধ্যা বলিলেও ক্ষোভ মিটিবে না—সুতরাং স্বামীকে নাক-ফোঁড়া বলদ না করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্যের সহায়তা করা ও কর্ত্তব্য কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া রমণীর কর্ত্তব্য। উক্ত গ্রন্থের নায়িকা রাণী সুমিত্রার স্বামী রাজা বিক্রম দেব স্ত্রৈণ্যতা পরবশ হইয়া যখন স্বীয় কর্ত্তব্য রাজ্যপালন পরি ত্যাগ করিয়া দিবানিশি অন্তঃপুরে অব-স্থান করিতেন, তখন রাণী সুমিত্রা বড়ই ব্যথিতহৃদয় হইতেন। বাস্তবিক সংসা-রের প্রিয়তম বস্তুতে কোনও খুঁৎ আছে জানিতে পারিলে প্রাণে বড়ই বেদনা অনুভূত হয় এবং সেই খুঁৎ নিখুঁৎ করিবার জন্য প্রাণ ব্যগ্র হইয়া উঠে। তাই রাণী সুমিত্রা রাজা বিক্রম দেবকে তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—রাজ্যে অরাজকতাজনিত অনাচারী ও অত্যা-চার প্রপীড়িত প্রজাগণের হাহাকার ধ্বনি রাজার কর্ণগোচর করিয়া তাঁহার কর্ত্তব্য রাজ্য সুপালনের কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন—কিন্তু কিছুতেই কর্ত্তব্যপালনে উদাসীন, স্ত্রৈণ রাজার জ্ঞানোদয় হইল না, বরং উহাতে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। তখন সুমিত্রা দেবী মনে ভাবিলেন যে তিনি কিছুদিনের জন্য স্থানান্তরিত না হইলে রাজা স্বকর্ম্মে মনোযোগ দিবেন না। এই ভাবিয়া তিনি গোপনে ছদ্মবেশে পিতৃভবনে গমন করিলেন। ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে সুমিত্রা স্বামীকে ভাল বাসিতেন না, সুমিত্রার ভালবাসা সাধারণ রমণীগণের ভালবাসা অপেক্ষা অনেক উচ্চ, সুমিত্রা পতি বিরহিতা হইয়া পতির বিরাগভাজন হইবার ভয় না করিয়া স্বামীকে কর্ত্তব্য পথে লইবার জন্য পাগল! এইরূপ কার্য্যই প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর কর্ত্তব্য এবং স্বামীর কর্ত্তব্যপথের কন্টক হওয়া কখনই সহ-ধর্ম্মিণীর উচিত নহে। কু, রা।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। অষ্ট্রীয়ার সম্রাজ্ঞী ভারত ভ্রমণে ইচ্ছা করিয়াছেন।

২। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ দানশীলা শ্রীযুক্তা বাই দীনবাই বোম্বেতে একটী টাউনহল ও একটী পুস্তকালয় স্থাপনের জন্য ৭ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট বাটী নির্ম্মাণের জন্য জমি দিবেন।

৩। মহারাণী ভারতেশ্বরী মুন্সী আবদুল করিমকে বড়ই ভাল বাসেন। ইঁহার নিকটেই তিনি হিন্দীভাষা শিক্ষা করিয়াছেন। সে দিন মহারাণী যুবরাজকে সঙ্গে করিয়া মুন্সী আবদুল করিমের বাটীতে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন।

৪। পৃথিবীতে সাড়ে এগার কোটী লোক ইংরাজীতে কথা কহিয়া থাকে। পৃথিবীতে প্রতি বৎসর প্রায় ১৮ হাজার লোক আত্মহত্যা করে ও দশ লক্ষ অন্ধ আছে।

৫। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ডিউক অব এডিনবর্গ জন্মাইলে রেজেষ্টারি আফিসে খবর দিতে ভুলিয়া যান। ছয় সপ্তাহের পর এই ভ্রম ধরা পড়ে, তখন জন্মের তারিখ রেজেষ্টরি না করার জন্য ৭ শিলিঙ ৪ পেন্স জরিমানা হইয়াছিল।

৬। রুসের মেমাচিন সহরে কেবল পুরুষদিগের বসবাস, একটীও স্ত্রীলোক নাই। পৃথিবীর আর কোনও স্থলে এরূপ রমণীশূন্য নগর নাই।

৭। প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক এডিসন সাহেব বিদ্যুতের সাহায্যে এমন এক যন্ত্র প্রস্তুত করিয়াছেন যে, তাহাতে মনুষ্যের অঙ্গচালনা ঠিক রক্ষিত হইবে। ফনোগ্রাফে যেমন মানুষের কথা ধরিয়া রাখা হয়, এই যন্ত্রে সেইরূপ অঙ্গচালনা ও নৃত্য ধরিয়া রাখা যাইবে। যন্ত্রের নাম হইয়াছে 'ফিনোটেস্কোপ।'

৮। চিন-জাপানী যুদ্ধে চিনেরা সন্ধি স্থাপনে ব্যস্ত হইয়াছে, কিন্তু জাপানীরা জয়োল্লাসে উন্মত্ত হইয়া আরও যুদ্ধ চালাইতে অগ্রসর। সম্প্রতি তাহারা মেটিনলিং আক্রমণ করিতে গিয়া চিন সৈন্য কর্তৃক পরাভূত ও বিতাড়িত হইয়াছে।

৯। ঘোরতর যুদ্ধের পর জাপানীরা আর্থর বন্দর অধিকার করিয়াছে। চীন দূত জাপানে সন্ধি প্রস্তাব লইয়া যান। জাপানীরা সমুদায় যুদ্ধের ব্যয় ছাড়া প্রায় শতকোটী মুদ্রা চাহিতেছে

১০। জাপানের নারীগণ রণোৎসাহে উন্মত্ত হইয়াছে। এক দল স্ত্রীলোক জাপান সম্রাট্ মিকাডোর নিকট চিনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার প্রার্থিনী হয়। সম্রাট তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিয়া আহত যোদ্ধাদিগের শুশ্রূষা করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

১১। রাজকুমারী আলিক্সের (আলেকজান্দ্রা ফিওডোভ্না) সহিত নব রুশীয় সম্রাট্ নিকোলাসের শুভবিবাহ শীত প্রাসাদের নিভৃত ধর্ম্মমন্দিরে বিনাড়ম্বরে সম্পন্ন হইয়াছে। সম্রাট এই শুভানুষ্ঠানের স্মরণার্থ এক ঘোষণা পত্র প্রচার করিয়া দীন দরিদ্র ও কারাবাসীদিগের প্রতি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করিয়াছেন।

১২। রাজপ্রতিনিধি লর্ড এলগিন অমৃতসরের শিখদিগের স্বর্ণমন্দির দর্শনে গমন করিয়া ১০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১৩। জর্ম্মণ ভীষ্মদেব প্রিন্স বিসমার্ক বৃদ্ধবয়সে স্ত্রীহীন হইয়াছেন।

১৪। ইংলণ্ডেশ্বরী নব জারকে রাজকীয় স্কট গ্রে সৈন্যের কর্ণেল পদ দিয়াছেন। ইংলণ্ডের যুবরাজও রুসিয়েশ্বর কর্ত্তৃক এইরূপ সম্মানিত হইয়াছেন।

১৫। কুমারী কর্ণিলিয়া সোরাবজী একটী পারসী যুবতী। বিলাত হইতে বারিষ্টার হইয়া বরদারাজ্যে ওকালতী করিবার অনুমতি পাইয়াছেন। ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম স্ত্রী-বারিষ্টার।

১৬। দক্ষিণ আমেরিকার পাটাগোনিয়াবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘাকৃতি এবং লাপলণ্ডবাসীরা সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি। তথাপি অন্যজাতির মধ্যে এক একটী অদ্ভুত মনুষ্য দেখা যায়। স্কটলণ্ডের ফনাম নামক এক সাহেব দীর্ঘে ১১॥ ফুট, তাঁহার মত দীর্ঘাকার মনুষ্য পৃথিবীতে দৃষ্টিগোচর হয় না। আর হলণ্ডের ১৮ বর্ষীয় এক যুবতী দীর্ঘে ২০ বুরুল মাত্র, ইহাঁর মত ক্ষুদ্রাকারও বোধ হয় আর নাই।

১৬। সাবিত্রী লাইব্রেরীর ১৪শ সাংবৎসরিক অধিবেশন সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। রাজা প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায় সভাপতির কার্য্য করেন এবং বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এম এ "বাঙ্গালার অভাব ও অবস্থা" বিষয়ে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই পুস্তকালয়ের দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

বামা রচনা।

নিরাকাঙ্ক্ষী।

কি চাহিব প্রিয়তম,
এ মর-হৃদয়ে মম,
কামনা, বাসনা, সাধ, কিবা অপূরণ ?—
দাসীরে দয়াল বিধি
দিতেছেন যেই নিধি,
স্বরগ মরতে প্রভো, কি আছে তেমন ?

চাহি না, রক্তিম ছবি,
উষার বালক রবি,
শারদ সন্ধ্যার শশী রজত বরণ;
চাহি না তারকা কুল,
প্রকৃতির হীরা ফুল,
চাহিনা, বাসব ধনু, বসুধা গগণ।

চাহিনা বাসন্ত বায়,
অমিয়া ছড়ায়ে যায়,
সুকণ্ঠ দোয়েল-কণ্ঠে মধুমাখা গান;
চাহিনা কুসুম-রাণী
আধেক ঘোমটা টানি,
দেখায় সে হাসি-মাখা, আধেক বয়ান!

৪

চাহিনা বকুল-তলে,
প্রজাপতি দলে দলে,
সাটিন পোষাক পরি, বেড়ায় নাচিয়া;
চাহিনা শুনিতে সুখে,
শ্যাম ভ্রমরের মুখে,
বসন্ত বাহারে বীণা উঠিছে বাজিয়া।

৫

চাহিনা সুমেরু-গা'য়
স্বর্ণ গঙ্গা বহি যায়,
দ্রবীভূত হেম স্রোতঃ স্বর্গ হ'তে আসে,
চাহিনা, তাহার পরে
দেখি চারু শশধরে!—
বসি সে সুবর্ণ শৈলে চন্দন বাতাসে!

৬

চাহিনা নন্দন বনে
দেবের বালিকা সনে,
বসিয়া মন্দার-ছায় গাঁথি ফুলমালা;
সেথা মন্দাকিনী-জলে
স্ফুট স্বর্ণ শতদলে,
চাহিনা করিতে খেলা মিলি সুরবালা!

৭

চাহিনা, করিনা আশ,
অলকা অমরা বাস,
যক্ষের ভাণ্ডারে যত অমূল্য রতন;
রাজ্য কিবা মহারাজ্য,
নাহিক আমার কার্য্য,
ধন মান যশে মম কিবা প্রয়োজন?

৮

কি চাহিব, সবি তুচ্ছ—
তুমিই মহান্, উচ্চ,
তোমা বিনা ছাই ভস্ম কি করিব আশা—
তুমি দেব, প্রাণারাম,
স্মরণে সফল কাম,
তব স্মৃতি কোটী স্বর্গ, অমর-পিপাসা!

৯

যে ক'দিন বেঁচে থাকি,
যেন গো তোমারে ডাকি,
যোগী যথা যোগীশেরে করে আরাধনা;
দিয়ে শত অশ্রুজল,
ভিজায়ে ও পদতল,
মিটাই মনের সাধ, প্রাণের কামনা!

১০

বল তবে প্রিয়তম,
কে সুভগা মম সম,
কার তুমি মতি গতি ধ্যান ও ধারণা?—
এত সুখে ভ'রে হৃদি,
কারে দিয়াছেন বিধি,
কে,ও'রাজ্য একেশ্বরী—অনন্যপ্রধানা?

শ্রীকাব্যকুসুমাঞ্জলিরচয়িত্রী।

স্বর্গ।

১

স্বরগ স্বরগ নাম শুনি সর্ব্বক্ষণ।
কোথায় স্বরগ ধাম, স্বরগ কাহার নাম,
ভেবেছি করিব আমি তাহার বর্ণন॥

২

পুণ্যাত্মা জনের পুণ্যময় হৃদিতল
বহে যথা নিরমল ধর্ম্মনীর সুশীতল,
প্লাবিত করিয়া ধরা, সেই স্বর্গ স্থল॥

৩

বহে যথা নিরন্তর ধর্ম্মের সুবাস
চির দিন যার গুণে, চিরসুখী সর্ব্বজনে,
শান্তিতে বিধৌত সদা যাহার আবাস।

৪

সেই স্বর্গ ধাম ভবে সেই স্বর্গ ধাম,
পাপ সঙ্গ পরিহরি চল মন ত্বরা করি,
পবিত্র স্বরগ রাজ্যে লভিতে বিশ্রাম॥

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্তা।

// বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬০ সংখ্যা | পৌষ ১৩০১—জানুয়ারি ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

রাজধানীর শুভযোগ—রাজ-প্রতিনিধি লর্ড এলগিন সপরিবারে ও সদলে পুনরায় কলিকাতায় প্রত্যাগত হইয়াছেন। ছোট লাটও সদলে আসিয়াছেন। ত্রিপুরা, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যের রাজারাও এখানে শুভাগমন করিয়া নগরের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন। জয়পুর, যোধপুর, কর্পূরতলা, পদুকোটা প্রভৃতির মহারাজগণেরও আগমনের সম্ভাবনা।

জাতীয় মহাসভা—বিলাত হইতে পার্লেমেণ্ট সভ্য মেঃ ওয়েব এম, পি এবং ভারতের নানাস্থানীয় প্রতিনিধিগণ মান্দ্রাজে উপনীত হইয়াছেন। ওয়েব সাহেব সভাপতির কার্য্য করিবেন, পথে বোম্বাইয়ে তাঁহার জাঁকাল অভ্যর্থনা হইয়াছে।

নারিকেলে মুক্তা—বিলাতের ডাক্তার মরিস বলেন ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের নারিকেলের জলে বহুমূল্য মুক্তা জন্মে। ঝিনুকের ন্যায় নারিকেলও কি স্বাতীনক্ষত্রের জল পান করে?

ক্ষুদ্রতম পক্ষী—বামাবোধিনীতে হমিং বা গুণ গুণ পক্ষীর বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, ইহা পক্ষিজাতির মধ্যে ক্ষুদ্রতম। এক একটী ওজনে ৵৹ আনাও হইয়া থাকে।

মহৎলোকের মৃত্যু—সুয়েজ-খালের প্রসিদ্ধ খননকর্ত্তা ফার্ডিনেণ্ড লিসেপ্‌স্ ৮৯ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন। শেষ অবস্থায় তাঁহার বড় দুঃখ দুর্গতি গিয়াছে। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার শান্তি বিধান করুন্।

ইটালীর ভূমিকম্প—এই ভূমি-

কম্পে শত শত লোকের মৃত্যু, অনেক অট্টালিকা ভগ্ন এবং অনেক সম্পত্তি নষ্ট হইয়াছে। একটী গির্জ্জায় উপাসনা হইতেছিল, গৃহটী পড়িয়া গিয়া অধিকাংশ লোক হত হয়।

চিন জাপানী যুদ্ধ—জাপানীরা পোর্ট আর্থর জয়ের পর টাকুবকুজো এবং হে চেং অধিকার করিয়াছে। চিনেরা ক্রমাগত হারিতেছে ও হঠিতেছে। চিনদূত সন্ধিপ্রস্তাব লইয়া জাপান সম্রাটের নিকট গিয়াছেন।

ভারত চিকিৎসা সভা—গত ২৪ এ ডিসেম্বর সেণ্ট জেভিয়ার কলেজ গৃহে ইণ্ডিয়ান মেডিকাল কনগ্রেসের অধিবেশন হইয়াছিল, নানা দেশ বিদেশ হইতে প্রতিনিধি ডাক্তার সকল উপস্থিত হইয়া বক্তৃতা করিয়াছেন।

আলেকজণ্ডার এবং আফ্রিকার কোন প্রদেশীয় অধিপতি।

আজ কাল সভ্যতার জন্য অনেকেই পাগল, কিন্তু চৈতন্য, বুদ্ধ, রামপ্রসাদ প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মের পাগল আর দেখা যায় না। ধর্ম্ম সভ্যতার ভানমাখান, কপট গাম্ভীর্য্যপূর্ণ, গণিয়া গণিয়া কথা বলার মধ্যে বড় একটা মিশিতে চাহেন না। ধর্ম্ম কেবল লেখনীনিঃসৃত বা মুখনিঃসৃত "দয়া" "প্রেমের" নিকটও তিষ্ঠিতে পারেন না। তিনি রাজনীতির, সমরনীতির, অর্থনীতির ও সমাজনীতি প্রভৃতির কূটতর্কেরও বাধ্য নহেন। ধর্ম্ম নিজে সরল, চাহেন সারল্য, ইহার প্রমাণস্বরূপ আজ আমরা একটী সভ্য দিগ্বিজয়ী অধিপতি ও একটী অসভ্য রণানভিজ্ঞ শান্তিপ্রিয় নৃপতির বিষয় পাঠিকা ভগিনীগণকে উপহার দিতেছি।

যে সময় মহাবীর আলেকজাণ্ডার দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে তিনি একদিন জয়োল্লাসে তাঁহার বিজয়ী সৈন্যগণের সহিত আফ্রিকার কোনও অসভ্য দেশের মধ্যে উপস্থিত হইলেন। ঐ স্থানবাসী লোকেরা অতিশয় শান্তিপ্রিয় এবং পত্রকুটিরে বাস করিত। ইহারা কখনও যুদ্ধ বা জেতা বিজেতা কাহাকে বলে তাহা জানিত না। আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে উপস্থিত হইলে এই দেশবাসীরা তাঁহাকে সমাদরপূর্ব্বক রাজার নিকট লইয়া গেল। আফ্রিকা অধিপতি নূতন অতিথিকে সাদরে গ্রহণ করিলেন ও তাঁহাকে উপযুক্ত আসনে উপবেশন করাইলেন; এদিকে অতিথি সৎকারের জন্য খাদ্যাদিরও আয়োজন চলিতে লাগিল। যথাসময়ে আলেকজাণ্ডারের সম্মুখে প্রচুর খাদ্যবস্তু রক্ষিত হইল, ঐ খাদ্য

আর কিছুই নহে, সোণার রুটী, ফল ও মাংস ইত্যাদি। ঐরূপ অদ্ভুত খাদ্য-দর্শনে আলেকজাণ্ডার সবিস্ময়ে বলিলেন "আপনার দেশে কি স্বর্ণ ভক্ষিত হইয়া থাকে?"

আফ্রিকার বর্ব্বররাজ বলিলেন, "আমি তাহাই বিবেচনা করি, কারণ যখন আপনাদের দেশে প্রচুর খাদ্য দ্রব্য আছে, তখন আপনি কি জন্য এই সুদূর প্রদেশে আগমন করিয়াছেন?"

আ। আপনার এই স্বর্ণরাশির লোভে আমি এখানে আসি নাই, আপনাদের রীতিনীতি জানিবার নিমিত্ত এই সুদূর প্রদেশে আসিয়াছি।

সুচতুর আলেকজাণ্ডারের বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিপতি বলিলেন, "আচ্ছা, তাহাই হউক, আপনার যতদিন ইচ্ছা আমাদের মধ্যে বাস করুন্।"

ইহাঁদের এই সমস্ত কথোপকথন সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে দুইটী নগরবাসী বিচারপ্রার্থী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন। বাদী বলিলেন, "আমি প্রতিবাদীর নিকট হইতে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছি। ঐ জমীতে আমি নালা খনন করিতে গিয়া অনেক অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। ঐ অর্থ রাশি আমার নয়, আমি কেবল জমী খরিদ করিয়াছি মাত্র, উহাতে যে গুপ্ত অর্থ ছিল তাহাত আমি খরিদ করি নাই। তথাপি ঐ জমীর পূর্ব্বাধিকারী যিনি প্রতিবাদী, তাঁহাকে বিস্তর অনুনয় বিনয় করাতেও তিনি ঐ অর্থ গ্রহণ করিতেছেন না।" প্রতিবাদী বলিলেন, "আমি ভরসা করি আমার দেশীয় ভ্রাতৃগণের ন্যায় আমারও বুদ্ধি ও ধর্ম্মজ্ঞান আছে, আমি বাদীর নিকট জমীর সমুদয় স্বত্ব বিক্রয় করিয়াছি, সুতরাং ঐ অর্থ এখন বাদীর।"

এই দেশের অধিপতিই প্রধান বিচারক। তিনি এই সকল কথা আনুপূর্ব্বিক শ্রবণ করিলেন। যাহাতে তাঁহার বিচারে বিন্দুমাত্র দোষস্পর্শ না হয়, তিনি সেজন্য বিশেষ চিন্তা করিয়া তৎপরে প্রতিবাদীকে বলিলেন, "ভরসা করি আপনারও পুত্র সন্তান আছে।"

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

বিচারক তৎপরে বাদীকে বলিলেন, "আপনার কন্যা সন্তান আছে?"

বা। আজ্ঞা, হাঁ।

অধিপতি বলিলেন "তাহা হইলে প্রতিবাদীর পুত্রের সহিত বাদীর কন্যার বিবাহ দেওয়া হউক এবং সেই নব-দম্পতীকে ঐ অর্থ যৌতুকস্বরূপ প্রদান করা হউক।"

এই ঘটনায় আলেকজাণ্ডারকে আশ্চর্য্যান্বিত এবং বিস্ময়াবিষ্টের ন্যায় দর্শন করিয়া অধিপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিচার কি অন্যায় হইয়াছে?"

আ। না মহাশয়! আপনার বিচারে আমি চমৎকৃত হইয়াছি।

অ। যদি আপনার দেশে এইরূপ ঘটনা ঘটিত, তাহা হইলে কিরূপ বিচার করিতেন?

আ। সত্য বলিতে কি, আমরা বাদী প্রতিবাদী উভয়কে আবদ্ধ রাখিয়া ঐ অর্থ রাজ-ভাণ্ডারে রক্ষা করিতাম এবং ঐ অর্থ রাজারই ব্যবহার্য্য হইত।

আলেকজাণ্ডারের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অধিপতি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, "কি. রাজার ব্যবহার্য্য! সূর্য্য কি সেই দেশে কিরণ প্রদান করিয়া থাকেন?

আ। হাঁ।

অ। সে দেশে বৃষ্টি হয়?

আ। নিশ্চয়ই।

অ। খুব আশ্চর্য্যের বিষয়। আচ্ছা, সে দেশে গৃহ পালিত পশু আছে, যাহারা তৃণ ঘাস দ্বারা জীবন ধারণ করে?

আ। বহুসংখ্যক এবং নানাবিধ।

অ। কারণ বুঝিয়াছি, জগদীশ্বর ঐ সকল নিরীহ পশুগণের খাতিরে সূর্য্যকে কিরণ এবং মেঘকে জলবর্ষণ করিতে দিতেছেন।

পাঠিকা ভগিনীগণ! আলেকজাণ্ডারের সভ্যতা ভাল, কি অসভ্য আফ্রিকা অধিপতির সরল ধর্ম্মবিশ্বাস ভাল এবং উক্ত দেশ স্বর্গ কি মর্ত্ত্য এবং উক্ত দেশবাসিগণ দেবতা কি মানব? আপনারা তাহার মীমাংসা করুন, আমি অদ্য বিদায় গ্রহণ করিলাম। কু, রা।

মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনায় সন্তানের মুক্তি।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৩৯ পৃষ্ঠার পর)

এইরূপে মাতৃ-ভক্ত মাতৃ-উপাসক সন্তানের ভক্তি-বৃত্তি যখন পূর্ণ বিকাস পাইতে থাকে, তখনই ভক্তির তৃতীয় বা চরম অবস্থা উপস্থিত হয়। হিন্দু শাস্ত্রে লিখিত আছে "যদ্দারা পরমাত্মার সহিত মনের একতা সাধিত হয়, তাহাই ভক্তিযোগ।" আমরা ইহাকেই ভক্তির তৃতীয় অবস্থা বলিতেছি। মাতৃভক্ত সন্তানের পক্ষে মাতৃত্বের সহিত মনের একতা সাধনেই ভক্তির সম্পূর্ণতা। মাতৃত্বের সহিত মনের ঐক্য করিতে হইলে মাতৃত্বের আদর্শে সন্তানের আত্মগঠন করিতে হয়; মাতার সদ্গুণ সকল গ্রহণ করিতে হয়। এই ভক্তিভাবে মাতৃত্বসাধনা অর্থাৎ মাতার সদ্গুণের মহত্ব বুঝিয়া তাহা অভ্যাস করাই শেষ মাতৃউপাসনা। ইহাতেই সন্তান মাতার দেবভাব স্পষ্ট দেখিতে পান। ইহাই ভক্তির শেষ সীমা, উপাসনার শেষ সীম— মাতৃভক্তিরও শেষ সীমা! উপাস্য দেবতার মত সম্পূর্ণ হও, এই শিক্ষাই শিক্ষা! আর্য্য ঋষিগণ বেদ উপনিষদে, গীতা ভাগবতে, এই শিক্ষাই দিয়াছেন। নরদেবতা যীশুখ্রীষ্ট এই

শিক্ষাই দিয়াছেন। চৈতন্য, নিত্যানন্দ, নরদেবতারাও এই শিক্ষাই দিয়াছেন। ব্রাহ্ম সম্প্রদায় এই শিক্ষাই দিতেছেন; নব্য হিন্দু সম্প্রদায়ের মুখোজ্জ্বলকারী মহাত্মা বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার "কৃষ্ণ-চরিত্র" গ্রন্থে এই শিক্ষাই দিয়াছেন। মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতেও সন্তানকে এই শিক্ষায় প্রবর্ত্তিত করে। মাতৃ-ভক্তির উচ্ছ্বাসে সন্তান যদি ব্রহ্মভাবে তন্ময় হইয়া মাতৃ-উপাসনায় মাতৃত্বের আদর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ করিতে পারেন, তাহা হইলেই সন্তানের দেবত্ব লাভ হয়, সন্তানত্ব সার্থক হয়, মাতৃ-ভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি লাভ হয়।

এইখানে একটী কথা আছে, কথা এই যে এ জগতে সাধারণ মনুষ্যজীবন অসম্পূর্ণ; শিক্ষা ও সাহায্য অভাবে সাধারণ বঙ্গমহিলার জীবন আরও অসম্পূর্ণ; অথচ এ দেশে বঙ্গমহিলারাই সন্তানের মাতা। জগতে দেবচরিত্রই মানব শিক্ষার পূর্ণ আদর্শ, তদভাবে দেবতুল্য চরিত্রবান্ মানবই মনুষ্যত্বের আদর্শ। এরূপ স্থলে বঙ্গমহিলাদিগের সন্তানগণ মাতৃ-চরিত্র আদর্শে আত্মগঠন করিলে—মাতার অনুকরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহাদিগের জীবনের সম্পূর্ণতা লাভ অসম্ভব। মাতা কোপনস্বভাবা হইতে পারেন, কলহপ্রিয়া হইতে পারেন, কুসংস্কারপরায়ণা হইতে পারেন—বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার যে রকম দুরবস্থা, তাহাতে এদেশীয় মাতাদিগের চরিত্রে এ প্রকার বহুল ত্রুটি লক্ষিত হইতে পারে, তবে তাঁহাদের জ্ঞানী, কৃতবিদ্য সন্তানগণও কি মাতৃ-ভক্তি সম্পূর্ণ করিতে গিয়া এই দারুণ অবনতিগ্রস্ত হইবেন? মুক্তি লাভের পরিবর্ত্তে কি মুক্তি পথে কাঁটা পড়িবে? কোনও মাতৃ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এরূপ প্রশ্ন অবশ্যই করিবেন না। কিন্তু সাধারণের মনে এ প্রশ্নের উদয় হওয়া অসম্ভব নহে। ইহার উত্তর এই যে মাতৃভাবের জন্যই মাতা বিশ্বমাতার প্রতিকৃতি। বঙ্গমহিলাদিগের জীবন অন্যান্য অংশে অসম্পূর্ণ হইলেও মাতৃত্বে সম্পূর্ণ। মাতা শিক্ষিতা হউন আর অশিক্ষিতা হউন, বিশ্ব সৃষ্টি রক্ষা করিবার জন্য ভগবান্ দেবভাবে মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ করেন। বিশ্বজগতে ভগবানের দেবত্ব যেমন প্রকাশিত, সন্তানের পক্ষে মাতার দেবত্বও তেমনি প্রকাশিত; তাই মা সন্তানের দেবতা—মা সংসারের চক্ষে অশিক্ষিতা হউন, অশ্রদ্ধেয়া হউন, নগণ্যা হউন, তিনি সন্তানের সর্ব্বার্থসাধিকা পরম দেবতা। মাতৃত্বের আদর্শে সন্তান যখন আত্মগঠন করিতে পারেন, তখন সন্তানও দেবতা হইতে পারিবেন। মাতৃত্ব ও যা, দেবত্ব ও তাই। এই মাতৃত্বে ও দেবত্বে কিরূপ ঐক্য তাহা আমরা তাহা সংক্ষেপে লিখিতেছি।

মাতৃত্বের প্রথম লক্ষণ—ভালবাসা। ভালবাসা গুরুজনের প্রতি সমর্পিত হইলে ভক্তি, বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তিদিগের উপরে সমর্পিত হইলে প্রণয় এবং কনিষ্ঠ সম্পর্কীয় ব্যক্তির উপরে সমর্পিত হইলে স্নেহ

সুতরাং স্নেহ ভালবাসারই রূপান্তর মাত্র। ভালবাসা যে দেব-বৃত্তি, একথা অনেকেই জানেন, আমরাও উপস্থিত প্রবন্ধে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছি। ভালবাসা প্রেমময় জগদীশ্বরের প্রকৃতির অংশ। ভগবতী বিশ্বজননীই ভালবাসার পূর্ণ আদর্শ। এ বিশ্বজগৎ কিসের বলে টিঁকিয়া আছে? এই সকল গ্রহ উপগ্রহ, এই সকল বৃহত্তম পদার্থ হইতে জড়াণু, জীবাণু, পরমাণু পর্য্যন্ত কিসের বলে সুনিয়মে রক্ষিত ও বর্দ্ধিত হইতেছে? কিসের বলে জগতের অসংখ্য অভাব প্রতিক্ষণেই পূর্ণ হইতেছে? আর তুমি মর মানব! তোমার শারীরিকী, জ্ঞানার্জ্জনী, কার্য্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী, এই চতুর্বিধ বৃত্তির পোষক ও রক্ষক উপকরণসমূহ কোথা হইতে পাইতেছ? তুমি ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিবে বলিয়া উপযুক্ত আহার পানীয়, তুমি জ্ঞানী হইবে বলিয়া তোমার জ্ঞান-প্রবর্দ্ধক উপকরণ নিচয়, তুমি সাধুতা ও মহত্ত্ব লাভ করিবে বলিয়া তদুপযোগী সাধু, মহৎ প্রবৃত্তি ও সদিচ্ছা সকল, তুমি প্রীত হইবে বলিয়া সুন্দর কুসুমরাজি, সুশ্রাব্য বিহঙ্গগীতি, সুদৃশ্য মেঘশ্রেণী, প্রকৃতির অনন্ত সৌন্দর্য্যচ্ছটা, এ সব কেমন করিয়া আসিল? ইহাতেও কি আমরা বুঝিব না যে এ সবই সেই স্নেহময়ী বিশ্বজননীর অপরিমিত স্নেহের দান! বিশ্বতত্ত্ব যতই আলোচনা করিবে, ততই বুঝিতে পারিবে, বিশ্বজগতের কোনও কার্য্য কেবল কর্ত্তব্যপালনের অনুরোধে সম্পন্ন হয় নাই, সকল বিষয়ই বিশ্বজননীর ভালবাসার পূর্ণ আদর্শ। আর এ জগতে স্নেহের —অপরিসীম স্নেহের পরিচয় পাওয়া যায়! তাই বলিতেছি ভগবতী বিশ্বজননীর মাতৃ-স্নেহই আদর্শ ভালবাসা! ভগবতী বিশ্বজননী স্বর্গীয় ভালবাসায় মাতৃহৃদয় পূর্ণ করেন, তাই মাতৃস্নেহ সীমাশূন্য! তাই সন্তানের ভালবাসায় মা' পাগলিনী! তাই সন্তান মা'র প্রাণের সর্ব্বস্ব; মা' সন্তানের মঙ্গল আশয়ে অনায়াসে প্রাণ পরিত্যাগ করিতে পারেন, সকল সুখের মাথায় পদাঘাত করিতে পারেন! মাতৃ-স্নেহ ভাষায় লিখিবার জিনিস নহে, কথায় বুঝাইবার জিনিস নহে; তাহা প্রকৃত মাতৃভক্ত সন্তান প্রাণের প্রাণে অনুভব করিতে পারেন! এই ভালবাসায় অভ্যস্ত হইতে পারিলেই মানব দেবতা হইতে পারেন। যাঁহারা "নরদেবতা" আখ্যা পান, তাঁহাদের হৃদয় মাতৃস্নেহের মত আদর্শ ভালবাসায় পরিপূর্ণ। খ্রীষ্ট, চৈতন্য, শাক্যসিংহ হাউয়ার্ড, জেনারল বুথ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি ইহার উদাহরণ।

মাতৃত্বের দ্বিতীয় লক্ষণ সমতা—মাতৃ-স্নেহে যে বৈষম্য নাই, একথা সকলেই জানেন। মাতা বহু সন্তানবতী হইলেও, প্রত্যেক সন্তান মাতৃস্নেহ সমভাবে পাইয়া থাকেন। এ উদারতাও ভগবৎ-সম্পত্তি। এ জগতে কি বৃহত্তম কি ক্ষুদ্রতম, সকল পদার্থই ভগবানের।

"ছোট বড়" বিচার না করিয়া তিনি সকলকেই সমভাবে স্নেহ করিতেছেন, সমভাবে প্রতিপালন করিতেছেন, সমভাবে সকলের অভাব পূর্ণ করিতেছেন! এই অনন্ত শক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মাতা সমভাবে সকল সন্তানকে স্নেহ করেন, সমভাবে পরিচর্য্যা করেন, সমভাবে মঙ্গলকামনা করেন। তবে একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে ভগ ব্রহ্মাণ্ডপালকে যেমন ভগবানের প্রিয় মন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, নটিও সেইরূপ স্তান-জননীরও সেই কিন্তু তাহা হইলেও তা। যে মহাত্মা ন্যায় মাতার মমত সহিষ্ণু হইতে নর প্রতি সমভাবাপন্ন। এই কৃতর র আদর্শে নরদেবতাগণ সমতা শিক্ষা করেন ব্রাহ্মণ চণ্ডাল, পুরুষ, রমণী, ধনী, দরিদ্র সকলকে সমভাবে প্রীতি দান করিয়া থাকেন।

মাতৃত্বের তৃতীয় লক্ষণ সহানুভূতি ও দয়া—সন্তানের শরীর যেমন মাতৃরক্তে গঠিত, সন্তানের হৃদয়ও সেইরূপ মাতৃ-কর্তৃক বিকসিত হয়। তাই প্রাপ্তবয়সেও সন্তানের হৃদয়-তত্ত্ব মা' বুঝিতে পারেন। অন্যের নিকট মানবচরিত্রের যে সকল রহস্য অবোধ্য, মাতা তাহাও বিশেষরূপে বুঝিতে পারেন। কোনও ভাবোচ্ছ্বাসে সন্তান কোনও কার্য্য করিয়াছে, অন্তর্যামিনী দেবতার মত মাতাই সে সকল জানিতে পারেন। তাই সন্তান সহস্র দোষী হইলেও মা তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন না। যাঁহার হৃদয়ে প্রকৃত সহানুভূতি আছে, যিনি দোষীর অবস্থা, উপযোগিতা, দোষের অবশ্যম্ভাবী কারণ বুঝিতে পারেন, এজগতে দোষীকে তিনিই প্রকৃত দয়া করিতে পারেন। মাতৃহৃদয় এইরূপ সহানুভূতিপূর্ণ। "আমার বাছা রাগের মাথায় কুকথা বলেছে" অথবা "আমার বাছা মোটে খিদে সইতে পারে না, আজ খিদের জ্বালাতেই কুপথ্য করেছে" এ রকম কথা যে কতদূর সহানুভূতিপূর্ণ, তাহা সহৃদয় ব্যক্তিগণ অবশ্যই বুঝিবেন। এরকম কথা যাঁহার মুখে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়, সেই মাতৃ-হৃদয় যে কিরূপ সহানুভূতিপূর্ণ, তাহা ভাবিতেও পারা যায় না! জগতের মানব প্রকৃত সহানুভূতি দুই জনের কাছেই পাইয়া থাকেন; একজন, যিনি মানব-হৃদয় গঠন করেন, সেই জগজ্জননী; আর একজন যিনি সেই হৃদয় একটু একটু করিয়া ফুটাইয়া তোলেন, সেই গর্ভধারিণী। এই সহানুভূতির জন্যই মা সন্তানের সুখে সকল লোকের অপেক্ষা সুখী হন, সন্তানের দুঃখে সকল লোকের অপেক্ষা দুঃখিতা হন! মা' আমাদের সুখ দুঃখ যতদূর গ্রহণ করিতে পারেন, অনেক সময়ে আমরা নিজেরাও ততদূর পারি না! এই সহানুভূতি হইতেই দয়ার উৎপত্তি। যিনি দুঃখীর দুঃখ অনুভব করিতে পারেন, দয়া তাঁহার হইবেই। মা' সন্তানের দুঃখ সম্পূর্ণ অনুভব করিতে পারেন বলিয়াই সন্তানের মধ্যে দুঃখী সন্তানটী তাঁহার সর্ব্বস্ব

ধন হইয়া থাকে। তাই ভগবান্ যেমন দীনহীনের গতি, দয়াময়ী মা'ও সেই রকম দীনহীনের গতি; মর জগতে যাঁহাদের এই সহানুভূতি ও দয়া আছে, তাঁহারাও দীন হীনের গতি; তাঁহারা নরদেবতা।

মাতৃত্বের চতুর্থ লক্ষণ ক্ষমা—সাধারণ মানব ক্ষমাকে দুর্ব্বলতা মনে করিতে পারেন, কিন্তু জ্ঞানিগণ বোঝেন যে ক্ষমাই প্রকৃত বীরত্ব। "যে মারিবে তাহাকে মারিব, যে গালি দিবে তাহাকে গালি দিব, যে রাগ করিবে তাহার উপর রাগ করিব" ইহাই সাধারণ মানব-ব্যবহার। মা'র খাইয়া আশীর্ব্বাদ করিতে, গালির উত্তরে মিষ্টকথা বলিতে, শত্রুর সহিত সাধু ব্যবহার করিতে, এজগতে কয়জনের ক্ষমতা আছে? তাই বলিতেছি, ধন মান, বিদ্যা, বুদ্ধি প্রভৃতি উপার্জ্জন করা সহজ, প্রকৃত ক্ষমাশীল হওয়াই কঠিন। সাধারণ মানবচরিত্র অসম্পূর্ণ; তাই সাধারণ মানব চরিত্রে ভ্রম, ত্রুটি ও দোষ বহুল পরিমাণে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু অনেক মানবের স্বভাব এই যে নিজেদের বহু দোষ থাকিলেও তাহাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, অথচ পর-চরিত্রে সামান্য ত্রুটি দেখিলেই ক্রোধান্ধ হইয়া পড়েন! দোষীকে ক্ষমা করা দূরে থাকুক, পদ-দলিত করাই যেন তাঁহাদের অবশ্য কর্ত্তব্য! কিন্তু দেবভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ভগবানের চরণে মানব মাত্রেই অপরাধী। অজ্ঞান, দুর্ব্বলচেতা মানবদিগের তো কথাই নাই, জ্ঞানী, মহাত্মারাও কত সময়ে ভ্রম প্রমাদাদির জন্য পাপচিন্তা, পাপকামনা প্রভৃতির বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন। কিন্তু ক্ষমাময় জগদীশ্বর চিরদিনই মানবের সকল অপরাধ ক্ষমা করিতেছেন, চিরদিনই মানবকে কুপথ হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতেছেন [illegible]নরাধম বলিয়া তিনি কাহ[illegible]সন্তানের ভাল[illegible]রেন না! এই ক্ষমা [illegible]ই সন্তান মা'র প্রা[illegible]! মানবকুলে [illegible]ন্তানের মঙ্গল আশয়ে [illegible]তী কে আছেন [illegible]ত্যাগ করিতে পারে[illegible] অপরাধ করেন না[illegible] পদাঘাত ক[illegible]ন্তান নহে, সুসন্তানগণও [illegible] বহুতর অপরাধ করিয়া থাকেন। সময়ে মানব ইতালীর ম্যাট্সিনি বা বাঙ্গালার বিদ্যাসাগরের ন্যায় ভক্তিমান্ সন্তান হইতে পারেন; কিন্তু তাঁহারও শৈশব কৈশোরে দুরন্তপনা ছিল, আবদার ছিল, স্বেচ্ছাচারিতা ছিল! প্রাপ্ত বয়সেও ভ্রম ও অসাবধানতায় তাঁহার সহস্র ত্রুটি হইতে পারে! কিন্তু সন্তান সহস্র অপরাধী হউন, চোর হউন, ডাকাত হউন, আত্মীয় বন্ধুর ঘৃণ্য হউন, সমাজের পরিত্যক্ত হউন, তথাপি মা তাহাকে "সন্তান" বলিয়া গ্রহণ করিবেন! ভগবানের মত মাও অনুতপ্ত সন্তানকে ক্ষমা করিতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত।

মাতৃত্বের পঞ্চম ও ষষ্ঠ লক্ষণ ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা—সন্তান গর্ভস্থ হইতে সন্তানের জীবিত কাল পর্য্যন্ত মাতার ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা অক্ষুণ্নাবস্থায় থাকে।

জগতের মানব সংস্র দুর্দ্দান্ত হইলেও ভগবতী বিশ্বজননী তাহা ধীরভাবে সহিয়া থাকেন। আর গর্ভজাত সন্তান সহস্র অত্যাচারী হইলেও জননী দেবী ধীরভাবে সহিয়া থাকেন। তা ছাড়া সন্তানের লালনপালন করিতে সন্তানের পরিচর্য্যার জন্য নিজের গায়ের রক্ত জল করিতে মা' অধীর হইয়াছেন বা কবে? অসহিষ্ণু হইয়াছেন বা কবে? ব্রহ্মাণ্ডপালনে ব্রহ্মাণ্ড জননীর যেমন ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা, সন্তানপালনে সন্তান-জননীরও সেই রকম ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতা। যে মহাত্মা এইরূপ ধৈর্য্যশীল ও সহিষ্ণু হইতে পারেন, তিনিই জগতে গুরুতর কার্য্য সম্পাদনে সক্ষম।

মাতৃত্বের সপ্তম ও অষ্টম লক্ষণ আত্ম-ত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা—আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা, এ দুইটীতে বড় নিকট সম্বন্ধ,একটী অপরটীর সাপেক্ষ। এসংসারে যিনি আত্মত্যাগ করিতে পারেন, সেবা-পরায়ণ হইতে তাঁহারই ক্ষমতা আছে; অথবা যিনি সেবা-পরায়ণ হইতে পারেন, আত্মত্যাগে তাঁহারই ক্ষমতা আছে। আত্মত্যাগ ও সেবার পূর্ণ আদর্শ ঈশ্বর, তিনি বিশ্বজগতের জন্য যেরূপ আত্ম-ত্যাগী, যেরূপ সেবাপরায়ণ, তাহা ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়! এই ভগবৎশক্তিতে শক্তিমতী হইয়াই মাতা সন্তানের জন্য আদর্শ আত্মত্যাগিনী—আদর্শ সেবাপরা-য়ণা। মা সন্তানের জন্য কি প্রকার আত্মত্যাগ করেন, কি প্রকার সেবায় আত্মসমর্পণ করেন, তাহা আমরা ইতি-পূর্ব্বে বলিয়াছি। আত্মত্যাগপূর্ণ সেবার উচ্চ গৌরব এই যে ইহাতে দীনতা ও সহৃদয়তা ভিন্ন অহঙ্কারের লেশ মাত্র থাকে না। মা' কখনও ভাবেন না "আমি মহৎ, তাই শিশু অথবা সন্তানের পরিচর্য্যা করিতেছি।" অথবা "আমার জন্যই সন্তান এত উপকৃত হইতেছে!" মা সন্তানের জন্য আত্মবিসর্জ্জন করিয়াই সেবাপরায়ণা হন, তাই সকল সুখ হইতে বঞ্চিতা হইলেও মাতার প্রাণ আকুল হয় না এবং সন্তান-সেবায় প্রাণ গেলেও আত্মগৌরব ভাবিতে পারেন না। পাছে তাঁহার সেবার অযোগ্যতায় সন্তানের ক্লেশ হয়!—এই দীনতা! আর "বাছা আমার কিসে সুখে থাকিবে?" এই প্রাণের টান সহৃদয়তা। যাঁহারা ঈশ্বরের প্রিয় পুত্র কন্যা, তাঁহাদের মধ্যে এই আত্মত্যাগ ও সেবাপরায়ণতা প্রবল হইয়া থাকে। বুথের মুক্তিফৌজ সম্প্রদায় ও কলিকাতার দাসাশ্রমও ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মাতৃত্বের নবম লক্ষণ নিঃস্বার্থ হিতৈ-ষণা।—জগদীশ্বরের কার্য্য যেমন জগতের হিতের জন্য, নিজের কোনও প্রয়োজন সিদ্ধি অভিপ্রায়ে নহে, মাতার সকল কার্য্যও সেইরূপ সন্তানের মঙ্গল আশয়ে, নিজের কোন প্রয়োজন সিদ্ধি অভিপ্রায়ে নহে। সন্তানের সর্ব্বাঙ্গীণ মঙ্গল হইলেই মা পরিতৃপ্তা ও চরিতার্থা হন। মাতৃস্নেহ সন্তানের ধন, মান, বিদ্যা, খ্যাতি, রূপ, স্বাস্থ্য প্রভৃতির অপেক্ষা রাখে না; বরং

ধনী অপেক্ষা দরিদ্র, বিদ্বান অপেক্ষা মূর্খ, সুন্দর অপেক্ষা কুৎসিত প্রভৃতি দুরবস্থা-গ্রস্ত সন্তানের উপরে মাতার আদর ও যত্ন যে অপেক্ষাকৃত অধিক, এ কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এরূপ ভাব যে নিঃস্বার্থতার আদর্শ, সেকথা বলা বাহুল্য মাত্র। এইরূপ নিঃস্বার্থ হিতৈষণা শিক্ষা করিলে মানব "দেবতা" হইয়া উঠেন।

মাতৃত্বের দশম লক্ষণ পবিত্রতা—যিনি সকল প্রকার পাপ মলিনতার অতীত, যিনি নিষ্কলঙ্ক, বিশুদ্ধ, পুণ্যময়, তিনিই প্রকৃত পবিত্র। সন্তানের কাছে মাতৃ-দেবী এইরূপ পবিত্রা, পবিত্রতমা। যেমন পবিত্রতম ঈশ্বরের পবিত্র কিরণে মানবের অসৎবৃত্তি ও পাপ সকল পুড়িয়া ভস্ম হয়, পবিত্রতারূপিণী মাতৃদেবীর পবিত্র কিরণে সন্তানের অসৎবৃত্তি ও পাপ সকল সেই রকম পুড়িয়া ভস্ম হয়। সন্তান মা'র কাছে দাঁড়াইলে—বৃদ্ধ হউক, যুবক হউক—সে শিশু। সে শিশুর মত সরলতা, শিশুর মত কোমলতা, শিশুর মত পবিত্রতা পাইবার যোগ্য হয়। "মা" বলিলেই সন্তানের হৃদয় ক্ষণকালের জন্যও নিষ্পাপ ও নির্ম্মল হইয়া থাকে। এইজন্য মাতৃ-সম্বোধন আমাদের দেশে পবিত্রতা ও বিশ্বস্ততার প্রতিজ্ঞাস্বরূপ। যে কোনও পুরুষ "মা" বলিয়া ডাকে, অবরোধবাসিনী বঙ্গ-মহিলা তাহাকে গর্ভজাত পুত্রবৎ নির্ম্মল-চরিত্র, বিশ্বাসভাজন ও পবিত্রহৃদয় মনে করেন। "মা" বলিলেই মা'র মহত্ত্ব, মা'র দেবত্ব, মা'র পবিত্রতা সন্তানের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হইবে, পরের মা'কে "মা" বলিলেও সেভাব জাগরুক রহিবে। পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বর ও পবিত্রতারূপিণী মাতা, ইহাতে সন্তানের চক্ষে কোনও পার্থক্য নাই—যাহার থাকে সে "সন্তান" নামের অযোগ্য। এই পবিত্রতাতেই মা'র পূর্ণ মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। পবিত্রতা মানব জগতেরও শ্রেষ্ঠতম অলঙ্কার।

এই সকল দেবভাবে মাতৃ-হৃদয় পূর্ণ। দেবত্বে যাহা আছে, মাতৃত্বেও তাহাই আছে। মাতৃ-ভক্তগণ ভক্তিভাবে তন্ময় হইয়া যখন মাতার ব্রহ্মভাব বুঝিতে পারেন, যখন মাতৃ-হৃদয়ের আদর্শে আত্ম-গঠন করিতে পারেন, তখনই সন্তান দেবত্ব লাভ করিতে পারেন। জগতের চক্ষে তিনি মহৎ হউন বা ক্ষুদ্র হউন, তাঁহারই জীবন ধন্য হয়, মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনাতে সন্তানের মুক্তি সাধিত হয়।

(ক্রমশঃ)

বিগত শত বর্ষে ভারত রমণীদিগের অবস্থা।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর)

ব্যক্তিগত অবস্থা ধর্ম্মভাব; গত শতাব্দীর প্রথম যুগ প্রবর্ত্তন সময়ে(১২০১ সালে) এদেশে ধর্ম্মভাব অর্থাৎ ঈশ্বরে ভক্তি বিশ্বাস বড়ই প্রবল ছিল। তখন

ধর্ম্মশিক্ষার প্রধানতঃ দুইটি পথ ছিল, এক পুরাণ শ্রবণ অপর ব্রত নিয়মাদির অনুষ্ঠান। তখন ঘরে ঘরে ঠাকুর ঘর ও গ্রামে গ্রামে দেব মন্দির প্রতিষ্ঠা হইত। পুরুষেরাও অতি অল্প বয়সে ইষ্ট গুরুর নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সন্ধ্যা আহ্নিকাদি ধর্ম্ম ক্রিয়ায় রত হইতেন। এসময়ে, পিতা, ভ্রাতা, স্বামী প্রভৃতির উপদেশে, মাতা পিতামহী শ্বশ্রূ প্রভৃতির আদর্শে ভারতবাসিনীরাও অতি অল্প বয়স হইতে ঈশ্বরে ভক্তিমতী হইতেন। ভক্তি বিশ্বাস অনুশীলনফলে প্রাপ্ত বয়সে তাঁহাদের ধর্ম্মভাব এত প্রবল হইত যে তাঁহারা শতাধিক ক্রোশ দূরবর্ত্তী তীর্থ স্থানে হাঁটিয়া যাইতেন; পীড়িত সন্তানাদির আরোগ্য কামনায় সপ্তাহাধিক কাল আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া হত্যা দিয়া থাকিতেন; কোনও কোনও ব্রতে ব্রতী হইতে গিয়া ক্ষুধা, পিপাসা, শীত, গ্রীষ্ম প্রভৃতিতে অলৌকিক সহিষ্ণুতার পরিচয় দিতেন!—দেবতার প্রীতি কামনায় স্নেহময়ী মাতা প্রাণের সন্তানকেও অকূল সাগরে ভাসাইতে পারিতেন (১)!, ধর্ম্ম লাভ আশয়ে নব বিধবা মৃত পতির জ্বলন্ত চিতায় শরীর ঢালিয়া দিতেন! (২) ব্রহ্মচারিণী বিধবাগণ মস্তক মুণ্ডন, চীর বা গৈরিক বস্ত্র পরিধান, হবিষ্যান্ন ভোজন, কম্বল বা কুশাসনে শয়ন প্রভৃতি কার্য্য দ্বারা পুণ্যার্জ্জন করিতেন (৩)। অধিক কি, ধর্ম্মের নামে তাঁহাদের জীবন এরূপ উৎসর্গীকৃত ছিল, যে ধর্ম্মের জন্য তাঁহারা অসাধ্য—অসাধ্য না হউক, সকল রকম দুঃসাধ্য কার্য্যই করিতে পারিতেন! মানব-শিশু যত দিন মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে না শিখে, যত দিন তাহার বিচার শক্তি অস্ফুটাবস্থায় থাকে, যতদিন মস্তিষ্কের শক্তি বিকাশ না হওয়াতে কেবল হৃদয়ের ভাবই অসংযতরূপে প্রবল হয়, ততদিন তাহার হৃদয়ে যেমন অলৌকিক সরলতা ও অলৌকিক বিশ্বাস, গত শতাব্দীর প্রথম যুগের আরম্ভ সময়ে ভারতমহিলাদিগের হৃদয়ে সেইরূপ সরলতা ও সেই রূপ বিশ্বাস বর্ত্তমান ছিল; ক্রমশঃ এবিষয় অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। ফলতঃ ধর্ম্মপ্রাণতায় তাঁহারা যে অলৌকিক শক্তিমতী ছিলেন, তাহার কারণ সেইরূপ সরলতা ও বিশ্বাস।

(১) সে কালে যে রমণীর উপযুক্ত বয়সে সন্তান না জন্মিত, তিনি ভগবানের উদ্দেশে প্রতিশ্রুত হইতেন যে "সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানটী গঙ্গাকে দিব," পরে সন্তান জন্মিলে প্রথম সন্তানটী সাগর সঙ্গম তীর্থে নিক্ষেপ করিতেন!! এ প্রথা আর্য্য বংশীয়েরা অনার্য্যজাতির নিকটেই শিখিয়াছিলেন, সন্দেহ নাই।

(২) সহমৃতা বা অনুমৃতাদিগের মৃত্যুর উদ্দেশ্য যে "নিষ্কাম ধর্ম্ম" নহে, তাহা শাস্ত্র ও দেশাচার অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিগণও অবশ্য জানেন।

(৩) অদ্যাপি ভারতের স্থানে স্থানে এইরূপ আয়াসসাধ্য "ব্রহ্মচর্য্য" প্রচলিত আছে; ইহাও নিষ্কাম ধর্ম্মানুমোদিত নহে। ইহার উদ্দেশ্য স্বর্গলাভ বা জন্মান্তরে বিধবা না হওয়া।

জ্ঞান—তখনকার সময়ে সাধারণতঃ মস্তিষ্ক হইতে হৃদয়ের শক্তি অধিকতর অনুশীলিত হইত, এই অনুশীলনে স্ত্রীজাতির এক বিশেষ ক্ষতি এই হইত যে, স্বভাবতঃ রমণীগণের হৃদয়ের শক্তি, মানসিক শক্তি অপেক্ষা প্রবলতর, তাহার উপরে কেবল হৃদয়ের শক্তির অনুশীলনে মস্তিষ্কের শক্তি নিস্তেজ হইয়া পড়িত। জ্ঞানানুশীলন ব্যতিরেকে জ্ঞান লাভ করা মানবের পক্ষে—অন্ততঃ সাধারণ মানবের পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। জ্ঞানানুশীলন অভাবেই প্রাচীনা মহিলাগণ সাধারণ বিষয়ে তর্ক, বিচার, মীমাংসা, পরিণামদর্শিতা প্রভৃতি কার্য্যে অক্ষম ছিলেন। এই জন্য ভূত, প্রেত, ব্রহ্মদৈত্য প্রভৃতি উপদেবতাগণ স্ত্রীজাতির উপরে বড়ই "উপদ্রব" করিত; এই জন্য রোজা, ফকির প্রভৃতি বেশধারিগণ স্ত্রীলোকের নিকট হইতেই অধিকতর উপার্জ্জন করিতে পারিত; এই জন্য স্বামিবশীকরণ মন্ত্র, মৃতবৎসার সন্তানরক্ষার মন্ত্র, বন্ধ্যার সন্তান জন্মিবার মন্ত্র—প্রভৃতি নানাবিধ মন্ত্র তন্ত্র স্ত্রীজাতির উপরে প্রয়োগ করিলেই অধিকতর সফল হইত! জ্ঞানানুশীলনে অভাবেই সাধারণ মহিলাগণের মন এইরূপ অজ্ঞানতায় পূর্ণ ছিল!

মানবের বহিরিন্দ্রিয়ের মধ্যে যেমন চক্ষু, অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যে সেই রূপ জ্ঞান। অন্ধের অন্যান্য সহস্র সুখের উপাদান থাকিলেও তাহার ন্যায় দুঃখী এজগতে আর নাই, কারণ জগতে যাহা কিছু প্রিয়দর্শন, সে তাহা কিছুই দেখিতে পায় না, এবং দর্শনশক্তির অভাবেই তাহাকে পরমুখাপেক্ষী, স্বাবলম্বনে অক্ষম হইয়া জীবন্মৃতরূপে থাকিতে হয়; জ্ঞানহীন মানবও জগতে এই রকম দুঃখী। জগতে যাহা সত্য, সে তাহা কিছুই বুঝিতে পারে না; হিতাহিত বিচার শক্তির অভাবে তাহাকে আত্মরক্ষাতেও অন্যান্য গুরুতর কার্য্যে অশক্ত হইয়া থাকিতে হয়! হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে,

> শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
> সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ, জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে *॥

ভারতীয় ধর্ম্মাচার্য্যগণ যে জ্ঞানের এতাদৃশ গৌরব করিয়াছেন, তাহার এক প্রধান কারণ, জ্ঞানের অভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না—যাহা কিছু মনুষ্যত্বের উপকরণ, জ্ঞানের অভাবে তাহার একটীও উপযুক্ত রূপে বিকাস লাভ করিতে পারে না।—জ্ঞানহীন ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মাচরণ করে, তাহাদের বিদ্যা অবিদ্যার ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, নীতি ও দুর্নীতি হইয়া উঠে। যাঁহারা অসভ্য জাতির ইতিবৃত্তে মনোযোগ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, মনুষ্যের মত সকল জিনিস থাকিয়া যাহাদিগের জ্ঞানের অভাব থাকে, তাহারা কিছুরই উপযুক্ত রূপে ব্যবহার করিতে

* হে পার্থ! ফলের সহিত সমুদয় কর্ম্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত; অতএব দ্রব্যময় দৈব যজ্ঞ হইতে জ্ঞান যজ্ঞই শ্রেষ্ঠ। গী। ৪র্থ অ—৩৩ শ্লোক।

পারে না—জ্ঞানের অভাবে সরলতায় নির্ব্বোধতা, ধর্ম্মভাবে কুসংস্কারান্ধতা, আর সকল বিষয়ই আতিশয্য দোষে দূষিত হইয়া থাকে। আমাদের দুর্ভাগ্য তাই সত্যের অনুরোধে বলিতে হইতেছে, প্রাচীনা মহিলাদিগের জীবনও মার্জ্জিত জ্ঞানের অভাবে এই সকল দোষে দূষিত ছিল।

কিন্তু এইখানে বলা আবশ্যক, সাধারণ বিষয়ে জ্ঞানার্জ্জনী বৃত্তির অনুশীলন না হওয়াতেই পুরাতন মহিলাদিগের মানসিক শক্তি এরূপ নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছিল। নচেৎ তাঁহারা যে প্রকৃত পক্ষে নির্ব্বোধ ছিলেন না, তাঁহাদের সহজ বুদ্ধি যে স্বভাবতঃ উপযুক্তরূপে বিকসিত হইত, এবিষয় তাঁহাদিগের গার্হস্থ্য জীবন আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়। এ জগতে তাঁহাদিগের একমাত্র কার্য্যক্ষেত্র গৃহ, আর এক মাত্র কার্য্য গৃহধর্ম্ম পালন। এই কার্য্য ক্ষেত্রে তাঁহারা যেরূপ দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতেন, প্রকৃত নির্ব্বোধ মানবের পক্ষে তাহা অসম্ভব। এতদ্ভিন্ন, তাহাদিগের ব্যবহৃত (সম্ভবতঃ কাহারও কাহারও রচিত) চুট্‌কী গল্প ও প্রবচন হইতে, তাঁহাদিগের ভাবগ্রাহিতা ও চতুরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। এগুলিও বুদ্ধিবৃত্তির কার্য্য। কেহ কেহ তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্নাও ছিলেন।

নীতি—আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, তখন মানসিক শক্তির অপেক্ষা হৃদয়ের শক্তি অধিকতর প্রবল ছিল। এই জন্য নীতির বা চরিত্রের যে সকল সদ্গুণ হৃদয়শক্তির অন্তর্গত, প্রাচীনাদিগের সেই সকল সদ্গুণ যথোচিতরূপে পরিস্ফুট হইত; অর্থাৎ দয়া, সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি সাধুভাবসকল এবং সেবা, পরোপকার, ত্যাগস্বীকার প্রভৃতি সাধুকার্য্য সকল, প্রায় সকল রমণীর হৃদয় ও শরীরের অলঙ্কার স্বরূপ ছিল। এইজন্য নারীজীবন কোমলতার প্রতিকৃতি বলিয়া অনুভূত হইত। পক্ষান্তরে, নীতির যে সকল সদ্গুণ মানসিক শক্তির অন্তর্গত—ধীরতা, অপক্ষপাতিতা, আত্মসংযমন, প্রভৃতি, তাঁহাদিগের অনেকটা হীনতর ছিল *। এই জন্য তাঁহাদিগের অনেকে কোমলতার প্রতিকৃতি হইয়াও স্থিরবুদ্ধিহীনা, কোপনস্বভাবা, কলহপ্রিয়া বলিয়া অপবাদগ্রস্তা। শ্রমশীলতা ও গৃহকার্য্যানুরাগ যদি নীতির অন্তর্ভুত হয়, তবে তাহাতে তাঁহারা উচ্চতর প্রশংসা লাভের যোগ্য পাত্রী— অন্নপূর্ণা বা জগদ্ধাত্রী গৌরবে গৌরবান্বিতা হইবার উপযুক্তা।

বিদ্যা—সেকালে স্ত্রীজাতির মধ্যে লেখা পড়া শিখিবার প্রথা রহিত হইয়াগিয়াছিল, আমরা ইতিপূর্ব্বে সে কথার উল্লেখ করিয়াছি। সুতরাং গত শতাব্দীর

* এ সকল কথা সাধারণের প্রতি প্রয়োজ্য। নচেৎ সেকালে যাঁহারা মহাপ্রাণা দেবী ছিলেন, তাঁহারা এ কথার লক্ষ্য নহেন। তাঁহারা উন্নতচরিত্রা।

প্রারম্ভসময়ে ভারত মহিলাগণ বিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল, ইতিহাস, অঙ্ক, সাহিত্য প্রভৃতির অমৃতাস্বাদ গ্রহণে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিতা ছিলেন। সংসারের দৈনিক আয় ব্যয়ের হিসাব, বিদেশস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের লিখিত পত্রাদি পঠন বা তাঁহাদিগকে পত্রাদি লিখন, শিশুদিগকে অধ্যাপনা প্রভৃতি কার্য্যও রমণী-হস্তে সম্পন্ন হইত না। এতদ্ভিন্ন লেখা পড়া শিখিলে মনের যে রূপ উন্নতি সাধিত হয় ও জগতের সুখ যেরূপ আয়ত্ত হয়, তাহা হইবারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। আমরা তখনকার মহিলাগণের মানসিক শক্তি যে অনেক অংশে হীন দেখিতে পাই, তাহার এক প্রধান কারণ এই লেখা পড়ায় অনভিজ্ঞতা। তবে দৈবাৎ কোনও স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিতেন, এমন কথাও জানিতে পারা যায়।

দেশীয় শিল্পবিদ্যা ও কারুকার্য্যে অনেক মহিলাই সুশিক্ষিতা ছিলেন। কাঁথা, বুতি, ক্ষীরের ছাঁচ, খয়েরের বাগান, চুলের দড়ি, সিকা, ধানের হার, যবের হার প্রভৃতি প্রস্তুত করিয়া তাঁহারা সুন্দর শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয় দিতেন। এই সকল জিনিস দেখিতে যেরূপ সুন্দর, অনেক গুলি সেইরূপ প্রয়োজনে ও আসিত।

রুচি—মানব জীবন গঠন পক্ষে রুচি, এক প্রধান উপকরণ। যে জাতির রুচি যেরূপ পবিত্র ও উন্নত, তাহাদিগের সমাজও সেইরূপ পবিত্র ও উন্নত হইয়া থাকে। গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতীয় স্ত্রী পুরুষদিগের রুচির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা সন্তোষজনক নহে।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে গেলে বোধ হয়, মানবের রুচি দুই ভাগে বিভক্ত। মানবের শিল্প, চিত্র, সঙ্গীত ও সাহিত্যে রুচির যে ভাগ প্রকাশিত হয়, সে ভাগ রুচির আন্তরিক ভাগ; আর বেশ, ভূষা, আলাপাদিতে রুচির যে ভাগ প্রকাশিত হয়, সেভাগ রুচির বাহ্যিক ভাগ। যাঁহারা ভারতের ইতিহাসের সহিত সুপরিচিত, তাঁহাদের অবশ্য স্মরণ আছে যে চৈতন্যদেব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের অবনতির সহিত বাঙ্গালার বিশুদ্ধ রুচিও প্রায় দূর হইয়াছিল। বাঙ্গালীর শিল্প, চিত্র যেমনই হউক, বাঙ্গালির সঙ্গীত, সাহিত্য বড়ই কুরুচি পূর্ণ ছিল। তখনকার তরজা প্রভৃতি সঙ্গীতে রুচিদোষ বহুল প্রমাণে লক্ষিত হইত; তখনকার সাহিত্যে—বাঙ্গলা সাহিত্যে গদ্য জন্মিত না, পদ্যলেখকগণ অনেকেই জয়দেব, বিদ্যাপতি, ও চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব কবিগণের ভাব ও ভাষা লালিত্যে মুগ্ধ হইয়া বাঙ্গালা ভাষার কপাল পোড়াইতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অনেক ক্ষমতাপন্ন কৃতী গ্রন্থকারও ভদ্রলোকের অপাঠ্য গ্রন্থ প্রচার করিতেন। বড় দুঃখের বিষয় সেই সকল সঙ্গীত ও সাহিত্য নিরাপত্তিতে অনেক ভদ্র সমাজে গৃহীত হইত। ইহা যে অবনতির পরিচায়ক, এ কথা বলা বাহুল্য মাত্র। *

* রুচির কথা বলিতে এখনও লজ্জা করে। গৃহস্থ বাড়ীতে এখনও বাই নাচ, খেমটা নাচ প্রচলিত ! তবে সেকালের তুলনায় অনেকটা উন্নত বটে।

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৫৩ সংখ্যা ২৪৮ পৃষ্ঠার পর)

শ্রীযুক্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এম এ কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

কীর্ত্তন—তাল দশকুশী। *

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	প	ম	গ	গ	ঋ	গ	গ	গ	ম	গ
ব-	ড়	সা	ধ	ম-	নে,	হৃ-	দ	য়	র-	ত-	নে,

+।	।	।	।	।	।	।	।	
সা	সা	ঋ	প	ঋ	সা	ঋ	ঋ	গ ঋ
(আ-	মার)	হৃ-	দ-	য়	মা-	ঝা-	রে	পাই।

+।	।	।	।	।	।		।	।	।	।	।	।
ঋ	গ	প	ম	গ	গ		প	প	নি	ধ	ধ	ধ
ব-	ড়	সা-	ধ	ম-	নে,	(১ম বার)	ব-	ল,	বু-	দ্ধি,	ম-	ন,
						(২য় বার)	সে	প্রে-	ম	সা-	গ-	রে,
						(৩য় বার)	শ্রী-	প-	দে	বি-	কা	ব,

* আমরা পূর্ব্ব পত্রিকায় একটী আগমনী গীতের স্বরলিপি দিয়াছি, এই পত্রিকায় একটী কীর্ত্তনের গীত দিলাম।

দশকুশী তালটী বার মাত্রা যুক্ত, তন্মধ্যে সাতটী আঘাত ও পাঁচটী ফাক। ঠেকা যথা।—

÷।	৩।	০।	৪।	০।	৫।	০।	৬।
ধা	ধিনাক্‌ধিনা	ধিনাক্‌	ধিনাক্‌ধিনা	ধিনাক্‌	ধিনা	তিনাক্‌	তিনাক্‌তিনা

০।	৭।	০	১।
তিনাক্‌	তিনাক্‌তিনা	তিনাক্‌	তিনা

শারদীয় পূজার সময়ে ভগবতীর কৈলাস হইতে হিমালয়ে আগমন সম্বন্ধীয় গানকে আগমনী কহে। ষষ্ঠির দিন দুর্গা, কৈলাস ত্যাগ করিয়া, সপ্তমীর দিন মাতৃগৃহে তিন দিন বাস করিয়া দশমীর দিন আবার কৈলাসে চলিয়া যান। ভগবতী সম্বৎসর কৈলাসে থাকেন, তজ্জন্য মেনকা, দুর্গার পুনর্ব্বার আগমন সময়ে বাৎসল্যভাবে নানাপ্রকার দুঃখ করেন। পূর্ব্বে কবির দলে দুর্গা পূজার সময়ে আগমনী গানের সৃষ্টি হয়, পরে পাঁচালীতেও ইহার প্রচলন হইয়া পড়ে।

হরিলীলা বিষয়ক গীতকে কীর্ত্তন বলে। অপর গীত অপেক্ষা ইহার স্বর অন্যরূপ। কীর্ত্তনের সুরের মধ্যে মনোহরসাহী উৎকৃষ্ট।

+।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।	।
প	সা'	নি	ধ	নি	প	প	ধ	প	ম	প	গ
জী-	ব-	ন,	যৌ-	ব-	ন,	নি-	জে-	র	কি	ছু	যে
জ-	ন-	মে-	র	ত-	রে,	ম-	গ-	ন	হ	ই	তে
দা-		হ-	য়ে	র-	ব,	প-	রা	ণ	স-	পি	ব

+। ।।।	।	।	।	।।	।		+।	।	।	।।	।
গ ঋ	ঋ	ঋ	গ	প	ধ	নি	প	ধ	প	ম	প
না ই,-	আ-	মি	হৃ-	দয়	না	থেরে	নি-	জে-	র	কি	ছু
চা ই,-	আ-	মি	স-	তার	ভু	লে,	ম	গ	ন	হ-	ই
ভা ই,-	প্র-	ভুর	অ-	ভয়	প-	দে,	প-	রা	ণ	স-	পি

।	।।	।	।
গ	গ ঋ	ঋ	ঋ
যে	নাই,-	(আ-	মি)
তে	চাই!	(আ-	মি)
ব	ভাই।		

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(৩৫৯ সংখ্যা ২৪ [illegible]ার পর)

রক্তপিত্ত।

প্রতিদিন নবদূর্ব্বার রস পানে রক্ত-রোগের রক্ত বমনাদি নিবারণ হয়।

২। কিস্‌মিস ভিজান জলপান ও কিস্‌মিস ভক্ষণ করিলে রক্তপিত্ত রোগে উপকার দর্শে।

৩। মধু ১৬ তোলা, শীতল জল ১৬ তোলা, একত্র যোগ করিয়া রক্তপিত্ত রোগীকে প্রতিদিন পান করাইলে, ভয়ঙ্কর রক্তপিত্ত বমনাদিসহ রক্তপিত্ত রোগের উপশম হয়।

৪। প্রতিদিন কিস্‌মিস্‌ ভিজান জলপান ও কিস্‌মিস ভক্ষণ কিম্বা ডুম্বুর সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ মধুসহ পান করিলে রক্তপিত্তাদি রোগের রক্তস্রাব বন্ধ হয়।

৫। সাজো গোবরের রস নস্য করিলে, নাসিকা, মুখ, চক্ষু ইত্যাদি দ্বার দিয়া রক্তস্রাব হইলে,তাহার সত্বর উপশম হয়।

৬। গান্ধারির শিকড় এক আনা পরিমাণ ভালরূপে ধুইয়া বাটিয়া খাইলে রক্তপিত্ত ভাল হয়।

৭। আধছটাক কচি যজ্ঞডুম্বুরের রস আধ ছটাক খাঁটি গোলাপজল একত্রে মিশ্রিত করিয়া দুই দিবস প্রাতে খাইলে রক্তবমন নিবারণ হয়।

কাশি।

১। আদার রস একতোলা মধুর সহিত সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশি নিবারিত হয়।

২। কণ্টীকারীর রসে অথবা বাসক ছালের রসে পিপুল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে কিম্বা তুলসী পত্রের রস মরিচের গুঁড়াসহ সেবনে কাশ রোগের উপশম হয়।

৩। মুখে গঁদ ও মিছরী কিম্বা হরীতকী ও যষ্টিমধু অথবা লবঙ্গ বা কাবাব চিনি রাখিলে কাশির বেগ শান্তি হয়।

৪। বুকে সর্দ্দি বসিলে পুরাতন ঘৃত কণ্ঠদেশে মালিস করিবে, কিম্বা একটী পাতিলেবু গোবরের ভিতর করিয়া পোড়াইবে, এবং সেই লেবু ও পুরাতন ঘৃত একত্র মিশ্রিত করিয়া বুকে মালিস করিলে উপকার হয়। বুকে বেদনা হইলে পুরাতন ঘৃতে আদার রস ও কর্পূর মিশাইয়া মালিস করিবে। গরম দুগ্ধের সহিত গাওয়া ঘৃত অল্প করিয়া সেবন করিলে সর্দ্দি ও কাশির লাঘব হয়।

৫। বাসক পাতার রস কাঁচ্চা খানেক লইয়া সেইরূপে কাশীর চিনি মিশ্রিত করিয়া তিন চারি দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৬। পুষ্করিণীর পাড়ের আমগাছের অর্দ্ধ জলপচা পাতা দিয়া নুতন হাঁড়িতে এক সের জল সিদ্ধ করিয়া অর্দ্ধ সের থাকিতে নামাইয়া ২।৩ দিন খাইলে কাশি ভাল হয়।

৭। কাবাবচিনি পানের সহিত ২।৪ দিন খাইলে কিম্বা মিছরি ও মরিচ এক সঙ্গে মিশাইয়া সিদ্ধ করিয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৮। কাশিজনিত কষ্ট হইলে খোসা ছাড়াইয়া আদার গোল গোল কুচি একটী শলাতে গাথিয়া তাহাতে লবণ মাখাইবে। পরে প্রদীপের শিশে বেশ করিয়া পোড়াইয়া আদা চিবাইয়া খাইলে কাশি ভাল হয়।

৯। আকরকরা বচ সর্ব্বদা মুখে রাখিলে, কিম্বা সর্ব্বদা গঁদ চুষিলে সামান্য কাশ নিবারণ হয়।

১০। ঈষদুষ্ণ গব্যঘৃত, গোলমরিচ চূর্ণ, আদার রস, এই সকল দ্রব্য একত্র যোগ করিয়া সেবন করিলে, কাশ, সর্দ্দি-বসা, গলাখুসখুসনি, স্বরভঙ্গ সত্বর আরাম হয়।

১১। বাসকছাল, বামনহাটী, যষ্টি-মধু, কণ্টীকারী, বচ, কুড়, তালিশপত্র, পিপুল, কটফল, কাঁকড়ারশৃঙ্গী প্রভৃতির ক্কাথ, বংশলোচন, তুলসীপত্র, পান ও আদার রস প্রভৃতি কাশ ও প্রতিশ্বাস নিবারক দ্রব্য।

চীন সম্রাটের প্রার্থনা।

অনেকেই জানেন যে, বৌদ্ধধর্ম্ম নাস্তিক ধর্ম্ম। বৌদ্ধেরা এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়কর্ত্তা কেহ আছেন এরূপ বিশ্বাস করেন না, জীবন্ত কর্ম্মশীল পরমেশ্বরের উপাসনা করেন না ও তাঁহার সঙ্গে ঐহিক বা পারত্রিক কোনও সম্বন্ধ আছে স্বীকার করেন না। কিন্তু সুবিশাল চীন সাম্রাজ্যের বৌদ্ধ প্রজামণ্ডলীর অধিনায়ক চীনসম্রাট সিংহাসন আরোহণকালে যে প্রার্থনা করিয়া থাকেন, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। পণ্ডিতপ্রবর ভট্ট মোক্ষমুলর চীনদেশীয় ধর্ম্মগ্রন্থের যে ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন, সেই পুস্তক হইতে চীন সম্রাটের সিংহাসনে আরোহণ কালীন নিম্নলিখিত প্রার্থনাটী অনুবাদিত হইলঃ—

"হে লীলাময় প্রভো, তোমারই দিকে আমার চিন্তাকে নিয়োজিত করিতেছি। এই সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড তোমার অপার মহিমা প্রচার করিতেছে। হে প্রভো, আমি তোমায় দাস, একটু সামান্য তৃণের মত কত ক্ষুদ্র! আমার হৃদয় পিপীলিকার ক্ষুদ্রহৃদয়ের মত! কিন্তু তথাচ তুমি তোমার কৃপাহইতে বঞ্চিত না করিয়া এই ক্ষুদ্র জীবকে এই বৃহৎ সাম্রাজ্য শাসনের ভার দিয়াছ! আমার অজ্ঞতা ও অন্ধতা সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ আছি। আমার ভয় হইতেছে যে, পাছে তোমার দয়ালাভে অযোগ্য হই। সেইজন্য আমি সাধ্যমতে বিধিব্যবস্থায় অধীন হইয়া কার্য্য করিব।"

"আমি তোমার স্বর্গীয় আলোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছি। তোমার মহার্ঘ যানে আরোহণ করিয়া আমার এই মন্দিরে আবির্ভূত হও। হে দয়াময়! তোমার চরণে আমার মস্তক অবনত করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। তোমার পূজার জন্য, তোমার চরণতলে এই ভৃত্য পারিষদগণসহ উপস্থিত হইয়াছে। মৃত আত্মাগণ শূন্যদেশে পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে, তোমার চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। হে ঈশ্বর! আমি তোমার সেবক, তোমার চরণতলে পতিত হইয়া ভক্তির সহিত তোমাকে নমস্কার করিতেছি। তোমার সহবাসের জন্য তোমার দিকে মন নিয়োগ করিতেছি। হে প্রভো, তুমি আমার নৈবেদ্য সকল গ্রহণ কর; আমার প্রতি তুমি করুণা কর; তোমার অপার করুণায় আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

"তুমি বলিয়াছ যে, তুমি আমাদের প্রার্থনা শুনিবে। তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে রক্ষা করিতেছ। তোমার সন্তান হইয়াও আমি তোমার প্রতি প্রকৃত ভক্তি অর্পণ

করিতে অসমর্থ, কেননা আমি অজ্ঞ ও উদ্যমবিহীন।”

“হে প্রভো! তুমি আমার প্রার্থনা গ্রহণ করিয়াছ, তোমাকে ধন্যবাদ করিতেছি! তোমার নাম মহান্‌। ধন্যবাদ ও ভক্তির সহিত তোমার চরণতলে পতিত হইতেছি। কোকিল যেমন নববসন্ত সমাগমে আনন্দিত হয়, সেইরূপ আনন্দের সহিত তোমার চরণতলে এই বহুমূল্য রত্ন ও বস্ত্রাদি রাখিয়া তোমার প্রেমের কথা প্রচার করিতেছি।”

যাঁহারা ঈশ্বর মানেন না, এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া কাহাকেও স্বীকার করেন না, কেবল ‘শূন্যবাদ’ লইয়া যাঁহাদের ধর্ম্মকর্ম্ম, তাঁহাদের হৃদয় হইতে কি এরূপ প্রার্থনা উত্থিত হইতে পারে? চীনসম্রাটের এই প্রার্থনাদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বৌদ্ধসমাজ মতে নাস্তিকতা প্রকাশ করিলেও কার্য্যত ঈশ্বরবিশ্বাসী। আস্তিক চীনসম্রাটের ভাব ও ভক্তিপূর্ণ এই মর্ম্মস্পর্শী প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে নাস্তিক ধর্ম্ম বলিতে আর কাহারও সাহস হইবে না।

মাঘ।

খনা বলিয়াছেন,—
“ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।
যদি বর্ষে মাঘের শেষ॥”

এ কথা অতি সার। কারণ প্রকৃত পক্ষে মাঘ মাসই সম্বৎসরের চাস আবাদ আরম্ভের সময়। ঐ মাসে জল হউক বা নাই হউক, কৃষকদিগকে চাস আবাদের কিছু না কিছু আয়োজন করিতেই হয়। তাহার উপর যদি ঐ মাসের শেষ ভাগে বৃষ্টি হয়, তাহাহইলে “সোণায় সোহাগা” হয়। আমাদের প্রধান খাদ্য ধান্য, তাহার আবাদ চৈত্রের শেষে, কিম্বা বৈশাখের প্রথমে করিতে হয়। সেই ধানের জমির প্রথম চাস মাঘ মাসে হইয়া থাকে। পাট, শণ, কচু, অরহর, হরিদ্রা প্রভৃতি নানাবিধ প্রধান প্রধান ফসল, যাহাদিগের চাস আবাদ বৈশাখ মাসে হইয়া থাকে, তৎসমুদায়ের জমির প্রথম চাস এই মাঘ মাসে। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে আলু, কপি, পলাণ্ডু প্রভৃতি যে সকল উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান্‌ ফসল হইয়া থাকে, তাহার আয়োজনও এই মাঘ মাস হইতে করিতে হয়।

বর্ষাকালে যে সকল বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের চারা ভূমিতে রোপণ করিতে হয়, এই মাঘ মাসে উহাদিগের জন্য যথাস্থানে দেড় বা দুই হস্ত গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া খনিত মৃত্তিকা ঐ গর্ত্তের চতুঃপার্শে কিছু দিন ফেলিয়া রাখিতে হয়। রৌদ্র ও

বায়ু খাইয়া ঐ সকল মাটী উর্ব্বর ও শিথিল হইলে মৃত্তিকার বিপর্য্যয় করিয়া অর্থাৎ উপরের মাটী নীচে এবং নিম্নের মাটী উপরে দিয়া ঐ গর্ত্ত পূর্ণ করিয়া রাখিতে হয়। উহার সহিত কিছু সার মিশ্রিত করিয়া দিলেও ভাল হয়। বর্ষাকালে যে সকল ফসল করিতে হয়, এই মাসে তাহাদের ভূমিতে যথাযোগ্য সার দিয়া রাখিতে হয়। ক্ষেত্রের নিকটবর্ত্তী শুষ্ক বিল, খাল, বা অন্যবিধ জলাশয় হইতে পলি তুলিয়া আলু, কপি, ও পলাণ্ডুর ক্ষেত্রে দিতে হয়। ঐ পলিমাটী দিয়া পুনঃ পুনঃ লাঙ্গল দ্বারা সকল মাটীকে উলট্ পালট্ করিয়া জমি গুলিকে এরূপে রক্ষা করিতে হয় যেন তাহাতে একটীও তৃণ বা আগাছা না জন্মে।

ওল,—এই মাস হইতেই ইহার চাস আবাদ আরম্ভ করিতে হয়।

ইক্ষু,—এই মাস হইতেই ইক্ষু ছেদন ও তদ্দারা গুড় প্রস্তুতীকরণ আরব্ধ হইয়া থাকে।

মূলার বীজ,—এই মাসে মূলার যতদূর পরিপুষ্টি হইতে পারে, তাহা হইয়া থাকে। বেশ মোটা ও পুষ্ট মূলার অগ্রভাগ কর্ত্তন করিয়া মাটীতে রোপণ করিলে তাহা হইতে উৎকৃষ্ট বীজ জন্মিয়া থাকে। কোন কোন কৃষক ফল ধরিবার অগ্রে ঐরূপ মূলার অগ্রভাগের দিকে চারি অঙ্গুলি কাটিয়া তাহাতে খোল করেন এবং ঐ খোল পূর্ণ করিয়া জল দিয়া তাহাকে অধঃশাখ ভাবে টাঙ্গাইয়া রাখেন। প্রতিদিন ঐ খোল পূর্ণ করিয়া জল দিতে হয়। তাহার পত্র ও শীষ্ গুলি ক্রমশঃ বাঁকিয়া উপরের দিকে উঠিবে এবং তাহা হইতেও উত্তম বীজ জন্মিয়া থাকে। মৃত্তিকা প্রোথিত মূলা অপেক্ষা ঐরূপে লম্বমান মূলা হইতে যে বীজ জন্মে তাহা উৎকৃষ্টতর এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। আমরাও তাহা বিশ্বাস করি। মূলার বীজ যতই পুরাতন হয়, তাহা ফসলাংশে ততই উপযোগী হইয়া থাকে।

হলুদ ও আদা,—এই মাসের শেষ ভাগ হইতেই তাহা ক্ষেত্র হইতে তুলিতে আরম্ভ করে এবং হলুদের মোতা ও আদার মুখী ভবিষ্যৎ বীজের জন্য গাছের ছায়ায় তৃণ পত্রাদির আচ্ছাদন দিয়া রাখিয়া দেয়। যাহাদিগের অধিক হলুদের চাস আছে, তাহারা অগ্রহায়ণ মাসের শেষ ভাগ হইতেই হলুদ তুলিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এই মাসের পূর্ব্বে হলুদ তুলিলে ফসলে কিছু কম হয়, তেমন হলুদ দমে ভারী হয়। তুলিতে যত বিলম্ব হয়, ফসল তত বেশী হয়, কিন্তু ওজনে হাল্কা হয়। হলুদ ক্ষেত্র হইতে তুলিয়া প্রথমতঃ গোবর মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিতে হয় এবং পরে রৌদ্রে শুষ্ক করিতে হয়। উনানে চড়াইবার পর একবার উতলাইয়া উঠিলেই নামাইতে হয়, নচেৎ অধিক সিদ্ধ হইলে হলুদ নষ্ট হইয়া যায়। অর্দ্ধ শুষ্ক হইলেই তাহা

চট্ কিম্বা বাঁশের চাটাইর উপর রাখিয়া প্রতিদিন অপরাহ্ণে একবার রগড়াইতে হয়। পূর্ব্ব দেশের কৃষকেরা একখানি বাঁশ বা কাষ্ঠ লগুড়ের অগ্রভাগে একখণ্ড ক্ষুদ্র তক্তা যুড়িয়া তদ্দ্বারা হলুদ রগ্ড়াইয়া থাকে। হলুদ যত রগ্ড়াইতে পারা যায় শুঁঠ হলুদ ততই গোলাকার, শক্ত, পরিষ্কৃত, অল্পায়ত ও ভারবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উত্তমরূপে শুকাইতে ও রগ্ড়াইতে পারিলেই উত্তম হলুদ প্রস্তুত হয়। হলুদের চাস আবাদে বিঘা প্রতি ২০৲।২৫৲ টাকা খরচ করিয়াও ৫০৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। আমরা এই লাভজনক ফসলের বিশেষ বিবরণ পুনরায় প্রকাশ করিব। আদার মুখী পোঁতা, যথাকালে তোলা, ছায়াযুক্ত স্থানে যত্নে রাখা এবং আবশ্যক মতে ব্যবহার করা, বা অধিক থাকে ত বিক্রয় করা ভিন্ন উহাতে কোন ঝঞ্ঝাট কাজ নাই, অথচ লাভ বিলক্ষণ আছে। আমরা আদার বিশেষ কথাও পরে বলিব।

কুল, পিয়ারাদি ফল,—ইহাদিগের পুরাতন ডাল কাটিয়া দিতে হয়। নহিলে পুরাণ ডালের ফল ছোট হয় ও তাহাতে পোকা ধরে।

বেল, মল্লিকাদি ফুল,—ইহাদিগের পুরাতন পাকা শাখা সকল কাটিয়া ফেলিতে হয়। শাখা কাটিয়া দিলে নূতন তেজাল ডাল বাহির হয় এবং তাহাতে উৎকৃষ্ট ফুল হয়। ঐ সকল কর্ত্তিত শাখা দ্বারাই শাখা কলম প্রস্তুত হইয়া থাকে।

সর্ষপ ও মাঠ কড়াই,—এই মাসে সর্ষপ মাড়িয়া ঝাড়িয়া এবং মাঠকড়াই কাটিয়া ফসল সংগ্রহ করিতে হয়।

ধান,—এই মাসে ধান কাটিলে ফসল পাওয়া যায় না, কেবল নাড়া হয়।

আমরা মাঘ মাসের বিবরণ শেষ করিবার পূর্ব্বে একটী অঙ্গীকারপালনে বাধ্য আছি। অগ্রহায়ণ মাসের বামাবোধিনীতে লিখিয়াছি যে, তামাকের চাস, পাইট্ ও প্রস্তুতী করণ এই তিনটী ক্রিয়ার মধ্যে পাইট পৌষ মাসের বিবরণ সহ প্রকাশিত হইল, প্রস্তুতীকরণ প্রণালী মাঘ মাসের বিবরণের সহিত প্রকাশিত হইবে। অতএব তামাক কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাই এস্থলে লিখিত হইবে।

মাঘ মাসের শেষ ভাগে কিম্বা ফাল্গুন মাসের প্রথমাংশে তামাকের পাতার চরম পাক হইয়া থাকে। তবে ঋতুর ব্যতিক্রমে, বা বর্ষার অগ্র-পশ্চাতে কথঞ্চিৎ উহার ব্যতিক্রমও হইতে পারে। কিন্তু প্রায়ই ঐ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তামাকের পাতা পাকিয়া ঈষৎ লাল হয়। তখন তাহা কাটিতে হয়। তামাকের পাতা গুলি এরূপ কৌশলে কাটিতে হয় যেন পত্রগ্রন্থির (কাণ্ডের যে স্থান হইতে পত্র নির্গত হয়) কিয়দংশ ঐ তামাক পত্রের সহিত থাকিয়া যায়, তাহাতে হালা বাঁধিবার সুবিধা হয়। সুবিধা এই, ঐ গ্রন্থি হালার দড়িতে বেশ বাধিয়া থাকে; নচেৎ

পত্র সকল হালার রজ্জু হইতে স্খলিত হইয়া যাইতে পারে। তামাক কাটিয়া কয়েক দিন ক্ষেত্রেই ফেলিয়া রাখিতে হয়। পত্র সকলকে শুষ্ক করাই ক্ষেত্রে ফেলিয়া রাখার উদ্দেশ্য। কিন্তু শুষ্ক করা উদ্দেশ্য হইলেও একটু রস থাকিতে থাকিতেই পত্রসকলকে গৃহে আনিতে হয়। অনন্তর চারিটী চারিটী পাতা একত্র করিয়া বাঁশ কিম্বা দড়ার উপর শুকাইতে হয়। ঐ শুষ্কীকরণ কার্য্য এরূপ স্থানে করিতে হইবে, যেখানে দিনমানে রৌদ্র, রাত্রে শিশির লাগিতে পারে। ঐ তামাকের উপর যাহাতে ঝড় বৃষ্টি লাগিতে না পায়, তদ্বিষয়ে সবিশেষ সতর্ক হইতে হইবে। এইরূপ ৩।৪ দিন শুষ্ক হইলে তামাকে "যাঁত" দিতে হয়।

তামাকের "যাঁত" আবার কি? এস্থলে তাহাও বলিতে হইবে। একখানি বা যত গুলি মই আবশ্যক হয়, তাহার উপর তামাক সাজাইতে হয়। ঐ সজ্জীকরণে একটু কৌশল আছে। প্রত্যেক তামাক পত্রের গোড়া গুলি মইয়ের পার্শ্বে এবং অগ্র ভাগ মইয়ের মধ্যে থাকা চাই। প্রথমে তামাকের গোড়া গুলি মইয়ের একধারে রাখিয়া সাজাইবে। পরে অন্য ধারে গোড়া রাখিয়া সাজাইতে হইবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে উপর্য্যুপরি মইয়ের উপর তামাক সাজাইয়া ঠিক্ তাহার মধ্য স্থলে এক খানি বাঁশ দিয়া বাঁশের মই প্রান্ত মইয়ের সহিত বদ্ধ করিতে হয়। তাহাতে তামাক পত্রগুলি চাপ পাইয়া পাটে পাটে চাপিয়া যায়, ইহাকেই তামাকের "যাঁত" কহে। এই সকল কার্য্য অতি প্রত্যূষে বা কোয়াসার দিন ভিন্ন হইতেই পারে না, অন্য সময়ে করিলে তামাক গুঁড়া নাড়া হইয়া নষ্ট হয়। তামাক প্রস্তুতীকরণ অলস কৃষকের কর্ম্ম নহে,—ইহাতে বিলক্ষণ উদ্যম ও ক্ষিপ্রকারিতা আবশ্যক।

এই রূপে ২।৩ দিবস "যাঁতে" রাখিয়া পুনরায় খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁশের উপর শুকাইতে হয়। উত্তমরূপে শুষ্ক হইলে তামাক সকল ঘরের মধ্যে মাচার উপর উপর্য্যুপরি সাজাইতে হয়। ১০।১২ দিবস এই ভাবে রাখিয়া পরে "হালা" "ঝাড়া" বা "গোছা" রূপে বাঁধিতে হয়। অনন্তর তাহাদের উপরে ও নীচে এক এক খণ্ড চট্ দিয়া প্যাক্ করিলেই তামাকের "পাটী" বা "হালা" প্রস্তুত হয়। ইহাই উৎকৃষ্ট বাণিজ্য দ্রব্য রূপে গাড়ী, নৌকা, ইত্যাদি যোগে নানা স্থানে প্রেরিত হয়। ঐ "পাটী" বা 'হালার" আকার ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দৃষ্ট হয়। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলের মতিহার, হাতীকাণী প্রভৃতি বড় বড় তামাকের পাটি কাষ্ঠের অষ্টিকার ন্যায় করিয়া বাঁধা হয় এবং তাহাদের গোঁজ গুলি এক দিকে ও চটের বাহিরে থাকে।

প্রেসিডেন্সি বিভাগের নানা স্থানে

"হিঙ্গলি" নামক একপ্রকার উৎকৃষ্ট তামাকের চাস আবাদ হইয়া থাকে। তাহার প্রস্তুতীকরণ প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। আমরা পূর্ব্বে যে প্রণালীর বর্ণন করিলাম, তাহার অধিকাংশ রাজসাহী ও ঢাকা বিভাগের। "হিঙ্গলি" তামাক কাটিয়া "খোলায়" শুষ্ক করে। যেমন যে স্থানে ধান্যাদি শস্যের ঝাড়াই মাড়াই হয়, তাহাকে "খামার" কহে, তেমনি তামাকের খামারকে "খোলা" কহে। তাহা কৃষি ক্ষেত্রের মধ্যেই নির্ম্মিত হয়। খোলায় তামাক শুকাইতে ২দিন হইতে ৪ দিনের অধিক লাগে না। তামাকের পাতা গুলি সুপক্ক হইলে শুষ্ক হইতে অধিক রৌদ্র লাগে না। যে গুলি অপেক্ষাকৃত কাঁচা থাকে, তাহা শুষ্ক করিতে অধিক রৌদ্র আবশ্যক হয়। হিঙ্গলি তামাক গাছ শুদ্ধ শুকাইতে দেয়। শুষ্ক হওয়ার পর একপ্রকার দন্তহীন কাস্তিয়া দ্বারা তাহা কর্ত্তন করে। প্রত্যেক খণ্ডে ২টী হইতে ৪টি পাতা রাখে। পরে তাহা গৃহে লইয়া গিয়া গোশালায়, বা শূন্য ঘরে খড়ের দড়ির উপর শুকাইতে দেয়। সেই ভাবে প্রায় এক কি দেড় মাস থাকে। তাহার পর পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাটী বা হালা বাঁধে।

এই বিবরণ পাঠের পর হয় ত কোন কোন পাঠক পাঠিকার তামাকের বিবিধ নাম শুনিবার ইচ্ছা হইতে পারে। সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন বঙ্গকবি বলিয়াছেন,—

"কেনা শুনাইবে ঐ নাম।
না জানি কতেক মধু, ঐ নামে আছেগো
বদন ছাড়িতে নাহি পারে।"

চণ্ডী দাস।

অতএব গোপাল সহস্র নামের ন্যায় তামাক সহস্র নামের গাথা হইতে পারে। এস্থলে নমুনা স্বরূপ কয়েকটী নাম দেওয়া গেল:—

(১) পানমুটী, (২) হরিণপানী, (৩) হাতিকানী, (৪) জটাভাং বা শিবজটা, (৫) কপি, (৬) শকুনকানী, (৭) কালীজিবে, (৮) ছোটনা, (৯) কৃষ্ণকলি, (১০) মান্ধাতা, (১১) সিন্দুর খটুয়া, (১২) ভেলেঙ্গি, (১৩) চামা, (১৪) নয়োখোল ইত্যাদি। *

মহীসুরের মহারাজার মৃত্যু উপলক্ষে। (১)

কি কঠিন হিয়া তোর—নিঠুর শমন,
অঞ্চলের নিধি মা'র করিলি হরণ!
কোল হ'তে কেড়ে নিলি দ্বিতীয়ার চাঁদ,
তাই বুঝি পেতে ছিলি মৃত্যু রূপী ফাঁদ?
শ্রীহীন করিলি আজ শ্রীরঙ্গপট্টন,
শূন্য হ'ল এতদিনে রাজসিংহাসন।
সতীর মাথার মণি—কবরীর ফুল,
কেড়ে নিলি অকস্মাৎ বুকে বিঁধে শূল।
নিষাদ শরেতে বিদ্ধ বিহঙ্গিনী প্রায়,
ছট্ ফট্ করে সতী মরম ব্যথায়।

* পণ্ডিত শ্রীকালীময় ঘটক প্রণীত কৃষি শিক্ষা দেখ।

(১) যে মহারাজার আগমন সংবাদ দিয়া আমরা

বিষাদ-কালিমা মাখা ওমুখ কমলে,
রাহুগ্রস্ত শশী যেন শোভিছে ভূতলে!
পতিশোকে একেবারে সুখশান্তিহারা,
নয়নে বহিছে শত যমুনার ধারা।
গভীর আঁধার ঘরে ঘেরেছে হৃদয়,
সুখের তপন আর হবে কি উদয়?
প্রবাসের সুখ যত ফুরাইল সব,
আবাসে চলেছে সতী মুখে নাই রব!
পতি-সহ গৃহবাস—আশার স্বপন,
ভাঙ্গিয়াছে একেবারে নিষ্ঠুর শমন।
কি কাজ সাম্রাজ্যে তার—পতি নাই যার,
সংসার শ্মশান তুল্য—অনিত্য অসার।
সঙ্গিনী পতির ভস্ম রেখে বঙ্গদেশে,
দেশে যায় একাকিনী কাঙ্গালিনী বেশে!
কে লঙ্ঘিবে বিধাতার অলঙ্ঘ্য বিধান,
তাঁর কাছে রাজা প্রজা সকলি সমান!
আশা ও ভরসা কত—কত আকিঞ্চন,
অতল সমুদ্র তলে হলো নিমগন।
মরতে অমরাবতী পুরী মহীশুর,
আনন্দ আহ্লাদে সদা ছিল ভরপুর;
রাজার অকাল মৃত্যু বার্ত্তা ভয়ঙ্কর,
বিনা মেঘে বজ্রাঘাত মাথার উপর।
লক্ষ লক্ষ প্রজা আজি লুটায়ে ভূতলে,
ভাসাইছে মহীশূর নয়নের জলে।
কত সুখ ভুঞ্জিয়াছে রাজার শাসনে,
সকলি জাগিছে আজ তাহাদের মনে।
রাম রাজ্যে যেন তারা করিয়াছে বাস;
জগৎ যুড়িয়া যাঁর যশ সুপ্রকাশ,
এমন রাজারে কাল করিলি হরণ,
কে আছে নিষ্ঠুর হেন তোমার মতন?
অপগণ্ড শিশু আজ হয়ে পিতৃহীন,
দীন হ'তে সেও যেন হইয়াছে দীন!
রাজ্যসুখ ধন মান অতুল সম্পদ,
সব হ'তে শ্রেষ্ঠতর জনকের পদ।
সে পদ সেবনে যেবা না পায় সুযোগ,
রাজ্যভোগ তার কাছে করমের ভোগ।
ধৈরয ধরিয়ে এবে শান্ত হও রাণী,
ওই শোন কাণপেতে বিধাতার বাণী?
"পতিশোকে সতী কেন হইছ কাতর?
দেব লোকে আজি তাঁর মহা সমাদর।
প্রবাস ছাড়িয়া যেবা যায় নিজ বাসে,
ডেকে ল'ন বিশ্বমাতা আপনার পাশে।
জরা মৃত্যু নাহি সেথা,—আনন্দবাজার,
যাইতেছে কত যাত্রী হয়ে ভব পার।
সেথায় বসন্ত চির বিরাজে কেবলি
বহিছে মলয়ানিল ঝঙ্কারিছে অলি।
বিকসিত পারিজাত অতুল মাধুরী,
কি সুন্দর মরি মরি!—সে অমরাপুরী!
দেব পতি, মর্ত্ত্যে তব দেবীর জীবন,
কিছু দিন পরে পুনঃ হইবে মিলন।
যে ব্রত নিয়েছ সতী—পাল কায় মনে,
জ্ঞানে ধর্ম্মে শান্তি সুখে পাল প্রজাগণে।
মহীশূর 'মহীশূর-মাহষীর' গুণে,
কতই আনন্দ হয় ওই কথা শুনে!
'স্বর্গদেবী' মহীশূরে করিছেন বাস,
এই কথা কোটিকণ্ঠে করুক প্রকাশ!!

শ্রীচ—

আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলাম, বিধির দুর্লক্ষ্য বিধানে তিনি অকস্মাৎ অন্তর্হিত হইয়া রাজধানীকে ও ভারতকে শোকাচ্ছন্ন করিয়াছেন। জগদীশ তাঁহার শোকার্ত্ত পরিবারকে শান্ত করুন্।

আশ্চর্য্য রবকারী পক্ষী

শুক তোতা প্রভৃতি পাখী মানুষের কথা শুনিয়া তাহার নকল করিতে পারে, ইহা সকলেরই জানা আছে। কিন্তু এমন কতক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারা স্বভাবতঃ মানুষের বুলী বলিয়া থাকে। আমাদের দেশে 'বউ কথা ক' পক্ষী বউ কথা ক বা গৃহস্থদের খোকা হোক্ বলিয়া থাকে। ভোতল নামে এক ভয়ঙ্করমূর্ত্তি পক্ষী আছে, তাহারা রাত্রিকালে উচ্চ বৃক্ষে বসিয়া ঘোঁষরা স্বরে "ঝি দিবি কি বউ দিবি" বলিয়া বার বার ডাকিতে থাকে, না তাড়াইলে উড়িয়া যায় না। কড়্কড়ে নামক আর এক জাতীয় পক্ষী আছে, তাহারাও রাত্রিকালে উচ্চবৃক্ষ বা গৃহের চূড়ায় বসিয়া "কড় কড় কড় কড় কড়াৎ" বার বার এই শব্দ করে এবং শঙ্খ বাজাইয়া বা ঢিল ছুড়িয়া ইহাদিগকে তাড়াইতে হয়। ভোতল ও কড়্কড়ে পক্ষী 'অলক্ষণে' বলিয়া খ্যাত, ইহারা যে গৃহের নিকটে বসিয়া ডাকে, সে গৃহে অনেক সময় মৃত্যুঘটনা হইতে দেখা যায়। আমাদের চাতক "ফটিক জল" বলিয়া গ্রীষ্মকালে আকাশকে প্রতিধ্বনিত করিয়া সকলের প্রাণকে শীতল করে।

আমেরিকার অদ্ভুত রবকারী বিবিধ জাতীয় পক্ষী আছে। বামাবোধিনীর পাঠক পাঠিকাগণ হরবোলার সহিত বিশেষ পরিচিত। এই পক্ষী সকল প্রকার পক্ষীর ডাকের নকল করিয়া কত আমোদ করে! পেরুর জঙ্গলে টরোপিশু নামে পক্ষী দূরস্থ বৃষগর্জনের ন্যায় ভয়ঙ্কর শব্দ করে। টনকুই রক্তবর্ণ, কৃষ্ণপক্ষ, সুন্দর পক্ষী, কিন্তু শূকরের মত "ঘোঁত ঘোঁত" করিয়া ডাকে। ডেমারারা প্রদেশে ছাগ-শোষক (Goat-sucker) নামক পক্ষী, মানুষ অতি শোকে যেমন "হা হা হা হা" করিয়া প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে পরে মৃদুস্বরে কাঁদিয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ ডাকে। উচ্চসুর ধরিয়া থামিয়া থামিয়া ক্রমে নরম সুরে ডাকে। ইহারা নিশাচর পক্ষী, পোকা মাকড় হইতে গোরু বাছুর রক্ষা করে। ওয়াটারটন নামক এক প্রাণিতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত কতকগুলি পক্ষীর ডাক অনুসারে তাহাদের নামকরণ করিয়াছেন। ইহারা স্পষ্টস্বরে এই ইংরাজী কথাগুলি বলে। হু আর ইউ পক্ষীর ডাক who are you? who, who, who, who are you? হু আর ইউ, হু হু হু হু আর ইউ? ইহারা এই ডাক ডাকিতে ডাকিতে দ্বারের কাছে আসিয়া কয়েক হাত উড়িয়া ৫।৬ হাত উচ্চস্থান গিয়া বসে। ওয়ার্ক এওয়ে পক্ষী work away, work work work away, ওরার্ক এওয়ে, ওয়ার্ক ওয়ার্ক ওয়ার্ক এওয়ে বলিয়া ডাকে। আর এক জাতীয় পক্ষী

"Willy come go, willy willy willy come go" উইলী কম গো, উইলী উইলী উইলী কম গো করুণস্বরে এই কথা বলে। আর এক জাতীয় পক্ষী "Whip poor will, whip whip whip poor will" হুইপ পুওর উইল, হুইপ হুইপ হুইপ পুওর উইল বলিয়া ডাকিয়া থাকে।

লুস্বর পক্ষী যন্ত্রবাদক। ইহারা অর্গান বাজনার ন্যায় সুস্বর বর্ষণ করিয়া পেরুর নির্জ্জন বনপ্রদেশ আনন্দময় করে। এই স্বর এরূপ মুগ্ধকর যে পথিক ইহা শুনিয়া আসন্ন ঝটিকা বৃষ্টি ভুলিয়া থমকাইয়া দাঁড়ায়। সিলজিরো পক্ষী কণ্ঠ-সঙ্গীতে কিউবার পর্ব্বতময় প্রদেশকে প্রতিধ্বনিত করে। বুলবুল ইহার গানে পরাজিত হয়। ধনী গায়েনাবাসী শত শত মুদ্রা দিয়া এক একটী পক্ষী কিনিয়া থাকে। গায়েনার বাঁশী পক্ষী ও আমেরিকার চামচচঞ্চু পক্ষীর গানও সুমধুর।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

(২৫৯ সংখ্যা ২৫৩ পৃষ্ঠার পর)

শরীর ভাল না থাকিলে কোনও ধর্ম্ম—কোনও কর্ত্তব্যকর্ম্ম পালন করা যায় না। শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধ করা হয়, সেই অপরাধের ফল স্বাস্থ্যভঙ্গ। বিশুদ্ধ জল, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, নিয়মিত স্নান, পান, আহার পরিশ্রম, ও ধর্ম্ম চিন্তাদির দ্বারা মনে শান্তি আনয়ন করিয়া শারীরিক নিয়মাদি রক্ষা করা উচিত।

বিদ্যা ও নীতি শিক্ষা দ্বারা বুদ্ধিবৃত্তিকে সুমার্জ্জিত করিবে, কি কার্য্যের কি ফল তাহা বুঝিয়া লইবে, পরিজনগণ ও অন্যান্য পরিচিত লোকগণ কে কিসে পরিতুষ্ট হয়েন, তাহা জানিয়া লোককে পরিতুষ্ট করা কর্ত্তব্য কেন না—"জনস্যাশয়মালোচ্য যো যথা পরিতুষ্যতি। তং তথৈবানুবর্ত্তেত পরারাধনপণ্ডিতঃ॥" কোনও আশু বিপদ উপস্থিত হইলে অধৈর্য্য না হইয়া যাহাতে সেই বিপদ-হইতে উদ্ধার প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য।

শৈশবহইতেই নীতি শিক্ষা করা নিতান্ত আবশ্যক। সুনীতি ও উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষা, জীবনের প্রত্যেক কর্ত্তব্য দেখাইয়া দেয়; কর্ত্তব্য কার্য্যে আদেশ ও উৎসাহ প্রদান করে; অনুচিত কার্য্যে অগ্রসর হইতে দেয় না; কার্য্যের সুশৃঙ্খলতা বুঝাইয়া দেয়; মনুষ্যকে সৎকর্ম্মের দিকে ও ঈশ্বরের দিকে আকর্ষণ করে। নীতিকে সকল কার্য্যের ভিত্তি করিলে সমস্ত গুণগুলিই সুপ্রকাশিত হয়।

সুনীতি দ্বারা স্বভাবের গঠন করিতে হইবে। হীনচরিত্র ব্যক্তির কোনও

সৎকার্য্যে অধিকার নাই, আত্ম-সংযমদ্বারা মার্জ্জিত হইলে স্বভাব প্রোজ্জ্বল হইবে। স্বভাব গঠন করিলেই আপনাকে গঠন করা হয়, কেন না "অতীত্য হি গুণান্ সর্ব্বান্ স্বভাবোমূর্দ্ধি বর্ত্ততে॥" অতএব সচ্চরিত্র রমণীগণ—ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সত্য-পরায়ণতা, শ্রমশীলতা, মিতাচারিতা, অপক্ষপাতিতা, সংযতেন্দ্রিয়তা, পরসেবা-পরতা ও ত্যাগ প্রভৃতি গার্হস্থ্য ধর্ম্মের উপযোগী গুণগুলি সহজেই আয়ত্ত করিতে পারিবেন।

লজ্জা রমণীকুলের উজ্জ্বল ও সুচারু-ভূষণ। লজ্জাহীনা রমণীর অন্যান্য সহস্র গুণ থাকিলেও তিনি কুসুমবিহীনা লতার ন্যায়, বারিশূন্য সরসীর ন্যায়, ছাদশূন্য ঘরের ন্যায় শোভা-বিহীন। চৌদ্দ হাত ঘোমটার মধ্যহইতে অট্ট-হাসির রোল বাহির হওয়া, ও একজন অপরিচিত লোক বা ভাশুর শ্বশুর দেখিলে থিয়েটারের পার্টিদের ন্যায় দুম দাম করিয়া গৃহমধ্যে পলায়ন করা প্রকৃত লজ্জা নহে; প্রকৃত লজ্জা মৃদুতা ও বিনয়-মাখা। কোন একটী বালক বালি-কাকে অপরিচিত লোকের নিকট আর-ক্তিম গণ্ডে, বিনতলোচনে, গদ্গদবচে নিজ নখ খুঁটিতে খুঁটিতে তাহার প্রশ্নের উত্তর করিতে দেখিলে যে লজ্জার প্রতি মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হয়, সেই লজ্জার কথা বলিতেছি। শ্বাশুড়ী ননদ ও অন্যান্য পরিবারগণের নামে মিথ্যা নিন্দাপূর্ণ চিঠি স্বামীর সকাশে প্রেরণ করিতে লজ্জা না হইয়া পীড়িত স্বামীর পার্শ্বে বসিয়া শুশ্রূষা করিতে যে লজ্জা অবতীর্ণ হয়েন, সে লজ্জার কথাও বলিতেছি না, বলি-তেছি, অসৎ কর্ম্ম করিতে যে লজ্জা হয়—স্বার্থের জন্য অন্যকে ক্লেশ দিতে যে লজ্জা হয়—গুরুজন সমক্ষে চাপল্য ও পরিহাসাদি প্রকাশ করিতে যে লজ্জা হয়—পরিজনগণের প্রতি অন্যায় আচরণ করিতে যে লজ্জা হয়—এক জনকে নিন্দিত করিবার জন্য মিথ্যা বলিতে যে লজ্জা হয়—বৃথা গর্ব্ব ও আত্মপ্রশংসা করিতে এবং শুনিতে যে লজ্জা হয়—অকারণে বহু পুরুষ সমক্ষে, অনাত্মীয় বা অপরিচিত পুরুষ সমক্ষে বাহির হইতে যে লজ্জা বোধ হয়, সেই লজ্জাই হিন্দু রমণীগণের প্রকৃত লজ্জা, রমণীগণের এই রূপ লজ্জায় বিভূষিতা হওয়া কর্ত্তব্য।

সংসারে ঈশ্বরই সকলের প্রধান আরাধ্য। ঈশ্বরের প্রতি অটল বিশ্বাস ও ভক্তি রাখিয়া সর্ব্ব কর্ম্ম করিবে। যেমন বাজীকরগণ মস্তকে কলসী স্থাপন করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি চালনা করে অথচ তাহাদের মস্তকের কলসী অটল থাকে, সেইরূপ ঈশ্বরকে হৃদয়ে অটল রাখিয়া আহার, বিহার, শয়ন, বিশ্রাম ও সাংসারিক কার্য্যসমূহ নির্ব্বাহ করিবে। ব্যবস্থানুসারে হিন্দুগণ প্রায় সকল অব-স্থায় ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন; শয়নে পদ্মনাভ, ভোজনে জনার্দ্দন, সঙ্কটে মধুসূদন, সর্ব্বকার্য্যে মাধব এবং

স্নানে গঙ্গা, আচমনে বিষ্ণু, পাকে অন্নপূর্ণা, ধনার্জ্জনে লক্ষ্মী, অধ্যয়নে সরস্বতী প্রভৃতি নামে ঈশ্বরকে স্মরণ করিয়া থাকেন, সুতরাং রমণীগণকে সেজন্য স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিতে হইবে না, কেবল মনের একাগ্রতা থাকিলেই চলিবে। ঈশ্বরারাধনায় গৃহটী স্বতন্ত্র হওয়া আবশ্যক, সেই ঘরটীতে কোন অপবিত্র দ্রব্যাদি রাখা কর্ত্তব্য নহে। ধর্ম্মপুস্তক, সুগন্ধি কুসুম, চন্দন, ধুনা গুগ্গুল্, অগ্নি, পবিত্র আসন ও দেওয়ালের গায়ে প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা গণের প্রতিমূর্ত্তি ব্যতীত অন্য কিছু রাখিবে না। সেই গৃহে হাস্য পরিহাস করিবে না ও শাস্ত্রালাপ ব্যতীত অন্য কথা বলিবে না। ধৌত বস্ত্র পরিধান করিয়া সেই গৃহে প্রবেশ করিবে এবং যতক্ষণ তথায় থাকিবে, কেবল ঈশ্বরচিন্তা ও ঈশ্বরের গুণগান করিবে। যে বাটীতে ঈশ্বরের পবিত্র ও অমৃতময় নাম কীর্ত্তিত না হয় সে বাড়ী মরুভূমি বা শ্মশান।

পারিবারিক সুখ সাধন ও অতিথি সেবাই গার্হস্থ্যধর্ম্মের মূল। বহু পরিবার একান্নে থাকিয়া স্থানবিশেষে যে আমরা অশান্তি দেখিতে পাই সে কেবল গৃহিণীগণের স্বার্থপরতা, পরিশ্রম-কাতরতা ও ঈর্ষাপরায়ণতা দোষেই ঘটিয়া থাকে এটী পূর্ব্বে এত অধিক ছিল না, তাহ চিন্তা ও অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে, কেননা পূর্ব্বে হিন্দু পরিবারে ইংরেজ অনুকরণ প্রবেশ করে নাই। এখন ইংরেজ অনুকরণের গুণের ভাগ আত্মনির্ভর, কর্ম্মশীলতা প্রভৃতি আসুক না আসুক, বিলাসিতা ও সৌখিনতার অংশ টুকু পূর্ণ মাত্রায় হিন্দু পরিবারে বিরাজ করায় অনেক গৃহিণী আর এখন একান্নে বহু পরিবার মিলিত হইয়া থাকিতে চাহেন না। যদিও বহু পরিবার একান্নে থাকার দোষ গুণ আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে, তবুও এই টুকু না বলিয়া থাকা যায় না যে বহু পরিবারবেষ্টিত ও একান্নভুক্ত ব্যক্তির মৃত্যুকালে আপন স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের জাতি ও মানরক্ষা এবং প্রতিপালনের ভাবনা ভাবিয়া যাইতে হয় না। যাহাহউক একান্নবর্ত্তিতা যেন রমণীর দোষে পলায়ন না করে। কেননা হিন্দুরমণীর গার্হস্থ্যধর্ম্ম—গুরুজনের শুশ্রূষা, ননন্দা ও যাতৃগণের প্রতি প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করা, দেবরগণের প্রতি ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করা, ভ্রাতা ভগিনীর হিতকামনা করা ও সংসারস্থ লোকগণ যাহাতে সুখে থাকেন কায়মনোযত্নে তাহার অনুষ্ঠান করা। মহর্ষি বেদব্যাস তাঁহার মহাভারত নামক গ্রন্থের নারীধর্ম্মে বলিয়াছেন—

"শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী গুণান্বিতা।
পিতৃমাতৃপরা নিত্যং যা নারী সা তপোধন॥"

এখন অনেক স্থলেই বিশেষতঃ ধনিকন্যা পুত্রবধূকে পুত্রের সন্তোষার্থে—বিলাসিনী বধূর বিলাস-বাসনা চরিতার্থ জন্য শ্বাশুড়ীকেই বধূর শুশ্রূষা

করিতে হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় মহর্ষি ব্যাসদেব এখন জীবিত নাই, থাকিলে "শ্বশ্রূ শ্বশুরয়োঃ পাদৌ তোষয়ন্তী" স্থলে বধ্বাঃ পাদৌ তোষয়ন্তী, বসাইয়া দিতেন যদি বধূর অকল্যাণ হওয়ার আশঙ্কা হইত, তাহা হইলে নয় "পাদৌ" স্থলে "হস্তৌ" দিলেই চলিতে পারিত। সে যাহা হউক অতিথিকেও যতনে আহারাদি প্রদান করা রমণীর কর্ত্তব্য, অতিথি শত্রু হউক, মিত্র হউক, হীন জাতি হউক অথবা যে অবস্থাপন্ন হউক, গৃহে আসিলেই মনে করিতে হইবে—

"সর্ব্বদেবময়োঽতিথিঃ"।

সন্তান-পালন রমণীর একটী গুরুতর কার্য্য। সুধু স্নান, পান, আহার, বেশভূষা করাইয়া 'বাবা,যাদু, গোপাল' বলিয়া আদর করিলে পালন করা হয় না, ধাত্রীকরে সমর্পণ করিলেও সে কর্ত্তব্যের শেষ হইল না। অশিক্ষিতা, অসদ্বংশজা বেতনভোগিনী ধাত্রী-করে কদাচ সন্তানকে প্রদান করিবে না, সন্তানের স্বাস্থ্যের দিকে সর্ব্বক্ষণ দৃষ্টি রাখিবে, সুনীতি দ্বারা সন্তানের চরিত্র গঠন করিবে, অসভ্য ও অসচ্চরিত্র লোক হইতে সন্তানকে দূরে রাখিবে, শিশুর নিকট মিথ্যা কথা বলিবে না ও অন্যায় কার্য্য করিবে না। সন্তানকে সুধু খাওয়াইয়া শোওয়াইয়া আদুরে গোপাল করিয়া তুলিলে চলিবে না, যাহাতে শিশু শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহার অঙ্কুর শিশুর কোমল হৃদয়ে উপ্ত করিয়া দিবেন, তাহা হইলে শিশু ভবিষ্যতে সমাজের ও জগতের কার্য্যে আসিবে এবং বাঙ্গালীগণের মধ্যে "আদর্শ মাতা নাই" এই কলঙ্কও ঘুচিয়া যাইবে। শিশুর হৃদয়ে কুসংস্কার যাহাতে স্থান না পায় তাহার চেষ্টা করিবে, শিশুর সংসাহসে উৎসাহ দিবে, ক্রীড়া কুর্দ্দনে বাধা দিবে না, তবে যাহাতে আঘাত প্রাপ্ত না হয় অবশ্যই সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখিবে—এক কথায় সন্তানটীকে সুশিক্ষিত ও সচ্চরিত্র করাই জননীর কর্ত্তব্য, তাহা নহিলে আর মনুষ্য-জননীর গৌরব কি? পশু পক্ষীরাও ত সন্তান প্রসব করিয়া বাঁচাইয়া রাখে, কিন্তু পশু পক্ষি-জননী অপেক্ষা মনুষ্য-জননীর দায়িত্ব গুরুতর এই কথা স্মরণ করিয়া রাখা মনুষ্য জননীর কর্ত্তব্য, কেননা সমাজের আশা ভরসা ও উন্নতি তাঁহাদের করে ন্যস্ত। অতএব সন্তানকে বাধ্যতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায়, ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ত্তব্যে অটলতা শিক্ষা দিবেন ও অন্যায়, দুষ্কর্ম্ম এবং প্রলোভনহইতে দূরে রাখিবেন, পাপ কার্য্যে ঘৃণা ও ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি জন্মাইয়া দিবেন। জননী শিশুর প্রতি মিষ্ট ব্যবহার করিবেন। কর্কশ ব্যবহারে শিশুগণ বাধ্য না হইয়া অবাধ্য হইয়া উঠে। শিশুকে শাসন করিতে হইলে দুমদাম করিয়া প্রহার না করিয়া বা যমের বাড়ী যাইতে আদেশ না দিয়া তাহার প্রিয়বস্তু হইতে একদিনের জন্য

বঞ্চিত করিলে সে বিলক্ষণ শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। শিশুকে কোন দ্রব্য দিতে চাহিয়া পরে তাহা না দেওয়া অন্যায়, কারণ উহাতে তাহাকে প্রতরণা শিক্ষা দেওয়া হয়। শিশুগণ স্বইচ্ছায় যাহা খায় তাহা ব্যতীত জুজুর ভয় দেখাইয়া খাওয়ান অন্যায়। শিশুগণ যাহাতে উদ্যমশীল ও শ্রমশীল হয় তাহা করা কর্ত্তব্য।

(ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। নূতন বর্ষে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হইয়াছেনঃ—বাবু নৃসিংহচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বাবু ভূপেন্দ্রনাথ বসু এবং বাবু দেবপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী। তিনজনই সুবিদ্বান্ ও সুযোগ্য।

২। গত ২৮এ ডিসেম্বর প্রাতে কলিকাতার বেলেঘাটা প্রাসাদে মহীশুরের মহারাজা সার রাজেন্দ্র উদিয়ার বাহাদুরের মৃত্যু হয়। ইনি বিধবারাণী এবং ২ পুত্র ও ৩ কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। সদাশয়া রাণী এই উপলক্ষে ১০ হাজার ভিক্ষুককে এক একখানি কম্বল বিতরণ করিয়া সদল স্বদেশ গমন করিয়াছেন।

৩। মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে এক মুসলমান বালিকা এফ এ পরীক্ষা দিয়াছেন। ইহাঁর নাম কুমারী বেলগ্রামি। ইহা মুসলমান স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির প্রমাণ।

৪। জাতীয় মহাসমিতি উপলক্ষে মান্দ্রাজে সামাজিক সভার ৮ম বার্ষিক অধিবেশন হয়, তাহাতে সুব্রহ্মণ্য আর্য্য সি আই ই সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, সভায় কয়েকটী সৎপ্রস্তাব ধার্য্য হইয়াছে।

৫। সমাজ-সংস্কার প্রচারক বাবু মহেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বঙ্গদেশের নানাস্থান পরিদর্শন করিয়া বহুবিবাহের যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় বরিশালের কলসকাটীর ঈশ্বরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অল্পদিন পরলোকগত, তিনি ১০৭টী বিবাহ করিয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় ভাটকুল গ্রামের কিশোরীমোহন মুখোপাধ্যায় জীবিত বহুবিবাহকারীদিগের শ্রেষ্ঠ, তাঁহার স্ত্রীসংখ্যা ৬৫টী। ২০ বৎসরের দুইটী ব্রাহ্মণ যুবক ১১টী ও ৭টী করিয়া বিবাহ করিয়াছেন। আজিও দেশের কি দুর্দ্দশা!

৬। ভিয়েনা নগরে আডল্‌ফ শ্লেসিঙ্গার নামে এক ব্যক্তি সম্প্রতি ক্ষয়কাশ রোগে মারা গিয়াছে। তাহার হৃৎপিণ্ড বক্ষকোশের দক্ষিণ দিকে এবং প্লীহা, যকৃৎ ও নাড়ী সকলের সংস্থান উল্‌টা দিকে ছিল!

৭। বাইবেল ও কোরাণমতে মানবের আদিমাতা ইব। আরবের

জিড্ডা নগরে তাঁহার এক কবর আছে, প্রতি বৎসর ৪০ হাজারের অধিক যাত্রী তাহা দর্শন করিতে যায়।

৮। পশুশালায় ৯ ফিট দীর্ঘ একটী বরাচিতা সাপ ৭ ফিট দীর্ঘ এক সহচর সর্পকে উদরসাৎ করিয়াছে।

৯। সুরাজপুরের রাজরাজেশ্বরী প্রসাদ সিং আরায় জলের কল স্থাপনার্থ দেড় লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

১০। মহারাণী স্বর্ণময়ী কলিকাতা মূকবধির বিদ্যালয়ে ৩০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

১১। আফগানস্থানে বিবি হামিল্‌টন আমীরের অন্তঃপুরের ডাক্তার হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে একা এক ঘরে ৬ জন শাস্ত্রি-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে হয়। কোনও সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার কিছু লিখিবার অধিকার নাই।

১২। হস্তী ৬০০ হস্ত দূর হইতে মানবের আঘ্রাণ বুঝিতে পারে।

বামারচনা।

শীতকালের পত্র।

শ্রীমতী নঃ——

১

কি লিখিব বিধুমুখি,
তব সুখে আমি সুখী,
জানিছ তা' চির দিন কি কাজ কথায়,
তবে কি না পৌষ মাস,
তাহাতে পশ্চিমে বাস,
এত শীতে চিটি ফিটি লেখা বড় দায়!
আমার মুখের কথা,
কি লিখিব স্নেহলতা,
দারুণ পাহা'ড়ে শীতে ফেটে গেল কায়;
জানিতেছ অতঃপর,
অগাউন কলেবর,
পায়ে নাই বুট মোজা, ক্যাপ না মাথায়!
বিধি পাঠাইলা ভুলে,
বাঙ্গালি হিন্দুর কুলে—
পাথর লোহায় গ'ড়া যাহাদের নারী—
আমরা তো ননী-দলা—
কাজ নাই খুলে বলা—
মা' পিসী, ঠাকু'মা সম আমরা কি পারি?
পরম গুণের নিধি
শ্রীমতী বামুন দিদি
গরম গরম রুটি দিবেন রাঁধিয়া—
কপালে তা লেখা নাই,
তাই যেতে হয় ভাই,
নিঠুর রন্ধন-শালে "অন্নদা" স্মরিয়া!
যদি মোরে ভালবাস
ত্বরা তুমি হেথা এস,
তোমা বিনা এত শীতে টি'কেনা পরাণ;
এ বাহুতে তুমি শক্তি,
এ হৃদয়ে তুমি ভক্তি,
এ শীতে তুমিই মম শাল আলোয়ান!
এস চলি সুবদনে,
লেপ গায়ে দুইজনে,
খুলি হৃদি খুলি মুখ জাগি সারা রাতি,
ছারপোকা ভরি প্রাণ
শোণিত করিয়া পান,
আমাদের "মহত্বের" করুক সুখ্যাতি!

আমি তাই ভাবি নিত্য,
কি সুখ ভ্রমিতে তীর্থ,
তুমি ভাই, চলে গেলে হরিদ্বার কাশী ?
কি বলিব কি যে দুঃখ,
তুমিও হ'লে কি মূর্খ ?—
কোটী তীর্থফল পেতে এখানে যে আসি !
ঘোমটায় মুখ ঢেকে,
(চাঁদেতে নীরদ মেখে !)
এখানে হ'তনা সদা লুকাতে অন্দরে,
ফিরিতাম দুই জনে
শৈলে শৈলে বনে বনে,
নির্ঝরে, তটিনী-তটে, নীরব কন্দরে !
হা ধিক্ তোমার চিত্তে,
এর চেয়ে কোন্ তীর্থে
আশার সুসার কিবা, কিবা পুণ্য মিলে ?
অনিত্য জগত ভাই,
সুখহীন সর্ব্ব ঠাঁই,
কি হইবে রেলওয়ে ভ্রমিতে লাগিলে ?
নিত্য সুখ চিরতরে
এখানে বিরাজ করে,
দোলে মানবের পিঠে যশ-পুণ্য-ছালা,
অদৃষ্টে সৌভাগ্য ফোটে,
নিত্য দুপহরে জোটে
খিচুড়ী পায়সে ভরা খাগড়াই থালা !
বেশী কথা কাজ নাই
"পয়সা" অনিত্য ভাই—
"রিটার্ণ টিকেট" খানি ছিঁড়ে ফেলে দাও,
কাব্য রস, গব্য রস,
দেহে পুষ্টি, নামে যশ,
আইস !—এসব সুখ ভোগ করে যাও।

শুনিলাম এই মাসে
যাবে তুমি পতি-পাশে,
করিতে গৃহিণীপনা—ধিক্ মূর্খতায়—
এত শীতে নারী কেবা,
করে পতি-পদ-সেবা,
পৌষ মাসে ঘরকন্না কে করিতে চায় ?
শাস্ত্রের বচন সতি !
শীত কালে যার পতি
রাঁধেন বাড়েন নিজে প্রফুল্ল অন্তরে,
"সেই ধন্যা নারীকুলে,
লোকে তারে নাহি ভুলে"
চির-সোহাগিনী জায়া শিবদুর্গা-বরে !
ছুতো পেলে মুখ নাড়া—
মনে মনে "লক্ষ্মী ছাড়া"
সে অনিত্য আবদার দূর করি দাও,
ত্বরা করি এস চলে,
আমারি লেপের তলে,
কিছুদিন নিত্য সুখ ভোগ করে যাও।
পত্র পাঠ মাত্র, রাগি,
নিয়ে এস মুখখানি,
অধরে সে হাসি এন, নয়নে সে দিটি,
কথা এন মিঠে কড়া,
(অভিমানে সুর চড়া)
আঁচলে বাঁধিয়া এন সে ক'খানি চিটি।
এ শীতে পাহা'ড়ে দেশে,
একেলা নিরীহ বেশে,
নিতান্ত নীরব হ'য়ে থাকা বড় দায়—
তাই পত্র ডাকে দিয়ে,
পথ-চাওয়া আঁখি নিয়ে,
রহিলাম লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায়।

তোমারই
মেজদিদি।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬১ সংখ্যা | মাঘ ১৩০১—ফেব্রুয়ারি ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

কুমারী মূলার—ইনি বিলাতের (Purity Society) পবিত্রতা সংরক্ষণী সভার সম্পাদিকা এবং এক ধনাঢ্যা রমণী। ভারতের প্রতি তাঁহার এতদূর অনুরাগ যে অক্ষয়কুমার ঘোষ নামক এক হিন্দু বালককে পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার বারিষ্টারী শিক্ষার ব্যয় দিতেছেন। ইনি নিরামিষ ভোজন করেন এবং অনেক বিষয়ে হিন্দু-ভাবের পক্ষপাতিনী। মান্দ্রাজ কনগ্রেস দেখিয়া কলিকাতায় আসিয়াছেন।

মূক-বধির বিদ্যালয়ে আশ্চর্য্য দান—খিদিরপুরবাসিনী শ্রীমতী কামিনী দাসী সুবর্ণবণিক্জাতীয়া এক বিধবা রমণী। তাঁহার স্বামী তেজারতী করিয়া কিছু টাকা সঞ্চয় করেন এবং মৃত্যুকালে সৎকার্য্যে অর্থ দান করিবার আদেশ করিয়া যান। পতিব্রতা রমণী "কালা বোবারা অতি দয়ার পাত্র" বুঝিয়া তাহাদের জন্য ৬১৮০ টাকা দান করিয়াছেন। ইহাদ্বারা কোম্পানীর কাগজ ক্রীত হইয়া মূক-বধির বিদ্যালয়ের ট্রষ্টীদিগের হস্তে থাকিবে। আমরা আশা করি এই দানে বিদ্যালয়ের স্থায়ী ফণ্ডের সূত্রপাত হইল। অন্যান্য দয়াশীল পুরুষরমণীগণ এই সদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া এই ফণ্ডের উন্নতিবিধান করুন্।

দান—মহীশূরের মহারাণী শোভাবাজার দাতব্য সভায় ৪০০৲ টাকা দান করিয়াছেন। বোম্বাই সহরের দুর্গ মধ্যে এক পুস্তকালয়ের গৃহনির্ম্মাণার্থে দীন বাই লক্ষ টাকা দিয়াছেন।

চীন জাপানী যুদ্ধ—হাইফঙ্গ নামক স্থানে আবার এক ঘোরতর যুদ্ধ হয়,

তাহাতে চীনেরা পরাস্ত ও তাহাদের ২০০ সৈন্য হত হইয়াছে। জয়ী জাপানীরা চিঙ্কু অধিকার করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছে। চীন সৈন্যদল তাহাদের ভয়ে সুবিখ্যাত বৃহৎ প্রাচীরের নিম্নে আশ্রয় লইয়াছে। শীত ও বরফপাত হেতু জাপানীরা দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতে পারিতেছে ন।

ভারতেশ্বরীর সৌজন্য— বোম্বাইয়ের ফতেহালি সেথ মহম্মদের দুহিতা আলি আকবর বিবি সাহের উইণ্ডসার প্রাসাদে মহারাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বহস্ত নির্ম্মিত কয়েকটী জরীর পাড় উপহার দেন। মহারাণী অতি সমাদরে তাহা গ্রহণ করিয়া স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বিবীর এক পুস্তকে স্বহস্তে আপনার নাম লিখিয়া দিয়াছেন।

নগর ভাঙ্গা গড়া—দিল্লী মহানগর অনেকবার ভাঙ্গিয়া নূতন নূতন স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে, কিন্তু হিরাটের ন্যায় ধ্বংসশীল নগর আর নাই। ইহা ৫৬ বার ধ্বংস হইয়া ৫৬ বার নূতন গঠিত হইয়াছে।

রুক্মা বাই—বিলাতে এম ডি পরীক্ষোত্তীর্ণা হইয়া স্বদেশে ফিরিয়াছেন ও চিকিৎসা ব্যবসায় আরম্ভ করিয়াছেন।

অতিকায় রমণী—রেঙ্গুণে এক স্থূলকায় মগ যুবতী প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার বয়স ২১ বৎসর মাত্র, ইতিমধ্যে দেহের উচ্চতা ৭ ফুট অতিক্রম করিয়াছে।

বারমেসে।

ফাল্গুন।

ফাল্গুন পুরা বসন্ত কাল। এই কালে মৃত্তিকায় নব রসের সঞ্চার হইয়া থাকে। এই জন্য এমাসে চাসবাসের অনেক কথা আছে। আমরা অতি সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিব।

পান,—যাহারা পানের চাস করে, তাহাদিগকে বারুজি বারুই কহে। বারুজি নবশাখ জাতির অন্তর্গত, জলাচরণীয়। পানের চাসে যেরূপ লাভের কথা শুনা যায়, তাহাতে এক বিঘা জমিতে পানের চাস করিতে পারিলে, পল্লীগ্রামের একটী ক্ষুদ্র গৃহস্থের সংসার চলিয়া যায়। পান চাসের জমা খরচ ঠিক্ করা বড় সহজ নহে; কিন্তু শুনিতে পাই, খরচ বাদে এক বিঘা জমির পানে বাৎসরিক ১৫০৲ দেড় শত টাকা লাভ হইতে পারে।

যেখানে বেশি রৌদ্র পায় না, প্রায়ই ছায়া থাকে, তাদৃশ দোআঁশ মাটীর ভূমিকে ন্যুব্জপৃষ্ঠ অর্থাৎ কাছিম পিঠে করিয়া তাহাতে পানের চাস করিতে হয়; কারণ পানের গোড়ায় বর্ষার জল লাগিলে অনিষ্ট হয়। এই জন্য ভূমিকে

কাছিম পিঠে করিতে হয় এবং বৃষ্টির জল সহজে নির্গত হইতে পারে, এজন্য ঐ ভূমির মধ্যে মধ্যে নালা কাটিতে হয়। ঐ নালার উভয় পার্শ্বে দাঁড়া বাঁধিয়া ফাল্গুন মাসে পান লতার গোড়া, বা ডগা রোপণ করিয়া তাহা তৃণপত্রাদিদ্বারা আচ্ছাদন পূর্ব্বক তদুপরি জল সেচন করিতে হয়। ঐ তৃণাদি সর্ব্বদা জলসিক্ত থাকা আবশ্যক। পরে উপরে ও চারিপাশে শর, খড়ি, বা পাকাটির মাচা ও বেড়া বাঁধিয়া দিবে এবং প্রত্যেক দাঁড়ার পার্শ্বে শর বা খড়ির জাফরি বাঁধিয়া দিবে। ভূমির মধ্যে মধ্যে জিয়ল, জীবন, জয়ন্তী প্রভৃতি বহুপত্রযুক্ত জীবিত বৃক্ষ সকল রোপণ করিতে হয়, তাহাতে পানের ভূমিতে ছায়া হয়। ছায়ায় পান ভাল থাকে। প্রত্যেক পানের মূলে এক একটী সর, খড়ি, বা পাকাটি দিয়া পার্শ্বের বেড়া ও মধ্যের জাফ্রির সহিত যোগ করিয়া দিতে হয়। তাহাতে পানের লতা সকল ঐ শরাদির আশ্রয়ে মাচায় উঠে। ভূমি পরিষ্কার রাখা, মধ্যে জল সেচা এবং পানের লতা সকলকে টানিয়া ও গোছাইয়া দেওয়াই পানের প্রধান পাইট। পাকা পানই ব্যবহার যোগ্য, এজন্য লতার গোড়ার দিক হইতে পান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিতে হয়। পানের ক্ষেত্রে অধিক চাস দিতে হয় না। যথা—

"ষোল চাসে মূলা,
তার অর্দ্ধেক তুলা;
তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাসে পান।"　খনা।

আড়াই বৎসরের কমে পানলতা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় না। প্রথম ফাল্গুন বা চৈত্রে রোপণ করিতে হইবে, তাহার পর তিন শ্রাবণ অতীত হওয়া আবশ্যক। যথা,—

"এক আষনে ধান;
তিন শাওনে পান।"　খনা।

আষাঢ় শ্রাবণ মাসে অতিরিক্ত পান জন্মে, সে পান খাইলে পিত্তবৃদ্ধি হয়; এজন্য তাহা খাওয়া নিষিদ্ধ।

ধান,—যদি বর্ষার গতিকে এমন ঘটনা হয় যে, ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে হৈমন্তিক ধান্যচ্ছেদ করা যায় না, ফাল্গুনেই তাহা করিতে হয়, তাহা হইলে সে ধানে কিছুই হয় না। যথা,—

"——ফাল্গুনে ফাঁড়া।" ফাঁড়া অর্থাৎ ধান্যে মহা বিঘ্ন।

তিল,—ফাল্গুনের শেষ আট দিন এবং চৈত্রের শেষ আট দিন, ইহার মধ্যে তিল বপন করিলে সেই তিলগাছ উত্তমরূপ সতেজ হয়। যথা,—

"ফাল্গুনের আট, চৈত্রের আট;
সেই তিল দায়ে কাট।"　খনা।

কলা,—ফাল্গুন মাসে কলাগাছের এঁটে কাটিয়া রোপণ করিলে কলার ঝাড় খুব বড় হয় এবং সেই ঝাড়ে অধিক কলা ফলে। যথা,—

"ফাল্গুনে এঁটে পোঁত কেটে;
বেধে যাবে ঝাড়কি ঝাড়।
কলা বইতে ভাঙ্গবে ঘাড়।"　খনা।

ফাল্গুন মাসে কলার আবাদ করিলে ঝাড় এত উত্তম হয় যে, সেই ঝাড়ে মাঝে মাঝে কলা ফলে। যথা,

"যদি রোয় ফাল্গুনে কলা;
তবে হয় মাস ফসলা।" খনা।

পটল,—এই মাস পটল রোপণের প্রশস্ত সময়। পটলের মূল সকল উত্তমরূপে কর্ষিত ভূমিতে প্রতি থানায় ৩।৪টী হিসাবে রোপণ করিতে হয়। রোপিত মূলগুলির উপর শুষ্ক আচ্ছাদন করিতে হয়। ঐ পরিচালক তৃণে শিশির সঞ্চিত হইয়া সত্বর অঙ্কুরোদ্‌গমের সহায়তা করে।

"পটল বুন্‌লে ফাগুনে;
ফল বাড়ে দ্বিগুণে। খনা।

ওল,—ওলের প্রথম আবাদও এই মাসে করিতে হয়। এই মাসে ওলের আবাদ না করিলে ওল ভাল হয় না। ওল উৎকৃষ্ট তরকারী। এই মাসে বিশেষ যত্নসহকারে ওলের আবাদ করা উচিত।

"ফাগুনে না রুলে ওল;
শেষে হয় গণ্ডগোল।" খনা।

যে স্থানে উত্তমরূপে রৌদ্র লাগে না, সর্ব্বদা ছায়া থাকে, সেখানে ওলের আবাদ করা উচিত নহে; কারণ তথাকার ওলে মুখ ধরে; কিন্তু তত্রত্য ওল বেশ বড় বড় হয়।

"ছায়ার ওলে চুলকায় মুখ,
কিন্তু তাতে নাহিক দুখ।" খনা।

বাঁশ,—এই মাসে বাঁশঝাড়ের গোড়ায় আগুন দিতে হয়। শরতের প্রারম্ভ হইতেই বৃক্ষাদির পত্র স্খলন আরম্ভ হয়। অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত তরুলতাদির প্রায় সমস্ত পত্র পতিত হইয়া যায়। এই মাসে বাঁশ ঝাড়ের গোড়ায় যত শুষ্ক পাতা পতিত থাকে, তাহা মূলদেশের চতুঃপার্শ্বে রাশীকৃত করিয়া তাহাতে অগ্নি দিতে হয়। ঐ অগ্নিদ্বারা গোড়ায় সমস্ত বাঁশপাতা পুড়িয়া ছাই হয় এবং চৈত্রমাসে ঐ ছাইয়ের উপর মাটী চাপা দিতে হয়। এই মাটী পলল হইলে বড় ভাল হয়। ঐ বাঁশপাতা পোড়া সার এবং মাটী পরবর্ত্তী বর্ষা নাবিতে গলিত ও মিলিত হইয়া বাঁশঝাড়ের বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করে। এই শ্রীবৃদ্ধি অতি সত্বর হয়। এই সঙ্গে বাঁশঝাড়ের আরও একটা নিয়ম জানা উচিত। যখন ঝাড় হইতে বাঁশ কাটিবার প্রয়োজন হইবে, তখন তিন বৎসরের ন্যূন-বয়স্ক বাঁশ কাটা হইবে না।

"ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী;
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি। অথবা
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটী।"

মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায়, সন্তানের মুক্তি।

(৩৬০ সংখ্যা ২৬৬ পৃষ্ঠার পর)

শেষ।

এ জগতে যিনি মাতৃ-ভক্ত ও মাতৃ-উপাসক, তিনিই দেবতুল্য, তিনিই নর দেবত। ভগবদ্ভক্ত প্রহ্লাদ ও ধ্রুবের মাতৃ-ভক্তি, আদর্শ মাতৃ-ভক্তি। চৈতন্য দেব সন্ন্যাসী হইয়াও মা'কে দেখিতে আসিয়াছিলেন, ভিক্ষালব্ধ বস্ত্রখানি

মা'কে দিয়াছিলেন, মা'র আজ্ঞায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে অন্বেষণ ও নীলাচলে বাস করিয়াছিলেন। মহাত্মা যীশু খ্রীষ্ট শত্রুর চাতুরীতে যখন ক্রুশে নিহত হন, তখন পার্থিব ভাবনার মধ্যে কেবল মা'র ভাবনাই ভাবিয়াছিলেন, পার্থিব কাজের মধ্যে কেবল মা'কেই শিষ্যের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন (১)। যে রাজা রাম মোহন রায় ধর্ম্মবিশ্বাস, সত্যনিষ্ঠা ও মহাপ্রাণতার আদর্শস্বরূপ, তিনি এমনই মাতৃ-ভক্ত ছিলেন যে মাতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য (নিরাকার ঈশ্বরবাদী হইয়াও) ইজার চাপকান খুলিয়া, গোময়ে চরণ স্পর্শ করিয়া হিন্দু-দেবালয়ের সীমায় পদার্পণ করিয়াছিলেন (২)। যে কেশব চন্দ্র সেন দেশে বিদেশে "মহাপুরুষ" বলিয়া কীর্ত্তিমান্, সেই কেশব চন্দ্র সেন এমনই মাতৃভক্ত, যে মৃত্যু-কালে মায়ের পদধূলি মাথায় দিয়া বলিয়াছিলেন "মা! তোমার গুণগুলি পাইয়াই আমি মানুষ হইয়াছিলাম—তোমার মত মা যেন সকলেরই হয়"! যে অক্ষয় কুমার দত্ত বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন, যাঁহার মহত্ত্ব শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাইতে হয়, সেই অক্ষয় কুমার এমনই মাতৃভক্ত যে প্রাণের উচ্ছাসে বলিয়াছেন—

প্রত্যক্ষ-দেবত-মাতুশ্চরণং কমলায়তে।
অঙ্গুল্যশ্চ দলায়ন্তে মনো মে ভ্রমরায়তে।" (৩)

যে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা দেশ ধন্য করিয়া গিয়াছেন, যে বিদ্যাসাগরের গুণের খ্যাতি ভারতে "যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ" রহিবে, সেই বিদ্যাসাগর এমনই মাতৃ-ভক্ত যে সাঁতার দিয়া নদী পার হইয়া মাতৃ-দর্শনে গিয়াছিলেন এবং বহুদিনগতা জননীকে মনে হইলেই বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিতেন! এ সংসারে যে কেহ প্রকৃত মাতৃ-ভক্ত, মাতৃ-উপাসক, তিনি বিনীত, নিরহঙ্কারী, কৃতজ্ঞ, সহৃদয় ও নরদেবতা। সকলেই যে বিদ্যাসাগর প্রভৃতির মত যশস্বী হইতে পারেন না একথা সত্য, কিন্তু মাতৃভক্তি ও মাতৃ উপাসনাতে সন্তান যে মুক্তি লাভ করিতে পারেন, একথা আরও সত্য।

যে সন্তান মাতার নিকটে অকৃতজ্ঞ, সে মানব-কুলকলঙ্ক। সে জ্ঞানীই হউক, ধনীই, যত বড় ক্ষমতাপন্নই হউক, বরং মাতৃভক্ত দীন, মূর্খের পদ-ধূলি লইব, তথাপি সে অকৃতজ্ঞ সন্তানের ছায়াও স্পর্শ করিব না! তাহার হৃদয়ও নাই, তাহাতে মনুষ্যত্বও নাই!—বড় দুঃখের কথা, বড় ক্ষোভের কথা আজি কালি আমাদের দেশে অকৃতজ্ঞতার কিছু

---

(১) মোহন লিখিত সুসমাচার দেখ।

(২) রাজা রামমোহন রায়ের উক্ত কার্য্য শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ বিদ্যানিধি লিখিত ও "সাহিত্য পত্রে প্রকাশিত।

(৩) শ্রদ্ধেয় অক্ষয় বাবুর কবিতার অর্থ এই যে "প্রত্যক্ষ-দেবতা-মাতার চরণপদ্ম, অঙ্গুলিগুলি সেই পদ্মের দল এবং আমার মন তাহাতে ভ্রমর হইয়া আছে।"

বাড়াবাড়ি হইয়াছে! মা যে সন্তানের "সাক্ষাৎ ঈশ্বরী" একথা অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছেন; কারণ ভারতবর্ষের দুরদৃষ্ট ক্রমে অনেক ভারত-সন্তান বিচারশক্তি হীন হইয়া পাশ্চাত্য আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতেছেন! ভারতীয় নীতির অনেক গুলি যে আদর্শ নীতি, ইহা তাঁহারা বোঝেন না! তবে যাহা ভাল তাহা বিদেশের হইলেও গ্রহণীয়, যাহা মন্দ তাহা দেশের চিরন্তন প্রথা হইলেও ত্যাজ্য—কিন্তু আজিকার দিনে সে হিসাব দূর হইয়াছে—যাহা ইংরাজে বলে, ভাল হউক আর মন্দ হউক, তাহাই ভারতবাসীর শিরোধার্য্য। যাহা ইংরাজে করে, সঙ্গত হউক আর অসঙ্গত হউক, তাহাই ভারতবাসীর "অবশ্য কর্ত্তব্য"। ইংরাজের পদানুসরণ করিয়া চলিতে পারিলেই ভারতবাসীর জীবন সার্থক হয়! এসব কাজ রাজভক্তি-মূলক নহে, মহত্বের ভক্তিমূলকও নহে—অন্ধ ভক্তি মাত্র! অন্ধ ভক্তি প্রণোদিত হইয়াই ভারতবাসী সর্ব্বস্ব হারাইতে বসিয়াছেন, গুণ ছাড়িয়া দোষ অনুকরণীয় হইতেছে, ভাল ছাড়িয়া মন্দ টানিয়া আনিতেছেন? এদিকে স্বদেশের জীবন্ত নীতি, অমূল্য রত্নাবলী, ছাই চাপা পড়িয়া মারা যাইতেছে!—এই এদেশে মাতৃ-ভক্তি বিষয়ক অমূল্য উপদেশ, উজ্জ্বল আদর্শ সকল থাকিতে, পাশ্চাত্যে নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, ডিউক অব ওয়েলিংটন, জর্জ্জ ওয়াসিংটন, ম্যাট্সিনি, সামুয়েল রোমেলি প্রভৃতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত থাকিতে, এদেশীয়েরা সাধারণ সাহেব, নগণ্য সাহেব, চুণাগলির পচা সাহেব-দিগকে "আদর্শ" স্বরূপ মনে করিতেছেন! মাতৃ-ভক্তি দূরে যাউক, এই রকম সাহেবেরা মাতার ভরণ পোষণ যে প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য, তাহাও বোঝেন না! ইহাদিগের পদাঙ্ক লক্ষ্যকারী অনেক দেশীয় "কৃতীসন্তান"ও সেই আদর্শ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইয়াছেন!—ইঁহারা কেহ কেহ মাতাকে "Dear mother" বলিয়া "অনুগ্রহ" করেন, কেহ কেহ "বুড়া মাগী"কে ভক্তি ও যত্নাদি করা ভারি "অসভ্যতা" মনে করেন!! ভারতবর্ষ যত কারণে অধঃ-পতিত হইতেছে, সন্তানের মাতৃভক্তির হীনতা তন্মধ্যে এক প্রধান কারণ। মাতৃ-ভক্তির হীনতায় মানবের হৃদয় শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইতেছে; সহৃদয়তা, নিরহঙ্কারিতা দূর হইতেছে; আত্মার সদ্গুণ সকলও বিলুপ্ত হইতেছে!! যে ব্যক্তি মাতার নিকটে অকৃতজ্ঞ, সেইই প্রকৃত কৃতঘ্ন! যেখানে কৃতঘ্নের বাস, সেস্থান শ্মশান হইতেও ভয়ানক। কৃতঘ্ন ব্যক্তি নরপিশাচ সদৃশ—হিন্দু শাস্ত্রে কৃতঘ্নতাকে পাপের "শেষ সীমা" বলা হইয়াছে, সংস্কৃতে আছে—

"ব্রহ্মঘ্নে চ সুরাপে চ চৌরে ভগ্নব্রতে তথা।
নিষ্কৃতি র্বিহিতা রাজন্ কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ॥"

প্রকৃত পক্ষে কৃতঘ্নতা যে মহা পাতক, একথা ভাবিয়া দেখিলে সকলেই বুঝিতে

পারেন।—এবং সেই সঙ্গে মাতৃ-ভক্তি লাভ যে সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাও বুঝিতে পারেন। যেদিন এদেশের ছোট বড়, বালক বৃদ্ধ, মুর্খ পণ্ডিত, স্ত্রী পুরুষ সকলেই মাতৃ-ভক্ত হইবেন, মাতৃ-ভক্তির পূর্ণ বিকাস করিতে পারিবেন, এ পতিত দেশ সেই দিনেই উঠিবে, সেই দিনেই মানবের—এ দেশীয় মানবের "জাতীয় উত্থান" ঘটিবে!

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, ভারতীয় অনেক নীতি জগতের আদর্শ নীতি। জ্ঞান, ধর্ম্ম ও সভ্যতায় এক দিন ভারতীয় আর্য্যজাতি পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সর্ব্বাংশে সম্পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের মাতৃ-ভক্তির প্রবলতায়ও সকলকে মুগ্ধ হইতে হয়; তাঁহাদেরই নিকটে "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" ছিল! তাঁহারা জানিতেন

"যদ্গর্ভে জায়তে লোকো যস্যাঃ স্নেহেন জীবতি।
সা সাক্ষাদীশ্বরী মাতা কোঽস্তি মাতৃসমোগুরুঃ।"

মাতাকে সম্মাননা, মাতৃ-সেবা, মাতৃ-আজ্ঞা পালন, মাতৃ-প্রিয়কার্য্য সাধন, মাতাকে সামান্য মানবী না ভাবিয়া পরম দেবতা মনে করা, এই সকল মাতৃ-উপাসনা তাঁহারা সন্তানের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য মনে করিতেন। আবার মাতা পরলোক গামিনী হইলে সন্তান পাছে মাতৃ-ভক্তি চ্যুত হইয়া পড়েন সেই ভয়ে তাঁহারা পরলোকগতা মাতার আদ্য শ্রাদ্ধ, সপিণ্ডীকরণ, বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। এই কাজগুলি মাতার উদ্দেশে সন্তানকেই করিতে হয়; এই কাজগুলি যে মাতৃ-উপাসনা ভক্তিবৃত্তির স্ফুরণ ও ভক্তি-বৃত্তি চরিতার্থ করা যে এই কাজগুলির উদ্দেশ্য, ইহা বোধ হয় ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী সন্তান-গণ সকলেই বুঝিতে পারেন। ইহার মধ্যে গয়াধামের "মাতৃ-ষোড়শী" ভক্তিবৃত্তি স্ফুরণের একটী উৎকৃষ্ট উপায়। গয়াক্ষেত্রে গদাধরের পাদপদ্মের অতি নিকটে মাতৃ-ষোড়শী বলিয়া একটী স্থান আছে। সেখানে মাতৃ শ্রাদ্ধার্থী সন্তানকে মাতার উদ্দেশে ষোড়শটী পিণ্ড দান করিতে হয়, এবং প্রত্যেক পিণ্ডদান সময়ে এক একটী মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, মন্ত্রগুলি মাতৃভক্তি-উদ্দীপনার এত সহায়, যে পড়িলে প্রত্যেক মানবের হৃদয় মাতৃ-ভক্তি-স্রোতে প্লাবিত হইয়া থাকে এবং মাতা যে সন্তানের প্রত্যক্ষ দেবতা তাহাও বোধগম্য হইতে থাকে। পাঠক পাঠিকা-দিগের অবগতির জন্য আমরা মাতৃষোড়-শীর(১) সংস্কৃত মন্ত্র ও বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিলাম—

মাসি মাসি কৃত কষ্টং যাতনাং প্রসবেষু চ।
তস্যানিষ্ক্রমণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্।

গর্ভাবস্থায় যে মাতা (আমার জন্য) মাসে মাসে কষ্ট ও পরে প্রসবকালে যাতনা ভোগ করিয়াছেন, সেই সকল

(১) বহুদিন পূর্ব্বে মাতৃষোড়শী বামাবোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল।

নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

গাত্রভঙ্গোভবেন্মাতুঃ তৃপ্তিং নৈব প্রযচ্ছতি।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ২ ॥

গর্ভাবস্থায় সর্ব্বদাই মাতার গা ভাঙ্গিত, কিছুতেই তৃপ্তি হইত না, সেই নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পদভ্যাম্‌ সঞ্চায়তে মাতুর্দুঃখঞ্চৈব সুদুস্তরম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৩ ॥

গর্ভাবস্থায় সন্তানের পদতাড়নার জন্য মাতার বিবিধ, দুস্তর ক্লেশ হইয়া থাকে তাহা নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পূর্ণেচ দশমে মাসি মাতুরত্যন্ত দুষ্করম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৪ ॥

দশমাস পূর্ণ হইলে মাতার যে দারুণ গর্ভযন্ত্রণা হইয়াছে, তাহা নিষ্কৃতির জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

গর্ভাদবগমে চৈব বিষমে ভূমি বর্ত্মনি।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৫

গর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবার সময়ে মাতার যে বিষম কষ্ট হইয়াছে, তাহার নিষ্কৃতির (অর্থাৎ প্রতিশোধ) জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

শৈথিল্যং প্রসবে চৈব মাতুরত্যন্তদুঃসহম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৬

প্রসবের বিলম্ব হওয়াতে মাতার যে দুঃসহ যন্ত্রণা হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি এই মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

অগ্নিনা শুষানে দেহো ত্রিরাত্রানশনেনচ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৭

অগ্নিদ্বারা সেঁক তাপে এবং তিন রাত্রি অনাহারে (প্রসবান্তে) মাতার দেহ শুষ্ক হইয়াছে, তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

সেবেত কটুদ্রব্যানি দুঃখানি বিবিধানিচ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৮

নানাবিধ কটু দ্রব্য ভক্ষণে মাতার নানাপ্রকার ক্লেশ হইয়াছে,* তাহার প্রতিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

দুর্লভানাঞ্চ ভক্ষ্যাণাং ত্যাগে বিন্দতি যৎফলম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ৯

সুভক্ষ্য পদার্থ সকল ত্যাগ করিয়া মাতার যে দুঃখলাভ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

রাত্রৌ মূত্রপুরীষাভ্যাং ভিদ্যতে মাতৃকর্পটম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ১০

রাত্রিকালে সন্তানের মল মূত্র দ্বারা মাতার পরিধেয় জীর্ণ বাস ছিঁড়িয়া যাওয়াতে মাতার যে ক্লেশ হইয়াছে, তাহা পরিশোধ জন্য মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

পুত্রে ব্যাধিসমাযুক্তে মাতৃদুঃখমহর্নিশম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ১১

পুত্রের পীড়া হইলে দিবারাত্রি মাতার যে দুঃখ হয়, তাহা পরিশোধের জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

যদা পুত্রো ন লভতে তদা মাতুশ্চ শোচনম্‌।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্‌ ॥ ১২

পুত্র আহার না পাইলে মা যে

* এদেশে প্রসবান্তে প্রসূতিদিগকে, ঝাল, পাঁচন প্রভৃতি খাইতে হয়।

শোকাকুলা হন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

ক্ষুধয়া বিহ্বলে পুত্রে দদাতি নির্ভরস্তনম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৩

ক্ষুধায় বিহ্বল পুত্রকে মাতা যে বহুল পরিমাণে স্তন-দুগ্ধ পান করাইয়া থাকেন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি!

দিবারাত্রৌ সদা মাতুঃ শোষণঞ্চ পুনঃ পুনঃ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৪

স্তনপান করাইতে দিবারাত্রি মাতার শরীর শোষণ হইতে থাকে, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

অল্পাহারবতী মাতা যাবৎ পুত্রোঽস্তি বালকঃ।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্॥ ১৫

শিশু পুত্রের স্বাস্থ্যের জন্য মাতাকে অল্পাহার করিতে হয়, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

যমদ্বারে মহাঘোরে পথি মাতুশ্চ শোচনম্।
তস্য নিষ্ক্রয়ণার্থায় মাতৃ-পিণ্ডং দদাম্যহম্। ১৬

পাছে সন্তানের বিপদ বা মৃত্যু হয় এইজন্য মাতা (দিবানিশি) শোকাকুলা হইয়া থাকেন, তাহা পরিশোধ জন্য আমি মাতৃ-পিণ্ড দান করিতেছি।

ইহাই হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ষোড়শী। ভক্তির কার্য্য উপাসনা এ কথা আমরা আগে বলিয়াছি। উপাসনার আর এক উদ্দেশ্য এই যে উপাসনাদ্বারা ভক্তিবৃত্তি সম্পূর্ণতা লাভ করে। হিন্দুর মাতৃ-ষোড়শীও এক মাতৃ-উপাসনা; হিন্দুর অনেক ব্রত, নিয়ম, ক্রিয়া, উপাসনারই নামান্তর। সর্ব্বতত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ মানব-হৃদয়-তত্ত্ব বুঝিয়াই সে সকল শুভকর নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন। আজি কালি দেশের অনেক ব্যক্তি কিনা স্বদেশীয় সকল প্রথাই "ঘৃণিত" ও "কুসংস্কার" বলিয়া মুখ বিকৃত করেন, তাই আমরা এ সকল কথা লিখিলাম। যিনি হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ষোড়শী বুঝিবেন, তিনি হিন্দু আর্য্যগণের মাতৃ-ভক্তি-তত্ত্বও বুঝিবেন, ইহা আমি বিশেষ আশা করি। তবে এ আশা আমার দুরাশা কি না তাহা বলিতে পারি না।

উপসংহার কালে আমরা বলি, এজগতে মাতৃ-উপাসনাতেই সন্তানের মুক্তি। মানবের সকল উন্নতির মূল ভক্তি; আত্মোন্নতি, পারিবারিক উন্নতি, সামাজিক উন্নতি, জাতীয় উন্নতি—সকল প্রকার উন্নতি ভক্তিযোগেই সাধিত হয়। ভক্তিবৃত্তির সর্ব্বোচ্চ স্থান ভগবান্, কিন্তু মাতৃ-ভক্তিই ভক্তির আরম্ভ স্থান। গোড়ায় মাতৃ-ভক্তি, আগায় ভগবদ্ভক্তি-রূপে সম্পূর্ণতা লাভ করে। আমরা আগে বলিয়াছি, এ সংসারে মাতাই ভগবতী বিশ্বমাতার প্রতিকৃতিরূপিণী; বিশ্বেশ্বরী বিশ্বজগতের জন্য আর মাতৃদেবী সন্তানের জন্য দেবভাবে পরিপূর্ণা। যিনি মহাসমুদ্রে যাইতে চাহেন, তাঁহাকে মহানদী বাহিয়া যাইতে হয়, মহানদীর শেষ সীমাতেই সমুদ্র। সেই রকম যিনি ভগবদ্ভক্তির রাজ্যে পৌঁছিতে চাহেন, তাঁহাকে মাতৃ-ভক্তির রাজ্য দিয়া চলিতে হয়, মাতৃভক্তির পূর্ণতাতেই ভগবদ্ভক্তি।

মহাত্মা যীশুখ্রীষ্ট বলিয়াছিলেন "যে ব্যক্তি দৃশ্যমান ভ্রাতাকে প্রেম করিতে না পারে, সে অদৃশ্যমান ঈশ্বরকে কিরূপে প্রেম করিবে?" আমরাও বলি, যে ব্যক্তি প্রত্যক্ষদেবতা জননীকে ভক্তি করিতে অক্ষম, সে অপ্রত্যক্ষ ভগবান্‌কে ভক্তি করিবার ক্ষমতা কোথায় পাইবে? বর্ণমালা ত্যাগ করিয়া, লেখাপড়া শিক্ষা অসম্ভব, মাতৃ-ভক্তি না শিখিয়া ভক্তিবৃত্তির অনুশীলন-চেষ্টাও সেইরূপ অসম্ভব। মাতৃ-ভক্তিই ভক্তিভাবের বর্ণমালা। প্রত্যেক সন্তান ইহা বুঝিয়া মাতৃ-ভক্তি অভ্যাস করিবেন, মাতার মহত্ত্ব ও দেবত্ব স্মরণ করিয়া মাতাতে ঈশ্বরের শক্তি সকল দেখিবেন; প্রীত ও প্রফুল্লভাবে মাতার চরণ বন্দনা, মাতার সেবা শুশ্রূষা, মাতৃ-হিত সাধনে আত্মোৎসর্গ ও মাতৃ পরিতৃপ্তিতে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবেন। যাঁহার মাতা পরলোকগামিনী, তিনি মাতৃ-ভক্তি বিকাসের জন্য প্রত্যহ দেবার্চ্চনা বা উপাসনার সময়ে মাতার স্নেহ ও দেবত্ব স্মরণ করিবেন, মাতৃ-ষোড়শী-স্তোত্রাদির ন্যায় মাতৃ-ভক্তি-উদ্দীপক স্তোত্রাদি পাঠ করিবেন, মাতৃমূর্ত্তি ধ্যানপূর্ব্বক চরণ বন্দনা করিবেন। পরলোকগতা মাতার উদ্দেশে নিয়মিত শ্রাদ্ধাদিক্রিয়া ও অন্যান্য সাধুভাবপূর্ণ কার্য্য করা সন্তানের অবশ্য কর্ত্তব্য। এতদ্ভিন্ন মাতা এজগতেই থাকুন, আর স্বর্গেই থাকুন, সন্তান চিরদিনই মাতৃভাবে তন্ময় হইয়া মাতার আদর্শে আপনাকে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিবেন। এজগতে মাতৃঋণতো অপরিমিত অপরিশোধ্য, তবে মাতৃভক্তি ও মাতৃ-উপাসনায় সিদ্ধ হইতে পারিলে সন্তানই মুক্তিলাভ করিবেন।

অতএব যিনি মাতৃভক্তি মাতৃ-উপাসনায় সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছেন, তিনি অহঙ্কারশূন্য, বিনয়ী, সহৃদয়, কৃতজ্ঞ, সেবাপরায়ণ, দয়াময়, ক্ষমাময়, সহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, আত্মত্যাগী, পরার্থপর, জিতেন্দ্রিয়, দেশহিতৈষী * ও ভগবদ্ভক্ত; তিনি পুরুষ হইলে দেব, রমণী হইলে দেবী। হিন্দুধর্ম্ম-শাস্ত্র এই রকম নরদেবতাকেই "মুক্ত" বলিয়াছেন (১), আমরাও এই রকম নরদেবতাকে ইহলৌকিক "মুক্ত" বলি।—পরলোকেও যে এই রকম ব্যক্তি মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন, সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য—আত্মার যতদূর সদ্গতি সম্ভব, তাহাই যে প্রাপ্ত হন, একথা বলা বাহুল্য। ভগবতী বিশ্বমাতা স্নেহের হস্ত প্রসারণ করিয়া মাতৃভক্ত সন্তানকে, তাঁহার অমৃতময়

* মাতৃভক্তকে দেশহিতৈষী বলিলাম, কারণ জননীও জন্মভূমি একই রকমের পদার্থ। তাই যিনি জননীর মর্ম্ম বোঝেন, তিনি জন্মভূমিরও মর্ম্ম বুঝিতে পারেন।

(১) জ্ঞান-বিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা, কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
মুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সম-লোষ্ট্রাশ্ম-কাঞ্চনঃ॥
ভগবদ্গীতা, ৬ অঃ ৮ শ্লোক।

যাঁহার আত্মা জ্ঞান বিজ্ঞানে তৃপ্ত, যিনি নির্ব্বিকার জিতেন্দ্রিয়, লোষ্ট্র প্রস্তর কাঞ্চনে সমদর্শী, সেই যোগীই মুক্ত।

কোলে স্থান দিয়া থাকেন। তাই ডাকিতেছি, ভাই এস, ভগিনী এস, একবার সকলে মাতৃভক্তিরূপ মহাসাগরে—মগ্ন সমুদ্রে ডুবিব, মাতৃউপাসনা করিতে শিখিব, তাহা হইলে এ জীবন সার্থক হইবে, আমাদের মুক্তি লাভ হইবে। মূর্খ হই, অধম হই, নগণ্য হই, আমরা মায়ের সন্তান তো বটে! মা'র আশীর্ব্বাদে সিদ্ধকাম হইব।　　　লেখিকা

শ্রীমা——

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬০ সংখ্যা ২৭০ পৃষ্ঠার পর।)

স্ত্রী ও পুরুষ এই উভয়ের সংমিশ্রণেই মনুষ্যসমাজ। একের যাহা দোষ গুণ, অপরেও তাহা সংক্রামিত হইয়া থাকে। সুতরাং যে সমাজে পুরুষগণ কুরুচিগ্রস্ত, সে সমাজে স্ত্রীজাতি লজ্জাশীলা ও পবিত্রতা-আকাঙ্ক্ষিণী হইলেও তাহাদিগের রুচি অপবিত্র ও হীন ভাব ধারণ করে। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন বঙ্গ মহিলাদিগের মধ্যেও এইরূপ দোষ ঘটিয়াছিল; গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে স্ত্রীদিগের মধ্যে অতি ঘৃণিত আমোদ প্রচলিত ছিল। তদ্ভিন্ন সমবয়স্কারা একত্র হইয়া যে সকল রসিকতা করিতেন, তাহা ন্যক্কারজনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। স্ত্রীলোকেরা ক্রিয়া বিশেষ উপলক্ষে কুৎসিত ভাবে নৃত্য ও গীত করিতেন, এমন কথাও শুনা যায়।

বাঙ্গালায় গর্ভাধান প্রভৃতি ক্রিয়া উপলক্ষে স্ত্রীজাতির যেরূপ কুরুচির পরিচয় পাওয়া যাইত, ভারতের অন্যান্য স্থানে (হিন্দুস্থান, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি) বিতে, হোলী, প্রভৃতি পর্ব্বে সেইরূপ কুরুচির ছড়াছড়ি হইত, শুনা যায়। ইহাতে কেবল বাঙ্গালি নহে, ভারতের অন্যান্য উচ্চতর জাতিও যে রুচিদোষে দূষিত ছিলেন, এ কথা বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ তখন রুচির আন্তরিক ভাগ বিশেষ ত্রুটী পূর্ণ ছিল।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি, শরীরের বেশ, ভূষা ও আলাপাদির দ্বারা মানবের রুচির বাহ্যিক ভাগ প্রকাশিত হয়। তখনকার দিনে বাঙ্গালার বাবুগণ পর্য্যন্ত সচরাচর পিরাণ, জামা, জুতা, মোজা প্রভৃতির ধার ধারিতেন না। এখন যেমন রাজকর্ম্মচারীদিগকে ইংরেজী পরিচ্ছদ পরিয়া আপিসে যাইতে হয়, তখন সেইরূপ মুসলমানী পরিচ্ছদ ব্যবহৃত ছিল। সাধারণ ব্যক্তিগণ ধুতি চাদরেই দিন কাটাইতেন; ধনী গৃহের বালকেরা ১৮।২০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত হার, বাজু, বালা, গোঠ প্রভৃতি গহনা ব্যবহার করিতেন। বঙ্গমহিলারা কপাল, নাসিকা, চিবুক প্রভৃতি উল্কি দিয়া

চিত্রিত করিতেন। কোনও কোনও ধর্ম্মপরায়ণা মহিলা হস্তবক্ষ প্রভৃতি অবয়বে "রাম, দুর্গা" ইত্যাদি দেব দেবীর নাম উল্‌কি দিয়া চিত্রিত করিয়া লইতেন। সধবারা সিঁথি, কপাল ও নাসিকায় বহু পরিমাণে সিন্দুর লেপন করিতেন। সাদা দাঁত তাঁহাদিগের পছন্দ হইত না, এজন্য মিসি ব্যবহারে দন্ত গুলি "ভ্রমর কৃষ্ণ" করিতেন। নবীনারা চুল বিনাইয়া বহুতর দড়ি দিয়া, মাথার উপরে (প্রায় ব্রহ্মতালুকার কাছে) লম্বা রকমের খোঁপা বাঁধিতেন। সম্মুখের চুলগুলি ছোট ছোট করিয়া কাটিতেন; কাটা চুল গুলি "ঝাপ্‌টা" নামে কর্ণমূলে শোভা পাইত। ধনিগৃহের রমণীদিগের সোণা ও রূপার দুই স্থট গহনা থাকিত; সোনার স্থট নৈমিত্তিক গহনা অর্থাৎ ক্রিয়া কর্ম্ম উপলক্ষে ব্যবহৃত হইত; আর রূপার স্থট নিত্য গহনা অর্থাৎ সকল সময়ে ব্যবহৃত হইত। সে সকল গহনার নাম শুনিতে যদি দেশীয় ভগিনীরা কেহ উৎস্থক হন, সেজন্য তাহাও বলিতেছি; নাকের গহনা নথ, অর্দ্ধ চন্দ্র; কাণের গহনা চাঁপা, কড়ি; গলার গহনা মোহন, বড় বড় মাদুলি; মণিবন্ধের গহনা তাড় বাজু; হাতের গহনা বাউটী, পৈঁছে, খাড়ু; কোমরের গহনা গোঠ, চন্দ্রহার; পায়ের গহনা সাদামল, বাঁকমল, ইত্যাদি ইত্যাদি। গহনাগুলির আকৃতি যেরূপ ছিল, তাহার নমুনা এখন পাওয়া যায় না, তবে আমার পাঠিকা ভগিনীদিগের মধ্যে যদি কেহ প্রপিতামহী বা প্রমাতামহীঠাকুরাণীদিগের কোনও গহনা দেখিতে পাইয়া থাকেন, তিনি বুঝিতে পারিবেন। তাঁহারা সকল সময়েই একবস্ত্রা অর্থাৎ একখানি মাত্র কাপড় পরিয়া থাকিতেন। তখন বিলাতি কাপড় বা পাছাপেড়ে সাড়ী এ দেশে ছিল না; দেশের তাঁতি, জোলাদিগের হাতের কাপড় পরিয়াই তাঁহাদের দিন কাটিত। উৎসবের সময়ে ধনী রমণীরা মেঘডুম্বুর, আশ্‌মানতারা, রাসমণ্ডল, লক্ষ্মী বিলাস, সাটীন—এই সকল বহুমূল্য বস্ত্র ব্যবহার করিতেন। বেনারসী তখন বড় একটা ব্যবহার্য্য ছিল না। সধবারা প্রচুর পরিমাণে শাঁখা ব্যবহার করিতেন।

বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতের অন্যান্য স্থানের মহিলাদিগের পরিচ্ছদাদি অপেক্ষাকৃত উন্নত ছিল। একশতাব্দীর পরেও তাহা যে বিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, এমত বোধ হয় না। তবে পশ্চিম প্রদেশীয়া রমণীগণ সর্ব্বাঙ্গে উল্‌কির গহনা পরিতেন। অদ্যাপি সেদিকে অপেক্ষাকৃত নিম্ন শ্রেণীর রমণীগণের মধ্যে তাহা প্রচলিত আছে। প্রাচীন সময়ে সাধারণ রুচির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়।

স্বাস্থ্য ও পরিশ্রম—গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতবাসিনীদিগের স্বাস্থ্য এখনকার অপেক্ষা যে অনেক ভাল ছিল, একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন।

ইহার প্রকৃত কারণ শরীর-বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিতে পারেন ; কিন্তু তথাপি আমাদিগের বোধ হয় যে তখনকার রমণীরা অতি অল্প বয়সেই গৃহকর্ম্মে অভ্যস্ত হইতেন ; ব্যায়ামে যে ফল লাভ হয়, নিয়মিত রূপে অঙ্গচালনা ও শ্রম করিলে তদনুরূপ ফল লাভের সম্ভাবনা ; তাই গৃহলক্ষ্মীগণ ভাত রাঁধা, জলতোলা, বাসনমাজা, ঘরলেপা, ধানভানা, ঘুঁটেভাঙা, গোয়াল পরিষ্কার করা প্রভৃতি সংসারের যাবতীয় কর্ম্ম স্বহস্তে নির্ব্বাহ করিয়া অনেক সুস্থ ও সবল ছিলেন। শারীরিক বলে তাঁহারা এখনকার অনেক "সুকুমার" পুরুষদিগের উপরেও স্থান পাইবার যোগ্যা। সাহস যে প্রধানতঃ শারীরিক বলের ফল একথা বোধ হয় অনেকেই জানেন *। যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রাজশাসনের শিথিলতা এবং অন্যান্য কারণে ভারতে লুঠতরাজ, চুরি ডাকাতি প্রভৃতির প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তখন— বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভারতের সকল জাতি অপেক্ষা ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া পরিচিত, তখন সেই বাঙ্গালি জাতিরও প্রকৃত সাহস ছিল ; বঙ্গীয় অবলাদিগের এমন সাহসের কথা শুনা যায় যে অভিভাবক পুরুষগণ বাড়ী না থাকিলে রমণীরা স্বয়ং অস্ত্রধারিণী হইয়া চোর, ডাকাত অথবা হিংস্র জন্তুদিগকে তাড়না করিতেন ! * এখনকার দিনে এ সকল কথা "আষাঢ়ে গল্প" বলিয়াই বোধ হয়। যাহাহউক গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারত মহিলাদিগের ব্যক্তিগত অবস্থা সাধারণতঃ এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল।

পারিবারিক অবস্থা—আমরা রমণীগণের ব্যক্তিগত অবস্থা যতটুকু চিত্রিত করিলাম, তাহাতে গত শতাব্দীর প্রথম যুগে নারীজীবন যে বড় সৌভাগ্যপূর্ণ ছিল না, একথা সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন অপেক্ষা পারিবারিক জীবনই তাঁহাদিগের পক্ষে অধিকতর দুর্ভাগ্যজনক। নারী-জীবনের অজ্ঞানতা, নির্ধনতা, পরাধীনতা, পুরুষের বহুবিবাহ প্রচলিত থাকাতে সপত্নীযন্ত্রণা, বৈধব্যদশা উপস্থিত হইলে অসহনীয় ক্লেশ—এই সকল দুর্ঘটনার কখন কোনটী আক্রমণ করে, এই আশঙ্কায় ভারতবাসিনীদিগকে জীবন্মৃতা থাকিতে হইত ; সুতরাং কন্যা সন্তান ভূমিষ্ঠা হইলে মাতা পিতা ও বন্ধুগণের আনন্দ লাভ দূরে থাকুক, দারুণ দুঃখই জন্মিত। সদ্যোজাতা কন্যার এক বিভীষিকাময় পরিণাম তাঁহাদিগের মনশ্চক্ষে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগের হৃদয় দারুণ নৈরাশ্যে

* সাহসের আর এক কারণ সাধুতা। অসাধু বলবান্ হইলেও প্রকৃত সাহসী হইতে পারে না।

* কুমারী শার্লট্ স্মিথ্, তাঁহার কাগজে স্ত্রীলোকদিগকে ব্যায়াম শিখাইতে লিখিয়াছেন। তাঁহার বিবেচনায় ব্যায়ামে সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। তাঁহাদের দেশে স্ত্রীলোকের ব্যায়াম সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু এদেশে ব্যায়াম শিখিবার মত দেবী চৌধুরাণী সহজে মিলিবে না গার্হস্থ্য কর্ম্মই ভারতমহিলা দিগের ব্যায়াম।

পূর্ণ হইত। একে কন্যা সন্তান হইতে বংশের কোনও উন্নতি সম্ভব হয় না, তাহার পরে তাহাদিগের জীবনে এই সকল দুরবস্থার আশঙ্কা, তাই পুত্র সন্তান যেরূপ আদর ও যত্ন লাভ করিত, কন্যা সন্তানের ভাগ্যে সে রকম কিছুই হইত না। অনেক স্থলে তাহারা অনাদৃতা ও অবহেলনীয়া হইত!—বুঝি ভবিষ্যৎ জীবনে অনেক সহিতে হইবে বলিয়াই শৈশবে অভাগিনীদের ভাগ্য-ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতার বীজ উপ্ত হইয়া থাকিত। যাহা হউক ক্রমশঃ গর্ভধারিণীর স্নেহে, আত্মীয়গণের পালনে, সকলের উপরে বিশ্বজননীর কৃপায় শিশু বালার দেহ ও জীবন পরিপুষ্টি লাভ করিত। বালিকা বয়সে তাহারা স্বতঃ প্রবৃত্তা হইয়া খেলাঘরে গার্হস্থ্য জীবনের অভিনয় করিত; বালিকা বিদ্যালয়ে তাহাদিগকে লেখা পড়া শিখিতে হইত না, কিন্তু খেলা ঘরে বধূ গৃহিণী প্রভৃতি সাজিয়া রন্ধন, পরিবেশন, শিষ্টাচার প্রভৃতি আচরণে গৃহধর্ম্মের কার্য্যে অভ্যস্তা হইত। বঙ্গীয় বালিকাগণ ক্রমে সেঁজুতি, এয়ো-সিন্দুর, গোকাল, আদর সিংহাসন ইত্যাদি ব্রতাচরণে প্রবৃত্তা হইতেন। বয়োবৃদ্ধির সহিত মা, ঠাকুরমা, পিসীমা প্রভৃতির সহিত গৃহকার্য্যে যোগ দান করিতেন। কন্যাদিগের বিনয়, লজ্জা, শীলতা, ধর্ম্মভাব, বাধ্যতা ও গৃহকার্য্যে নিপুণতা শিক্ষা দেওয়া অভিভাবিকা-দিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

বিবাহ মানব জীবনের এক প্রধান সংস্কার। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগে দেশীয় মহিলাদিগের অনেকের বিবাহ এত অল্পবয়সে সম্পাদিত হইত যে প্রাপ্তবয়সে নিজের বিবাহের বিষয় কাহারও স্মরণ থাকিত না। আর্য্য ভারতের পরবর্ত্তী সময়েও এদেশে প্রাপ্ত বয়সে রমণীগণের বিবাহ চলিত ছিল, কিন্তু বল্লাল সেনের স্থাপিত কৌলীন্য প্রথা ও মুসলমান রাজগণের অত্যাচার, এই দুইটী ঘটনা হইতেই প্রধানতঃ বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাব হয়। কৌলীন্য প্রথা হইতে কন্যা পণের উৎপত্তি; কন্যাপণের জন্যই বাল্য বিবাহ অধিকতর প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।—বিবাহের সময়ে কন্যার পিত্রাদি বর পক্ষের নিকট হইতে মূল্য গ্রহণ করিলে তাহাকে "কন্যাপণ" কহে। যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে উচ্চশ্রেণীর শ্রোত্রীয় ও কায়স্থ বংশে উচ্চশ্রেণীর কুলীন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে (এখনকার পাস্‌করা ছেলের বাপের মত) কন্যার বিবাহ দিয়া প্রচুর টাকা লাভ করিতেন। নিম্নশ্রেণীর হিন্দু-গণ অদ্যাপি কন্যাপণ গ্রহণ করিয়া থাকেন।

কিন্তু এই রকম পণ লইয়া কন্যার বিবাহ দেওয়াকে আর্য্য-ধর্ম্মাচার্য্যগণ "আসুর বিবাহ" বলিয়া গিয়াছেন; "আসুর" শব্দের অর্থ নিন্দিত, অপবিত্র, অশুভকর, ইত্যাদি। মনু বলিয়াছেন—'পঞ্চানাস্তু ত্রয়ো ধর্ম্ম্যা দ্বাবধর্ম্মৌ স্মৃতাবিহ। পৈশাচশ্চাসুরশ্চৈব নকর্ত্তব্যৌ কদাচন॥"

অর্থাৎ প্রাজাপত্য, গান্ধর্ব্ব, রাক্ষস, আসুর ও পৈশাচ এই পাঁচ প্রকার বিবাহের প্রথমোক্ত ত্রিবিধ বিবাহ ধর্ম্মানুমুদিত; অবশিষ্ট পৈশাচ ও আসুর বিবাহ কাহারও কর্ত্তব্য নহে।

এই সকল বিষয় আলোচনা করিলে অনুমিত হয় যে আসুর বিবাহ হিন্দুশাস্ত্রের অননুমোদিত—নীতিরও বিরোধী। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের বহুলোক শাস্ত্র বা নীতি অপেক্ষা দেশাচারকে অধিকতর ভক্তি করেন। এইজন্য আসুর বিবাহও ভারত সমাজে গৃহীত হইয়াছে। যাহা হউক বাল্য বিবাহের প্রাদুর্ভাবে মাতৃস্তন্য ত্যাগ না করিতেই অনেক কন্যার বিবাহ হইয়া যাইত; সম্প্রদায় বিশেষে কন্যা গর্ভস্থ হইলে অথবা গর্ভস্থ হইবার পূর্ব্বে তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়া থাকিত। এইরূপ বাল্য বিবাহ হইতে শিশু বিধবাদিগের সংখ্যাও অনেক বেশী ছিল।

এতদ্ভিন্ন ভারতের পশ্চিম প্রদেশে কন্যা বিবাহ এত ব্যয়-সঙ্কুল ছিল, যে সাধারণ ব্যক্তিগণ তাহা নির্ব্বাহ করিতে অক্ষম হইয়া পড়িতেন, অথচ কন্যার বিবাহ না দিলে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত হইতে হইত।—সম্প্রদায় বিশেষে সমাজচ্যুতি না হইলেও বড় অপমানিত হইতে হইত। এই সকল কারণে সেই সকল স্থানে সদ্যোজাতা কন্যাদিগকে বিনাশ করা হইত।—অনেক স্থলে কন্যার স্নেহময়ী জননীই স্বহস্তে এই নৃশংসোচিত কার্য্য করিতেন! তত্তৎপ্রদেশীয় রমণীকুলের জীবন যে কিপ্রকার শোচনীয় ছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(২৫৯ সংখ্যা ২৪৭ পৃষ্ঠার পর)

শ্বাস কাস ও রক্তপিত্ত।

১। হাঁপকাস রোগী দোক্তাতামাক মুখে রাখা অভ্যাস করিলে হাঁপকাস দমন থাকে।

২। হাঁপানী রোগীরা আফিম খাওয়া অভ্যাস করিলে সুস্থ থাকে।

৩। আদার রস ৫ তোলা, পঞ্চমুখী লাল জবা ফুলের গাছের পাতার রস অর্দ্ধ ছটাক। এই দুই বস্তুকে যোগ করিয়া পরিবর্দ্ধিত হাঁপরোগ সময়ে, এই মহৌষধ নিত্য একবার করিয়া এক সপ্তাহ সেবিত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৪। (তুলসী গাছের ঘুংরী পোকা তাম্রমাদুলী করিয়া গলায় ধারণ করিলে বালকদিগের হাঁপানি রোগ আরাম হয়।)

৫। (কট্‌কটে বেঙের হৃৎপিণ্ডকে

চারিভাগ করিয়া একটী ভাগ কলার ভিতর পুরিয়া প্রত্যহ প্রাতে খাইলে ৪।৫ দিনের মধ্যে হাঁপ কাশি রোগী আরোগ্য হয়।

৬। একটী আরস্থলা, পা গুলি ছিঁড়িয়া কলার ভিতর পুরিয়া প্রাতে ৩।৪ দিন খাইলে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হয়।

৭। আটটা আরস্থলা এক সের জলে, মন্দ জালে সিদ্ধ করিয়া এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া চারিপুরু কাপড়ে ছাঁকিয়া লইতে হইবে। পরে সমান পরিমাণে রেক্‌টীফাইড্ স্পিরিট্ মিশাইয়া বোতলে রাখিবে। হাঁপরোগী এক কাচ্চা জলে এক ফোটা এই নিয়মে প্রাতঃকালে একবার, আড়াই প্রহরের সময় একবার সায়ংকালে একবার, ঔষধ সেবন করিবে। ইহাতে হাঁপ রোগ আরোগ্য হয়।

৮। মিঠা যাহাকে অমৃত বা বিষ কহে, বণিক্ দোকান হইতে আনিয়া চাকাচাকা করিয়া কাটিয়া গো মূত্রে ২।১ দিন ভিজাইয়া রৌদ্রে শুষ্ক করিলে শোধিত হইল। এই শোধিত মিঠা চারি আনা কৃষ্ণ ধুতুরার বীজ দুগ্ধে পাক করণানন্তর রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া এই চুর্ণ চারি আনা; এই সমস্ত দ্রব্য খলে জলদ্বারা বিশেষরূপে মর্দ্দিত হইলে সর্ষপ পরিমিত বটিকা প্রস্তুত করিয়া হাঁপ রোগীকে চর্ব্বণীয় তাম্বুলের সহ প্রতিবারে ২।৩ বটী দিবে। এই নিয়মে দিবসে ২।৩ বার সেবন করাইলে ভয়ঙ্কর হাঁপ আরোগ্য হয়। শ্বাস রোগে রাত্রিকালীন আহার লঘু হওয়া নিতান্ত আবশ্যক।

জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরুপণ।

সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, প্রভৃতি আমাদিগের পৃথিবী হইতে কতদূর, তাহা অনেকের কল্পনারও অনায়ত্ত। অথচ বালক শিক্ষার গ্রন্থে পর্য্যন্ত দেখাযায়, সূর্য্য পৃথিবী হইতে এতদূরে, চন্দ্র এতদূরে ইত্যাদি। ছাপার লেখায় অনেক বালকের ভক্তি অচলা বলিয়া, এসকল কথা তাহারা বিশ্বাস করে; কিন্তু অনেক প্রাপ্তবয়স্ক লোক, এসকল কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন দেখিয়াছি। তাঁহারা মনে করেন, এসকল আন্দাজের কথা, যাহার যাহা খুসী সে তাহাই বলিয়া ফেলে। প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হইতে পারে না, এইরূপই তাঁহারা মনে করেন। কি উপায়ে জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপিত হয়, অতি স্থূলভাবে সে বিষয়ে কিছু বলিব। তাহাতেই অনেকে বুঝিতে পারিবেন যে দূরত্ব নির্ণয় অসম্ভব নয়।

রেল গাড়ীতে যাইবার সময় প্রত্যক্ষ করা যায় যে, যে গাছটি নিকটস্থ, সেটি দেখিতে দেখিতে দূরে চলিয়া যায়;

কিন্তু সেই গাছের সমসূত্রে দৃষ্ট দূরস্থ একটি গাছ, তত শীঘ্র ছাড়াইয়া যাওয়া যায় না। পাহাড়ের দৃষ্টান্ত আরও উপযোগী। বনপথে হউক, অশ্বারোহণে হউক, অথবা হাঁটিয়া হউক, যে কোন প্রকারে পার্ব্বত্য প্রদেশে গমনাগমনের সময়, কোন্ পাহাড় দূরস্থ কোন্‌টি নিকটস্থ, তাহা অবয়বের পরিস্ফুটতা ভিন্নও অন্য উপায়ে নির্দ্ধারিত হইতে পারে। চলিবার সময় দুইটি পাহাড়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, একটি পাহাড় যেন ধীরে ধীরে অতিক্রম করিয়া যাওয়া যাইতেছে, কিন্তু অন্য একটি যে স্থানে ছিল ঠিক্ সেই স্থানেই যেন আছে; যেন একটুও অতিক্রম করিয়া যাওয়া যায় নাই। যে পাহাড় যত দূরস্থ, সেইটি তত এক স্থানে আছে বলিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সঙ্কেত অবলম্বন করিয়া অগ্রসর হইলে জ্যোতিষ্কদিগের মধ্যে কোন্‌টি অপেক্ষাকৃত পৃথিবীর নিকটস্থ, এবং কোন্‌টি দূরস্থ, তাহা নির্ণয় হইতে পারে। আমরা চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতির উদয় ও অস্ত প্রত্যক্ষ করি, কিন্তু এমন অনেক নক্ষত্র আছে, যেগুলি অতি স্থির বলিয়া মনে হয়। যে সময় চন্দ্রকে আকাশের উর্দ্ধে, আমাদিগের মাথার উপর দেখিতে পাওয়া যায়, যদি ঠিক্ সেই সময়ে একটা "হনুমান যন্ত্রে" চাপিয়া, এক লম্ফে নিমেষের মধ্যে কলিকাতা হইতে আফ্রিকার গিনি উপকূলে উপস্থিত হইতে পারা যাইত, তাহা হইলে দেখিতে পাওয়া যাইত যে চন্দ্র যেন ঠিক্ বিপরীত দিকে সেই সময়ে এক লম্ফ দিয়া প্রায় সমান পরিমাণে পিছাইয়া গেল; কিন্তু কতকগুলি নক্ষত্র যেন প্রায় যেখানে ছিল, সেই স্থানেই রহিয়া গেল।

দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে একটি জ্যোতিষ্ককে দেখিলে, একটু বিভিন্ন বিভিন্ন দিকে সেটিকে দেখিতে পাওয়া যাইতে পারে। এইরূপে দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট বিভিন্ন দুইটি দিকের অন্তর স্থির করিলে, জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণ করা যায়। এবিষয়ে একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাউক:—
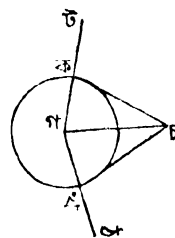
পার্শ্বস্থ চিত্রে বৃত্তটিকে পৃথিবী মনে করা যাউক; এবং মনে করা যাউক যে ক চিহ্নিত স্থানে একজন দাঁড়াইয়া চ নামক জ্যোতিষ্কটিকে দেখিতেছে। বলা বাহুল্য যে, জ্যোতিষ্কটি দ্রষ্টার চক্ষে ক চ রেখা ক্রমে দৃষ্ট হইবে। তেমনি যদি আর একজন খ চিহ্নিত স্থানে দাঁড়াইয়া দেখে, তবে সে ঐ জ্যোতিষ্কটি খ চ রেখা ক্রমে দেখিতে পাইবে।

এখানে কচখ কোণ, বিভিন্ন স্থান হইতে দৃষ্ট বিভিন্ন দিকের অন্তর। এখন

ক গ খ চ চতুর্ভুজের কোণ গুলির পরিমাণ, এবং পৃথিবীর ব্যাসার্দ্ধ 'গক' এর পরিমাণ নির্দ্ধারণ করিলে, ত্রিকোণ,মিতির একটি সহজ অঙ্ক কষিয়া, কচ,খচ এবং গ চ রেখার দৈর্ঘ্য স্থির করা যাইতে পারে। যাঁহাদের গণিত শাস্ত্র জানা আছে তাঁহারা অনায়াসেই একথাটার সম্ভবত্ব বুঝিতে পারিবেন।

জ্যোতিষ্কের দূরত্ব নিরূপণের কৌশল বুঝাইবার জন্য এ প্রবন্ধ নহে। কোনও ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাহা করাও অসম্ভব। তবে এই দূরত্ব নিরূপণ যে সম্ভবপর ব্যাপার, তাহাই বুঝাইবার জন্য প্রয়াস পাওয়া গেল।

উদাসীনের চিন্তা।

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং।
হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বং।।

ধন জন যৌবনের গর্ব্ব করিওনা, কাল নিমেষে সমস্তই হরণ করে।

ভবানীপ্রসাদ নিওগী তেঁতুলিয়া গ্রামের একজন প্রসিদ্ধ ধনী। ভবানীপ্রসাদ শৈশব কালেই পিতৃহীন হন। জননী অতি কষ্টে তাঁহার ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করেন। তিনি যৌবন কালে পদার্পণ করিয়া আপনাকে সম্পূর্ণ সহায়-সম্পদ-বিহীন দেখিতে লাগিলেন। ভবানী প্রসাদ কলিকাতায় যাইয়া জীবিকা নির্ব্বাহের কোনও উপায় করিতে পারেন কি না, তাহারই চিন্তা করিতেছিলেন। অবশেষে স্থির করিলেন কলিকাতায় যাইয়া কোনও সওদাগরের বাড়ীতে সামান্য কাজ করিবেন। কিন্তু কলিকাতায় যাইবার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে পারেন, এমন সংস্থান কিছু নাই। জননীর হাত শূন্য, সুতরাং তাঁহার নিকট হইতেও কিছু প্রত্যাশা করিতে পারেন নাই। কিন্তু প্রভু পরমেশ্বর যাঁহার সহায়, তাঁহার কোন না কোন উপায় শীঘ্রই সম্ভাবিত হইয়া থাকে। ভবানী প্রসাদের কোনও প্রতিবেশী বিধবা গঙ্গাবাসে যাইবেন স্থির করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া কলিকাতায় লইয়া যায় এমন লোক মিলিতেছে না। তিনি একদিন ভবানীপ্রসাদের নিকট এই প্রস্তাব উপস্থিত করিলেন। তখন ভবানীপ্রসাদ যেন হাতে স্বর্গ পইলেন। তিনি মনে মনে ঈশ্বরকে কতই ধন্যবাদ প্রদান করিলেন। কাল বিলম্ব না করিয়া বিধবা মহিলার সঙ্গে ভবানী-প্রসাদ কলিকাতায় আসিলেন। অচিরে তাঁহার এক সওদাগরের বাড়ী সামান্য কর্ম্ম জুটিল। ভবানীপ্রসাদ মাসে মাসে যাহা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাহার কিয়দংশ জননীকে পাঠাইয়া দেন, অবশিষ্টাংশ হইতে নিজের ভরণ পোষণ

নির্ব্বাহ করিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিতেছেন। ভবানীপ্রসাদ ভদ্রবংশ-সম্ভূত ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি বংশ-মর্য্যাদার অনুরোধে অবস্থা অতিক্রম করিয়া চলিতেন না। স্বহস্তে রন্ধন এবং ভৃত্যের সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিতেন। ইহাতে তাঁহার মনে মুহূর্ত্তরেও লোক-নিন্দার ভয় কিংবা কষ্টের উদ্রেক হয় নাই। বিধাতার বিধানই চমৎকার! তিনি যাহাদ্বারা যে কাজ সম্পাদিত করাইয়া লইবেন, তাঁহাকে সে কাজ সম্পাদনের উপযোগী উপাদানেই গঠন করেন। ভবানী-প্রসাদের চিত্তে জাত্যভিমানের ভাবটা প্রবল হইলে, তিনি তাঁহার সামান্য আয় হইতে কখনও কিছু সঞ্চয় করিতে পারিতেন না। যাহা হউক ভবানী-প্রসাদ তিন বৎসর কর্ম্ম করিয়া যাহা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা এক সামান্য বোতলের দোকান খুলিলেন। তখন আর তিনি সওদাগরের বাড়ীর কাজ রাখিতে পারিলেন না। দুই চারি মাস চলিয়া গেল, কারবার ভাপরূপ চলিতেছে না। ইহাতে তিনি ভগ্নমনোরথ হইলেন না। তাঁহার মনে কেমন এক বিশ্বাস যে তিনি ব্যবসায়ে বড়লোক হইবেন। এই বিশ্বাসের বলেই কখনও তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি হয় নাই। ফলসম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাস না থাকিলে মানুষ সহজেই ধৈর্য্যশূন্য হইয়া পড়ে। এক বৎসরকাল দোকান একরূপ চলিল। দ্বিতীয় বৎসরে পদার্পণ করিবামাত্র যেন অবস্থাচক্র ঘুরিয়া গেল। চতুর্দ্দিক্ হইতে আশার আলোক আসিয়া ভবানীপ্রসাদের চিত্তকে আলোকিত করিতে লাগিল। দোকানে বেশ লাভ দাঁড়াইতে লাগিল, নিকটবর্ত্তী গ্রামের কোনও এক অবস্থাপন্ন ব্যক্তি ভবানীপ্রসাদকে কন্যাদানে প্রস্তুত হইলেন। ভবানীপ্রসাদ বিবাহ করিলেন। বিবাহে যে অর্থ পাইলেন, তাহাও দোকানে মূলধনরূপে খাটাইতে লাগিলেন। এইরূপে একপুরুষের মধ্যেই তিনি বড়লোক হইয়া উঠিলেন। অর্থাগমের সহিত ক্ষুদ্রচেতা লোকদিগের স্বভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভবানীপ্রসাদের তাহা হয় নাই। ভবানীপ্রসাদের সেই ধৈর্য্য, সেই বিনয়, সেই অধ্যবসায়, সেই নিরভিমানিতা, সেই পরিশ্রমশীলতা সকলই রহিল। যে ভবানীপ্রসাদকে পূর্ব্বে গ্রামের লোক অবজ্ঞা করিত, সে এখন সকলের আদরের পাত্র। প্রাচীন লোকেরা এখন তাহাকে নিওগী মশায় এবং নব্য যুবকেরা ভবানী বাবু বলিয়া সম্বোধন করেন। ভবানী বাবু দানশীলতা-গুণে সরকার বাহাদুরের নিকটও বিলক্ষণ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এখন তিনি রায়বাহাদুর ও একজন সম্মানিত মাজিষ্ট্রেট। ভবানী বাবুর একমাত্র কন্যা। কন্যার নাম নিরয়কুমারী। নিরয়কুমারী পিতৃগুণ কিছুই পায় নাই। মায়ের দাম্ভিকতা, ধন ও জাত্যভিমানটুকু ষোল আনা লাভ করিয়াছেন। অলসের শিরোমণি,

মুখরার হন্দ। নিরয় যখন বালিকা ছিল, তখন তাহার মধ্যে এ সকল দোষ বড় দেখা যায় নাই। প্রতিবেশী রাধাগোবিন্দ বাবুর কন্যা স্বরজা তাহার বাল্যসখী ছিল। রাধাগোবিন্দের অবস্থা ভাল ছিল না। তবুও নিরয় স্বরজাকে আপনার বোনটীর মত দেখিত। তাহার সহিত খেলা করিত। কখন কখন মায়ের অজ্ঞাতে একত্র বসিয়া আহারাদি করিত। জননী জানিতে পারিলেই এজন্য তাহাকে তিরস্কার করিতেন। বাল্যস্থলভ সরলতা নিরয়ের প্রাণ অধিকার করিয়াছিল, সুতরাং সে জননীর তিরস্কারেও স্বরজার সহিত ভগ্নীর ন্যায় মিশিতে বিরত হয় নাই। ক্রমে ক্রমে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাব তাহার হৃদয়ে সঞ্চারিত হইতে লাগিল। স্বাভাবিক সরলতা, নিরভিমানিতা এবং সাম্যভাব ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতে লাগিল। জনক জননীর কুশিক্ষায় অনেক বালক বালিকার সর্ব্বনাশ হইয়া থাকে। নিরয়কুমারীর জীবন তাহার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। নিরয়কুমারী এখন আর স্বরজাদের বাড়ী যায় না, স্বরজার সঙ্গে কথা বলা অপমানজনক মনে করে। স্বরজাকে দেখিলে পাশ কাটিয়া চলিয়া যায়। স্বরজাও সাহস করিয়া তাহার নিকটবর্ত্তী হয় না। নিরয়কুমারীর বয়স এখন দশ বৎসরের অধিক নয়। তাহার পিতা তাহার বিবাহ দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু আর যখন সন্তান হইবার আশা নাই—তখন নিরয়কুমারীর বিবাহ দিয়া জামাইকে গৃহে রাখেন ইহাই ইচ্ছা। অথচ মৃত্যুর পর পিণ্ড প্রাপ্তির আশা প্রাণ হইতে দূর করিতে পারিতেছেন না। তাই এক একবার পোষ্যপুত্র গ্রহণেরও আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে পোষ্য পুত্র গ্রহণ কামনা পরিত্যাগ করিলেন। জামাইকে গৃহে রাখিতে হইলে বর মূর্খ ও দরিদ্র না হইলে চলিবে না, কারণ বর শিক্ষিত লোক হইলে শ্বশুরের গৃহে চিরকাল থাকিবেন প্রত্যয় কি? ধনী হইলেও কেহ এরূপ জীবন কাটাইতে সম্মত হইবে না। এজন্য ভবানী বাবু এক মূর্খ দরিদ্রের সন্তানকে কন্যার বর মনোনীত করিলেন। বরটী দেখিতে সুশ্রী ছিল বটে, কিন্তু অন্তঃসার-বিহীন। নিরয়কুমারীর পক্ষেও এরূপ বরই আদরণীয়, কারণ সে তাহাকে কলুর বলদের মত যথেচ্ছা ঘুরাইতে পারিবে। বিবাহের পর পাঁচ বৎসর বেশ কাটিয়া গেল। কিন্তু তৎপরে প্রতিকূল বায়ু বহিতে লাগিল। ভবানী বাবু পদ্মা নদীর তীরে এক প্রকাণ্ড জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। তাঁহার জমিদার হইবার ইচ্ছা এত প্রবল যে ঐ সম্পত্তি ক্রয়কালে ১॥ লক্ষ টাকা ঋণ করেন। ঋণের সুদ ক্রমশঃ পুঞ্জীকৃত হইতে লাগিল। এদিকে ব্যবসায়ের অবস্থাও তত ভাল নয়। লাভ আর পূর্ব্বের মত হইতেছে না। কিয়ৎকাল এইরূপে চলিতে লাগিল। পদ্মানদী অতি ভীষণ। যাঁহারা তাহার

মহিমার বিষয় জানেন, তাঁহারা সহজে তাহা ভুলেন না। বৎসর বৎসর কত গ্রাম অট্টালিকা—কত গৃহস্থপল্লী উদরসাৎ করিতেছে! ইহার প্রভাবে কত জমিদার দুই তিন বৎসরের মধ্যে ফকির হইয়া পড়িতেছে! ভবানী বাবুরও সে দুর্গতি ঘটিল। পদ্মানদীর প্রকোপ তাঁহার জমিদারীর উপর পতিত হইল। পাঁচ বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রকাণ্ড জমিদারী সমস্ত পদ্মা গর্ভে নিখাত হইল। এখন তিনি ঋণজালে জড়িত। দৈবদুর্বিপাকবশতঃ অন্ধ হইয়া পড়িয়াছেন। বিপদ একাকী আসে না। চতুর্দ্দিক হইতে যেন বিপদরাশি মুখবিস্তার করিয়া তাঁহার সুখচন্দ্রমা গ্রাস করিতে আসিতে লাগিল। কন্যা নিরয়কুমারী চিররুগ্না হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী বাতব্যাধি রোগে শয্যাশায়িনী। এদিকে উত্তমর্ণগণ ঋণ শোধের জন্য পীড়াপীড়ি করিতেছেন। ভবানী বাবু আর কোনও পথ না পাইয়া বিষপানে আত্মহত্যা করিলেন। উত্তমর্ণগণ এই সংবাদ পাইয়া অমনি তাঁহার সমস্ত সম্পত্তি আবদ্ধ করিল। নিরয়কুমারীর আর এখন উচুমুখে উঁচু কথা নাই—ম্রিয়মান হইয়া পড়িয়াছে। স্বামী এক পাখীর দলে জুটিয়া গৃহ পরিত্যাগ করিয়াছে। দশবৎসর পুর্ব্বে যে নিরয় রাজকুমারী ছিল, আজ সে পথের কাঙ্গালিনী। এমন কি উত্তমর্ণগণ বসত বাড়ী খানি পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বসিয়াছে। এখন নিরয়কুমারী এবং তাহার জননী যান কোথা? সুরজা এই সংবাদ শুনিতে পাইল। সুরজার পিতা নির্ধনী ছিলেন বটে, কিন্তু সুরজা এক ধনী জমিদারের হাতে পড়িয়াছে। তাহার স্বামীর বিপুল সম্পত্তি। কিন্তু এতাদৃশ সম্পত্তির অধিকারিণী হইয়াও সুরজার মস্তক ঘূর্ণায়মান হয় নাই। তাহার প্রকৃতি অধিক পরিমাণে ভবানী বাবুর প্রকৃতির মত ছিল। অবস্থার পরিবর্ত্তনসহ তাহার চরিত্রে কোন পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয় নাই। সুরজা নিরয়ের দুরবস্থার কথা শুনিতে পাইয়া তাহাকে বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিবে স্থির করিল। কিন্তু অভিমানী নিরয় তাহার সাহায্য গ্রহণ করিবে কি না এই সন্দেহ তাহার মনে উপস্থিত হইল। কিয়ৎকাল সন্দেহে দোলায়মান অবস্থায় থাকিয়া অবশেষে সুরজা সাহায্যের প্রস্তাব করাই স্থির করিল। সুরজা স্বয়ং এই উদ্দেশ্য সাধন জন্য পিতৃগৃহে চলিয়া আসিল। তাহার স্বামীও উদারচরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি সুরজার সাধু সংকল্পে বিঘ্ন না জন্মাইয়া সর্ব্বান্তঃকরণে তাহার অনুমোদন করিলেন। সুরজা পিতৃগৃহে আসিয়া ভবানী বাবুর বাড়ীতে গেল। সুরজাকে দেখিয়া নিরয়ের বাল্যস্মৃতি জাগিয়া উঠিল, আর সে অশ্রু সংবরণ করিতে পারিল না। কিয়ৎকাল সুরজার সঙ্গে বাক্য বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব হইল। শোকাবেগ কিয়ৎপরিমাণে নিবৃত্ত হইলে সে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা সুরজাকে

বলিল, এবং পূর্ব্বকৃত অপরাধের জন্য সুরজার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। নিরয়ের এই অবস্থা দেখিয়া সুরজাও অশ্রুজল সংবরণ করিতে পারিল না—অবশেষে নিরয়ের পিতার আংশিক ঋণ পরিশোধ করিয়া বসতবাড়ী খানি মুক্ত করিবার প্রস্তাব করিল। নিরয়ের আর এখন সে অভি-মান নাই। বিপদের ঘুর্ণিপাকে পড়িয়া সমস্ত গর্ব্ব খর্ব্ব হইয়াছে, সুতরাং সুরজার প্রস্তাবে দ্বিরুক্তি না করিয়া উহা গ্রহণ করিতে রাজী হইল। উত্তমর্ণ-দিগের কেহ কেহ সুরজার এই মহত্বের কথা শুনিয়া আংশিক টাকা গ্রহণ করি-য়াই নিরয়কে ঋণ মুক্ত করিয়া দিলেন। নিরয় এখন সুরজার অনুগ্রহে গ্রাসাচ্ছা-দনের এবং বাসগৃহাভাবের কষ্ট হইতে পরিত্রাণ লাভ করিল। ধন্য সুরজা!!! তোমার মহত্ত্ব সকল মহিলারই অনুকরণীয়।

উপসংহারে ভগিনীদিগকে প্রস্তাবের শিরোভাগস্থিত শ্লোকটীর প্রতি লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। বিধাতার বিধি বুঝা ভার, ভবিষ্যতের গর্ভে কার· জন্য কি নিহিত থাকে, কেহ তাহা বুঝিতে পারে না। তাই ক্ষুদ্রমনা লোক ভিন্ন কেহ কালের ক্রীড়ার বস্তু ধনমানের গর্ব্ব করে না। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই ধন, জন এবং যৌবনকে ক্ষণস্থায়ী মনে করেন, এজন্য তাঁহারা কখনও গর্ব্বিত হন না। তাঁহারা সর্ব্বদাই তৃণের মত নীচ্ হইয়া থাকেন। প্রত্যেক নর-নারীর এতাদৃশ আদর্শের অনুকরণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে জীবন মধুময় হইবে।

হিন্দু নারীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম।

শেষ।

দাস দাসীগণকে পরিবারের ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, কিন্তু তাহাদের সহিত ইয়ারকি দেওয়া বা পরিহাসাদি করা কর্ত্তব্য নহে এবং তাহারা যেখানে হাস্য পরিহাস ও গল্পগাছা করে, তথায় অবস্থান করা কর্ত্তব্য নহে। তাহাদের প্রতি জননীর ন্যায় স্নেহ প্রদর্শন করিবে। তাহাদের পীড়া হইলে চিকি-ৎসা করাইবে—চিকিৎসককে টাকা দিবে এবং পীড়িতের শুশ্রূষা করিবে। রোগী ভাল হইলে যদি তোমার আর্থিক অভাব থাকে, তবে না হয় তাহার বেতন হইতে কাটিয়া লইবে, কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি বিনা চিকিৎসায়, বিনা যত্নে মারা গেলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইতে হইবে। তাহারা মনোনীত না হইলে জবাব দেওয়া ভাল, কিন্তু গালি গালাজ দেওয়া উচিত নহে। গৃহে কোন উপাদেয় খাদ্যাদি প্রস্তুত হইলে অন্যান্য পরিবার-গণের ন্যায় উহাদিগকেও দেওয়া

উচিত। গৃহিণীর নিকট মাতার ন্যায় স্নেহ ও শাসন প্রাপ্ত হইলে উহারাও সন্তানের ন্যায় ভক্তি ও ভয় করিয়া গৃহের কার্য্য গুলি নিজের কার্য্যের ন্যায় মনোযোগের সহিত সম্পন্ন করিবে এবং ঐ গৃহ ত্যাগ করিয়া অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিবে না।

গাভীগণ হিন্দুদিগের মাতার ন্যায় পূজ্যা। আমরা ইহার অর্থ যেটুকু বুঝিতে পারি, তাহা এই যে গাভীদুগ্ধ স্তনের ন্যায় মনুষ্যশরীরের পুষ্টিবর্দ্ধক। যে সকল শিশু অন্ন অথবা তদ্রূপ কোন জিনিষ ভক্ষণ করিতে পারে না এবং যে শিশুগণ স্তন্যে বঞ্চিত, গাভীদুগ্ধ তাহাদের জীবন স্বরূপ। গাভীদুগ্ধে নানা প্রকার উপাদেয় খাদ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। অন্য কিছু আহার না করিয়াও এক গাভীদুগ্ধে মনুষ্য জীবন ধারণ করিতে সমর্থ; তদ্ভিন্ন যাগযজ্ঞ হোম বিবাহাদি ক্রিয়া কলাপে গাভীদুগ্ধ ও ঘৃত একটী প্রধান সামগ্রী। এমন উপকারিণী গাভীকে মাতৃস্থানীয়া করিয়া হিন্দুগণ কেমন সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন! গাভীগণ অতি নিরীহস্বভাব এবং উদ্ভিদ ভক্ষণেই জীবন ধারণ করে—হিংসা প্রবৃত্তি ইহাদের আদৌ নাই, সুতরাং এই সুন্দর স্বভাবাপন্ন জীবকে দেবী বলিয়া পূজা করিতে হিন্দুগণ কেন কুণ্ঠিত হইবেন? গাভীর বিষ্ঠা মূত্রও গৃহস্থের অনেক উপকারে আইসে। গার্হস্থ্যধর্ম্মপরায়ণা গৃহিণীগণ এই গাভীকে অতি ভক্তির সহিত যত্ন ও পালন করিবেন। এইরূপ যে পশুগণ আমাদের উপকারে আইসে এবং আমাদের প্রতিপাল্য, তাহাদের যত্ন ও তত্ত্বাবধান করা রমণীর কর্ত্তব্য। গৃহপালিত পক্ষীগুলির প্রতিও যত্ন চেষ্টার ক্রটী হওয়া উচিত নহে। স্বাধীনতা-বঞ্চিত পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণ যদি গৃহস্থের আশ্রয়ে থাকিয়া অনাহারে অযত্নে মরিয়া যায়, তাহা হইলে ঈদৃশ শোচনীয় মৃত্যুতে কি তোমার হৃদয় বিগলিত হয় না? যদি না হয় তবে তুমি হৃদয়হীনা এবং গার্হস্থ্য ধর্ম্মপালনের যোগ্যা নও। অতএব গৃহপালিত পক্ষীদিগকে জননীর ন্যায় আহার প্রদান করিবে ও সর্ব্বদা তাহাদের তত্ত্বাবধান করিবে। "প্রাণা যথাত্মনোঽভীষ্টা ভূতানামপি তে তথা। আত্মৌপম্যেন ভূতেষু দয়াং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ॥" এই উপদেশটী সর্ব্বদা স্মরণে রাখিয়া চলিবে।

স্বাস্থ্য যখন সকল ধর্ম্মের, সকল কর্ম্মের, ও সকল সুখের মূল, তখন রোগীর শুশ্রূষা দ্বারা যদি তুমি তাঁহাকে স্বাস্থ্য দিতে পার তবে রোগীকে কি না দিলে? পথ্যাভাবে ঔষধ, রোগীর কোন উপকার করে না। ঔষধাভাবে পথ্যদ্বারা রোগী বাঁচিলেও বাঁচিতে পারে, কিন্তু পথ্যাভাবে বাঁচিতে পারে না,—"যা না করে বৈদ্য তা করে পথ্য" এই কথাটী অতি সার। সুতরাং পথ্যাদিদ্বারা রোগীর শুশ্রূষা করাও গার্হস্থ্যধর্ম্মের অন্তর্গত।

এখন আর তপোবন নাই—সংসার-

ত্যাগী, ফলমূলাহারী সংযতেন্দ্রিয় বনবাসী আর্য্য ঋষিগণও নাই এবং সহমরণ প্রথাও নাই, সুতরাং বিধবাগণকে যখন গৃহে থাকিয়াই চিরজীবন ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিতে হইবে, তখন সধবা রমণীকেও ঈশ্বর এবং পতি পদে মতি রাখিয়া উক্ত প্রকারে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালন করিতে হইবে। সধবা রমণীগণের সহিত গার্হস্থ্য ধর্ম্ম আচরণে তাঁহাদের প্রভেদ এই যে তাঁহারা নির্লিপ্ত ও নিরাসক্তভাবে গৃহধর্ম্ম রক্ষা করিবেন। একদা মহামুনি বশিষ্ঠ, ভগবান্ রামচন্দ্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

"বহির্ব্যাপারসংরম্ভোহৃদি সংকল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তাবহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥"

হিন্দুবিধবাগণেরও এইরূপে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম পালন করা উচিত। পরিজন অতিথি ও গৃহপালিত পশুপক্ষিগণের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত না করিলে তাঁহার ধর্ম্মের উৎকর্ষ হইবে না। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্ম ধারয়তে প্রজাঃ। যৎস্যাদ্ধারণপ্রযুক্তং সধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"

সতীধর্ম্ম যে কেবল মাত্র স্বামীকে লইয়া তাহা নহে, তাহা হইলে স্বামীর চাকরীস্থানবাসিনী—শ্বশুর শাশুড়ী ভাসুর প্রভৃতিকে অবজ্ঞাকারিণী—পরিজনগণের সহিত কলহপ্রিয়া—পরিজনদিগের মধ্যে কেহ গলা শুকাইয়া মরিলেও এক বিন্দু জল না দিয়া, বাবু (স্বামী) আসিলেই মিছরী ভিজা ও খাবারাদি লইয়া যাঁহারা হাজির থাকেন, তাঁহারা কি পবিত্র সতী নামের যোগ্যা? কখনই নহে। শাণ্ডিলী নাম্নী একটী সতীরমণী স্বর্গে গমন করিলে স্বর্গবাসিনী সুমনা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দেবি! তুমি কি পুণ্যে এত উচ্চ স্বর্গে আসিয়াছ? ইহার উত্তরে শাণ্ডিলী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই প্রকৃত সতীধর্ম্ম—তাহাই হিন্দুরমণীর গার্হস্থ্য ধর্ম্ম, এইজন্য শাণ্ডিলীর সেই সুধাময় নীতিপূর্ণ বাক্যগুলি আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিতেছি।

নাহং কাষায়বসনা নাপি বল্কলধারিণী।
ন চ মুণ্ডা চ জটিলা ভূত্বা দেবত্বমাগতা॥
অহিতানি চ বাক্যানি সর্ব্বাণি পরুষাণি চ।
অপ্রমত্তা চ ভর্ত্তারং কদাচিন্নাহমব্রুবং॥
দেবতানাং পিতৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণানাঞ্চ পূজনে।
অপ্রমত্তা সদা যুক্তা শ্বশ্রূশ্বশুরবর্ত্তিনী॥
পৈশুন্যেন প্রবর্ত্তামি ন মমৈত মনোগতং।
অদ্বারি ন চ তিষ্ঠামি চিরং ন কথয়ামি চ॥
অসদ্বাহসিতং কিঞ্চিদহিতং বাপি কর্ম্মণা।
রহস্যমরহস্যং বা ন প্রবর্ত্তামি সর্ব্বথা॥
কার্য্যার্থে নির্গতঞ্চাপি ভর্ত্তারং গৃহমাগতং।
আসনে নোপসংযোজ্য পূজয়ামি সমাহিতা॥
যদন্নং নাভিজানাতি যদ্ভোজ্যং নাভিনন্দতি।
ভক্ষ্যং বা যদি বা লেহ্যং তৎসর্ব্বং বর্জ্জয়াম্যহং॥
কুটুম্বার্থে সমানীতং যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যমেবতু।
প্রাতরুত্থায় তৎসর্ব্বং কারয়ামি করোমিচ॥
প্রবাসং যদিমে যাতি ভর্ত্তা কার্য্যেণ কেন চিৎ।
মঙ্গলৈর্বহুভির্যুক্তা ভবামি নিয়তা তদা॥
অঞ্জনং রোচনাঞ্চৈব স্নানমাল্যানুলেপনং।
প্রসাধনাঞ্চ নিষ্ক্রান্তে নাভিনন্দামি ভর্ত্তরি॥
নোত্থায় যামি ভর্ত্তারং সুখসুপ্তমহং সদা।
অন্তরেষপি কার্য্যেষু তেষু তুষ্যতি মে মনঃ॥
নায়াসায়ামি ভর্ত্তারং কুটুম্বার্থেপি সর্ব্বদা।
গুপ্ত গুহ্যা সদাচাস্মি স সংসৃষ্ট নিবেশনা॥

তৎপরেই বলা হইয়াছে যে, "যে নারী সমাহিত হইয়া এইরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালন করেন, তিনি অরুন্ধতীর ন্যায় স্বর্গলোকে পরম সুখভোগ করেন। শ্রীকুমুদিনী রায়।

কোরিয়া প্রদেশের মহিলা।

পাঠক পাঠিকারা অবগত আছেন কিছুকাল হইতে কোরিয়া প্রদেশ লইয়া চীন ও জাপানের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে। জাপান বলেন ন্যায়তঃ কোরিয়া রাজ্য তাঁহারই অধিকার-ভুক্ত, কিন্তু চীন জাপানের এই দাবী অস্বীকার করেন। কোরিয়া রাজ্যের উপর কে আধিপত্য করিবেন, তাহাই মীমাংসার জন্য বর্ত্তমান মহাযুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে। কোরিয়া প্রদেশ সভ্যজগ-তের নিকট এক প্রকার অজ্ঞাত ছিল।

চীন-জাপান সমর আরম্ভ হওয়া অবধি কোরিয়া প্রদেশ সম্বন্ধীয় বিবিধ তত্ত্ব অবগত হইতে সকলেই ঔৎসুক্য প্রকাশ করিতেছেন। আমাদিগের পাঠিকাগণ কোরিয়ার মহিলাগণের অব-স্থার বিষয় জানিতে স্বভাবতঃই কৌতু-হলাক্রান্তা হইতে পারেন। আমরা সংক্ষেপে তাঁহাদের কৌতূহল চরিতার্থ করিতে চেষ্টা করিব।

কোরিয়াদেশীয় মহিলাগণের জীবন বহু-লাংশে চীনমহিলাগণের জীবনের আদর্শে গঠিত। কোরিয়ার সামাজিক ব্যবস্থানু-সারে স্ত্রীলোক পুরুষের সম্পূর্ণ অধীন। সেখানে বহুবিবাহ রীতি প্রচলিত আছে। যে পুরুষ একের অধিক স্ত্রী গ্রহণ করেন, তাঁহাকে প্রত্যেক স্ত্রীর জন্য এক একটী পৃথক্ গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হয়। এক বাটীতে বহু স্ত্রী লইয়া বাস করার প্রথা কোরিয়াবাসিগণ ঘৃণনীয় বিবেচনা করেন। চীন ও জাপানীয় রমণীগণ সাধারণতঃ রূপলাবণ্য-বিশিষ্টা, কিন্তু কোরিয়া মহিলা-গণের মধ্যে অনেকেই সৌন্দর্য্য-বিরহিতা। ইউরোপীয় পরিব্রাজকগণের বিবেচনায় কোরিয়ার নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ অতীব কুৎসিতা। ভারতবর্ষের ন্যায় কোরি-য়ার নিম্ন শ্রেণীর স্ত্রীলোকগণ রাজপথে বাহির হইতে সঙ্কুচিতা হয় না, কিন্তু ভদ্র ও সম্ভ্রান্তা বংশীয়া রমণীগণ অবগুণ্ঠনবতী হইয়া গৃহমধ্যে অবরুদ্ধা থাকেন। নিতান্ত প্রয়োজনানুরোধে ইহাঁদের মধ্যে যাঁহারা রাজপথে বহির্গতা হন, তাঁহারা মস্তক ও মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে বস্ত্রদ্বারা আবৃত করেন, এবং তাহাতে কেবল চক্ষুদ্বয়ের উপযোগী দুইটী ছিদ্র রাখিয়া দেন। কোরিয়া প্রদেশে সাত বৎসর বয়ক্রম পর্য্যন্ত বালিকাগণ বালকদিগের সহিত একত্র ক্রীড়া করে এবং বালকদিগের ন্যায় পরিচ্ছদ পরিধান করে। এখানে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। অষ্টম বৎ-সরে পদার্পণ করিলেই কোনও বালিকাকে কোনও বালকের সহিত আর বাক্যা

লাপ করিতে দেওয়া হয় না এবং অষ্টম বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তাহাকে উদ্বাহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হয়। কোরিয় মহিলাগণের পরিচ্ছদ কতকটা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রদেশীয় কোন কোন স্থলের রমণীগণের পরিচ্ছদের অনুরূপ। কোরিয়া প্রদেশে ধুতী বা সাড়ী ব্যবহৃত হয় না। স্ত্রীলোকগণ পাজামা পরিধান করেন; কিন্তু একটী পাজামা পরিধান করা স্ত্রীলোকের পক্ষে যথেষ্ট নহে; উপর্য্যুপরি তিনটী পাজামা পরিধান না করিলে তাঁহারা দেশাচারের বিরুদ্ধে কার্য্য করারূপ অপরাধে অপরাধিনী হন। পাজামার উপরে পিরাণের ন্যায় একটী গাত্রাবরণ পরিধান করিতে হয়; উহা রঞ্জিত হওয়া আবশ্যক। গাত্রাভরণে পকেট না থাকাতে, ইহাঁরা একটি থলিতে দড়ি বাঁধিয়া তাহা কোমরে আবদ্ধ করিয়া রাখেন।

কতকগুলি সুমাতা।

(৩৫৭ সংখ্যা-১৮২ পৃষ্ঠার পর)

মাতাই সন্তানের আদিগুরু। প্রকৃতি হইতে শিশু যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তৎপরেই জননীর নিকট শিক্ষিত হইতে থাকে। ক্ষুদ্র শিশুর গৃহই প্রধান শিক্ষাগার। এই গৃহে যদি সুখশান্তি, পবিত্রতা, বিশুদ্ধ আমোদ থাকে এবং আদিগুরু জননী যদ্যপি সুশিক্ষিতা উচ্চহৃদয়া ধর্ম্মপরায়ণা হয়েন, তাহা হইলে উদ্যানজাত সুগন্ধ কুসুমের ন্যায় শিশুচরিত্র পরিণামে সুগন্ধ ও মধুময় হইয়া জনক জননীর আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ শিশুচরিত্র বিশুদ্ধ; কিন্তু পাত্রভেদে লবণ যেমন তিক্ত হইয়া পড়ে, জননীর দোষগুণে শিশুগণ তেমনি বিগড়াইয়া যায়। ক্ষুদ্র শিশু যে অবাধ্য হয় বা মিথ্যা বলে, সে কাহার দোষ? তাহার না তাহার শিক্ষাদাত্রী জননীর? পূর্ব্ব কালে মাতা শিশুকে যদ্রূপ শিক্ষা দিতেন শিশুগণ সেইরূপ আচরণ করিয়া যশস্বী হইতেন। নিম্নলিখিত জননীদ্বয়ের চরিত্রদ্বারা বুঝা যাইবে কিরূপ শিক্ষাদ্বারা তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণ সন্তান প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

সুমিত্রা—রামায়ণবর্ণিত সুমিত্রা দেবী এক আদর্শ মাতা। প্রাণাধিক পুত্রকে চতুর্দ্দশ বৎসর অরণ্যে জ্যেষ্ঠের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিতে তিনি আদেশ করিয়াছিলেন। আদর্শ মাতা আরণ্য গমনোদ্যত পুত্রকে বলিতেছেন;—

সৃষ্টস্ত্বং বনবাসায় স্বনুরক্তঃ সুহৃজ্জনে;
রামপ্রমাদং মাকার্ষীঃ পুত্র ভ্রাতরি গচ্ছতি।
ইদংহি বৃত্তমুচিতং কুলস্যাস্য সনাতনম;
দানং দীক্ষাচ যজ্ঞেষু তনুত্যাগ মৃধেষু হি।

রামং দশরথং বিদ্ধি মাংবিদ্ধি জনকাত্মজাম্ ;
অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথাসুখমং।

"হে পুত্র! বনবাসের নিমিত্তই তোমার সৃষ্টি হইয়াছে। আমি তোমাকে বনগমনে আদেশ দিতেছি। রাম বিপন্ন বা সম্পন্ন হউন, ইনিই তোমার গতি, তুমি ইহাঁর সকল বিষয়ে সতর্ক হইবে। তোমার ভ্রাতা অরণ্যে চলিলেন, জ্যেষ্ঠের অনুবর্ত্তী হওয়াই ইহলোকের সদাচার বলিয়া জানিবে; বিশেষতঃ এহরূপ কার্য্য এই বংশেরই যোগ্য। দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, সমরে দেহত্যাগ ইহাই এ বংশের ধর্ম্ম। এক্ষণে তুমি রামকে পিতা, জানকীকে জননী এবং গহন বনকে অযোধ্যা জ্ঞান করিবে।" সুমিত্রাদেবী প্রিয়দর্শন লক্ষ্মণের শিরোঘ্রাণ করতঃ সজলনয়নে পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিলেন "বৎস! তবেএ খন তুমি সচ্ছন্দে শ্রীরামের সহিত অরণ্যচারী হও।" সুমাতার নিকট সাধুবাক্যে উৎসাহ পাইয়াছিলেন বলিয়াই লক্ষ্মণ অযোধ্যার অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, প্রাণাধিকা সহধর্ম্মিণী এবং যৌবন-তৃষ্ণা পরিহার করিয়া জটা অজিনধারী ব্রহ্মচারী হইতে পারিয়াছিলেন। সুমিত্রা সতী ভাবাবেগ রুদ্ধ করিয়া কর্ত্তব্যপালন করিতে পুত্রকে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাই পরিণামে ইন্দ্রজিৎ-জয়ী বীর লক্ষ্মণের জননী হইয়াছিলেন এবং আদর্শ দেবতা হইয়া অদ্যাপি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর শ্রদ্ধা-ভক্তি গ্রহণ করিতেছেন।

দুহিতা। যদুবংশের ভাগিনেয় ভোজরাজ কুন্ত অপুত্রক থাকায় শূরসেন-নৃপতি নিজ কন্যাকে তাঁহার নিকট লালনপালনার্থে দিয়াছিলেন। শূরসেন-তনয়া সে সময় পৃথা নামে অভিহিত হইতেন। পরে ভোজ-রাজ কুন্ত নিজ নামানুসারে কুন্তী আখ্যা প্রদান করিয়াছিলেন। ধর্ম্মশীল কুন্ত নৃপতি দুহিতা কুন্তী দেবীকে অতিথিপরিচর্য্যার্থ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই সময় কুন্তী দেবী দুর্ব্বাসাপ্রসাদাৎ "অভীষ্ট মন্ত্র" পাইয়াছিলেন। মহাবংশে মহারাজ পাণ্ডুর সহিত কুন্তীদেবীর বিবাহ হইয়াছিল, এবং তাঁহার পুত্রগণ এক এক জন পরাক্রান্ত বীর, তথাচ তিনি এক দিনের জন্যও অহঙ্কার করেন নাই। ধর্ম্মপ্রাণা কুন্তী দেবী ধর্ম্মকে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জ্ঞান করিতেন। তাই মাদ্রী দেবী নিজ সুতগণকে তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া গর্ভজাত পুত্রাপেক্ষা নকুল সহদেবকে অধিক স্নেহ করিতেন। বন-বাস গমনকালে কুন্তীদেবী সপত্নী-পুত্রকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন;—

"ওরে পুত্র সহদেব! ফিরে চাহ মোরে
কেমনে আমার মায়া ছাড়িলে অন্তরে
তিলেক না বাঁচি তোমা না দেখি নয়নে
কেমনে রহিবে প্রাণ তোমার বিহনে॥
ভাই সব যাক যদি না পারে রহিতে।
সবে যাক্ তুমি থাক আমার সহিতে॥"

যখন কুন্তী দেবী দেখিলেন সহদেব ভ্রাতৃগণের সঙ্গ ত্যাগ করিবে না, সক-

েরেই বনবাসে নিশ্চয়ই যাইতে হইবে, তখন বধূকে বলিতেছেন ;—

"না করহ আন, ভাবী নহে আন,
ধাতা নারে খণ্ডিবারে।
পাল সত্য ধর্ম্ম, কর সাধু কর্ম্ম,
ধর্ম্ম রাখে ধার্ম্মিকেরে॥
তুমি সত্য ব্রতা, সতী পতিব্রতা,
আমি কি করাব শিক্ষা।
সহ স্বামিগণ, যাইতেছে বন,
আমি মাগি এক ভিক্ষা॥
কনিষ্ঠ নন্দন, আমার জীবন,
তুমি জান ভাল মতে।
সহজে বালক, বনে মহা দুঃখ,
সদা দেখিবে স্নেহেতে।
সুকুমার দেহ, প্রাণাধিক স্নেহ,
আপনি করিবা তুমি।
কুন্তী ইহা বলি, যেমন বাতুলী,
মূর্চ্ছিতা পড়িল ভূমি।'

কুন্তীচরিত্রে, এই এক মহত্ব। আপনাকে ভুলিয়া পরকে ভালবাসা এই ত অসাধারণ মহত্ব। জননী মাত্রেই প্রাণাপেক্ষা গর্ভজাত তনয়কে স্নেহ করেন। সপত্নী-তনয়ে যাহার এতাদৃশ প্রেম, না জানি তাঁর ভালবাসা কতই ছিল! আর এক স্থলে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষে পাণ্ডবেরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলে শ্রীকৃষ্ণ যখন বর প্রদান করিতে চাহিলেন, সেই সময় পিতৃস্বসা কুন্তী দেবীকে বলিতেছেন "হে মাতঃ আপনার গুণেই আপনার পুত্রগণ জয়লাভ করিয়া সসাগরা ধরার অধীশ্বর হইলেন। আমি আপনারও আপনার পুত্রগণের গুণে একান্ত বশীভূত ও প্রীত হইয়াছি, এখন আপনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করুন!" ধর্ম্মপরায়ণা কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শুনিয়া একান্ত বিনয় সহকারে সজলনয়নে বলিতে লাগিলেন, "তাত! এ সংসারের ধন সম্পদ কিছুই নহে, অকিঞ্চিৎকর দৃষ্ট বস্তু মাত্র। ইহা ভোগতৃষ্ণা ও প্রবৃত্তিকুলকে বর্দ্ধিত করিয়া মানবকে বিনাশের পথে চালিত করে। সুখেচ্ছা বর্দ্ধিত ও অসংযত হইয়া মানব অহঙ্কৃত হয় এবং মত্ত হইয়া তোমার দেবদুর্ল্লভ চরণারবিন্দকে* তুচ্ছ করিয়া থাকে। হে বৎস! যদি একান্তই আমাকে অনুগ্রহ করিয়া থাক, তবে দুঃখই পুনরায় প্রদান কর, কারণ দুঃখের অবস্থায় তোমাকে স্মরণ ও তোমার উপর নির্ভরের ভাব বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তোমাকে বিস্মৃত ও তোমার প্রতি ভক্তিশূন্য হওয়াই মৃত্যুর অবস্থা। হে কৃষ্ণ! এই অবস্থা হইতে আমাকে ও আমার প্রাণাধিক পুত্রগণকে রক্ষা কর। কুন্তী দেবীর চরিত্রে উদারতা, প্রেম, সহিষ্ণুতা, নির্ভরশীলতা, ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি একাধারে বিরাজমান। এমন প্রেমময়ী নিঃস্বার্থ জননী না হইলে কি পাণ্ডবগণ এতদূর শক্তিশালী হইতে পারিতেন? কখনই না। যে যত মহৎ হউক না কেন, মূলে জননীর শক্তি। কুন্তীর ঐ সকল গুণ এক একজন পাণ্ডবের চরিত্রে লক্ষিত হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

সুশীলাবালা সিংহ।

* শ্রীকৃষ্ণকে ভগবান্ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন।

ইয়োরোপীয় নাবিকদিগের কয়েকটী কুসংস্কার।

কোন অর্ণবপোতে শব লইয়া গেলে সেই অর্ণবপোতের ভবিষ্যতে অমঙ্গল হইবে।

দ্রুতগামী অর্ণবপোতের প্রতি অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিলে তাহার অমঙ্গল ঘটিবে।

ঝটিকার সময় ব্যতীত অন্য কোন সময়ে যদি কোন অর্ণবপোতারোহী কেশ মুণ্ডন বা নখ কর্ত্তন করেন, তাহাহইলে সেই অর্ণবপোতের বিপদ ঘটিবে।

অর্ণবপোতস্থ মূষিকগণ যদি তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যায়, তাহাহইলে অল্পকালের মধ্যে জাহাজ জলমগ্ন হইবে।

জাহাজ ছাড়িবার সময় যদি আরোহীদিগের মধ্যে কেহ বামদিকে ফিরিয়া হাঁচিয়া ফেলেন, তাহা হইলে তাহা বড় অশুভকর।

যদি অনুকূল বায়ু প্রবাহিত করাইবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে একটী শূকরশাবক হনন করিলে, কিম্বা জাহাজের মাস্তলে একটী ছুরিকা বিদ্ধ করিয়া রাখিলে উক্ত বাসনা পূর্ণ হইবেক।

পেট্রেল নামক পক্ষী দৃষ্টিগোচর হইলে ঝটিকা ও বৃষ্টিপাত হইবে এবং অক্-পক্ষী নয়নপথে পড়িলে শীঘ্র গম্য স্থানে পৌছান যাইবেক।

জাহাজের উপর হইতে সমুদ্রবারি মধ্যে বিড়াল নিক্ষেপ করিলে শীঘ্র ঝটিকা হইবে।

সমুদ্রের যে সকল স্থলে কোন অর্ণবপোত পূর্ব্বে জলনিমগ্ন হইয়াছে এরূপ প্রবাদ আছে, সেই সকল স্থলে জলমগ্ন পোতারোহীদিগের প্রেতাত্মা সর্ব্বদাই বিচরণ করিতেছে।

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

পল্লীগ্রাম অপেক্ষা নগরেই আত্মঘাতীদিগের সংখ্যা অধিক দেখা যায়। ষ্টোয়িক (কৃচ্ছ্রসাধক) সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রীকদার্শনিকগণ আত্মহত্যা প্রশংসাজনক বিবেচনা করিতেন। রোমান্ ব্যবস্থাপকদিগের মতে আত্মহত্যা দোষ বা পাপ বলিয়া বিবেচিত হইত না। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় শিক্ষিত ও ধনবান শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যেই আত্মহত্যা অধিক সংখ্যায় ঘটিয়া থাকে। ইয়োরোপে স্ত্রীলোক আত্মঘাতিনীদিগের মধ্যে অনেকেই বিষপান, উদ্বন্ধন, অনাহার, প্রভৃতি উপায়ে কিম্বা অস্ত্রদ্বারা গলদেশচ্ছেদন করিয়া আত্মহত্যা করেন। খ্রীষ্টের জন্মগ্রহণ করিবার তিন শত বৎসর পূর্ব্বে রোমান্‌দিগের মধ্যে শ্মশ্রু মুণ্ডন প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এমন দিন শ্মশ্রু মুণ্ডন করিবার সময় মহোৎসব করিবার রীতি রোমান্‌দিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। তাহারা মনে করিতেন ঐ

দিন হইতে তাঁহারা প্রৌঢ়াবস্থায় পদার্পণ করিয়া সংসারে প্রকৃতপক্ষে প্রবেশ করিলেন।

টিন্‌টোরোটো নামক ইতালীয় চিত্রকর কর্ত্তৃক চিত্রিত "স্বর্গ" নামক চিত্রের ন্যায় দীর্ঘাকৃতি চিত্র পৃথিবীতে আর নাই। এই চিত্রখানি ৮৪ ফিট্ প্রশস্ত এবং ৩৩½ ফিট উচ্চ। ইহা এক্ষণে বিনিস্ নগরের "ডোজেস্ পেলেস্" চিত্রশালায় রক্ষিত আছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে উদ্ভিদ্‌বিদ্‌দিগের মধ্যে বৃক্ষের দীর্ঘতা লইয়া আলোচনা হয়। তৎকালে প্রতিপন্ন হয় যে বিক্টোরিয়া প্রদেশে ৫২৫ ফিট দীর্ঘ যে বৃক্ষ নয়নগোচর হইয়াছিল, তদপেক্ষা বৃহৎ বৃক্ষ আর কুত্রাপি নাই।

ইয়োরোপবাসিগণ বর্ষে বর্ষে বিবাহ দিবসের সাংবৎসরিক উৎসব করিয়া থাকেন। প্রথম বাৎসরিক উৎসবকে ইহাঁরা লৌহময় বিবাহ আখ্যা প্রদান করেন, এবং তদনুসারে পঞ্চম বাৎসরিক উৎসবকে কাষ্ঠময়, দশম বাৎসরিক উৎসবকে টিন্‌ময়, পঞ্চদশ বাৎসরিক উৎসবকে স্ফটিকময়, বিংশ বাৎসরিক উৎসবকে কাচময়; পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক উৎসবকে রৌপ্যময়; ত্রিংশ বাৎসরিক উৎসবকে তুলাময়; পঞ্চত্রিংশ বাৎসরিক উৎসবকে বস্ত্রময়; চত্বারিংশ বাৎসরিক উৎসবকে উর্ণাময়; পঞ্চচত্বারিংশ বাৎসরিক উৎসবকে রেশমময়; পঞ্চাশৎ বাৎসরিক উৎসবকে স্বর্ণময়; এবং পঞ্চসপ্ততি বাৎসরিক উৎসবকে হীরকময় বিবাহ আখ্যা প্রদান করিয়া থাকেন।

রেলগাড়ীতে ভ্রমণকালে তাহা ঘণ্টায় কত মাইল গমন করিতেছে, তাহা জানিবার একটী সহজ উপায় আছে। একটী রেলের সহিত অপর একটী রেলের যেখানে সংযোগ আছে, সেই স্থানের উপর দিয়া গাড়ী যাইবার সময় একটী বিশেষ শব্দ শ্রুতিগোচর হয়। কুড়ি সেকেণ্ডের মধ্যে যতবার ঐ শব্দ শুনিতে পাওয়া যাইবে, রেলগাড়ী প্রতি ঘণ্টায় সেই সংখ্যক মাইল যাত্রা করিতেছে স্থির করিতে হইবে। এই গণনা সকল রেলগাড়ীর সম্বন্ধেই প্রযুজ্য। (ক্রমশঃ)

নূতন সংবাদ।

১। গত ২৬এ জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশন বা উপাধি বিতরণ সভা হইয়া গিয়াছে। এবার ছোটলাট ও জষ্টিস গুরুদাস বাবু দুইধারে বসেন এবং বাইস চান্সেলর সার আলফ্রেড ক্রফ্‌ট ডিগ্রী পরীক্ষোত্তীর্ণদিগকে উপাধি দান করিয়া সুন্দর বক্তৃতা করেন। অনেকগুলি ইংরাজ ও বঙ্গমহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী নির্ম্মলা সোম দ্বিতীয় বার এম এ এবং কুমারী হেমপ্রভা বসু ও সরলা রক্ষিত বি এ উপাধিতে ভূষিতা হইয়াছেন।

২। ৫ই ফেব্রুয়ারি পার্লেমেণ্ট মহাসভা খুলিয়াছে। প্রতিনিধি দ্বারা মহারাণীর বক্তৃতা পঠিত হয়।

৩। হচিং নামক স্থানে চীনজাপানীগণের মধ্যে আয়ার এক মহাযুদ্ধ হয়, তাহাতে চীনেরা পরাভূত হইয়াছে; চীনদিগের ১০০০ এবং জাপানীদিগের ৪০ জন মাত্র সৈন্য হত হইয়াছে।

৫। বোম্বাই হাইকোর্টের জজ্ সার টী মথুস্বামী আর কে, সি, আই, ই পরলোক গমন করিয়াছেন। ইহাঁর মৃত্যুতে ভারতমাতা একটী উপযুক্ত সন্তান হারাইলেন। সুব্রহ্মণ আর সি আই ই ইহাঁর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন।

৬। বিলাতের প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ লর্ড চর্চ্চহিলের মৃত্যু হইয়াছে।

৭। প্রশান্ত মহাসাগরের হাবাই দ্বীপের রাজ্ঞী লিনুকোকেলানিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তথায় সাধারণতন্ত্র স্থাপিত হয়, দেশবাসীরা পুনরায় তাঁহাকে পদস্থ করিতে চেষ্টা করিতেছে।

৮। জর্ম্মণীতে বিড়ালের ট্যাক্স হইয়াছে।

৯। আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা এবং ১৮ই এফ এ ও বি এ পরীক্ষা বসিবে। ১৮৯৬ সালের প্রবেশিকা পরীক্ষা ২৭এ জানুয়ারী এবং এফ এ, বি এ পরীক্ষা ৬ই ফেব্রুয়ারি বসিবে।

১০। পারস্যদেশে কুচান নগরে ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়া অনেক লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

১১। মেথডিষ্ট খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকদিগের এক বৈদেশিক প্রচার সভা আছে, তাহার শাখার সংখ্যা ৬১২৮ এবং সভ্য সংখ্যা দেড় লক্ষেরও অধিক। ইহাঁরা গত এক বৎসরে ধর্ম্মবিষয়ে ৫০ পৃষ্ঠা লেখা মুদ্রিত ও প্রচারিত করিয়াছেন।

বামারচনা।

দেবঘর।

"সকলে তারেই ডাকে আমি যারে ডাকি"।

শ্যামল সুন্দর ছটা চারু তপোবন—
স্বরগ বাতাস চুমি
আরামে পড়িছে ঘুমি,
কানন, প্রান্তর, গিরি, পশু, পাখিগণ!
মানবের বুকে বুকে,
কোটী জনমের সুখে,
খুলিয়া যেতেছে যেন সুধা প্রস্রবণ!
বিভল পরাণ মন,
সচেতনে অচেতন,
অনন্ত সুখের স্রোতে ভাসিছে ভুবন!
নয়নে জাগিছে শ্যাম চারু তপোবন!

২

এদেশে বহেনা বুঝি মরতের বা'য়,
এখানে মুহূর্ত্ত-পরে,
ফুল বুঝি নাহি ঝরে,
চাঁদিমা ঢাকেনা মুখ তামসী নিশায়?
আসি এই রাজাসনে,
(মলয়-সুহৃদ-সনে)
বসন্ত,দু'দিনে বুঝি ফিরে নাহি যায়?

এই খানে চির তরে,
পাহাড়ের স্তরে স্তরে,
বরষা উছলে বুঝি শত ফোয়ারায়?
ধরার বিষাক্ত বায়ু
হরে যে জীবের আয়ু,
সে কভু এ দেব-দেশ ছুঁইতে না পায়!
এখানে বহেনা কভু মরতের বা'য়!

৩

বিরাজিছে "তপোগিরি" দেব-সৌধ বৎ—
স্নেহ কোল প্রসারিত,
জুড়া'তে শ্রান্তের চিত,
গড়িলা কি বিশ্ব কারু শত শৃঙ্গ রথ!
ও বরাঙ্গে মধু মাসে
কচি কিশলয় ভাসে,
কনক কেতন রাঙ্গা, মাতায় জগৎ!
এদিকে তুলিয়া কর
"নন্দন" ভূধর বর,
দেখায় পথিকে ডেকে ত্রিদিবের পথ!
এ দেশের সব যেন দেব-চিত্রবৎ!

৪

নিরমল শশী তারা জাগিছে আকাশে,
দেব মন্দিরের মাঝে,
শত শঙ্খ ঘণ্টা বাজে,
দ্রবীভূত পবিত্রতা "শিব-গঙ্গা" ভাসে!
কোটী কণ্ঠে ডাকে নর,
"বম্ বম্ হর হর"
দিগন্ত প্লাবিত করে একই নিশ্বাসে!
পুণ্য, শান্তি, পবিত্রতা,
নরে দিতে অমরতা,
ছাড়ি সে অমরাবতী ভবে নেমে আসে,
তারি সাক্ষী তারা শশী জাগিছে আকাশে!

৫

সসীম মানব-প্রাণে "অসীম" উদয়,
অসীম অনন্ত শক্তি,
অসীম অনন্ত ভক্তি,
অসীম অনন্ত দেবে পূরিত হৃদয়!
খুলি হৃদি খুলি মন,
আয় ডাকি, ভাই বোন,
"জয় অনাথের নাথ, বৈদ্য নাথ জয়!"

মুছি অশ্রু-মাখা আঁখি,
প্রাণ ভরে সবে ডাকি—
কোমল দুর্ব্বল কণ্ঠ তাহে নাহি ভয়!—
শিশুর করুণ ভাষে,
স্নেহে মা ছুটিয়া আসে,
এক ফোঁটা অশ্রু পড়ি ভিজে বিশ্বময়!
অনন্তে—দিগন্ত প'র;
এ আকুল দীন স্বর
উঠিবে, মিলিবে সেই চরণে আশ্রয়—
আয় ডাকি, ভাই বোন, ডাকিতে কি ভয়?

৬

ধন্য তুমি পুণ্যভূমি, ধন্য দেব ঘর,
ধন্য তুমি মহাতীর্থ,
তোমার বাতাসে চিত্ত,
মন্দাকিনী-স্নাত যথা পূত কলেবর!
ভূধর, নির্ঝর, তব
অতুল সুন্দর সব,
প্রকৃতির লীলাগৃহ, এ বন প্রান্তর!
নগর কি রাজালয়,
এ মাধুরী—কোথা নয়,
(কার এ উদার প্রাণ সরল সুন্দর?)
সেথা যে গরজে বাজে,
বেহাগ ভৈরবী বাজে!—
সেথা বাঁশি অর্থ দাসী, সদা স্বার্থপর!
তুমি মা আনন্দধাম,
বুকে ভরা শিব নাম,
সাধক-হৃদয় তুমি দেবতার ঘর!
জনতায় পরিহরি,
তাপসীর বেশে মরি,
লুকি আছ শান্ত, স্নিগ্ধ, আশ্রম ভিতর!
তাই তুমি নিরুপম,
মায়ের অঞ্চল সম,
স্নেহ মমতার গঙ্গা, সুখের নির্ঝর!
হেন মনে সাধ করি,
এ সৌন্দর্য্যে ডুবে মরি,
এক পলে হয়ে যাক্ কোটী জন্মান্তর!
ধন্য তুমি পুণ্যভূমি, ধন্য দেব ঘর।

শ্রী কাব্য কুসুমাঞ্জলি রচয়িত্রী।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬২ সংখ্যা	ফাল্গুন ১৩০১—মার্চ্চ ১৮৯৫।	৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

জন্মমৃত্যু—পৃথিবীতে প্রতি মিনিটে ৭০, প্রতিদিন ১ লক্ষ ৮ শত এবং প্রতি বৎসর ৩ কোটী, ৬৮ লক্ষ লোকের জন্ম হয় এবং প্রতি মিনিটে ৬৮, প্রতিদিন ৯৭, ৭৯০ ও প্রতি বৎসর ৩ কোটী, ৫৭ লক্ষ লোকের মৃত্যু হয়। মিনিটে জাত ৭০টীর মধ্যে ২টী সন্তান বাঁচে, তাহাতেই পৃথিবী চলিতেছে !!

দান —কাশীর মহারাজ তত্রত্য ঈশ্বরী স্ত্রী-হাঁসপাতালে মাসিক ৩০০, টাকা দান স্বীকার করিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজ—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন সি, আই, ই, সুদীর্ঘ কাল সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কার্য্য করিয়া সম্প্রতি অবসর লইয়াছেন, তাঁহার স্থানে প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতাধ্যাপক বাবু নীলমণি মুখোপাধ্যায় এম, এ, নিযুক্ত হইয়াছেন। ন্যায়রত্ন মহাশয় যেরূপ প্রশংসিতরূপে কার্য্য করিয়াছেন, কলিকাতা গেজেটে ছোটলাট তাহার বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

বসন্তে মারীভয়—কলিকাতা ও উপনগরের স্থানে স্থানে এবৎসর বসন্তের যেরূপ প্রাদুর্ভাব, অনেক দিন এরূপ দেখা যায় নাই। প্রতি সপ্তাহে কলিকাতায় এই রোগে গড়ে প্রায় ৫০ জনের মৃত্যু হইতেছে। যাহারা টীকা না লইয়াছে, তাহাদের মধ্যে পীড়া ও মৃত্যু অধিক। টীকা লইতে কেহ যেন ঔদাস্য না করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা—প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীর সংখ্যা এবৎসর

৫৭৮৩, গত বৎসর, ৫৩৮০ ; এফ,এ ৩০৪১ গত বৎসর ২৩৬০ ; বি, এ, ১৪২৭, গত বৎসর ১৪২৯ জন। বি এ ভিন্ন অন্যান্য পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়িতেছে।

বিবী আনি বেসাণ্ট—পুনরায় কলিকাতায় আগত। এই মার্চ্চ মাসের প্রথমে নানাস্থানে তাঁহার প্রকাশ্য বক্তৃতা হইবে।

সৃষ্টিতত্ত্ব—বড় বড় জ্যোতির্বিদ-পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ছায়াপথে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী যে সৌরজগৎ আছে, তাহার জ্যোতি পৃথিবীতে আসিতে ৯ কোটী বৎসর লাগিবে। আলোক প্রত্যেক সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৫ হাজার মাইল চলিয়া থাকে।

লেডী এলগিনের সৌজন্য—রাজপ্রতিনিধিপত্নী গরিবদিগের ছোট ভগিনীগণের আশ্রম পরিদর্শন করিয়াছেন।

শোভাবাজার দাতব্য সভা—গত ১৫ই ফেব্রুয়ারি ৮ মহারাজা কমলকৃষ্ণ বাহাদুরের ভবনে ইহার বার্ষিক সভা মহা সমারোহে সম্পন্ন হয়। ছোট লাট সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। গত বৎসর এই সভার আয় প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে এবং অনাথ নিরাশ্রয় বিধবাদিগের ভরণপোষণ ও গরিব ছাত্রদিগের সাহায্যে অধিকাংশ ব্যয় হইয়াছে। আমরা সর্ব্বান্তঃ করণে এই সভার উন্নতি কামনা করি।

কার্য্য ধুরন্ধর রমণী—বিলাতের "ওম্যান" নামক সংবাদ পত্র ১৮৯৪ সালে স্ত্রীজাতির উপকারার্থ যত স্ত্রীলোক কার্য্য করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বিবি আর্মিষ্টন ডেণ্টকে ১ম, লেডী হেনরী সমারসেটকে ২য়, সদারলণ্ডের ডচেসকে ৩য়, ইংলণ্ডীয় যুবরাজপত্নীকে ৪র্থ, ওয়ারউইকের কাউণ্টসকে ৫ম, এবং লেডী জোনকে ৬ষ্ঠ স্থান দিয়াছেন। নামজাদা না হইয়াও গোপনে যে সকল মহিলা স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিতেছেন, অন্তর্যামী ঈশ্বর তাঁহাদের পুরস্কারদাতা।

গৃহকর্ম্মনিপুণা রমণী—ডেন্মার্কের রাণী স্বহস্তে স্বামীর ছেঁড়া পোষাক মেরামত করিয়া থাকেন।

উঃ পঃ স্ত্রীশিক্ষা সভা—গত ১১ই ফেব্রুয়ারি লক্ষ্ণৌর প্রাসাদে নূতন স্থাপিত এই সভার কার্য্য নির্ব্বাহক সভার এক অধিবেশন হয়, তাহাতে তত্রত্য ছোটলাট সভাপতির আসন লন। বেথুন স্কুলের মত একটী স্ত্রী বিদ্যালয় লক্ষ্ণৌয়ে শীঘ্র স্থাপিত হইবে আশা করা যায়।

বড়লাটের সিমলা যাত্রা—বড়লাট আগামী ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়া গয়া, দার্জ্জিলিং, দানাপুর প্রভৃতি দর্শন করিয়া সিমলায় যাইবেন।

লেডী ইলিয়ট স্মরণার্থ ফণ্ড—অল্পদিন পরে ছোটলাট সস্ত্রীক এদেশ

ত্যাগ করিবেন। তাঁহার পত্নীর তৈল-চিত্রের জন্য ৬০০০ টাকা চাঁদা উঠিয়াছে, আরও ৪০০০৲ টাকা চাই। এ টাকায় বঙ্গমহিলাদের হিতার্থে কোনও অনুষ্ঠান করিলে অর্থের অধিক সার্থকতা হইত।

রাজসৌজন্য—জর্ম্মনির ভূতপূর্ব্ব সাম্রাজ্ঞী আপনার ভৃত্যদিগকে দিবসের অধিকাংশকাল আলস্যে কাটাইতে দেখিয়া তাহাদের জন্য এক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছেন। পুস্তকগুলি তাঁহার নিজের নির্ব্বাচিত।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬১ সংখ্যা ৩০৩ পৃষ্ঠার পর।)

বঙ্গদেশে নববধূদিগকে শ্বশুরগৃহে বিশেষ সংযত ও সহিষ্ণু হইয়া বাস করিতে হইত। তাঁহারা প্রত্যূষে উঠিয়া শ্বশুর শ্বাশুড়ী স্বামী প্রভৃতি গুরুজনদিগের পাদবন্দনা ও চরণামৃত পান করিতেন। গুরুজনদিগের সহিত কোনও অবিনীত ব্যবহার করা তখন গুরুতর অপরাধ বলিয়া গণনীয় ছিল। প্রাপ্তবয়স্ক পুত্রও তখন মাতা পিতার কোন অন্যায় কার্য্যের প্রতিবাদ করিতেন না—সে রকম করা মহাপাপ মনে করিতেন। পাছে বালিকা বধূদিগের বিনয়ের কোনও রূপ ত্রুটি হয়, এই আশঙ্কায় তাহাদিগের লজ্জাশীলতা আতিশয্য দোষে দূষিত হইত। নববধূগণ প্রাণান্তে গুরুজনদিগের সহিত কথা কহিতে পারিতেন না; তাঁহাদিগের ক্ষুধা তৃষ্ণা বা রোগকাতরতা নির্লজ্জতার স্বরূপ গণ্য হইত।

তখনকার প্রত্যেক গৃহেই প্রায় একান্নভুক্ত বহুপরিবার থাকিত। জীবনের উচ্চ উদ্দেশ্য-শূন্য, অসংযত-চিত্ত, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির বহুলোক একত্র বাস করিলে সে স্থান যেমন অশান্তিকর হয়, তখনকার অনেক গৃহ সেই রকম অশান্তিকর হইত *। নুণটুকু, চুণটুকু উপলক্ষ করিয়া গার্হস্থ্য বিবাদ, প্রায় সকল ঘরেই ছিল। নববধূগণ, অনেক স্থলেই দারুণ নিপীড়িতা হইতেন। শ্বাশুড়ী, ননদিনী, যাতা—প্রধানতঃ সপত্নী (সপত্নী তখন প্রায়ই থাকিত!) নববধূদিগের নিপীড়নের প্রধান কারণস্বরূপা ছিলেন। অভিভাবিকা রমণীগণ যে রকম চাহেন, নববধূ সেই রকম নিরীহ, সেই রকম মৃদুস্বভাবা, সেই রকম গৃহকার্য্যে সুদক্ষা এবং সেই রকম সেবা-পরায়ণা না হইলেই

* একান্নভুক্ত বহু পরিবারের ফলে অনেক মহত্ত্ব, অনেক সুখ, অনেক সাধুতা লাভ হইতে পারে। কিন্তু "বহু পরিবার" সুশিক্ষিত না হইলে যে তাহার ফল বিষম অনর্থকর হইয়া পাকে, একথা অনেকেই "সত্য" বলিয়া স্বীকার করিবেন।

অনেকে তেলেবেগুণে জলিয়া উঠিতেন! কার্য্যতঃ কিছু করিবার ক্ষমতা না থাকিলেও অনেক বালিকাবধূর পক্ষে এ রকম ক্লেশ "অসহনীয়" বলিয়াই বোধ হইত! মাতা পিতার স্নেহ যত্নে লালিতা পালিতা বালিকাটীর পক্ষে এরূপ বধূত্বের ক্লেশ যে কিরূপ ক্লেশকর, তাহা যাঁহার হৃদয় আছে, তিনি বুঝিতে পারেন। সেই নববধূদিগের অনেকে শ্বশুরালয়কে "যমালয়" বলিয়া মনে করিতেন।

ভার্য্যাগণের অবস্থা যেরূপ জানা যায়, তাহাতে অনুভূত হয় যে পতিপ্রেম অপেক্ষা পতিভক্তিই তাঁহাদের মধ্যে "প্রচলিত" ছিল। তাঁহারা স্বামীকে "অভিন্নহৃদয় বন্ধু" মনে না করিয়া কেবল "পূজনীয় গুরু"ই মনে করিতেন। সেইজন্য সর্ব্বদা স্বামীর পাদবন্দনা, চরণামৃতপান এই সকল ভক্তিভাবপূর্ণ কার্য্যেই তাঁহাদের পরিতৃপ্তি জন্মিত। স্বামীর সহিত একহৃদয় হওয়া, তাঁহার নিকটে অসঙ্কোচে মনের কথা বলা, তাঁহার সহিত বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদ করা এ সকল, তখনকার সময়ে নির্লজ্জতার ও প্রগল্‌ভতার পরাকাষ্ঠা বলিয়া বিবেচিত হইত। প্রাচীনা গৃহিণীগণও স্বামীকে দেখিলে একহাত ঘোমটা টানিয়া দূরে পলায়ন করিতেন।

দাম্পত্য প্রেমের যাহা শ্রেষ্ঠতম লক্ষণ, সেই একনিষ্ঠা পুরুষজাতির মধ্যে কচিৎ মিলিত। পুরুষেরা একবিন্দু ছল ছুতা পাইলেই দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেন। প্রথমা স্ত্রী কেবল কন্যাপ্রসবিনী, কোনও কুমারীর পিত্রাদি কর্ত্তৃক বিবাহ অনুরুদ্ধ, সুন্দরী বা উচ্চ বংশীয়াকন্যা "পুত্র বধূ হইবে" এই লোভে মাতা পিতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট, প্রথমা ভার্য্যার সহিত বিবাদ করিয়া তাহাকে "জব্দ" করিবার প্রয়োজন এই সকল ঘটনার কোনও একটী উপস্থিত হইলে অনেক পুরুষ দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন বঙ্গীয় কুলীন ব্রাহ্মণ ও কুলীন কায়স্থগণ বিশেষ কারণ না থাকিলেও বহুতর কুমারীর পাণিপীড়ন করিতেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে ভার্য্যার ভরণ পোষণ করা দূরে থাকুক, অনেক ভার্য্যার সহিত বিবাহের সময় ব্যতীত সাক্ষাৎ হইত না। ইঁহারা বিবাহে অনেক টাকা পাইতেন বলিয়া বিবাহ করিয়া অনেকে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। *

এইখানে একটী কথার উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সেকালে অনেক পুরুষই বহুবিবাহ করিতেন; তাই স্বামীর গভীর প্রণয়তৃষ্ণা রমণী-হৃদয়ে অপরিতৃপ্তাবস্থাতেই থাকিত। এই জন্য, সপত্নীবতী রমণীগণ অনেক সময়ে ঔষধ বা মন্ত্রপ্রয়োগে স্বামীকে সর্ব্বতোভাবে নিজের বশীভূত ও পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্য হইতে তখনকার মহিলাগণের জীবন যে

* কৌলীন্য প্রথা এদেশ হইতে অদ্যাপি দূর হয় নাই, ইহা নব্য ভারতের কলঙ্কের কথা। তবে অনেকটা হ্রাস হইয়াছে বটে।

কতদূর অসুখী ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়।

রমণীগন গৃহধর্ম্মে বিশেষ নিপুণতা লাভ করিতেন, সে কথা আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তাঁহাদিগের গৃহকর্ম্মদক্ষতা ও শ্রমশীলতা যেরূপ প্রশংসনীয়, তাঁহাদিগের দয়া ও সেবাপরায়ণতাও সেইরূপ প্রশংসনীয়। আত্মীয়দিগের তো কথাই নাই, আতুর, অনাথ, দরিদ্র, বিপন্ন ব্যক্তিগণ নিতান্ত "পর" হইলেও মাতার মত স্নেহে, ভগিনীর মত যত্নে, দাসীর মত পরিচর্য্যায় তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে প্রস্তুত থাকিতেন। তখন অতিথিসৎকার গৃহস্থগণের পরম ব্রত স্বরূপ ছিল; প্রতিদিন ঘরে ঘরে অতিথি সেবা হইত। গৃহিণীগণ অতিথিসেবার অনুরোধে মুখের গ্রাস অতিথিকে দিয়া সন্তুষ্ট মনে উপবাস করিতেন। অপরিচিত বিপন্ন মানব প্রবাসে এইরূপ মাতা, ভগিনী ও পরিচারিকা লাভ করিত!

কেবল মনুষ্য-সেবা নহে, তাঁহাদের দয়া সকল জীবে পরিব্যাপ্ত হইত, তাঁহাদের সেবায় ইতর জীবগণও পরম সুখে থাকিত। গৃহপালিত গরু, বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি তাঁহাদিগের নিকটে অপত্যবৎ স্নেহে পালিত হইত। ইহার মধ্যে গো-সেবা একটী প্রধান ধর্ম্ম কার্য্যের মধ্যে পরিগণিত ছিল। গো জাতি আমাদের যেরূপ উপকারী, তাহারই উপযুক্ত সেবা শুশ্রূষা লাভ করিত। এতভিন্ন জ্ঞাতি বা প্রতিবেশী পরিবারের কোনও অভাব বা প্রয়োজন জানিলে তাঁহারা প্রাণপণে সহায়তা করিতেন।

মাতৃগণ শিশুর (শরীর) পালনে নিপুণা ছিলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষানুসারে না হউক, তাঁহারা শিশু-চিকিৎসায়-শিশু-শুশ্রূষায় বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। তবে অনভিজ্ঞতাবশতঃ মানসিক শিক্ষা দিতে পারিতেন না। "জুজু" "কানকাটা" ডাকিয়া, ভুত পেত্নীর কথা বলিয়া, প্রাণের সন্তানকে অনেক সময়ে ভীরু ও নিস্তেজ করিয়া বসিতেন। সূতিকা গৃহের প্রণালী তখন অতিশয় জঘন্য ছিল।

রোগীর শুশ্রূষায় গৃহিণীগন এত নিপুণা ছিলেন যে চিকিৎসক যে রোগীকে ঔষধে আরাম করিতে পারেন নাই, প্রবীণা গৃহিণীগণ কত সময়ে শুশ্রূষাগুণে সে রোগীকেও আরাম করিয়াছেন। ফলতঃ গৃহধর্ম্ম রক্ষা যেমন তাঁহাদের জীবনের ব্রত, তাঁহারা প্রায় তাহারই সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। গত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত মহিলার পারিবারিক অবস্থা এইরূপই।

সামাজিক অবস্থা। পুরুষ জাতি যেরূপ সমাজের বহির্ভাগ, স্ত্রীজাতি সেইরূপ অন্তর্ভাগরূপে অবস্থিত। সমাজের বাহিরের কাজ যে রকম পুরুষের কর্ত্তব্য, ভিতরের কাজ সেইরূপ রমণীর কর্ত্তব্য। পুরুষ যেমন সমাজের পালক, রমণী সেইরূপ সমাজের সেবিকা। কিন্তু ভারতে অদ্যাপি এমন লোক সকল আছেন, যে রমণীর সামাজিক কিছু কর্ত্তব্য আছে

বলিয়া স্বীকার করিতে পারেন না। সুপ্রসিদ্ধ এমার্সন বলিয়াছেন, পুরুষ লেখক কবি, কিন্তু রমণী কার্য্যকরী কবি। স্ত্রীলোক কঠোর হৃদয়কে কোমল, নিরাশ মনকে আশাপূর্ণ, নিষ্ঠুরকে দয়াবান্ এবং অপবিত্রকে পবিত্র করিয়া থাকে।” হইতে পারে, মহাত্মা এমার্সন স্ত্রীজাতির প্রতি অনুগ্রহাতিশয় এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, কিন্তু সাধ্বী সুশিক্ষিতা রমণী যে জনসমাজের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়, ভাবিয়া দেখিলে একথা অনেকেই সত্য বলিয়া বুঝিবেন। আমরা বিশ্বাস করি, যে দিন সকল রমণী প্রকৃত সুশিক্ষিতা ও সাধ্বী হইবেন, যে দিন সকল রমণীকেই পুরুষজাতি পবিত্রতার প্রতিরূপ বলিয়া বুঝিবেন, সেদিন এজগতে পাপ নীচতা কিছুই রহিবে না। যাহাদিগের জাতীয় উন্নতির উপরে জগতের এতদূর মঙ্গল নির্ভর করিতেছে, তাহাদিগের “সামাজিক কর্ত্তব্য কিছুই নাই” একথা বলা প্রলাপ মাত্র।

রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য আছে।—রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য রাজকীয় কর্ত্তব্য নহে, রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য পুরুষের নেতৃত্ব গ্রহণ নহে, রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য যুদ্ধবিগ্রহ নহে, ব্যক্তিবিশেষের পক্ষে অবস্থা ও ঘটনাক্রমে সঙ্গত হইলেও সাধারণতঃ কোনওরূপ অস্বাভাবিক পুরুষোচিত কার্য্য রমণীর কর্ত্তব্য নহে। রমণী-জীবনে যে সকল সামাজিক কর্ত্তব্য আছে, রমণীর তাহাই পালনীয়।

ধর্ম্মভাব-উদ্দীপন, সাধুতা ও পবিত্রতা বিকাশ, দয়াবৃত্তির চরিতার্থতা, জাতীয় অভাব (স্ত্রীজাতির) মোচন, জাতীয় (স্ত্রীজাতির) উন্নতিসাধন, এবং স্বদেশপ্রীতি অনুশীলন, এই কয়টী কার্য্যকে রমণীর সামাজিক কর্ত্তব্য বলা যায়। এই কয়টী করিলেই রমণী পুরুষের সহকারিণী হইবেন। কিন্তু তাঁহার এই সকল কার্য্য করিবার উপযুক্ত গঠিত জীবন আবশ্যক। রমণীগণের এইরূপ সামাজিক কর্ত্তব্য পালনোপযোগী গঠিত জীবন হইলে, রমণী তাঁহার সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে যথাসাধ্য চেষ্টা করিলে, মানব সমাজ বহুতর উন্নতি লাভ করে—সুপ্রসিদ্ধ এমার্সনের মহাবাক্য সম্পূর্ণরূপে সফল হয়।

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে স্ত্রীজাতির অবস্থা ভারতবর্ষে যেরূপ জানা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে অনেকেই অনুপযুক্ত ছিলেন। মহাপ্রাণা রমণী বিদ্যাসাগর-জননী, কালীকৃষ্ণ মিত্রের জননী প্রভৃতি দুইচারি জন মহিলা সামাজিক কর্ত্তব্য পালনে মহাপ্রাণতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সাধারণ মহিলাগণদ্বারা সামাজিক কর্ত্তব্য অনেকগুলিই পালিত হইত না। তবে সমাজে তাঁহারা যে দুইটি মহৎ কার্য্য করিতেন, আমরা তাহার পরিচয় পাইয়া থাকি। ধনবতী রমণীগণ দেবতাপ্রতিষ্ঠা, ব্রতাচরণ, তীর্থদর্শন প্রভৃতি ধর্ম্মভাবোদ্দীপক কার্য্য করিতেন, ইহাতে

সাধারণের মনও ধর্ম্মপথে আকর্ষিত হইত। আর দীনে দান, ব্যথিতে দয়া, অন্নসত্র স্থাপন, জলাশয় খনন প্রভৃতি পুণ্য কার্য্যের দ্বারা দয়াবৃত্তি চরিতার্থ করিতেন, ইহাতেও জনসমাজ মহোপকৃত হইত। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কার্য্য করিবার মত তাঁহাদিগের শিক্ষা, অবস্থা ও ক্ষমতা কিছুই ছিল না।

সমাজে স্ত্রীজাতির জাতীয় সম্মান ও গৌরব যে রকম ছিল, তাহা মনে করিতে গেলে আগে আর্য্য ভারতের কথা মনে পড়ে। সেই একদিন, এই ভারতবক্ষে দাঁড়াইয়া, প্রাণের উচ্ছ্বাসে দিগন্ত ভরিয়া আর্য্য ঋষিগণ বলিয়াছিলেন,

"যত্র নার্য্যাস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।
যত্র তাস্তু ন পূজ্যন্তে সর্ব্বাস্তত্রাফলাঃ ক্রিয়াঃ।"‡

বর্ত্তমান সভ্য সমাজে (বিদেশের অবশ্য) স্ত্রীজাতি বিশেষ সম্মানিতা ও গৌরবান্বিতা বটে, কিন্তু ভারতীয় আর্য্যগণ স্ত্রীজাতিকে যে রকম সম্মান গৌরবের চক্ষে দেখিয়াছেন, তাহা বুঝি কোনও দেশে—কোনও সমাজে নাই।

ভারতীয় আর্য্যগণের রাজত্বের সহিত ভারত মহিলার সে সামাজিক সম্মান গৌরব দূর হইয়াছিল, আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ তাহা জানিতেছেন। বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগে (ব্যক্তি বিশেষ না হউক) সাধারণ রমণীগণ এদেশে পুরুষ সমাজে অশ্রদ্ধেয়া ও অবহেলনীয়া ছিলেন। পুরুষের মধ্যে যাঁহারা স্বার্থপর, তাঁহারা স্ত্রীজাতির উপরে নানারূপ নির্ম্মম প্রভুত্ব খাটাইতেন। স্বার্থপর পুরোহিত বা ব্রাহ্মণগণ "ধর্ম্মাচরণ" বলিয়া স্ত্রীজাতির নিকট হইতে প্রতারণাপূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিত; বিধবা রমণীর সম্পত্তি স্বার্থপর আত্মীয় বা কুটুম্বগণ ফাঁকি দিয়া অথবা কাড়িয়া লইত। স্ত্রীজাতির ভ্রম, ত্রুটি, দোষ প্রভৃতি দেখিলে সংশোধন করা দূরে থাকুক, "স্ত্রীবুদ্ধিঃ প্রলয়ঙ্করী" বলিয়া সাধারণ লোকে হাসিত। মার্জ্জিত জ্ঞান ও চিন্তাশীলতা অভাবে স্ত্রীজাতি নিজেদের দুরবস্থার বিষয় বুঝিতে পারিতেন না—অথবা জাতীয় উন্নতির জন্যও কোন চেষ্টা করিতে পারিতেন না, "অদৃষ্ট লিপি" অথবা জন্মান্তরের কর্ম্মফল বলিয়াই সকল দুঃখ সহিতেন।

পূর্ব্বে বলিয়াছি, রমণীদিগের অনেকেই শৈশবে বিবাহিতা হইত। শৈশবেই কোন কোন কুমারীকে দশ গণ্ডা সপত্নীর উপরে চাপাইয়া দেওয়া হইত। কোথাও পাঁচ বৎসরের বালিকাকে পঞ্চান্নবর্ষবয়স্ক পুরুষের সহধর্ম্মিণীত্ব করিতে দেওয়া হইত। বালিকা বিধবা অথবা শিশু বিধবা অপরিচিত, অজ্ঞানিত পতির জন্য চিরদিনই ব্রহ্মচর্য্য করিত। তাহাদিগকে ব্রহ্মচর্য্যের উপযোগী করিয়া গঠন করা হইত না, যে সকল মানসিক শক্তির অনুশীলনে মানব আত্ম-জয়ের শিক্ষা লাভ করে, তাহাদিগের সে মান-

‡ যেখানে স্ত্রীলোকেরা পূজিত হন, সেখানে দেবতারা প্রসন্ন হন; আর যেখানে স্ত্রীলোকেরা অনাদৃতা হন, সেখানে সকল ক্রিয়াই বিফল।

সিক শক্তির অনুশীলন হইত না; তথাপি সমাজ তাঁহাদিগকে "পতিপ্রাণা ব্রহ্মচারিণী" সাজাইতে চাহিত। প্রাপ্ত-বয়স্কা নববিধবাগণ কেহ কেহ হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে স্বামীর সহিত সহমৃতা হইতেন। "সহমরণে" বংশগৌরব ছিল বলিয়া অনেকে সহমরণের জন্য স্ত্রীজাতিকে উত্তেজিত করিত। যে নববিধবা অগ্রে স্বীকৃতা হইয়া, পরে সহমরণের ক্লেশ স্বীকার করিতে অসম্মতা হইত, সমাজ তাহাকে কখনই ছাড়িত না, তাহাকে বাঁশবাখারির লাঠির আঘাতে আধমরা করিয়া সহমৃতা করাইত। সেইরূপ রমণীরও বহুবৎসর স্বর্গ লাভ হইত!

বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারত-মহিলাদিগকে, সমাজ এই রকম নিষ্ঠুর অধীনতায় বাঁধিয়া পদদলিত করিতেন। স্ত্রীজাতির বাহ্যিক স্বাধীনতা আমরা "বঙ্গদেশের উপযোগী" অদ্যাপি বলিতে পারি না।* কিন্তু কার্য্যতঃ স্বাধীনতা, জাতীয় জীবনের উন্নতি বিষয়ে স্বাধীন-চিত্ততা, স্বাধীন চিন্তা প্রভৃতি, শতাব্দী পূর্ব্বে ভারত মহিলাদিগের সাধারণতঃ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। পঞ্জাব, বোম্বাই, লাহোর, অযোধ্যা প্রভৃতি প্রদেশে স্ত্রীজাতির বাহ্যিক স্বাধীনতা অনেকটা প্রচলিত ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তাঁহারাও বঙ্গমহিলার ন্যায় সর্ব্বতোভাবে পরাধীনা ছিলেন। শৈশব বিবাহ, বহুবিবাহ, সহমরণ প্রথা তাঁহাদের সমাজেও প্রচলিত ছিল। লেখা পড়া অথবা জ্ঞানানুশীলন ভারতের কোনও স্থানেই প্রচলিত ছিল না। বহু শতাব্দী পূর্ব্বে যে ভারতবর্ষে আর্য্যগণ "যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতা" বলিয়াছিলেন, গত শতাব্দীর সেই ভারতবর্ষে, নারী জাতির অবস্থা, মোটের উপরে এই রকমই দাঁড়াইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

বিবিধ তত্ত্ব সংগ্রহ।

লণ্ডনে নগরে ও প্রুশিয়ার অন্তঃপাতী ব্রিমেন নগরে দিবাভাগ ১৬ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। সুইডেনের অন্তঃপাতী ষ্টক্হলম নগরে দিবাভাগ ১৮ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটর্স্বর্গ নগরে ও সাইবিরিয়া প্রদেশের অন্তঃপাতী টোবলস্ক নগরে দিবাভাগ ১৯ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। ফিন্‌লেণ্ড প্রদেশের টর্ণিয়া নগরে জুন মাসের ২১ তারিখে ২২ ঘণ্টা কাল পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। উত্তর কেন্দ্রস্থ স্পিটজ বার্জেন নগরে দীর্ঘতম দিনের স্থায়িত্ব সার্দ্ধ তিন মাস কাল।

ভারতবর্ষে সর্ব্বপ্রথমে কোন সময়ে

* স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে আমাদিগের যে মতামত তাহা ১২৯৮ সালের পৌষ মাসের বামাবোধিনী পত্রিকার 'ভিখারিণীর গাতি' শীর্ষক প্রবন্ধে বিস্তারিত লিখিয়াছি।

এবং কোন্ ব্যক্তি চসমা প্রস্তুত করেন, তাহার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু ইয়োরোপে উহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর্লাটি নামক ফ্লোরেন্সবাসী একজন ইতালীয় কর্ত্তৃক প্রথম প্রস্তুত হয়।

ইংলণ্ডের অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত লোকদিগের সংস্কার আছে যে জানুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কন্যা সৎস্বভাবা ও বুদ্ধিমতী গৃহিণী হইবে; ফেব্রুয়ারি মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে দয়াবতী, স্নেহময়ী ও স্বামিভক্তিপরায়ণা হইবে; মার্চ্চ মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে কলহপ্রিয়া ও আমোদপ্রিয়া হইবে; এপ্রেল মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে বুদ্ধিহীনা কিন্তু শ্রীসম্পন্না হইবে; মে মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে সুখসম্পদভোগিনী, সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী হইবে; জুন মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে আবেগ পূর্ণা হইবে এবং অল্প বয়সে পরিণীতা হইবে; জুলাই মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে অসন্তোষপ্রকৃতি হইবে; আগষ্ট মাসে জন্ম গ্রহন করিলে কার্য্যনিপুণা ও অমায়িকস্বভাবা হইবে এবং ধনী ব্যক্তির সহিত পরিণীতা হইবে; সেপ্টেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে বিবেকসম্পন্না ও মিষ্টভাষিণী ও সর্ব্বজন প্রিয়া হইবে, অক্টোবর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে রূপলাবণ্যবিশিষ্টা কিন্তু অসুখিনী হইবে, নবেম্বর মাসে জন্ম গ্রহণ করিলে স্থূলকায়া ও অপরিমিতব্যয়শীলা হইবে।

সাক্ষাৎ হইলে ইংরাজে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কেমন আছ?" ফরাসীরা জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আপনাকে কেমন ভোলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ?" ইটালীয় জিজ্ঞাসা করেন, "তোমার অবস্থা কিরূপ?" জর্ম্মণ বলেন "তুমি আপনাকে কেমন দেখ্ছ?" সুইডেনবাসী বলেন "তুমি কেমন?" ওলন্দাজ বলেন, "তুমি কিরূপ বলেছ? "মিসরবাসী বলেন;—"তোমার কেমন ঘর্ম্ম হচ্ছে?" চীন জিজ্ঞাসা করেন "তোমার উদরের অবস্থা কিরূপ?" অথবা "তুমি কি ভাত খেয়েছ?" পোলাণ্ডবাসী জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি আপনাকে কেমন রেখেছ?" রুষ বলেন, তুমি কেমন বেঁচে আছ?" পারস্যবাসী বলেন "তোমার ছায়া যেন কখন হ্রস্ব না হয়।" পাঠক বিবেচনা করিয়া দেখিবেন এই সমস্ত সম্ভাষণ গুলির একই ভাবার্থ।

মৎস্যের শ্রবণ শক্তি আছে ইহার নানা প্রমাণ পাওয়া যায়। মৎস্যজীবীদিগের এই তত্ত্ব প্রায় জানা নাই। তাহারা মৎস্য ধরিবার সময় মৎস্য শ্রবণশক্তি-বিহীন মনে করিয়া শব্দ করা সম্বন্ধে কিছুমাত্র সাবধানতা অবলম্বন করে না। মৎস্যের শ্রবণশক্তির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কোন ইংরাজ প্রাণিতত্ত্ববিদ বলেন যে একবার তিনি একটী পুষ্করিণীর ঘাটে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে দূরে বন্দুকের শব্দ শুনিতে পাইলেন। একদল শিকারী পক্ষী মারিবার জন্য বাহির হইয়াছিল; ক্রমাগত বন্দুক ছুড়িতেছিল। তিনি দেখিলেন যতবার

বন্দুকের শব্দ হইল, ততবার তাঁহার সম্মুখস্থ ঘাটের জলে যে সকল মৎস্য ক্রীড়া করিতেছিল, তাহারা ভীত হইয়া জলের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।

উত্তর আমেরিকার অন্তঃপাতী মিসিসিপি নদীর তীরে "রাক্ষস পাদপ" নামে এক জাতীয় বিষাক্ত বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হয়। এই বৃক্ষের নিকটস্থ স্থানে অন্যান্য লতা বৃক্ষাদি রোপিত হইলে তাহা অল্পকাল মধ্যে শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার লালবর্ণ ছোট ছোট ফুল হইয়া থাকে। ফুলগুলি দেখিতে পেয়ালার ন্যায়; মধ্যভাগে অতি অল্প পরিমাণ জলীয় পদার্থ দেখা যায়; উহা কীট পতঙ্গদিগের প্রাণনাশক। পুষ্পমধ্যস্থ এই জলীয় পদার্থে শত শত মক্ষিকা ও অন্যান্য পতঙ্গ মৃতাবস্থায় পতিত রহিয়াছে দেখা গিয়া থাকে। গরু বাছুর এই বৃক্ষের পত্র বা পুষ্প আহার করিলে মৃত্যু মুখে পতিত হয়। এই বৃক্ষের বিষের প্রতিশোধক এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। আমেরিকার যে সকল স্থানে "রাক্ষস পাদপ" জন্মাইতে দেখা যায়, সেই খানেই প্রায়ই ভয় হইয়া থাকে।

বারমেসে।

চৈত্র।

জল হইয়া "যো" হইলেই এইমাসে অধিক পরিমাণে ভূমিতে লাঙ্গল দিতে হয়। বৈশাখ মাসে যে সকল ফসলের আবাদ করিতে হয়, জলের সুবিধা হইলে, তৎসমুদয় এই মাসে করা যাইতে পারে। জল না হইলেও কৃষকেরা এই মাসে আশুধান্যের "কাঁকড়ি" করিয়া থাকে। চৈত্রমাসে শুষ্ক ভূমিতে অধিক পরিমাণে লাঙ্গল ও মই দিয়া মৃত্তিকা ধূলিবৎ চূর্ণ করিতে হয়। সেই ধূলির মধ্যে আশুধান্যের বীজ বপন করিতে হয়। পরে জল হইলে অবিলম্বে সেই বীজ অঙ্কুরিত হয়। ঐরূপ শুষ্ক ভূমির ধূলির উপর বীজ বপন করাকে 'কাঁকড়ি' করা বলে। 'কাঁকড়ির' অনেকবীজ পক্ষ্যাদিতে নষ্ট করিয়া ফেলে বটে, কিন্তু ঐ প্রক্রিয়ার আর একটা বিশেষ গুণ আছে। ঐরূপে উক্ত বীজ হইতে যে সকল ধানের গাছ জন্মে, তাহাতে আদৌ কোন প্রকার পোকা লাগে না। ইহা ধান্য আবাদের পক্ষে নিতান্ত অল্প সুবিধা নহে। কেননা আশুধান্যে বিবিধ কীটের উৎপাত হইয়া থাকে।

বেগুণের চারা—এই মাসে বেগুণের চারা তৈয়ার করিতে হয়। একটী চৌকার মাটী উত্তমরূপে চূর্ণ ও সার মিশ্রিত করিয়া তাহাতে বেগুণের বীজ বপন করিবে এবং চৌকার মাটী চাপিয়া দিবে, নচেৎ পিপীলিকা ও অন্যান্য কীটে তাহা খাইয়া ফেলে। খেজুরের

পাতা কলার বাইল দ্বারা ঐ চৌকা আচ্ছাদন পূর্ব্বক প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার উপর অল্প পরিমাণে জল সিঞ্চন করিবে। এই চারা বড় হইলে চৈত্র ও বৈশাখ এই দুইটী মাস বাদ দিয়া অবশিষ্ট দশ মাসেঁর যে কোন মাসে ক্ষেত্রে রোপণ করা যাইতে পারে। কিন্তু আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণ মাসে রোপণ করাই প্রশস্ত। বেগুনের ক্ষেত্র শুষ্ক হইলেই তাহাতে জল দিতে এবং গাছে বা ফল-ফুলে পোকা ধরিলে তাহাতে ভস্মচূর্ণ দিতে পারিলে বার মাসই বেগুণ ফলে। কিন্তু শীতকাল ভিন্ন অন্যকালে জাত বেগুন তাদৃশ সুস্বাদু হয় না। এই ফসলের চাষ আবাদ সম্বন্ধে খনা আপন স্বামী মিহিরকে 'বরাহের পো' এই নাম দিয়া বলিয়াছেন,—

"বলে গেছে বরাহের পো।
দশটা মাস বেগুণ রো॥
চৈত্র বৈশাখ দিবে বাদ।
ইথে নাই কোন বিবাদ॥
পোকা ধরলে দিবে ছাই।
এর চেয়ে ভাল উপায় নাই॥
মাটী শুকালে দিবে জল।
সকল মাসে পাবে ফল॥"

ইক্ষু,—ফাল্গুন মাসে ইক্ষু কাটিয়া ফেলা হয়। কোন কোন কৃষক প্রত্যেক ঝাড়ের কিয়দংশ ভূমিতে রাখিয়া ইক্ষু ছেদন করে। চৈত্র মাসে সেই ভূমিতে সাবধানে ২।১ বার লাঙ্গল দিয়া তাহাতে জলসেচন করে। তাহাতে প্রত্যেক ইক্ষুমূলের চতুঃপার্শ্ব হইতে নূতন ইক্ষু জন্মে। সেই ইক্ষুকে রীতিমত পালন করিলে তাহা সম্পূর্ণ কার্য্যোপযোগী হয়। এইরূপে একবার আবাদ করিয়া ২।৩ বর্ষ ইক্ষু আবাদ চালাইতে পারা যায়।

পান,—এই মাসে পানের লতা অনেকটা বড় বড় হয়। তাহার কিয়-দংশ টানিয়া খড়ি খাঁকড়ার গোড়ায় জড়াইয়া দিয়া অগ্রভাগ মাচায় উঠাইয়া দিতে হয়। পানের পাতা প্রস্তুত, অর্থাৎ পক্ক হইলে প্রথমে লতার মূলের দিক্ হইতে ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিবে।

আর একজাতীয় পান ও লঙ্কা আছে, উভয়ই লতা জাতীয়, যে কোন বৃহৎ বৃক্ষের মূলে উহা রোপণ করিয়া ঐ বৃক্ষে উঠাইয়া দিতে হয়। উহার বিশেষ চাষ আবাদ কিছু নাই! লঙ্কার নাম "চই," উহার গোড়াই লঙ্কার কার্য্য নির্ব্বাহ করে। ফলতঃ লঙ্কা হইতে উহা স্নিগ্ধ ও উপকারক। যে সকল পীড়ায় লঙ্কা মরিচের ঝাল এককালে নিষিদ্ধ, তাহাতে 'চই ঝাল' অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে, কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় না। ঐ পানের বিশেষ কোন নাম নাই। উভ-য়ই বঙ্গের পূর্ব্ব ও পূর্ব্বদক্ষিণ অঞ্চলে প্রচুর জন্মিয়া থাকে।

কুলের কলম,—যদি কুলের "চোঙ্গ কলম" ও "চক্ষু কলম" করিবার ইচ্ছা হয়, তাহা এই মাসেই করিতে হইবে। কলম করা উদ্যান কার্য্যের অন্তর্গত। উহা নানাবিধ এবং বিলক্ষণ জটিল

ব্যাপার। একবার স্বচক্ষে ঐ সকল প্রক্রিয়া দর্শন না করিলে, কেবল বিবরণ পাঠে কৃতকার্য্য হওয়া কঠিন।

(১) একটী দেশী কুলের নধর চারার মূল হইতে এক ফুট আন্দাজ রাখিয়া ছেদন করিবে। ঐ ছিন্ন অংশের অব্যবহিত নিম্নে যে পত্রগ্রন্থি আছে, তাহা হইতে ছিন্ন অংশ পর্য্যন্ত চারিপাশের ছাল চাঁচিয়া ফেলিবে। একটী বিলাতী কুলের নূতন তেজাল শাখার কর্ত্তিত মুখের দিকে কিঞ্চিৎ মাইজ বা কাষ্ঠ বাহির করিয়া ফেলিবে। চতুর্দ্দিকের ত্বক্‌টী যেন ছিঁড়িয়া বা কাটিয়া না যায়। এই শাখার কাষ্ঠশূন্য অংশ পূর্ব্বোক্ত চারার কাষ্ঠে বসাইয়া দিবে। এই কার্য্য এরূপ হস্তনৈপুণ্য ও বুদ্ধি বিবেচনা পূর্ব্বক করিতে হইবে যেন, ঐ যোড়ের কাষ্ঠ ও ত্বক্ ছোট বড় এবং শিথিল না হয়। পরে উহার চারিদিকে মসলা মাটী দিয়া চট বা মোটা কাপড় দ্বারা উত্তমরূপে বাঁধিয়া দিতে হইবে। এই কলমে অধিক রৌদ্র না লাগে এবং যে পর্য্যন্ত বর্ষারম্ভ না হয়, তদবধি জলের ঝারা দিতে হয়। এই প্রস্তুতীকরণ প্রক্রিয়ার কোন অংশে কিছুমাত্র ত্রুটি হইলেই কলম শুষ্ক হইয়া যায়। ইহার নাম "চোঙ্গকলম"।

(২) দেশী কুলগাছের যে সকল স্থান হইতে শাখা নির্গত হয়, সেই সকল স্থানকে চক্ষু কহে। এই মাসে গাছে নূতন শাখার মুকুল বা কুঁড়ি নির্গত হইতে থাকে। উত্তম ধারাল ছুরী দ্বারা চতুঃপার্শ্বের কিঞ্চিৎ ত্বক্ ও কাষ্ঠের সহিত ঐ কুঁড়ি কাটিয়া ফেলিতে হইবে। অনন্তর বিলাতী কুলের তাদৃশ নূতন শাখা মুকুল বা কুঁড়ি আনিয়া উহার মধ্যে বসাইয়া দিতে হইবে। পরে তাহাকে যথাবিধি পালন (যেমন চোঙ্গকলমে বিবৃত হইয়াছে।) করিলে চক্ষু কলম প্রস্তুত হয়।

বাঁশ,—গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে গোবর ও জল দিয়া উত্তমরূপে কাদা করিবে। একখানা পুরাতন বাঁশের কিয়দংশ মূল শুদ্ধ তুলিয়া ঐ গর্ত্তের মধ্যে বসাইয়া দিবে। ঈষৎ হেলাইয়া বসাইবে এবং চারি পাঁচ হাতের অধিক রাখিবে না। উহাকে বাঁশের মুড়া কহে। মধ্যে মধ্যে উহার মূলে জল সিঞ্চন করিতে হয়। ইহা হইতে কাল সহকারে একঝাড় নূতন বাঁশ প্রস্তুত হয়।

আরও এক প্রকারে নূতন বাঁশঝাড় প্রস্তুত করা যাইতে পারে। এক খানা বহুগ্রন্থিযুক্ত পাকা বাঁশ লম্বাভাবে পুতিয়া ফেলিতে হয় এবং মধ্যে মধ্যে তদুপরি জল দিতে হয়। ক্রমে উহার প্রত্যেক গাঁইট হইতেই প্রায় নূতন বাঁশ জন্মে। প্রথম দুই তিন বৎসর বাঁশ সকল বড় স্থূল হয় না। পরে যথাকালে অনুরূপ অন্তরে কয়েকটা ঝাড় রাখিয়া অবশিষ্ট ঝাড়গুলি মারিয়া ফেলিলে বাঁশ ক্রমশঃ মোটা ও লম্বা হইতে থাকে। এই সকল ব্যাপার কেবল পড়িলে চলিবে না।

যাঁহার সুবিধা আছে, তাঁহাকে হাতে কলমে করিতে হইবে, যে হেতু এসকল বিষয় ক্ষণিক আমোদজনক কার্য্যও নহে,—নাটকও নহে। কাজের কথা, কাজে দাঁড় করাইবার চেষ্টা করাই উচিত। এই মাসে পুরাতন বাঁশঝাড়ের গোড়ায় সরস পলি মাটী তুলিয়া দিতে হয়, যথা—

"ফাল্গুনে আগুন চৈতে মাটী।
বাঁশ বলে শীঘ্র উঠি॥
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটী॥"

তিল,—ফাল্গুন মাসের শেষ আট-দিন এবং চৈত্র মাসের প্রথম আটদিন, এই ষোলদিনের মধ্যে যে কৃষক তিল বপন করিতে পারেন, তাঁহার তিল বেশ হয়। যথা,—

ফাল্গুনের আট চৈতের আট।
সেই তিল দায়ে কাট॥"

এই প্রবাদে গাছ তেজাল হইবার কথা আছে। গাছ তেজাল হইলেই ফলন বেশী হওয়া সম্ভব।

ভুট্টা,—এই ফসলকে এদেশে জনারা কহে। ধান্যাদির চাষ আবাদ যেমন এদেশে প্রচুর পরিমাণে হয়, পশ্চিমে ভুট্টার আবাদ তদ্রূপ। মথুরা, কাণপুর, বুলন্দসহর, ফরেক্কাবাদ প্রভৃতি স্থানে আমরা ভুট্টার ক্ষেত্র ও আড়ত দেখিয়াছি তাহা দেখিয়া বেশ বুঝা যায় যে, ঐ ফসল তত্তদ্দেশের একটী প্রধান শস্য। আড়ত সকলের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘরে ভুট্টার ফল বোঝাই হইয়াছে। বহুসংখ্যক স্ত্রী পুরুষ বালক-বালিকা ঐ ফল হইতে দানা বাহির করিতেছে। বেলেঘাটা প্রভৃতি চাউলের আড়তে যেমন পর্ব্বতময় চাউ-লের কাঁড়ি দৃষ্ট হইয়া থাকে, উপরি উক্ত স্থান সকলে সেইরূপ ভুট্টা দানার স্তূপ দেখা যায়। পশ্চিমাঞ্চলে ভুট্টা একটী মূল্যবান্ ফসল। সেই জন্য কথিত আছে,—

"যদি থাকে টাকা করিবার গোঁ।
তবে চৈত্রমাসে ভুট্টা গিয়া রো॥"

চৈত্রমাসে ভুট্টার আবাদ করিলে ফসল বেশী হইয়া অর্থাগম হয়।

আমরা এতদিনে "বারমেসে" অর্থাৎ দ্বাদশ মাসের প্রয়োজনীয় কৃষি বিবরণ শেষ করিলাম। এক্ষণে "কৃষি সম্বন্ধে নানা কথা" এই শিরোনামে কিছু বলিতে উদ্যত হইলাম। তন্মধ্যে চৈত্রমাসের বিবরণের সহিত মাঘ, ফাল্গুন ও চৈত্র এই তিন মাস সংক্রান্ত কথার আলোচনা করিব।

"যদিবর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজা পুণ্যদেশ।
যদি বর্ষে ফাল্গুনে,
চিনা কাউন দ্বিগুণে॥"

মাঘের শেষে বর্ষণ হইলে নৈদাঘ ও হৈমন্তিক উভয়বিধ ফসলই উত্তম হয়। ফাল্গুনে বর্ষণ হইলে পশ্চিম দেশীয় চিনা ও কাউন নামক ধান্য দ্বিগুণ পরিমাণে ফলিয়া থাকে।

"মাঘ মাসে বর্ষে দেড়া।
রাজা ছেড়ে প্রজার সেরা॥"

মাঘ মাসে সুবৃষ্টি হইলে কৃষকগণ বহু-

শস্য পাইয়া পরম সুখী হয়। তখন তাহারা অন্যের নিকট রাজবৎ সেবা ও সম্মান প্রাপ্ত হয়।

"যদি হয় চৈত্র মাসে বৃষ্টি।
তবে হয় ধানের সৃষ্টি॥"

যে বৎসর চৈত্র মাসে সুবৃষ্টি হয়, সে বার প্রচুর পরিমাণে ধান্য জন্মিয়া থাকে।

"যদি বর্ষে মকরে।
তবে ধান হবে টিকরে॥"

মাঘ মাসে সুবৃষ্টি হইলে টিকর, অর্থাৎ উচ্চ ভূমিতেও ধান জন্মে।

"চৈতে কূয়া ভাদ্রে বাণ।
নরের মুণ্ড গড়াগড়ী টান॥"

যে বৎসর চৈত্র মাসে কোয়াসা এবং ভাদ্র মাসে বন্যা হয়, সে বর্ষে নিশ্চয়ই মহামারী হইয়া সেখানে সেখানে নর কপাল গড়াগড়ি যায়।

"চৈতে থর থর বৈশাখে ঝড় পাথর
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফুটে।
তবে জানবে বর্ষা বটে॥"

যে বৎসর পর্য্যন্ত খুব শীত থাকে. বৈশাখ মাসে ঝটিকা সহকারে শিলাবৃষ্টি হইয়া থাকে, এবং জ্যৈষ্ঠ মাসে অধিক মেঘ বৃষ্টি হয় না ; সে বৎসর নিশ্চয়ই সুবর্ষা হইয়া থাকে।

যদি বাহ্য প্রকৃতির ফলাফল, ঐ সকল প্রবাদ অনুসারে সংঘটিত হয় এবং কৃষক গণ পূর্ব্ব হইতে তাহার অনুশীলন করিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের কার্য্যের সুব্যবস্থা হইতে পারে। এই সকল বিষয়ে কৃষক মাত্রেরই পরীক্ষা করা উচিত।

(ক্রমশঃ)

সিংহলের কতকগুলি আচার ব্যবহার।

ভগিনীগণ! আপনারা জানেন বা নাই জানেন আমরা বলি যে সিংহল প্রাচীন বাঙ্গালাজাতির উপনিবেশ মাত্র। যখন বৌদ্ধধর্ম্মের অতিশয় প্রাদুর্ভাব, তখন এই উপনিবেশ সংস্থাপিত হয়। তজ্জন্য অনেক সিংহলবাসী এখনও বাঙ্গালীদিগের বংশসম্ভূত ও বাঙ্গালী উপনিবেশীদিগের বংশধর বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দেওয়া গৌরবসূচক মনে করেন। করিবারও কথা। কালের স্রোতে অন্যান্য সমস্ত সৌসাদৃশ্য ভাসিয়া গেলেও একটি অবশিষ্ট আছে, তাহা কোনও কালে যাইবার নয়। সেটী দেহের গঠন। আহা! আমরা বাঙ্গালী, আমরা যতদূর অধঃপতিত হইতে হয় হইয়াছি। আমাদিগের আবার উপনিবেশ! আমাদিগের উপনিবেশিকগণ আবার আমাদিগের গুণকীর্ত্তন করেন এবং আমাদিগের আদর্শে চরিত্র ও সমাজ গঠন করিতে যত্ন পান। একথা শুনিলে হাসিও পায়, দুঃখও ধরে। ইহাতেই বেশ জানা যায় যে.বর্ত্তমান সিংহলবাসিগণ

কতদূর বিজাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত ও আচারভ্রষ্ট হইয়াছে। বিধাতার নিয়মে যখন কোনও জাতি অধঃপতনের চরম সীমায় উপস্থিত হয়, তখন তিনি এক অভূতপূর্ব্ব অবস্থায় তাহাদিগকে আনিয়া উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করিয়া থাকেন। তাই বলিয়াই বুঝি আজ সিংহলের কৃতবিদ্য ধনী মানীব্যক্তিগণ সমাজ, নীতি ও আচার ব্যবহার সংস্করণে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। ইহাদিগের বহুকাল হইতে প্রচলিত পরিচ্ছদ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং আরও হইবে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইহাতে দৃষ্টি পড়িয়াছে, আন্দোলন চলিতেছে।

সংপ্রতি সিংহলের কতকগুলি ভদ্রমহিলা বুদ্ধ গয়াদিতীর্থ পর্য্যটন উপলক্ষে কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। ইহাদিগের পরিচ্ছদ অনেকটা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের মত। তবে দেখিলাম সধবাতেও থান পরিয়াছেন আর বিধবাতেও সধবার মত শাটী—বোম্বাই শাটির মত শাটি পরিধান করিয়া থাকেন। তথ্যানুসন্ধানে জানিতে পারিলাম যে উহারা যেরূপ পরিহিতা ছিলেন, তাহা উহাদিগের দেশ প্রচলিত প্রথানুমোদিত নহে। তথায় স্বতন্ত্র প্রণালী। সে যাহা হউক আমরা যাহা দেখিয়াছিলাম তাহাতে বেশ বুঝা গেল যে, উঁহারা আমাদিগের স্ত্রীলোকদিগের পোষাক অনেকটা অনুকরণ করিয়াছেন। ইহাদিগের সহিত পার্থক্য এই যে, তাঁহারা পার্শি বা মাদ্রাজের মহিলাদিগের মত কশা জামা পরিধান করিয়া দক্ষিণ হস্ত বাহির করিয়া রাখেন। গৃহপরিচ্ছদ যাহাকে ভাষায় আট পহরিয়া পোযাক বলে, তাহা সচারাচরআমরা বহির্জগতে থাকিয়া দেখিতে পাই না। ইহা কোনও প্রকার দুই খণ্ড বস্ত্রে সম্পন্ন। একখণ্ড কটি হইতে পাদদেশ, অপর খণ্ড কটি হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। কি বিধবা কি সধবা জামা সকলেরই গাত্রে। অবগুণ্ঠন প্রথা সিংহলে প্রচলিত না থাকায় সিংহলমহিলাকে অবগুণ্ঠনে মস্তক আবৃত করিতে দেখি নাই। মাদ্রাজী স্ত্রীলোকদিগের মত বেশ বিন্যস্ত হইয়াছে ; কিন্তু বিধবাকেও আমাদিগের দেশের স্বর্ণ রৌপ্য ফুল সদৃশ স্বর্ণ বা রৌপ্য কেশালঙ্কারে কেশ বিভূষিত করিতে দেখা গিয়াছে। সিংহল নারী চর্ম্ম পাদুকাও ব্যবহার করিযা থাকেন।

হিন্দু সন্ন্যাসিনী আছেন, বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীও আছেন। ধর্ম্মজীবনের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় উপস্থিত হইলে, ইহাঁরা ভিন্ন ভিন্ন উপাধি লাভ করিয়া থাকেন,—যথা উপাসিকা ও ভিক্ষুনী। গৃহস্থের কথা পূর্ব্বে উক্ত হইল, এক্ষণে বৌদ্ধ-বৈরাগিণী দিগের বিষয় কিছু বলা যাইতেছে। এই সুযোগে লেখক অনেক উপাসিকাকেও দর্শন করেন। ইহাঁদের মধ্যে অনেকগুলি বৃদ্ধা, প্রৌঢ়া ও কতকগুলি যুবতীও ছিলেন। কেহ কেহ বিবাহ করিয়া শেষে স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন

পূর্ব্বক সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করেন, কেহ কেহ বা চিরকুমারী আছেন—আদৌ বিবাহ করেন নাই। ইহাঁরা পাদুকা পরিধান করেন না। পরিধেয় সাদাথান বা ধুতি। সকলের গায়ে জামা দেখিলাম। ইহাঁরা ভিক্ষু শ্রমণদিগের ও আমাদিগের দেশের বিধবাদিগের ন্যায় একাহারিণী। বৌদ্ধ বলিলে বাঙ্গালী সাধারণে অহিংসা পরমধর্ম্ম-পরতন্ত্র নিরামিষভোজী ধর্ম্ম-সম্প্রদায়কে বুঝিতে পারেন। কিন্তু তাহা নয়। সন্ন্যাস আশ্রমধারী বৌদ্ধদিগের মধ্যে অধিকাংশই নিরামিষভোজী। গৃহীদিগের মধ্যে অনেকেই আমিষভোজী। আমাদিগের দেশে যেরূপ সধবাকে আমিষ ভোজন করিতেই হইবে, সিংহলে সেরূপ নহে। মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করা তথাকার সধবাদিগের স্বেচ্ছাধীন, খাইলেও কোন বাধা নাই, না খাইলেও দোষ নাই। কপালে সিঁদুর, হাতে "লো" যেমন আমাদিগের সধবার চিহ্ন, সিংহলবাসিনীর সেরূপ কিছুই নাই। ইহাঁদিগের অনুষ্ঠীত ব্রতাদির কথাও বিশেষ কিছু শুনা যায় না, তবে এইমাত্র শুনিয়াছি যে, শুক্ল পক্ষীয় পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে ইহাঁরা ইচ্ছা করিলে বুদ্ধদেবের উদ্দেশে উপবাস করিয়া থাকেন।

পাত্রের বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৮।২০ ও পাত্রীর বয়ঃক্রম অন্ততঃ ১৬।১৮ বৎসর হইলে বিবাহ কার্য্য সম্পাদিত হয়। বৌদ্ধ বিবাহ হিন্দু বিবাহের মত নহে। ইহাতে পুরোহিতও নাই, মন্ত্রও নাই, বিগ্রহও নাই। উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে, উভয় পক্ষের কর্তৃপক্ষীয় মাঙ্গল্য ও বস্ত্র অলঙ্কারাদি লইয়া বিবাহ দেন। বলিতে কি ইহা কতকটা (সিভিল ম্যারেজের) আইনের বিবাহের মত। সিংহলে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। বিধবা ইচ্ছা করিলে বিবাহ করিতে পারেন, নাও পারেন। কোনও রূপ সামাজিক বাধা নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে সিংহলে স্ত্রীশিক্ষা ছিল না এক্ষণে, কিছু কিছু, দেখা যাইতেছে। অনেকগুলি বালিকা, বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে কলম্বো নগরীর সঙ্গমিত্রা বালিকা বিদ্যালয় প্রধান। প্রধান প্রধান বালিকা বিদ্যালয় গুলিতে ইংরাজী অধ্যাপনাও প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মনে করুন্ কাহারও নাম নবীনচন্দ্র ঘোষ। সিংহলী প্রথানুসারে ইহা রাখিতে হইলে ঘোষ নবীনচন্দ্র এইরূপ হইবে। আবার দেখুন, প্রায় সমস্ত সিংহল অধিবাসীর অনার্য্য বিজাতীয় য় নাম। বৌদ্ধধর্ম্ম লুপ্তপ্রায় হইলে খৃষ্টীয় ওলন্দাজদিগের অধীনে বহুকাল থাকাতে সিংহল এতদূর আচার ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হয় যে, অধিবাসীরা প্রায় সকলে বিজাতীয় খৃষ্টীয় নাম ও ধর্ম্ম পরিগ্রহ করে। এজন্য ইহাদিগের প্রায় সকলেরই ইউরোপীয় নাম। ধর্ম্ম বিধর্ম্ম কিম্বা প্রেতাত্মামূলক বিবৃত বৌদ্ধ

ধর্ম্ম। বর্ত্তমান সময়ের বিকৃত হিন্দু-ধর্ম্মের যে প্রকার শোচনীয় অবস্থা, কি সিংহলে, কি তিব্বতে, কি শ্যামে, কি ব্রহ্মে, কি চীনে, কি জাপানে, বর্ত্তমান বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও সেই প্রকার বিকৃত শোচনীয় অবস্থা, সুতরাং সিংহলের ধর্ম্ম-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারকের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য নাম পরিবর্ত্তন ও ধর্ম্মের অঙ্গীভূত কুসংস্কারের অপনয়ন এবং সমাজ পুনর্গঠন করা।

মুসলমানদিগের মত সিংহলীদিগের শগড়ির বিচার নাই। ইহাঁরা বিছা-নায় বসিয়া অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল ও পাঞ্জাব প্রভৃতি দেশে হিন্দুদিগের আচারটা ঐরূপ হইলেও তাঁহারা শয্যায় বসিয়া ভোজন পানাদি করেন না।

মৃত্যুর পর হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন চতুর্থী, দশপিণ্ড, ক্ষৌরকর্ম্ম ও শ্রাদ্ধ ক্রিয়াদির বিধি আছে, সিংহলনিবাসী বৌদ্ধদিগের তৎসমতুল্য ক্রিয়া কলাপের ব্যবস্থা আছে। চল্লিশ দিনে অশৌচ শেষ হয়—পরে শ্রাদ্ধ ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সৃষ্টি প্রক্রিয়ার রহস্য।

(৫৪১ সংখ্যা ৩৭৪ পৃষ্ঠার পর।)

শাস্ত্রে যে অণ্ড হইতে, মতান্তরে বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে, ব্রহ্মার উৎপত্তি বলা হয়, তাহার অর্থ এই যে অণ্ডাকার ক্ষিতি-মণ্ডল বহুকাল জলে ভাসমান ছিল। তত্ত্ব সকল পরিণত হইয়া আসিতে আসিতে যখন জল হইতে গন্ধ তন্মাত্র উৎপন্ন হইয়া তাহার পরিণামে ক্ষিতিতত্ত্ব উদ্ভূত হইল, তখন ঐ জল রাশিকে ক্ষিতি তত্ত্বের আধার বলা হইল। এজন্য ক্ষিতি-মণ্ডলরূপ অণ্ড জলে ভাসমান ছিল বলা যাইতে পারে। ক্ষিতিমণ্ডলরূপ অণ্ড-কেই ব্রহ্মার আবাসস্থান রূপ পথ বলিয়া কল্পিত হইয়া থাকে। মতান্তরে উহা-কেই মহাবিষ্ণুর নাভিপদ্ম বলে, কারণ ক্ষিতিতত্ত্ব প্রাকৃতিক পরিণামের সীমান্ত স্থল। সমস্ত তত্ত্বই মুকুলাবস্থা হইতে এই স্থলে আসিয়া পরিপুষ্টতা লাভ করে। মান, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও ইন্দ্রিয়াদির প্রকাশ এই ক্ষিতিতত্ত্বেই হইয়া থাকে; কারণ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয় স্থান আকৃতির উদ্ভব এই ক্ষিতিতত্ত্ব হইতেই সম্পন্ন হয়। সুতরাং, ইহাকে ব্রহ্মার আধার রূপ পদ্ম বা উৎপত্তিস্থানরূপ অণ্ড এই উভয় প্রকারেই কল্পনা করা যাইতে পারে। উক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত হইলে, অর্থাৎ ভূখণ্ড জল হইতে স্বতন্ত্র হইয়া প্রকাশিত হইলে, ব্রহ্মা তদুপরি অধিষ্ঠান করিলেন অর্থাৎ ক্ষিতি তত্ত্বের পরিণামে, যে প্রথম উদ্ভিদরূপ জীবত্বভাব দেখা দিল, তাই ব্রহ্মানামে কল্পিত হইল।

ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াই কোথা হইতে আসিলাম বলিয়া চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করাতে তাঁহার চারিটী মুখ হইল এবং নিরীক্ষণ করিয়া কাহাকেও দেখিতে না পাওয়াতে পদ্মনাভের অভ্যন্তরে নিজমূল অন্বেষণার্থে জলমধ্যে প্রবেশ করিলেন। কিন্তু অন্বেষণে কৃতকার্য্য না হইয়া, পুনরায় স্বস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এই সকল কথাদ্বারা এই অনুভব হয়, যে, জলজ বৃক্ষের পত্র পুষ্পসকল কোনও রূপ আবরণাভাবে একই সময়ে চতুর্দ্দিক দর্শন করিতেছিল, এজন্য ব্রহ্মা চতুর্মুখ বলিয়া কল্পিত হইলেন, এবং জলজবৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকা জল ভাগ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া উত্থিত হইতে যে কতকাল লাগিয়াছিল, তাহার সংখ্যা করা দুঃসাধ্য বলিয়া ব্রহ্মা তাঁহার মূল অন্বেষণে কৃতকার্য্য হইলেন না।

জলজ বৃক্ষের মূলস্থিত মৃত্তিকারাশি কালক্রমে জলভাগ অতিক্রম করিয়া উত্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐ জলে মৎস্য, কীট ও জল জন্তুসকল উৎপন্ন হইয়াছিল, কারণ চণ্ডীর প্রথম মাহাত্ম্যে লিখিত আছে যে, বিষ্ণুর কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটনামক দৈত্যদ্বয় উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, নারায়ণ কর্ত্তৃক নিহত হয়। কীটভ শব্দের উত্তর স্বার্থে "ষ্ণ" প্রত্যয় করিলে, কৈটভ পদসিদ্ধ হয়। অতএব জলমধ্যে প্রথম কীট সকলের জন্ম হওয়াকে লক্ষ্য করিয়াই কৈটভ নামক অসুরোৎপন্ন হওয়া কল্পিত হইয়াছে। মধু এক প্রকার পতঙ্গবিশেষ, যাহারা কীটরূপে জন্ম গ্রহণ করে, পরে পাখা নির্গত হইলে মশক ও মক্ষিকা ইত্যাদি হইয়া উড়িয়া যায়। মধু কৈটভ দৈত্যদ্বয় বিষ্ণুর সহিত বহুকাল (দেবমানে ৫০০০ বৎসর) যুদ্ধ করিয়া বিনাশ প্রাপ্তিকালে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিল যে, আমরা যেন পৃথিবীর উপরিভাগে তোমার হস্তে নিহত হই। ইহার অর্থ এই যে কালক্রমে যখন জল ভাগ কমিয়া গেল এবং মৃত্তিকা ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়া দেখা দিল, তখন কীট পতঙ্গাদি জীবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। এইক্ষণে দেখ উদ্ভিদ রাজ্যের জীবত্ব ভাবের নাম ব্রহ্মা, এবং উদ্ভিদ সকল সেই জীবনী শক্তির অধীন বলিয়া উহা ব্রহ্মার সৃষ্টবস্তু হইল, অর্থাৎ ব্রহ্মা যেন প্রথমে উদ্ভিদ্ সৃষ্টি করিলেন। ব্রহ্মার দ্বিতীয় সৃষ্টিতে কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষী ইত্যাদি তির্য্যক্ জীব স্রোতের উৎপত্তি হইয়াছিল।

(ক্রমশঃ)

জাপান।

ওই যে দ্বীপটী লোহিত বরণ
প্রশান্তসাগরে ক্ষুদ্র আয়তন,

দেখ নিরখিয়ে দেখ একবার
তুলনায় চীন-সাম্রাজ্য উহার

কতগুণে বড় !—নগণ্য জাপান
একতার বলে কত বলীয়ান্ !
অবাক্ হইবে শুনিলে সে কথা—
স্বদেশের তরে কি মহাপ্রাণতা !
স্বার্থ স্থখ সব দিয়ে বিসর্জ্জন
শত শত নর করি প্রাণপণ,
যুঝিছে সমরে নাশিছে অরাতি
অদম্য উৎসাহে রণমদে মাতি।
মহাবল করী—মুষিকের করে
পরাস্ত মানিছে সম্মুখ সমরে।
রণ-বিশারদ—ব্রিটিশ কেশরী
ফরাসী জর্ম্মণ উঠিছে শিহরি !
বিশ বছরের সভ্যতার বলে
কিবা স্থনিপুণ সমর কৌশলে !
জলযুদ্ধে কিবা স্থদক্ষ জাপান
ডুবাইছে কত চীন জলযান
সসৈন্যে সাগরে,—জনমের মত ;
ধন্য হে জাপান তোমার বীরত্ব !
শত শত নারী করিবারে রণ
রাজার নিকটে করে আবেদন !
মত্ত মাতঙ্গিনী—জাপান রমণী !
বীরাঙ্গনা কত—বীর-প্রসবিনী,
সমর প্রাঙ্গণে প্রাণ দিতে চায় ;
'স্বদেশানুরাগ' ধন্য এ ধরায় !
অসীম সাহসে করিয়ে নির্ভর
পশিছে সমরে নির্ভয় অন্তর !
শত্রুসেনা হেরি হটিবে না রণে,
যায় যাক্ প্রাণ দেশের কারণে।
অহিফেন সেবি—পুরুষত্ব হীন,
গেছে একেবারে অধঃপাতে চীন !
পুর্ব্ব গর্ব্ব খর্ব্ব দর্প চূর মার,
অপদার্থ এবে নিস্তেজ অসার !
অদ্ভুত জগতে চীনের প্রাচীর !
যে চীনেতে ছিল শত শত বীর,
কোথায় সে চীন—নেশার অধীন
তাই তার এত দুর্দ্দশা দুর্দ্দিন !
ভাবিলে সে কথা চোখে বহে জল,
একেবারে চীন গেছে রসাতল।
আলস্য বিলাসবাসনা ও ভোগ
একবার দেশে পশিলে এ রোগ,
করে সর্ব্বনাশ ! বল বীর্য্যহীন
সাধে কিগো গেছে রসাতলে চীন ?
ধন্য হে জাপান ! ধন্য বীরপণা,
এসিয়ায় নাহি তোমার তুলনা।
ক্ষুদ্র কলেবর—বিক্রম বিশাল !
ভেবে দেখ তুমি কি ছিলে হে কাল ?
কাল চক্রে ঘুরি—চীনের পতন,
উদয় তোমাতে স্থখের তপন !
কেমন বালার্ক শোভিছে ও শিরে !
আরো যে উজ্জ্বল হইবে অচিরে !
স্থসভ্য সমাজে লভি উচ্চ স্থান
তুমিও জগতে হইলে প্রধান।
আরও উচ্চ হবে তারি সূত্রপাত,
সৌভাগ্য তোমার তাই স্থপ্রভাত !!

হেঁয়ালি।

তিন অক্ষরে নাম মম বিদিত সংসারে,
কিন্তু পণ্ডিতেরা মোরে অধিক আদরে।
আপন কর্ম্মেতে আমি নাহি হই পিছু,
কালী কালী বিনে মম মুখে নাই কিছু।

পরের মনের কষ্ট না পারি সহিতে,
পর উপকার খাটি দিবসে নিশিতে।
টেনিসন বঙ্গবাসী বঙ্কিম সুজন,
সকলেরি উপকার করেছি সাধন।
নামের প্রথম আর দ্বিতীয় অক্ষর,
একত্র করিলে বিজ্ঞানের সহচর।
আদি বর্ণে শেষ বর্ণে একত্র করিলে,
তখনি বলিয়া হীন সবে অবহেলে।
শেষ আর দ্বিতীয়েতে কর একত্রিত,
ছিছি বলি পলাইবে তখনি ত্বরিত।
যেখানে সেখানে থাকি মূল্যবান নই,
কিন্তু যদি চেন তবে মূল্যবান্ হই।

পাঁচন ও মুষ্টিযোগ।

(২৬০ সংখ্যা ৩০৪ পৃষ্ঠার পর।)

আমাশয় ও রক্তামাশয়।

১। (আমাশয় হইলে জোলাপ লওয়া উচিত। অপক্ক বেল পোড়াইয়া তাহার শাঁস গুড় ও মিছরির গুঁড়া সহ সেবন করাইবে। আকন্দ মূলের ছাল চূর্ণ সেবনে আমাশয় রোগের উপশম হয়।)

২। কেশুরিয়া, কচি দাড়িম, দাড়িম পাতা, আয়াপানের পাতা, কালা কর্পূর জামপাতা বা দূর্ব্বার, অথবা কুড়চি ছাল ইহার কোন একটীর রস ছাগীদুগ্ধসহ সেবন করাইলে রক্তাতিসার নিবৃত্তি হয়।

৩। কোকশীমের পাতা সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ সেবন করিলে আমরক্ত বন্ধ হয়।

৪। চাঁপাকলার শিকড় দুই কুঁচ বাটিয়া খাইলে আমরক্ত সারে। থুল-কুড়ি নামক গাছ খলিসা মাছের সহিত ঝোল করিয়া ১ সপ্তাহ রোগীকে খাওয়া-ইলে আমরক্ত ভাল হয়।

৫। বেলশুঠা, ধাই ফুল, বালা, লোধ, গজপিপ্পলী এই সকল দ্রব্য সম-ভাগে লইয়া কিঞ্চিৎ যোয়ান, মুতা, ও শুঠ যোগ করিয়া, সিদ্ধ করণানন্তর গাঢ় ক্বাথ ছাঁকিয়া মধুসহ মুহুর্মুহু অবলেহন করাইলে শিশুগণের আমাশয় রোগ নিবৃত্তি হয়।

৬। বেলশুঠা, ইন্দ্রযব, বালা, মোচ-রস, মুতা এই সকলে মিলিত ২ তোলাকে ঈষৎ কুটা করিয়া ১৬ তোলা জলে সুসিদ্ধ হইলে কেবল দুগ্ধ মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে ছাঁকিয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পান করাইলে শিশুদের মাংস ও রক্তক্ষরণ সহ গৃহিণী ৪।৫ দিবসে আরোগ্য হয়।

৭। প্রথমে একটী নূতন হাঁড়িতে /৫ সের জল দিয়া অগ্নিতে জ্বাল দিতে থাকিবে, যখন দেখিবে যে জল ফুটিতেছে, সেই সময় ঢেঁকিতে কুটা /১ সের কুড়-চীর ছাল ফেলিয়া দিয়া ঘাঁটিতে থাকিবে। যখন দেখিবে বেশ সিদ্ধ হইয়া পাঁচ পোয়া আন্দাজ জল আছে, সেই সময় নামা-ইবে। পরে সেই রস বস্ত্রের দ্বারা

ছাঁকিয়া লইয়া দেখিবে যে পাঁচ পোয়া হইয়াছে কিনা। অনন্তর এক ছটাক ঐ রস এক কাঁচ্চা মধুর সহিত মিলিত করিয়া সকাল ও সন্ধ্যা দুইবার খাওয়াইবে। তিন দিন পরে এক্বার করিয়া খাওয়াইবে। এইরূপে সাত দিন খাওয়াইলে আমরক্ত আরাম হয়।

৮। জ্বর অসত্বে তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করিয়া সেই ক্বাথ কিছুদিন পান করিলে রক্ত আমাশয় আরাম হয়।

৯। তিন চারি দিন তেলাকুচা পত্রের রস ১ তোলা পরিমাণে আমাশয় রোগীকে সেবন করাইলে আমাশয় নিবৃত্তি হয়।

১০। শুষ্ক চিড়ে ৮ তোলা ঘৃত দ্বারা মাখিয়া রাত্রিকালে আমাশয় রোগীকে ভক্ষণ করাইয়া জল পান করিতে দিবে না। এইরূপ ৩ বা ৪ দিন ব্যবহার করাইলে ভয়ঙ্কর আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

১১। ৪ তোলা ইষবগুল জলে ভিজাইয়া সেই জল চিনির সহিত দিবসে দুই তিনবার খাইবে। পাঁচ ছয় দিন ব্যবহার করা আবশ্যক। ইহাতে আমাশয় রোগ আরোগ্য হয়।

১২। ইষবগুল কতকটা বাছিয়া লইয়া গালে জল দিয়া তাহা গিলিয়া ফেলিলে আমাশয়, এমন কি রক্তামাশয় ভাল হয়। রাত্রিকালে শয়নের সময় ও প্রাতে সেবন করা প্রশস্ত। বেশীভেদ হইলে ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক একবার সেবন করিতে হয়।

১৩। খই, যষ্টি-মধু ও ইক্ষুচিনি সমভাগে চূর্ণ করিয়া ৪ রতি মাত্রায় মধুসহ মাড়িয়া এক চামচে আতপ চালের জলসহ পান করাইলে শিশুদিগের আমাশয় আরোগ্য হয়।

রক্তস্রাব।

১। নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইলে শ্বেতদুর্ব্বার রস, ফটকিরির জল কিম্বা চিনি সংযুক্ত দুগ্ধের নস্য লইলে উপকার হয়।

২। ফটকিরি /০ আনা ও ছাগ দুগ্ধ ⁄০ পোয়া সমপরিমাণে জলের সহিত সিদ্ধ করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে নামাইয়া দিবায় তিনবার সেবন করিলে, রক্তভেদ, রক্ত বমন, রক্ত প্রদর রোগের রক্তস্রাব নিবারণ হয়।

৩। ছাগদুগ্ধ ও আতপ চাউলের চেলোনি জল একত্র মিশাইয়া পান করিলে রক্ত উঠা ক্ষান্ত হয়।

৪। পুরাতন চামড়া জল দিয়া থেঁতো করিয়া ক্ষতস্থানে পটী বান্ধিয়া রাখিলে কিম্বা মুখে চিবান দুর্ব্বা ঘাসের রস অস্ত্রাদি জন্য ক্ষত (কাটা) স্থানে প্রদান করিলে রক্তরোধ ও বেদনা নিবারণ হইয়া কাটা স্থান যোড়া লাগিয়া যায়।

৫। যদি কোন অস্ত্রাদি বা আঘাতাদি দ্বারা রক্তবাহিনী শিরা ছিন্ন হইয়া নিয়ত শোণিত স্রোত বহিতে থাকে, তাহা হইলে সেই ক্ষত স্থানে বরফ অথবা ফট্কিরি মিশ্রিত জল বারংবার সিঞ্চন

করিলে শিরার মুখ সঙ্কুচিত হইয়া রক্ত রোধ হয়।

৬। আয়াপানের পাতার রস পান ও ক্ষত স্থানে প্রদান করিলে রক্ত রোধ হইয়া বেদনাদি নিবারণ হয়।

৭। ফট্‌কিরির গুঁড়া, বা তামাকের পাতা লাগাইয়া দিলে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।

৮। পাথুরিয়া কয়লা জলে ঘসিয়া ক্ষত স্থানে দিলে কাটা ঘা ভাল হয়।

৯। কাটিবা মাত্র কাটা স্থানে গাঁদা পাতার রস দিলে কাটা ঘা যুড়িয়া যায়, কোনও বেদনা হয় না।

১০। মাখন ও তিল তৈল সম পরিমাণে লইয়া মস্তকে মর্দ্দন করিলে নাক দিয়া রক্ত পড়া নিবারণ হয়। (ক্রমশঃ)

স্বর সাধন প্রণালী।

(৩৬০ সংখ্যা ২৭২ পৃষ্ঠার পর।)

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

নবাব ওয়াজাদ্‌ আলি সা কৃত গান।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

ঋ গ { সা ঋ সা ম | গ গ ম ম | প প
আ- রে- { এই- সি নি- মক্ | হা- রা- মি মু- | ল- ক্

প ম | গ ঋ গ || }
বি- গা- | রা | আ- রে || }

ম ম প প | প
(১ম) হ- জ- র- ৎ | বাঁ-
(২য়) গ- লি গ- লি | রে।

সা নি | ধ প ম | মগ ঋ গ || }
তি- | হি ল- গুণ- | কো আ- রে || }
য়ে | পা- থ- রি- | য়া। |

ম ধ ধ ধ |
ম- হ- ল- ম- |

ধ নি সা | নি ধ প | ম গ | ঋ গ || }
হ- ল- মে | বে- গ- ম | রোঁ- য়ে- | আ- রে || }

ঝিঁঝিট মিশ্র।

একতালা।

শ্রীচরণ দাস বৈরাগী কৃত গীত পরিবর্ত্তিত ল ও স।

{ ঋ গ ঋ ঋ প প গ গ ম ঋ সা সা | সা সা ম ম গ
{ হে- লা- তে র- ত- ন, হা- রা- ও- না ম- ন, | হ- রি- হ রি ব-

। । । । ।।। +।। । । । । । । । +। ।
ম ঋপ ম গ সা নি ধ নি ধ প ম ম ম প
ল ব- দ- নে। হ- রি বোল, হ- রি- বোল, ব- ল শ- য়-

। । । । । । । । ।।।
প প প ধ ম প ম গ
নে, স্ব- প- নে, জা- গ- র- ণে॥

+। । । । । । । । । । । ।
গ গ গ গ গ ম ম প প প প প
(১ম) ত্রি- হি- কে- র সুখ হ' ল- না ব- লি- য়ে,
(২য়) ম- নে ক- র সেই দি- ন ভ- য়- ঙ্ক- র,
(৩য়) ত্য জ্য ক- রে যে দিন যা- বি- রে সং সার,
(৪র্থ) চ- রণ- ব- ল গ- তি নাই হ- রি বি- নে,

+। । । । । । । । । । । ।
প সা নি সা ধ নি প ধ প ম গ গ
তা ব- লে কি নাম র হি- বি ভু লি য়ে,
অ- বশ অঙ্গ যে দিন, হ- ই- বে তো- মা- র,
কো- থায় র- বে তোর পু ত্র প- রি- বা- র,
হ- রি না ম সু ধা পিণ্ড- রে ব- দ- নে,

×।। । ।।। । । । । ।
সা নি ধ নি ধ প ম ম
যাঁর না মে, যাঁর প্রে মে, হ'- লেন
সেই দিন ব- দনে য দি ব- লতে
সং সার অ- সার আঁ- খি মু- দলে
কলি- তে ত- রাতে, হ- রি না ম

+। । । । । । । । । । । ।
ম প প প প ধ ম প ম ম গ গ
শু- ক- দে ব সু খী, না- র- দ- বি- রা- গী-
পা- র না ম, হ- রি পু- রা- বে মন স্কা- ম,
অ- ন্ধ- কা র, ক- র হ রি প দ সা- র,
ব্র- হ্ম- ম- য়, যে জন জা নে রে নি শ্চ য়,

+। ।। ।। । ।।। । ।
গ ম সা নি সা ম ম
ম- হা- দেব যো- গী, বে- ড়ায়
ত- রে যাবে মো ক্ষ ধা ম,
ঘ- দি যাবে ভ- ব পা- র
তা র কি ভ বে ভ- য়,

+									
ম	প	প	প	প	ধ	ম	প	ম	গ
শ্ম-	শা-	নে-	ম	শা	নে,	যো	গ-	ধ্যা-	নে।
তো-	মায়	লবে-	না,	ছোঁ-	বে-	না,	শ	ম-	নে।
রে-	খ	রতি-	ম-	তি	হ-	রির	চ-	র	ণে।
সে-	জন	তরি-	তে	পা	রি	বে	তু-	ফা-	নে।

পিতৃ-ভক্তি।

গগনের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর—উচ্চতর স্থানে যাঁহার পবিত্র আসন; যিনি পরম গুরু স্নেহময়ী প্রেমময়ী জননীদেবীর পূজ্যতম দেবতা; যিনি নিরাশ্রয় বাল্য-জীবনের আশ্রয়; এবং যে স্নেহময় দেবতার অসীম, অপরিমেয় ও অতুলনীয় স্নেহে আহার সাজ সজ্জা বিদ্যাশিক্ষাদি নানাবিধ মঙ্গল লাভ করিয়া আজ আমরা জগতে মানব মানবী বলিয়া পরিচিত হইতেছি; সেই মঙ্গলময় প্রত্যক্ষ দেবতার প্রতি যে কি প্রকার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করা আমাদের কর্ত্তব্য তাহা বর্ণনা করা আমার ক্ষুদ্র শক্তির অতীত। এমন কি আমার এই ক্ষীণ মস্তিষ্ক যে সে বিষয় ধারণা করিতেও নিতান্ত অক্ষম ইহা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। যে পিতা অপত্য-স্নেহের বশীভূত হইয়া নিজের ক্লেশের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া, সন্তানকে সুখী, ধনী, মানী, জ্ঞানবান্, বুদ্ধিমান্ ও যশোগৌরবে বিভূষিত দেখিয়া আত্মহারা হইয়া আপনাকে সুখী ও ধন্য জ্ঞান করেন; সেই দয়াময়ের প্রতি যে কি প্রকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য তাহা অবধারণ করা আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধির অসাধ্য। পিতা যে অপত্য-বিচ্ছেদ শোকের বশীভূত হইয়া নিজ জীবন দিতেও অপ্রস্তুত নহেন, তাহা আমরা মহারাজ দশরথের অকাল-মৃত্যুতে বেশ অনুভব করিতে পারি। এমন যে স্নেহাধার পিতা; আমরা অধম, আমরা কি তাঁহার স্নেহরসের একধারারও ধার শুধিতে পারি? পিতা যে কি পরম বস্তু; আমরা অন্ধ, আমরা কি তাহা চিনিতে পারি? আমরা কি সেই দেবতার মহত্ত্ব অনুসরণ করিয়া চলিতে পারি; না তাঁহার প্রীতি বর্দ্ধনের নিমিত্ত তাঁহার প্রতি যথোপযুক্ত প্রেম বা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে যত্নবান্ থাকি? এই মহাপুরুষের মহিমা কীর্ত্তন করা মত্তুল্য জ্ঞানহীনা অবলা জনের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব এবং এই পিতৃভক্তি বিষয়ক রচনা কি এই সামান্য ভক্তিহীনা মানবীর নির্জ্জীব লেখনী প্রকাশ করিতে পারে? পরম ভক্ত না হইলে কি কেহ ভক্তিতত্ত্ব প্রকাশ করিতে

সমর্থ হয়? ভক্তির বলেই ধ্রুব প্রহ্লাদের নিকটে হিংস্র জন্তুগণও শান্তভাব ধারণ করিয়া তাহাদের শুভাকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল; আর সেই ভক্তি এবং বিশ্বাস বলেই তাহাদের ঈশ্বর দর্শন লাভ হইয়াছিল। এই ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া দেবর্ষি নারদ বীণাসহযোগে হরিগুণগাথা গাহিতে গাহিতে ভক্তিতেই উন্মত্ত হইয়া আপনার হীনতা ও বীণার শ্রেষ্ঠতা অনুভব করত নির্জ্জীব বীণাকে সজীব ভাবিয়া বীণার নিকটে ভক্তিতত্ত্ব জানিতে চাহিতেন। আর বিশ্বাস এবং ভক্তির প্রভাবেই নারদ সামান্যা দাসীপুত্র হইয়াও আজ দেবপুত্র বলিয়া সংসারে পূজিত। বৈষ্ণবেরাও বলিয়া থাকেন "ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর"। তাহাতেই বলি আমরা পিতৃভক্তির বিষয় মুখে হাজার বক্তৃতা করি, কিম্বা সুদীর্ঘ সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখি না কেন, "পিতা যে পরম দেবতা, ইহা বিশ্বাস ভিন্ন ও পিতার প্রতি ঐকান্তিক ভক্তি ভিন্ন," গোপরাণীর সামান্য রজ্জুদ্বারা গোপাল বন্ধনের ন্যায় দুই অঙ্গুলি ফাঁক থাকিবেই থাকিবে। বিশ্বাস এবং ভক্তি উভয়ের একত্র যোগ ভিন্ন, কেবল বিশ্বাস কিম্বা কেবল ভক্তিদ্বারা যে আমরা সেই পরম পিতাকে পাইতে পারি না, ইহা দেখাইবার নিমিত্তই যে, আমাদের পূর্ব্বতন সুচতুর আর্য্যঋষিগণ বিশ্বাসরূপিণী যশোদা, ও ভক্তিরূপিণী দেবকীর গর্ভে এক কৃষ্ণ দুই অংশে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, ইহা বুঝিতে পারা যায়। অতএব বিশ্বাস ভক্তির যোগ ভিন্ন যখন পূর্ণ প্রেমের আবির্ভাব হয় না, তখন আমরা অবিশ্বাসী এবং ভক্তিহীনা, সুতরাং প্রেমহীনা হইয়া প্রেমময় পিতার প্রতি কি প্রকার ভক্তি সম্ভব, তাহা কিরূপে সম্যক্ উপলব্ধি করিব? আমরা অবিশ্বাসী বলিয়াই ত নিয়ত শুনিতে পাই পিতার ভর্ৎসনায় কত সন্তান আপনাকে অপমানিত জ্ঞান করিয়া নানাপ্রকারে আত্মহত্যা করিয়া মনের দুঃখ দূর করিতে সচেষ্ট হইয়া থাকে। যদি আমাদের হৃদয়ে একবিন্দু বিশ্বাস কিম্বা ভক্তি থাকিত, তাহা হইলে অবশ্যই বুঝিতে পারিতাম যে পিতা আমাদেরই মঙ্গলের নিমিত্ত ভর্ৎসনা করেন অথবা শাস্তি দিয়া থাকেন। আমরা অবিশ্বাসী অন্ধ বলিয়া নিজের দোষ দেখিতে না পাইয়া মঙ্গলময় পিতাকেই কেবল শাস্তিদাতা ভাবিয়া অশান্তিতে ডুবিয়া যাই। আমাদের এই অন্ধতা ও অজ্ঞতা স্মরণ করিয়াই "ত" মহর্ষি বাল্মীকি বেদব্যাস প্রভৃতি ভবিষ্যৎজ্ঞানী মহাপুরুষগণ ভারতের পূর্ব্বতন ইতিহাসে পিতৃভক্তির জাজল্য প্রমাণ অঙ্কিত করিয়া নর নারীর অশেষ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীরাম, পুরুরাজ, ভীষ্মদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণের পিতৃভক্তির জলন্ত দৃষ্টান্তে আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয় স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া যায়। শ্রীরাম চন্দ্রের হস্তগত রাজ্য ঐশ্বর্য্য ত্যাগ করিয়া বনবাস আশ্রয়,

পুরুরাজের নিজের যৌবন দিয়া পিতার জরা ভার গ্রহণ এবং ভীষ্মদেবের অমানুষিক স্বার্থত্যাগ দেখিয়া আমরা হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মানবের অলৌকিক ক্ষমতা স্মরণ করিয়া, সেই সমস্ত অতীতের কথা আমাদের পক্ষে উপন্যাস বলিয়া বোধ হয়, অথবা তাঁহাদের কার্য্য সমূহকে আমরা দেবলীলা বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকি। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে যদি আমরা একান্ত বিশ্বাস ভক্তির সহিত "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ। পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ।" ইহা ভাবিতে পারি, তাহা হইলে পিতার প্রীতির নিমিত্ত আমাদের কোন কার্য্যই অসাধ্য বোধ হয় না। তখন সর্ব্বময় দেবতা পিতার প্রিয়কার্য্য সাধনার্থে জীবন যাক্ বা থাক্ সে জ্ঞান থাকে না; তখন পিতৃ আজ্ঞা পালনেই স্বর্গসুখ মনে হয়। পিতৃভক্তিপরায়ণ সন্তানের পক্ষে এ কার্য্য করিব কি না, ইহাতে আমার পক্ষে মঙ্গল কি অমঙ্গল ঘটিবে তাহা চিন্তা করিবার অবকাশ থাকে না; পিতৃ-আজ্ঞাই তাঁহার প্রতি ঈশ্বরাদেশ স্বরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সন্তান বুঝেন যে পিতাকে প্রীতিযুক্ত রাখিতে পারিলে, পরম পিতা পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন। অতএব যদি এই জাগতিক পিতার প্রীতিতেই সেই জগৎপিতার সন্তোষ সাধন হইল, তখন পিতার আদেশ হাজার দুরূহ হউক না কেন, তাহার বিচার না করিয়া সর্ব্ব স্বার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অগ্রে তাহা পালন করা আমাদের পক্ষে একান্ত কর্ত্তব্য কার্য্য হইতেছে।

এস্থলে অনেকে বলিতে পারেন যে, যদি কোনও পিতার অসাধু কার্য্যই প্রিয় হইয়া থাকে, তবে তাহাও কি দেবাদেশ বলিয়া তৎক্ষণাৎ প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য? এরূপ জিজ্ঞাস্য স্থলে বলা আবশ্যক যে, সে স্থলে সর্ব্বকার্য্য পরিত্যাগ করিয়া যতক্ষণ পিতার সেই অসাধু ইচ্ছা দূর না হয়, ততক্ষণ প্রাণপণ চেষ্টায় ধীর স্থিরভাবে ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত যুক্তি প্রদান দ্বারা পিতার চিত্তের মলিনতা মুছিয়া দেওয়া যে পিতৃভক্ত সন্তানের একান্ত কর্ত্তব্য তাহা অনেকেই বুঝিতে পারেন। মানব মাত্রেরই সময়ে সময়ে ভুল, ভ্রান্তি ভ্রম, প্রমাদ বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ পাইয়া থাকে। এরূপ স্থলে ধীরমনে এবং সুবিবেচনার সহিত পিতার আজ্ঞা পালন করা বুদ্ধিমান্ সন্তানের নিতান্ত আবশ্যক। আর পিতৃভক্তি বলিতে কেবল যে সর্ব্বদা পিতার মন যোগাইলেই পিতৃভক্তি সম্পন্ন হইল, আমরা তাহা বলিতে পারিনা। কিন্তু "পিতরি প্রীতিমাপন্নে" বলিতে কেবল যে কার্য্য করিলে পিতার আত্মার প্রীতি জন্মে, যাহাতে পিতার ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল কামনা সাধিত হয়, সেইরূপ কার্য্য করাকেই আমরা বাস্তব পিতৃভক্তি বলিয়া বুঝিতে পারি; আর তাহাতেই সর্ব্বদেবতা প্রীতিযুক্ত হইয়া থাকেন। ইহা দ্বারা স্পষ্টই

বুঝা যাইতেছে যে এক পিতৃভক্তি হইতে সেই সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান বিশ্বময় দেবতা সন্তুষ্ট হয়েন, সুতরাং তাহাতে সন্তানেরও ঐহিক পারত্রিক সর্ব্ব বিষয়ে মঙ্গল হইয়া থাকে। আর পিতৃভক্ত সন্তানের গুণে পিতারও পরম পদ লাভ হইয়া থাকে। পিতৃভক্ত সুজ্ঞানপরায়ণ সন্তানের গুণে যে পিতা মাতার সদ্গতি হইতে পারে, কপিল দেব, প্রহ্লাদ প্রভৃতি হইতে তাহা আমরা জানিতে পারি। (ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

আজি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা ভগবানের কৃপায় আমার জীবনে এক শুভ বা সুখস্মরণীয় দিন আসিয়াছে। তাই এমন দিনে আমি আমার স্নেহময়ী দেশীয়া ভগিনীকে আমার হৃদয়ের গভীর প্রীতি উপহার দিতেছি, ভরসা করি তিনি ইহা গ্রহণ করিবেন—তাঁহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীকে অধিকতর সুখী করিবেন।

আজিকার দিন "আমার জীবনের এক শুভ বা সুখস্মরণীয় দিন" কিসে, সেই কথা আগে বলিতেছি। আজি কালি ইংরাজ রাজের রাজত্বে আমাদের রেলের গাড়ী, কলের জাহাজ, তারের খবর, ডাকঘর প্রভৃতি (আমাদের ভারতবাসীর জীবনে) যুগযুগান্তরের অভিনব পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। ইংরাজরাজের প্রসাদেই বহুদূরবর্ত্তী দেশ সকল ক্রমশঃ কাছাকাছি হইয়া পড়িতেছে। এই সুবিধার জন্য ভগবানের ভক্ত সন্তানেরা অল্পায়াসেই স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ করিয়া ভগবৎসৃষ্ট সুন্দর, মহৎ ও অপূর্ব্ব দৃশ্য সকল দেখিতে পাইতেছেন; চক্ষের সফলতা, জ্ঞানের তৃপ্তি এবং ভক্তির প্রবলতা লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইতে পারিতেছেন। এই সকল কারণে অপরিচিত স্থান, সমুদ্র, পর্ব্বত প্রভৃতি দেখিবার সাধ আমার মনে বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল। কিন্তু মনের সাধ "বহুদিন হইতে বড়ই প্রবল" হইলে কি হয়, এ কে—সৌভাগ্যই বল আর দুর্ভাগ্যই বল, আমি বঙ্গবাসিনী।—অনেক বঙ্গবাসিনীর মত আমার সঙ্গেও বিনা কৈফিয়তে চন্দ্র সূর্য্য সব সময়ে সাক্ষাৎ করিতে পারেন না, তার পরে আরও নানারকম অসুবিধা, সুতরাং আমার পক্ষে "স্বদেশ ও বিদেশ ভ্রমণ" কতদূর সম্ভব, তাহা আমার স্বদেশীয়া, সহৃদয়া ভগিনীকে খুলিয়া বলা বাহুল্য মাত্র। তিনি মনে মনেই সব বুঝিতে পারিতেছেন, সন্দেহ নাই।

কিন্তু আমার পাঠিকা ভগিনী যাহাই মনে করুন আর আমি যাহাই মনে করি, এজগতে ভগবানের ইচ্ছা হইলেই "অসম্ভব" সম্ভব হইয়া পড়ে। তাই দেশভ্রমণটা দৃশ্যতঃ আমার পক্ষে যতই অসম্ভব

হউক না কেন, ভগবানের কৃপাতেই আমি কার্য্যতঃ বাসভূমি হইতে অনেক দূরে আসিয়া পড়িয়াছি। বিঘ্নহারী দেবতা আমার সহস্র বিঘ্ন কাটিয়া, সত্যসত্যই আমাকে বাঙ্গালার প্রেসীডেন্সী বিভাগ হইতে ছোটনাগপুর বিভাগ পর্য্যন্ত লইয়া আসিয়াছেন!—যে সকল ভগিনী বঙ্গদেশ হইতে বহুদূরে বাস করেন. তাঁহারা বোধ হয় আমার এই "ভ্রমণ বিবরণে" হাসি থামাইতে পারিতেছেন না; কিন্তু আমি এতদিন হাওড়ার ষ্টেশন পর্য্যন্ত কথনই দেখি নাই, তাই এই টুকু আসিয়াই আমার মনে বিদেশ ভ্রমণের সুখ অনুভূত হইতেছে।

এ পত্রে যাহা কিছু লিখিব মনে করিতেছি, সে সব লিখিবার আগে একটী ক্ষুদ্র ঘটনা (?) আমার মনে জাগিতেছে, পাঠিকা ভগিনীকে অনুগ্রহ করিয়া সেই কথাটী আগেই শুনিতে হইবে। কথাটী বিশেষ কিছু নয়; যে দিন পশ্চিমে আসিবার জন্য প্রথম হাওড়ার ষ্টেশনে প্রবেশ করিলাম, আত্মীয় স্বজনদিগের বিচ্ছেদ এবং পশ্চিম ভ্রমণের আনন্দে হৃদয়ে একটী মিশ্রিত সুখ দুঃখের ছায়া পড়িয়াছিল, প্রাণের ভিতর কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাব জড়াইয়া গিয়া যে দিনটী স্মৃতিপটে চিরদিনের জন্য আঁকিয়া রাখিতেছিল, (আমাদেরই জন্য ব্যথিত) একটী বালকের সুকুমার বিষাদক্লিষ্ট মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া চক্ষে অনাহূত অশ্রু আসিয়াছিল, সেই দিনে—সেই মধুমাখা বিষাদের দিনে, আমরা অভিভাবকের নির্দ্দিষ্ট স্ত্রীলোকের গাড়ীতে উঠিলাম। সে গাড়ী "রিজার্ভ" করা হয় নাই. সেজন্য তুইটী হিন্দুস্থানী মহিলাও আমাদের অধিকৃত গাড়ীতে উঠিলেন। তাঁহাদের মধ্যে .এক জনের বেশভূষায় তাঁহাকে একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা এবং অপরা তাঁহার পরিচারিকা অনুমিত হইল।—শুনিতে পাই এখনকার দিনে বিশেষ কারণ ব্যতীত অপরিচিত ব্যক্তির সহিত আলাপ করা "বিশেষ অসভ্যতার" মধ্যে পরিগণিত। আমার হিসাবে সামাজিক স্ত্রী ও পুরুষে এইরূপ নিয়ম থাকাই আবশ্যক; কিন্তু রমণীর কাছে রমণীর মুখ চুপ করিয়া থাকিবে কি করিয়া? আমার পাঠিকা ভগিনী বর্ত্তমান আইন কানুন দেখিয়া যাহাই বলুন, রেলের গাড়ীতে আমার অধিকৃত ঘরে, স্ত্রীলোক দেখিলেই আমার কথা কহিবার প্রবৃত্তি বড় প্রবল হয়, এবং সে প্রবৃত্তি আমি যথাসাধ্য "অনুশীলন" করিয়া থাকি। সুতরাং এই তুইটী হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গেও কিছুক্ষণের মধ্যে আমার আলাপ হইয়াছিল।

ইতি পূর্ব্বে প্রয়োজন বশতঃ কয়দিন শরীরের উপরে কিছু "নিষ্ঠুরতা" করিতে হইয়াছিল, সম্ভবতঃ সেই জন্য কোন্নগর ষ্টেশন পার হইতে না হইতে আমার শরীরে প্রবল জ্বর আসিল। শরীরের যাতনার সহিত আমার মনেও দারুণ

অভাব অনুভূত হইতে লাগিল—যেখানে জ্বরে স্নেহময়ী মা'র স্নেহমাখা সেবা না মিলে, আত্মীয় বন্ধুদিগের "আহা" না মিলে, পীড়িত আমার জন্য একটী স্নেহার্দ্র হৃদয়ের কাতর উষ্ণ নিশ্বাস না মিলে, সেখানে জ্বর হইলে, আমার যেন শতগুণ যাতনা হইতে থাকে। তাই শরীরের জ্বর অপেক্ষা মনের অসুস্থতা সেদিন আমার বড়ই বেশী বোধ হইল। কিন্তু প্রিয় ভগিনি, বলিব কি? সেই হিন্দুস্থানী মহিলাদ্বয় সত্য সত্যই আমাকে মাতার মত স্নেহে, ভগিনীর মত যত্নে শুশ্রূষা করিয়াছিলেন; তাঁহাদের নিকটে সেই অযাচিত স্নেহ মমতা পাইয়া আমার মন কৃতজ্ঞতা স্রোতে ভাসিয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের জন্য আমার সকল অভাব দূর হইল; সেই মুহূর্ত্তে আমার মনে হইল —জ্বলন্ত সত্যের মত আমার মনে হইল এজগতের মূলবন্ধন দয়া, সহানুভূতি। সেই দয়া ও সহানুভূতির খনি প্রধানতঃ রমণী-হৃদয়। সুখের দিনে যাহাই হউক, দুঃখের দিনে মানব জগৎ দয়া ও সহানুভূতি পাইবার জন্য প্রধানতঃ রমণীহৃদয়ের প্রতি চাহিয়া থাকে—রমণী হৃদয়ের দয়া ও সহানুভূতিই তাহার সে লালসা পরিতৃপ্ত করিয়া থাকে। একজন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কি ফাদার দামিয়েনের দয়া, শত সহস্র সাধারণ রমণীর দয়া হইতে শ্রেষ্ঠতর হইলেও, দয়া প্রধানতঃ নারী-হৃদয়ের সম্পত্তি। আমি ভগবানের চরণে প্রার্থনা করি, ভগবানের প্রদত্ত—আমাদের মা বিশ্বজননীর প্রদত্ত দয়ারূপ অমূল্য রত্নের সদ্ব্যবহার, এই হিন্দুস্থানী মহিলা দুইটীর মত আমরাও যেন করিতে পারি; ইঁহাদের দয়া ও স্নেহে আমার সন্তপ্ত হৃদয় যেমন আরাম লাভ করিল, আমরা সকলেই যেন পরের সন্তপ্ত হৃদয়ে এমনি আরাম ঢালিতে পারি —ইহাই রমণী জীবনে এক প্রধান সুখ! আমি প্রবাসের পথে, ভগবতী বিশ্বজননীর কৃপায় এই সুশিক্ষা লাভ করিলাম আর আমার স্নেহময়ী ভগিনী বামাবোধিনীর অনুগ্রহে লব্ধ জ্ঞান টুকু পাঠিকা ভগিনীর কাছে বলিয়া কৃতার্থা হইলাম।

(ক্রমশঃ)

পুস্তকাদি সমালোচনা।

১। যুগান্ত—সামাজিক উপন্যাস, শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রি-বিরচিত, মূল্য ১।০ আনা। এই পুস্তকখানি প্রায় ৩০০ পৃষ্ঠা পরিমিত, অতি সরল সুমিষ্ট ভাষায় লিখিত এবং ৫০ বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের পরিবারে ও সমাজে যেরূপ অবস্থা ছিল, তাহার বিবিধ চিত্রে পরিপূর্ণ। ইহা পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া ছাড়িতে ইচ্ছা হয় না এবং এতৎপাঠে পাপ ও দূষিত দেশাচারের

প্রতি ঘৃণা এবং সাধুতা ও সমাজসংস্কারের প্রতি উৎসাহ উদ্দীপিত হয়। বস্তুতঃ শাস্ত্রী মহাশয় মধুর ভাষায় গল্পচ্ছলে উপদেশ দিবার কৌশল এই সুন্দর গ্রন্থখানি দ্বারা সম্পন্ন করিয়াছেন। ইহা সর্ব্বসাধারণের আদরণীয় হইবে, অবশ্যই আশা করা যায়।

২। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি এ সম্পাদিত, মূল্য ১৲ টাকা। সম্পাদক একটী সুন্দর সুদীর্ঘ ভূমিকা এবং টীকা ও বঙ্গানুবাদসহ গীতা গ্রন্থ প্রচার করিয়া ধর্ম্মসাহিত্যজগতের বিশেষ উপকার সাধন করিয়াছেন। বঙ্গানুবাদ রামায়ণের সুপ্রসিদ্ধ অনুবাদক পণ্ডিত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্নকৃত। গীতার প্রকৃত মর্ম্ম পাঠকদিগের হৃদ্গত এবং এতৎসম্বন্ধীয় অনেক প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য সম্পাদক যেরূপ পরিশ্রম করিাছেন, তজ্জন্য তিনি সর্ব্বসাধারণের বিশেষ ধন্যবাদার্হ।

৩। গুরু ও সাধনতত্ত্ব—শ্রী কালীনাথ দত্ত প্রণীত, মূল্য ৷৷৹ আনা। এই গ্রন্থে গ্রন্থকার ধর্ম্মসাধন ও ভক্তিতত্ত্বের অতি গভীর বিষয় সকল যেরূপ সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার পাণ্ডিত্য ও ধর্ম্মাভিজ্ঞতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। তবে এরূপ বিষয় সাধারণের বোধগম্য হইবার নহে। যাঁহারা শ্রমশীল সত্যানুসন্ধ্যায়ী, ইহা হইতে অনেক সত্য লাভ করিতে পারিবেন।

৪। রঘুবংশ, দ্বিতীয় ভাগ শ্রীনবীনচন্দ্র দাস এম, এ, প্রণীত। আমরা ইতিপূর্ব্বে ইহার প্রথম ভাগের সমালোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে যে অন্তরের ধন্যবাদ দিয়াছি, এবারে তাহা আরও শতগুণে না দিয়া থাকিতে পারি না। মহাকবি কালিদাসের অতুলনীয় গ্রন্থ বঙ্গীয় পরিচ্ছদে শোভাহীন হয় নাই একথা আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি। যেরূপ সুললিত কবিতায় অনুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে ইহা অনুবাদ বলিয়াই বোধ হয় না, আমাদের প্রিয় কবির কবিত্বের ইহা সামান্য প্রমাণ নহে। উদ্ধৃত কবিতাদি সংযোগে গ্রন্থখানি আরও উপাদেয় হইয়াছে।

নূতন সংবাদ।

১। গত ৯ই মার্চ্চ কালা বোবা বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় বার্ষিক পারিতোষিক মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে ; হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সভাপতির কার্য্য করেন এবং অনরেবল সার আলেকজণ্ডর মিলার, বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি মহো-

দয়গণ বক্তৃতা করেন। ছাত্রদিগকে মেডাল ও বিবিধ মনোরম বস্তু পারিতোষিক দেওয়া হইয়াছে।

২। মহারাজা সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি কল্পে ১৫০০০ টাকা দিয়াছেন।

৩। বিবি আনি বেসান্ট কলিকাতার নানা স্থানে সুন্দর বক্তৃতা করিয়া সাধারণের প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

৪। আগামী গ্রীষ্মকালে রুষীয় সম্রাট্ সপত্নীক ইংলণ্ডেশ্বরীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

৫। সার চার্লস ক্রুস ওয়েট্ ষ্টেট সেক্রেটরীর কাউনসিলের মেম্বার নিযুক্ত হওয়াতে সার আণ্টনী ম্যাক্‌ডোন্যাল্ড উত্তর পশ্চিমের ছোট লাট হইলেন, সার আলেকজাণ্ডার মেকেন্‌জি বাঙ্গালার ছোট লাট হইবেন।

৬। সার টি মাথুস্বামী অনেক টাকা রাখিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে ২০০০০ টাকা দাতব্যে ব্যয় হইবে।

৭। অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু বিনা তারে তাড়িত চালাইবার কৌশল আবিষ্কার করিয়াছেন ইহা ঠিক হইলে বাঙ্গালীর বড় গৌরব।

৮। বিয়ানা নগরের জোসেফ ট্রেল্ নামক এক বৃদ্ধ ৯১ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিয়াছেন, মৃত্যুকালে তত্রত্য বিজ্ঞান মন্দিরের সাহায্যার্থ প্রায় ৪৫০০০০০ লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন।

৯। চীন জাপানীগণের মধ্যে সম্প্রতি একটী যুদ্ধ হয় তাহাতে চীনদিগের ২০০০০ জাপানীদিগের ১৯৬ জন সৈন্য হত হইয়াছে। জয় জাপানীদিগেরই।

১০। মাতাজী প্রতিষ্ঠিত মহাকালী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য বিশ্ববিদ্যালয় গৃহে সম্পন্ন হয়। এই বিদ্যালয়ের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি হউক আমাদের এই প্রার্থনা।

১১। রামপুরের নবাব আউডের বালিকা বিদ্যালয়ে ৪০০০ টাকা দান করিয়াছেন।

১২। প্রধান রাজমন্ত্রী লর্ড রোজবেরী উৎকট পীড়াক্রান্ত। তাঁহার পীড়ার একটু উপশম হইতেছে, ঈশ্বর কৃপায় সম্পূর্ণ আরোগ্য হউন।

১৩। রায় সূর্য্যমল ঝুমুঝুমওয়ালা বাহাদুরের মৃত্যু হইয়াছে। ইনি একজন ধন-কুবের ছিলেন এবং সৎকর্ম্মে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছেন।

বামারচনা।

বসন্ত কোকিল।

রজত জ্যোছনা-বাস ধরণীর তলে
গুটায়ে যামিনীনাথ ল'য়ে তারা দলে।
পাণ্ডুল বরণ ধরি
নভস্তল শূন্য করি
ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে যায় অস্তাচলে

সে সময়ে পিকবর
তোমার মধুর স্বর
ছড়ায়ে অমিয় রাশি মরতের তলে;
দিগন্ত কাঁপায়ে মহাশূন্যে ভেসে চলে।

তরুণ অরুণ রাগ উষার মাথায়,
ধীরে ধীরে সমীরণ
বুলি বুলি ফুল বন
ফুল সনে খেলা করি সৌরভ ছড়ায়,
ফুলের ভূষণ অঙ্গে
ধরণী পরেন রঙ্গে,
উষার মোহিনী মূর্ত্তি জগৎ হাসায়,
তখন ভাসাও বিশ্ব সঙ্গীত-ধারায়।

৩

প্রখর ভানুর করে তাপে ধরাখান,
তাপিত ধরণীবাসী
উত্তপ্ত বালুকা রাশি
রৌদ্রের প্রতাপে প্রাণ করে আন চান,
হইতে গেহের বা'র
পরাণ চাহেনা আর,
তুমি কিন্তু তরুকুঞ্জে খুলি মনঃপ্রাণ,
গাহিতেছ কলকণ্ঠে সুমধুর গান।

৪

সম্বরি কিরণমালা ভানু অস্তে যায়,
ধরণী শীতল যবে সুস্নিগ্ধ ছায়ায়;
নবীন পল্লব গুলি
বায়ুভরে হেলি দুলি
ঝর ঝর করিতেছে শাখায় শাখায়
নীল আকাশের গায়,
রক্তিম বরণ ভায়,
দুএকটী তারা উঠি মিটি মিটি চায়,
সুখে তুমি গাও সেই মোহিনী সন্ধ্যায়।

৫

সুপ্ত ধরা পূর্ণিমার গভীর নিশায়
সুষুপ্ত জগৎ জন
কার্য্য ত্যজি অচেতন
ভুলি যত্ন, চেষ্টা, প্রেম, স্নেহ মমতায়,
কেবল গগন তলে
অগণ্য তারকা জ্বলে
তার মাঝে জাগে শশী অতুল শোভায়,
আর জাগে সমীরণ
জাগে ফুল্ল ফুলবন
বাসন্ত জ্যোছনা সুখে মাখি সর্ব্ব গা'য়;
তোমার মধুর স্বরে
নীরবতা ভঙ্গ ক'রে
সুষুপ্ত ধরণী খানি যতনে চিয়ায়,
মাতাও জগৎ সেই গভীর নিশায়।

৬

এ আনন্দ রাশি কোথা পেলে পিকবর!
বিষাদ কালিমা রেখা
যদ্যপি থাকিত লেখা
স্মৃতি পটে, থাকিত না সুমধুর স্বর,
তুমি সদানন্দ চিত,
আমি শত ভয়ে ভীত,
সংসার আবর্ত্ত মাঝে কাঁপি থর থর,
এই উঠি এই পড়ি
ভাগ্য সনে জড়াজড়ি
করিয়া কাটাই কাল হীন ক্ষুদ্র নর,
আশা ও নিরাশা দুটী
সদা করে ছুটা ছুটী
হাসি অশ্রু, সুখ দুঃখ চির সহচর,
সংকীর্ণ অন্তরে বাঁধি আসক্তির ঘর।

৭

জগতে তুষিতে তুমি ধরেছ জীবন,
তুমি সাধু মহাপ্রাণ,
বসন্তে মধুর গান
গাহিয়া করহ তুমি সুধা বরিষণ,
যদিও অল্পায়ু ধর,
তবু ওহে পিকবর,
দীর্ঘ আয়ু চেয়ে তব সুখের জীবন!
(আমি) দীর্ঘ-আয়ু তব ঠাঁই
ও গুণ শিখিতে চাই,
কি করিলে হবে মন তোমার মতন,
বিনাশি কুচিন্তা রাশি
সদানন্দ-নীরে ভাসি
যত দিন বাঁচি সুখে কাটাব জীবন।
সুন্দর মধুর গীতি
গাহি সুখে নিতি নিতি
সুধাস্বরে পিকবর! তোমার মতন
বিশ্বজন মন প্রাণ করিব হরণ। কু, রা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

BAMABODHINI PATRIKA.

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।"

কন্যাকে পালন করিবেক ও যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক।

৩৬৩ সংখ্যা | চৈত্র ১৩০১—এপ্রেল ১৮৯৫। | ৫ম কল্প। ৩য় ভাগ।

সাময়িক প্রসঙ্গ।

বেথুন কলেজের পারিতোষিক—গত ২৩এ মার্চ্চ বেথুন কলেজের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। সার আলেকজণ্ডর মিলার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পত্নী স্বহস্তে পারিতোষিক বিতরণ করেন।

দান—(১) ডুমরাওনের মহারাণী লেডী ডফারিণ ফণ্ডে ২০০০ টাকা দান করিয়াছেন, এই টাকায় ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের ছাত্রীদিগের জন্য গৃহ প্রস্তুত হইবে। (২) বাবু কৈলাসচন্দ্র মুখোপাধ্যায় নদীয়া জেলার বেলগড়িয়া গ্রামে এক চিকিৎসালয় স্থাপনজন্য ২৮ হাজার টাকা দান করিয়াছেন। (৩) জেমস্ ডিলওয়ার্টা মৃত্যুকালে প্রায় ২০ কোটী টাকা রাখিয়া গিয়াছেন, ইহার অধিকাংশ নিউজিলাণ্ডে দরিদ্র বালকদের জন্য এক বিদ্যালয় স্থাপনে ব্যয়িত হইবে।

বসন্তের নিবারক—এবার ফাল্গুন চৈত্রে কলিকাতায় বসন্তে মৃত্যুসংখ্যা সপ্তাহে একশত হইতে দেড় শতের উপর উঠিয়াছে, সহরময় আতঙ্ক, স্কুল কলেজ তাড়াতাড়ি বন্ধ হইতেছে। গত ২০।২৫ বৎসরের মধ্যে এরূপ বসন্ত-মারীভয় দেখা যায় নাই। এই রোগ হইলে চিকিৎসা নাম মাত্র, যে বাঁচিবার বাঁচে, মরিবার মরে। কিন্তু ইহার নিবারণের কয়েকটী উপায় অনেক ফলপ্রদঃ—(১) ভ্যাক্সিনেসন বা গোবীজে টীকাদান, (২) ভ্যাক্সিনিয়স, (৩) ল্যাক্‌টস টিংচুরা এই দুই হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, (৪) কণ্টিকারীর শিকড় গোলমরীচের সহিত বাটিয়া খাওয়া।

ফাঁসীদণ্ড রহিত—আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম ফাঁসীদণ্ডের অসভ্য ও নিষ্ঠুর প্রথা স্পেনরাজ্য হইতে উঠিয়া গিয়াছে। সভ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের এ কলঙ্ক দূর হওয়া উচিত।

লেডি ডফারিণ ফণ্ড—গত ১রা চৈত্র ডফারিণ ফণ্ডের দশম সাম্বৎসরিক সভাধিবেশন হয়। গত ১০ বৎসরে এই ফণ্ডের সাহায্যে প্রায় ৩০ লক্ষ বালক ও বালিকার চিকিৎসা হইয়াছে, ১৭॥ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভারতের নানাস্থানে ৭০ টী হাঁসপাতাল স্থাপিত হইয়াছে এবং ১০০ জন স্ত্রী ডাক্তার এই সকল হাঁসপাতালে চিকিৎসা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। এতদ্ভিন্ন ২৪০ জন স্ত্রীলোক মেডিকেল স্কুলে শিক্ষা লাভ করিতেছে। কে না এই ফণ্ডের উন্নতি প্রার্থনা করিবে?

জাহাজ ডুবি—একখান স্পেনীয় জাহাজ ঝড়ে জলমগ্ন হওয়াতে সাড়ে চারি শত লোক মারা গিয়াছে।

রাজপ্রতিনিধির শিমলা যাত্রা—রাজপ্রতিনিধি সস্ত্রীক গত ২৯এ মার্চ্চ কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন, আগামী ৬ই এপ্রেল শিমলায় পৌঁছিবেন।

আমিরের ইংলণ্ড দর্শন—অনেক দিনের পর আমিরের ইংলণ্ড দর্শনে মতি স্থির হইয়াছে। ইতিমধ্যে বিলাতে তাঁহার অভ্যর্থনার বিশেষ আয়োজন হইতেছে।

রাজপদচ্যুতি—ভরতপুরের যুবক রাজা প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করাতে গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়াছেন। রাজনৈতিক এজেণ্ট কর্ণেল ফ্রেসার আপাততঃ রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

চীন জাপানের যুদ্ধ—চীন ও জাপানিদের মধ্যে আরও কয়েকটী যুদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে জাপানের জয় ও চীনের পরাজয় হইয়াছে।

আমেরিকায় হিন্দু ধর্ম্ম—স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকায় "বিশ্বজনিতার মন্দির" নামে এক দেবালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া তত্রত্য লোকদিগের মধ্যে হিন্দু-ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন।

বারমেসে। *

কার্পাস,—লাভের উদ্দেশ্যে অধিক পরিমাণে কার্পাসের আবাদের উপযোগী ভূম্যাদি যাঁহাদিগের নাই, তাঁহারাও অঙ্গনের এক পার্শ্বে, বা উদ্যানের বেড়ায় ২।৪টী কার্পাসের গাছ দিয়া রাখিতে পারেন, তাহাতে ঘর ব্যবহারের অনেক উপকার হয়। যাঁহারা লাভের জন্য কার্পাসের আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন,

* বার মাসের চাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ বামাবোধিনীতে প্রকাশিত হইয়াছে। এক্ষণে অতিরিক্ত কয়টী চাসের বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে।

তাঁহাদের অবগতির জন্য কার্পাসের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমরা এই স্থলেই বলিতেছি। যে দেশে যত প্রকার কার্পাস জন্মে, তন্মধ্যে আমেরিকার কার্পাস ও তদুৎপন্ন তুলা সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট; কেননা ঐ দেশে অতি যত্নের সহিত কার্পাসের চাস আবাদ করা হইয়া থাকে। বিশেষ অনুসন্ধানদ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, আমেরিকা হইতে ঐ কার্পাসের বীজ আনয়ন করিয়া যত্নে চাস আবাদ করিলে বিহার, আসাম, সুন্দরবন, উত্তর পশ্চিমাঞ্চল প্রভৃতি স্থানে উত্তমরূপ তুলা জন্মিতে পারে। বালুকা ও চিক্কণ মৃত্তিকা একত্র মিলিত হইলে দোআঁশ মাটী জন্মে। যে ভূমি কিঞ্চিৎ উচ্চ এবং যাহার মাটী দোআঁশ, তাদৃশ ভূমিই তুলা চাসের উপযোগী। কিন্তু অধিক থাকা আবশ্যক। আমেরিকার বীজ বপন করিতে হইলে, বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং অন্যান্য স্থানের বীজ কার্ত্তিক মাসে বপন করিতে হয়। যে ভূমিতে বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে আবাদ করিতে হইবে, মাঘ মাসে গোবরের সার ও বোদ মাটী দিয়া সেই জমি তৈয়ার করিতে হইবে এবং ফাল্গুন মাসে ঐ জমিতে তিন হাত অন্তর দাঁড়া বাঁধিতে হয়। কাপাস গাছের গোড়ায় জল লাগিলে বড় অনিষ্ট হয়, এজন্য দাঁড়ার উপর বীজ রোপণ করিতে হয়। যে ভূমি স্বভাবতঃ পরিশুষ্ক এবং জল হইলেও যাহাতে জল দাঁড়ায় না, সে ক্ষেত্রে দাঁড়া না বাঁধিলে চলে না; কিন্তু ঐরূপ ক্ষেত্রে তুলার আবাদ না করাই ভাল। যাহাহউক বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ দাঁড়ার উপর একটী গর্ত্তে ৩।৪টা বীজ রোপণ করিতে হয়, যদি এক এক গর্ত্তে দুইয়ের অধিক চারা বাহির হয়, তাহা হইলে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী মাত্র চারা রাখিয়া অবশিষ্ট যত্নপূর্ব্বক উত্তোলন করিয়া অন্য স্থানে রাখিয়া দিতে হয়। যে গর্ত্তে কোন বীজই অঙ্কুরিত হইবে না, বা একটী চারাও বাঁচিবে না, ঐ অতিরিক্ত চারা দুইটী করিয়া প্রত্যেক শূন্য গর্ত্তে পুঁতিয়া দিবে। এইরূপে প্রত্যেক গর্ত্তে দুইটী করিয়া চারা বাঁচিয়া গেলে ১০।১২ দিন পরে প্রতি গর্ত্তে একটী মাত্র চারা রাখিয়া অবশিষ্ট গুলি তুলিয়া ফেলিতে হয়। কার্পাসের চারা সকল যতই বড় হইতে থাকিবে, ততই ঘাস ও আগাছা নিড়াইয়া ভূমি পরিষ্কার করিতে হইবে। যদি বেশি ঝড় বৃষ্টি না হয় এবং জমি ভাল হয়, তাহা হইলে কার্পাস গাছে তিন মাসে ফুল ধরে। আশ্বিন মাসের প্রথম হইতেই কাপাসের ফল তুলিতে আরম্ভ করিবে। যদি নিয়মিত কালের মধ্যে গাছের বেশি তেজ হওয়ায় ফুল ফলের ব্যাঘাত ঘটে, তাহা হইলে প্রত্যেক গাছের ২।১টী উপশাখা ও ডাল কাটিয়া দিতে হয়। তাহাতে গাছের তেজোহ্রাস হইয়া শীঘ্র ফুল ফল জন্মে।

ফলের মুখ স্ফুটিত হইবার পূর্ব্বেই গাছ হইতে ফল তোলা উচিত। ফল

তুলিবার কালে তিনটী থলিয়া রাখিতে হয়। ফলগুলিকে উত্তম, মধ্যম, অধম তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তিনটী থলিয়ার মধ্যে রক্ষা করিতে হয়। পরে কিছু দিন রৌদ্রে দিয়া তুলা বাহির করিবে। ফল তুলিবার সময় যেন তাহার সহিত পাতা বা অন্য কিছু মিশাল না হয়। যদিও তুলার চাসে প্রতি বিঘায় অধিক লাভ হয় না, কিন্তু কাটতি বেশি হওয়ায় মোটের উপর অধিক লাভ হইয়া থাকে। তুলার প্রতি চাসে আবাদ খরচ বাদে ১২৲। ১৩৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

আমরা যে তুলার চাস আবাদের কথা লিপিবদ্ধ করিলাম, তাহা আমেরিকার তুলা। তদ্ভিন্ন অন্য প্রকার কার্পাসের চাস আবাদ এই মাসে করিতে হয়। এ দেশীয় কৃষকগণ কার্পাসের চাস আবাদে ঐরূপ পারিপাট্য করে না; করিলে কিন্তু আশাধিক ফল পাইতে পারে।

তুলার চাস আবাদ সম্বন্ধে খনার ২।১টী প্রবাদ আছে; তাহা উভয়বিধ কাপাসের চাস আবাদেই প্রযুক্ত হইতে পারে।

"ঘন সরিষা পাতলা রাই।
নেঙ্গে নেঙ্গে কাপাস যাই॥
কাপাস বলে কোষ্টা ভাই।
জ্ঞাতি পাণি যেন না পাই॥"

সরিষার বপনাপেক্ষা রাইয়ের বপন পাতলা হওয়া আবশ্যক। কার্পাসের বপন বা রোপণ এরূপ বিরলভাবে হওয়া আবশ্যক, যেন এক গাছ হইতে এক গাছের কাপাস সংগ্রহ করিতে এক "নেঙ্গের" অধিক যাইতে না হয়। এক ক্ষেত্রে কাপাসের ও পাট বপন নিষিদ্ধ; কারণ পাটের গাছের জলে কার্পাস-গাছের হানি হয়।

পলাণ্ডু —পলাণ্ডু একটী উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর মসলা বা তরকারী। ভোজন করা যাঁহাদিগের অভ্যাস নাই, তাঁহাদিগের নাসিকার উপর গন্ধ ভাল লাগে না; কিন্তু তরকারী ও মাংসাদির সহিত উহা যাঁহারা নিরত ভোজন করিয়া থাকেন, উহার গন্ধ পাইলে তাঁহাদের মুখ দিয়া লাল পড়ে। ফসলাংশেও ইহা বিলক্ষণ লাভজনক। এই জন্য উহার চাস আবাদের ২।৪টা কথা এই স্থানেই বলিব।

হিন্দুগণ পলাণ্ডুকে অপবিত্র খাদ্য মনে করেন। কিন্তু উহা মৃত্তিকাজাত অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায় এক প্রকার উদ্ভিদের অন্তস্তন কাণ্ড বা কন্দ ভিন্ন অপর কিছুই নহে। তবে উষ্ণদেশবাসিগণের পক্ষে উহা অনিষ্টকর বোধ হয়, এই জন্যই শাস্ত্রে উহার ভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। ফলে এক্ষণে হিন্দুদিগের মধ্যে অনেকেই ঐ নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া পলাণ্ডুর প্রচুর ব্যবহার আরম্ভ করিয়াছেন।

আলু ও কপির ন্যায় পলাণ্ডুর পক্ষেও পলিমাটী উত্তম সার। এই জন্য নদী, খাল, বিলাদির তীরবর্ত্তী ভূমি বা চড়া জমিতে পলাণ্ডুর আবাদ হইয়া থাকে।

যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ড কাষ্ঠহীন ও সরস, সে সকল উদ্ভিদের ক্ষেত্রের নিম্নে বালুকা থাকিলে অনিষ্ট না হইয়া বরং ইষ্টই হয়; কেননা বালুকামিশ্রিত মৃত্তিকা স্বতঃই শিথিল হইয়া থাকে। শিথিল মৃত্তিকাই উক্ত বিধ উদ্ভিদের বিশেষ উপযোগী।

উত্তমরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া আশ্বিনের শেষে, কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথমে ছয় অঙ্গুলি জমির উভয় পার্শ্বে সারিবন্দী করিয়া ছোট পিঁয়াজের এক একটী কলি রোপণ করিতে হয়। গাছগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইলেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে খুঁড়িয়া দিবে। এই খনন এক প্রকার বিশেষ কোদাইলদ্বারা হইয়া থাকে। ঐ কোদাইলের বিস্তার চারি অঙ্গুলির অধিক নহে; উহা কেবল পলাণ্ডুর চাসেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শীতকালে প্রচুর শিশির দ্বারাই উহার পুষ্টি হইয়া থাকে। যদিই কোন কারণে পলাণ্ডু ক্ষেত্র অতিশয় শুষ্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভূমিতে ২।১ বার জল সিঞ্চনের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

পলাণ্ডুর চাসে বিঘা প্রতি ২০৲ টাকা খরচ পড়ে। ঐ খরচ বাদেও এক বিঘার ফসলে ৭০।৭৫৲ টাকা লাভ হইয়া থাকে।

বিগত শতবর্ষে ভারতরমণীদিগের অবস্থা।

(৩৬২ সংখ্যা ৩২৮ পৃষ্ঠার পর)

গত শতাব্দীর প্রথম যুগে ভারতের রাজা ইংরাজ। বিধাতার চরণে সহস্র নমস্কার, ভারত যদিও পরাধীনা হইয়াছে, তথাপি এক সুযোগ্য জাতি ভারত সাম্রাজ্য অধিকার করিয়াছে। যে "লোক-শিক্ষা" আর্য্যগণের পরম ব্রত ছিল—সেই যে ধনী দরিদ্র অভেদে, সেই যে ক্ষুদ্র মহৎ অভেদে, স্ত্রী পুরুষ অভেদে, লোকশিক্ষা প্রচারিত ছিল, সেই "সার্ব্বভৌমিকতা" পূর্ণ শিক্ষা এত দিন ভারতবর্ষে—আর্য্য রাজত্বের পরে এত দিন ভারতবর্ষে, কেহই বুঝিয়াছিল না। তাই বলিয়াছি যে ভারত ঘুমাইয়াছিল—ভারতীয় সমাজ বড়ই অসম্পূর্ণ ছিল।

কিন্তু ভারতসমাজের এ প্রকার অসম্পূর্ণতা বিধাতার ইচ্ছা নহে—বিগত শতাব্দীতে ভারত-মহিলাদিগের অবস্থা আলোচনা করিয়াই আমাদের বিশ্বাস হয় যে, ভারতসমাজের এ প্রকার অসম্পূর্ণতা বিধাতার ইচ্ছা নহে। তাই ইংরাজ পরাধীন ভারতের রাজসিংহাসনে বসিল। সুতরাং যে ক্ষণে ভারতবর্ষ ইংরাজের হস্তগত হইয়াছিল—মোটের উপরে সে ক্ষণ অতি শুভক্ষণ। ভারতবাসী, ইংরাজ-রাজত্বেই নবজীবন পাইল—

আবার মনুষ্যত্ব বুঝিল, আত্মোন্নতির প্রয়োজন বুঝিল, স্বাবলম্বন বুঝিল, জাতীয়তা বুঝিল, স্ত্রী পুরুষের সামাজিক সম্বন্ধ বুঝিল, অনেক দিন যাহা জানিত না, তাহা আবার জানিল। ইংরাজ-রাজ যদি ভারতের উন্নতির জন্য কিছুই না করিয়া থাকেন, তথাপি লোকশিক্ষার জন্য, নারী-হিতৈষণার জন্য, ভারত ইংরাজরাজের নিকটে চির-কৃতজ্ঞ। ইংরাজ রাজত্ব ভারতের সর্ব্বাঙ্গীণ সুখকর না হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজ-রাজ যে ভারত-দেহে জীবনী সঞ্চার করিয়াছেন, ভারতকে গাঢ় নিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছেন এ কথা অনেকেই "সত্য" বলিবেন।

বিগত শতাব্দীর প্রথম যুগের কথা বলিতেছি। ইংরাজ-রাজ রাজত্বের সুশৃঙ্খলার সহিত আগে লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি করেন। ১২০৫ বঙ্গাব্দে মার্কুইস্ অব্ ওয়েলেসলি গবর্ণর জেনেরল হইয়া ভারতবর্ষে আইসেন; তখন ভারতবাসীদিগের জন্য "দশসালা"বন্দোবস্ত স্থায়ী হইয়াছে; অন্যান্য অনেক বিষয়েও ভাল বন্দোবস্ত হইয়াছে। আবার লর্ড ওয়েলেসলির সময়েই মহীশূরের টিপু সুলতান যুদ্ধে নিহত ও মহারাষ্ট্রীয়গণ পরাজিত হওয়ায় বৃটীষ প্রভুত্ব অধিকতর নিরাপদ হইল। তাই এই সময়েই লোকশিক্ষার প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়িল। ভারতের সাধারণ লোকে আর্য্যভাষা সংস্কৃত পড়িত না, হিন্দী ও বঙ্গভাষায় বিদ্যাপতি, জয়দেব, চণ্ডী দাস, গোবিন্দ দাস, বৈষ্ণব কবিগণ, কাশীরাম, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতির সুমধুর কাব্য ছিল বটে, কিন্তু তাহা হইতে সাধারণ লোকের মানসিক শক্তি কিছু মাত্র বিকাস লাভ করিত না। সাধারণতঃ বঙ্গভাষার অবস্থা বড়ই হীন ছিল, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। লর্ড ওয়েলেসলির সময়ে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগের বঙ্গভাষা শিখিবার প্রয়োজনে ও বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতির নিমিত্ত বঙ্গভাষায় কয়খানি গদ্য পুস্তক ও কেরি সাহেবের ব্যাকরণ, অভিধান প্রকাশিত হয়। এই সময়ে কেরি সাহেবের প্রধান উদ্যোগে মুদ্রাযন্ত্রও স্থাপিত হইল। তাহাতে মিশনরি সাহেবদিগের উৎসাহে, পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার মহাশয়ের সাহায্যে রামায়ণ ও মহাভারত ছাপা হয়। এতদ্ব্যতীত এতদিন গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জ্জনরূপ যে নৃশংস প্রথা প্রচলিত ছিল, লর্ড ওয়েলেসলি তাহার নৃশংসতা এদেশীয় লোকদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া, সে প্রথা রহিত করেন।

ওয়েলেসলির কিছুকাল পরে—লর্ড মিণ্টোর সময়ে, ১২১৪ বঙ্গাব্দে (১৮০৭ খ্রীঃ) খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকগণ ভারতবর্ষে ধর্ম্মপ্রচার করিতে প্রবৃত্ত হন। দেশের লোকের সুশিক্ষা এই ধর্ম্ম প্রচারকদিগের এক প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই সকল প্রচারকের উদ্যোগে (লর্ড ময়রার সময়ে) বঙ্গভাষায় প্রথম সংবাদ পত্র "সমাচার দর্পণ" প্রকাশিত হইল।

গত শতাব্দীর প্রথম যুগের শেষভাগে ১২২৪ বঙ্গাব্দে (১৮১৭ খ্রীঃ অব্দ) এ দেশীয় লোকদিগের সুশিক্ষার জন্য কলিকাতায় হিন্দু কালেজ সংস্থাপিত হয়। হিন্দু কালেজ সংস্থাপন জন্য এদেশের অনেক পুরুষই বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এইরূপে ইংরেজেরা ভারতের অভ্যন্তরীণ সংবাদ যতই জানিতে পারিলেন, ভারত মহিলাগণের অবস্থা ততই "শোচনীয়" বলিয়া বুঝিতে লাগিলেন। লোকহিতৈষণায় ইংরেজ সর্ব্বদাই প্রস্তুত, তাই ভারতবাসিনীর জাতীয় অবস্থা উন্নত করিতে তাঁহাদিগের মধ্যে আন্দোলন চলিল। খ্রীষ্টধর্ম্ম প্রচারকেরা ধর্ম্ম প্রচারের সহিত এদেশের পুরুষদিগকে স্ত্রীজাতির দুরবস্থার বিষয় বুঝাইতে লাগিলেন।

এদিকে, পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে এদেশীয় পুরুষগণ অনেকেই নিজেদের সামাজিক অবস্থা অনেক বুঝিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়ে এদেশের স্ত্রীজাতির জীবন যেরূপ বিপদাকীর্ণ ছিল, ইংরাজ রাজত্বে তাহাও দূর হইল। এই সকল কারণে দেশের সুশিক্ষিত পুরুষেরা অনেকেই স্ত্রীজাতির অবস্থার প্রতি মনোযোগী হইলেন। দেশীয় রমণীগণের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া তাঁহারা অনেকেই স্ত্রীজাতির হীনাবস্থা বুঝিতে পারিলেন। স্ত্রীজাতি হীনাবস্থায় থাকিলে যে পুরুষের জাতীয় উন্নতি অসম্ভব, একথা অনেকেরই মনে হইল।—পুরুষ জাতিকে শৈশব, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য, জীবনের সকল সময়েই যাহাদিগের সহিত বিশেষ সংশ্রব রাখিতে হয়, তাহাদিগের জীবন ও চরিত্র উপযুক্তরূপে গঠিত না হইলে, কেবল তাহাদের নিজেদের নহে, পুরুষ জাতিরও সমূহ ক্ষতি, একথা অনেকেই বুঝিলেন। এই সকল বুঝিয়া, দেশীয় পুরুষগণ রমণীর সুখ, দুঃখ, অবস্থা, উপযোগিতা ও কর্ত্তব্য, সকল বিষয়ের অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। এই অনুসন্ধান ফলে, স্ত্রীজাতিকে লেখাপড়া শিখাইয়া তাহাদিগের মানসিক শক্তি পরিস্ফুট করা, তাহাদিগকে সুশিক্ষিতা করা, বহুবিবাহ ও সহমরণ প্রথা রহিত করা, তাঁহাদিগের কেহ কেহ অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়াও বুঝিলেন। বিধাতার করুণ দৃষ্টি তাঁহার অভাগিনী কন্যাদিগের উপরে পড়িল। বিধাতারই কৃপায় ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রথম ফল ফলিল। নারীহিতৈষণার আন্দোলনেই গত শতাব্দীর প্রথম যুগ শেষ হইল অর্থাৎ প্রথম পঁচিশ বৎসর কাটিল।

ইহার পরে দ্বিতীয় যুগের আরম্ভ। প্রথম যুগে নারী জাতির উন্নতির যে আন্দোলন হইতেছিল, দ্বিতীয় যুগে তাহা কার্য্যে পরিণত হইতে আরম্ভ হইল। দেশের সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের অনেকে স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

হিন্দুশাস্ত্রে লিখিত আছে "শ্রেয়াংসি

বহু বিঘ্নানি” একথার সত্যতা বোধ হয় অনেকেই জানেন। এদেশের বামাহিতৈষীগণও প্রথমতঃ শুভ ইচ্ছা সফল করিতে গিয়া পদে পদে বিঘ্ন ও বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে লাগিলেন।

প্রথমতঃ এদেশের লোকদিগকে বামা হিতৈষী ব্যক্তিগণ স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা বুঝাইতে গেলে অনেকে অসম্মত হইল। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে এদেশের লোক শাস্ত্র হইতে দেশাচারকে অধিকতর মান্য করে। তাই হিন্দুশাস্ত্রে “কন্যাপ্যেবং পালনীয়া, শিক্ষণীয়াতি যত্নতঃ” উপদেশ থাকিলেও “মেয়েদের লেখা পড়া দেশে চলিত নাই,” বলিয়া কত ব্যক্তি আপনাদের পরিবারস্থা রমণীগণকে লেখা পড়া শিখাইতে আপত্তি করিল। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে পাছে পুরুষদিগের প্রভুত্ব খাটো হইয়া যায়, এই ভয়ে কত স্বার্থপর, ক্ষুদ্রচেতা ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষার বিরুদ্ধে কুৎসা, বিদ্রূপ প্রভৃতি করিয়া সাধারণের বিতৃষ্ণা জন্মাইতে লাগিল। তৃতীয়তঃ “স্ত্রীলোকে লেখা পড়া শিখিলে বিধবা হয়” এই কথা বলিয়া অনেক রমণী নিজেই লেখা পড়া শিখিতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া বসিলেন।*

সহমরণ ও বহুবিবাহ নিবারণ করিতে গিয়াও প্রথমতঃ বামাহিতৈষীদিগকে হতাশ্বাস হইতে হইয়াছিল। সহমরণ প্রথা আর্য্য ভারত হইতে এদেশে চলিয়া আসিতেছিল। ভারতবাসিগণের ধর্ম্মভাবের সহিতও সহমরণের কতকটা সম্বন্ধ ছিল, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন সহমৃতা বা অনুমৃতা রমণী বহুকাল পর্য্যন্ত স্বামীর সহিত (পরলোকে) স্বর্গভোগ করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত সহমরণ প্রথার জন্য—সহমৃতা সতীর আত্মীয়গণ সমাজে বিশেষ গৌরবান্বিত হইতেন। এই সকল কারণে সহমরণ প্রথা নিবারণ বিষয়ে অনেকেই সম্মত হইলেন না।

বহুবিবাহও আর্য্যভারতের প্রথা। বঙ্গদেশে বল্লাল সেনের সময় হইতে এই প্রথা এতদূর প্রশ্রয় পাইয়াছিল, যে কুলীন ব্রাহ্মণেরা অনেকে কেবল বহু বিবাহের প্রসাদাৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বঙ্গীয় কুলীন কায়স্থদিগের মধ্যেও ইহার প্রাদুর্ভাব বড় সামান্য ছিল না। এতদ্ব্যতীত বহু বিবাহ প্রচলিত থাকায় স্ত্রীজাতির উপরে পুরুষের যে অপ্রতিহত প্রভুত্ব ছিল, পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহাদের

* ভারতের বিদ্যা অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী রমণী মূর্ত্তিতেই পূজিতা; ভারতের আর্য্যমহিলাগণ আদর্শ বিদ্যাবতী; গত পূর্ব্ব শতাব্দীতে রাণী ভবানী, হটী বিদ্যালঙ্কার, শ্যামাসুন্দরী দেবী নানাশাস্ত্রে ও দর্শনবিদ্যায় সুপণ্ডিতা ছিলেন বলিয়া রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর তাঁহার লিখিত স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থে লিখিয়া গিয়াছেন। তবে গত শতাব্দীর দ্বিতীয় যুগে “লেখাপড়া শিখিলে বিধবা হয়” এ সংস্কার, স্ত্রীজাতি কোথা হইতে পাইলেন? কোনও স্বার্থপর পুরুষের উদ্ভাবিত কৌশল নয় তো?

স্বার্থপরতা প্রবল, তাঁহাদের নিকট সে প্রভুত্ব বড়ই "উপাদেয়" বোধ হইত। এই সকল কারণে বহু বিবাহ রহিত বিষয়েও এ দেশের অনেক লোক অসম্মত হইলেন। স্ত্রীজাতির উন্নতি চেষ্টা প্রথমতঃ এইরূপ বিফল হইল।

কিন্তু মনুষ্য শক্তির উপরে এক অজেয় শক্তি আছে; জগতের সকল শক্তি একীভূত হইয়াও এক পলকের জন্য সে শক্তির প্রতিকূলে পরমাণু পরিমিত কাজটীও করিতে পারে না। ঐশী-শক্তির কথা বলিতেছি—(আমরা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে যতটুকু বুঝিতে পারি তাহাতে অনুভূত হয় যে) এ দেশের স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য এই শক্তিই পরিচালিত হইতেছিল; তাই দারুণ বিঘ্ন বাধাতেও বামাহিতৈষীরা পরাজিত হইলেন না—বরং স্ত্রীজাতির উন্নতির নব নব উপায় বিধান হইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

কতকগুলি সুমাতা।

(৪র্থ সংখ্যা।)

৬। মদালসা। রাজমহিষী মদালসা একটী সুমাতা। তাঁহার স্বামীর নাম মহারাজ ঋতধ্বজ। তাঁহার চারিটী পুত্র, তন্মধ্যে রাজর্ষি অলর্কই প্রধান এবং সকলের কনিষ্ঠ। তিনি বাল্যকালেই পুত্রগণকে সংসারের অনিত্যতা এবং ভগবানের নিত্যতার বিষয় উপদেশ দিয়া নিবৃত্তি মার্গ অবলম্বন করাইয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে উপদেশ দ্বারা তিনি তিনপুত্রকে পর্থিব ধনে বিরাগী করিয়া অপার্থিব মহাধনে ধনী করিলেন। তদ্দর্শনে মহারাজ ঋতধ্বজ দুঃখিত হইয়া একদিন মহিষীকে কহিলেন যে, "তুমি এ কি করিতেছ? স্ত্রীলোক মাত্রেই নিজ তনয় ও স্বামীকে নিকটে রাখিতে চাহে। তোমার প্রকৃতিতে ঠিক্ তাহার বিপরীতাচরণ লক্ষিত হইতেছে। যাহা-হউক হে কল্যাণি! রাজ্য, প্রজা ও বংশরক্ষার কারণ কনিষ্ঠ পুত্রকে আমাকে দান কর।" মদালসা প্রিয় পতির প্রীত্যর্থে কহিলেন তাহাই হউক।" তদনন্তর একটী স্বর্ণ কবচে নিম্ন লিখিত শ্লোক কয়টী লিখিয়া অলর্ককে দান করিলেন ও কহিলেন "বৎস! দুঃখ ও বিপদের সময় এই কবচটী খুলিয়া পাঠ করিবে।" কিছুদিন পরে রাজকুমার অলর্ক কাশীরাজ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত, অবমানিত এবং যার পর নাই বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। তখন দৈবযোগে এক দিন বৃক্ষতলে বসিয়া চিন্তা করিতে করিতে মাতৃদত্ত কবচের কথা তাঁহার স্মরণ হইল। তিনি কবচ খুলিয়া পাঠ করিলেন:—

সঙ্গঃ সর্ব্বাত্মনা ত্যাজ্য সচেদ্ত্যক্তুং নশক্যতে, স সদ্ভিঃ সহ কর্ত্তব্যঃ সতাং সঙ্গোহিভেষজম্। কামঃ সর্ব্বাত্মনা হেয়ো হাতুং চেচ্ছক্যতেণ্ন সঃ, মুমুক্ষুন্ প্রতি তৎকার্য্যং সেব তস্যাপি ভেষজং। অস্যার্থ

মনুষ্যসঙ্গ ত্যাগ করিতে অভ্যাস করিবে। যদি তাহা না পার, তবে সাধু সহবাসই কর্ত্তব্য জানিবে, ইহাই বিষাদ রোগের মহৌষধি। সকল প্রকার বাসনা পরিত্যাগ করা উচিত; যদি তাহা না পার, তবে মুক্তির জন্য চেষ্টা করিও। মোক্ষচেষ্টাই বিপদ রোগের একমাত্র ঔষধ।"

অকস্মাৎ তাঁহার প্রাণে যে ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি লুক্কায়িত ছিল, তাহা মহাশব্দে জ্বলিয়া উঠিল। ধর্ম্মপ্রাণা জননী স্তন দুগ্ধের মধ্য দিয়া যে বীজ রোপণ করিয়া ছিলেন, তাহাতে সুশীতল বারিসেক হইল। শ্রান্ত-কলেবর দগ্ধপ্রাণ অলর্কের প্রাণ আশাপূর্ণ হইল, তিনি অদূরে দিব্যালোক দেখিতে পাইলেন। উদ্দেশে ভক্তিভাবে অশ্রুপূর্ণ নেত্রে মাতৃচরণ বন্দনা করিয়া তিনি সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিলেন।*

৭। মহামায়া। মহর্ষি বুদ্ধদেবের জননী শাক্য-মহিষী মহামায়া অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা ছিলেন। শাক্যরাজ শুদ্ধোদনের চারিটী মহিষী, তন্মধ্যে মহামায়া সমধিক লাবণ্যবতী, ধর্ম্মপ্রাণা এবং স্নেহশীলা ছিলেন, সুতরাং মহারাজ তাঁহাকে অধিক স্নেহ করিতেন। দীন দুঃখীকে দয়া, গুরুভক্তি, বিনয়, আতিথেয়তা, পতিভক্তি, পরিজনগণের প্রতি যথোচিত সৌজন্য, তাহাদের সুখ দুঃখে সহানুভূতি, যথাসাধ্য পরোপকার, ও নিয়মিত দান, ধ্যানাদি প্রভৃতিগুণে ও কার্য্যে তাঁহার সুকোমল হৃদয় অলঙ্কৃত ছিল, এবং সমস্ত সময় ব্যয়িত হইত। এক কথায় বলিতে হইলে তিনি ধার্ম্মিক বংশের উপযুক্ত প্রধানা মহিষী হইয়াছিলেন। অধিক বয়স পর্য্যন্ত অপুত্রক থাকায় তিনি সর্ব্বদা শুদ্ধচারিণী, ব্রতপরায়ণ ও পবিত্রচিত্ত হইয়া দেবারাধনায় নিযুক্ত থাকিতেন। প্রবাদ আছে শাক্য বংশের কোন পর্ব্বোপলক্ষে রাজা, মহিষীগণ ও অমাত্যবর্গ সকলে দান ধর্ম্মার্থে এক মনোহর উদ্যানে সম্মিলিত হইলেন। সমস্ত দিন উপবাসী ও স্নান দান করিয়া সন্ধ্যাকালেই সকলে অবসন্ন দেহে শয়ন করিলেন। নিদ্রামাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখিলেন যে এক সুন্দর শ্বেত পদ্মের শয্যায় তিনি শায়িত আছেন, অকস্মাৎ এক মত্ত শ্বেতহস্তী দ্রুতবেগে আসিয়া শুণ্ড দ্বারা তাঁহার শয্যা বিশৃঙ্খল করিয়া নাভিদেশ বিদীর্ণ করতঃ গর্ভে প্রবেশ করিল। মহামায়া জাগ্রত হইয়া মহারাজকে স্বপ্নবৃত্তান্ত বর্ণন করিলে তিনি তৎশ্রবণে পরমানন্দিত হইলেন। সেই রাত্রেই দয়াময় বুদ্ধদেব মহাদেবীর পবিত্র গর্ভে জন্মগ্রহণ করিলেন। যাহা হউক স্তনদুগ্ধের সহিত মাতৃ-প্রকৃতি যে সন্তানের হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া থাকে,

* বামাবোধিনীতে ইতিপূর্ব্বে মদালসার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া সংক্ষেপে লিখিত হইল।

তাহা এই দেবী চরিত্রে স্পষ্টরূপ বুঝিতে পারা যায়। বুদ্ধের জন্মের পর মহিষী সপ্তদিন মাত্র ইহলোকে ছিলেন। সপ্তদিন বুদ্ধদেব যে স্তন দুগ্ধ পান করিয়াছিলেন, জীবনে তাহার দ্বারা কি কাণ্ড করিয়াছেন! মাতৃ-প্রকৃতি উৎকৃষ্ট হইলে কি শুভফল উৎপন্ন হয়, জগৎ মুক্তকণ্ঠে তাহা ঘোষণা করিতেছে। ধন্য সেই প্রকৃতি যাহার জন্য আজ অর্দ্ধ পৃথিবী মাতোয়ারা এবং অগণিত প্রাণী যাঁহার সম্প্রদায়ের দয়ায় জীবিত, রক্ষিত ও প্রতিপালিত হইতেছে!

জাপান-সাম্রাজ্ঞী দ্বয়।

জাপানের এক সাম্রাজ্ঞী ১৭০০ বৎসর পূর্ব্বে কোরিয়া জয় করেন, তাঁহার নাম জিঙ্গু কঙ্গো। তাঁহার যেমনি রূপ, তেমনি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও মেধা, যুদ্ধ বিদ্যাতেও তিনি সুবিখ্যাত ছিলেন—এমন কি তিনি জাপান দেশের রণ-দেবতার মাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনি যখন সম্রাটের সহিত পরিণীত হন, তখন চীন কিম্বা কোরিয়া রাজ্যের অস্তিত্ব জাপানীরা জানিত না। রাণী একদিন স্বামী মিকাডোকে বলিলেন যে দেবতারা তাঁহার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছেন যে "সুদূর পশ্চিমে একটী রাজ্য আছে, জাপানী সৈন্যগণ পোতারোহণে তথায় যাইবে এবং তথা হইতে প্রচুর লুণ্ঠিত দ্রব্য আনিবে।" সম্রাট এই কথায় হাস্য করিয়া বলিলেন "তোমার দেবতাও মিথ্যা, তোমার কথাও মিথ্যা।"

কিছুদিন পরে প্রজারা বিদ্রোহী হইয়া সম্রাটকে বন্দী ও নিহত করিল; এই সময়ে সাম্রাজ্ঞী স্বয়ং সৈন্যচালনা করিয়া বিদ্রোহ দমন করিলেন। তিনি জোয়ান আব্ আর্কের ন্যায় পুরুষ বেশ ধারণ করিয়া অশ্বারোহণে রাজ্য মধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং বহুসৈন্য ও পোত সংগ্রহ পূর্ব্বক দক্ষিণ কোরিয়াতে আসিয়া উপনীত হইলেন। তথাকার রাজা বিনা-যুদ্ধে তাঁহার হস্তে রাজ্য সমর্পণ করিলেন।

রাণী সোনা রূপা রেসমী বস্ত্রে ৮০খানি জাহাজ পূর্ণ করিয়া এবং স্থানীয় বড় বড় পরিবারের প্রতিভূসকল সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। তাঁহার দেবতা প্রদত্ত স্বপ্ন সফল হইল। এই রমণী জাপানের শাসনপ্রণালী নূতন করিয়া গঠন করিলেন এবং নানাবিধ শিল্প শিক্ষা প্রবর্ত্তন করিলেন।

জিঙ্গু কঙ্গের পরে আর নয়টী রমণী জাপানের সিংহাসনে অধিরোহণ করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের মধ্যে কেহই ইহাঁর মহিমার শতাংশের একাংশও প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। মেকাডোর পত্নীগণ সচরাচর অন্তঃপুরে বদ্ধ থাকিতেন। অনেক দিনের পর জাপানে আর এক বরণীয়া রমণীর উদয় হইয়াছে। বর্ত্ত-

মান সাম্রাজ্ঞী হারুকো অনেকটা জিঙ্গু কঙ্গোর প্রকৃতি লাভ করিয়াছেন ; ইনি বর্ত্তমান সভ্য জাপানী রমণীর আদর্শ। তিনি কোরিয়া জয়ে জাপানীদিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন এবং স্বয়ং রণ-সঙ্গীত রচনা করিয়া সৈন্যদিগকে মাতাইয়া তুলিয়াছেন। জাপানীরা ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদিগের ন্যায় সভ্য হয়, ইহা তাঁহার সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। ইনি জিঙ্গ কঙ্গের ন্যায় এক নূতন জাতি গঠনের সহায়তা করিতেছেন। ইহাঁর বিষয়ে পশ্চাৎ আরও বলিবার ইচ্ছা রহিল।

মসূরিকা বা বসন্ত।

মসুর কলাইয়ের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট পীড়াকে মসূরিকা বা বসন্ত বলে। হাম বা বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে, রোগীর গৃহ নির্জ্জন, রম্য ও পবিত্রভাবে রাখিবে, সর্ব্বদা ধূপ, ধুনা ও গুগ্‌গুল ইত্যাদি দ্বারা গৃহ সদ্গন্ধান্বিত করিয়া সকলেই পবিত্রভাবে সতর্ক থাকিবে এবং কোন ক্রমে বসন্ত সম্বন্ধীয় পুঁয ও রক্তাদির সহিত সংশ্রবে দূষিত হইয়া দেহকে দূষিত করিবে না। এই রোগ অত্যন্ত সংক্রামক।

এ সময়ে চতুর্দ্দিকেই বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যাইতেছে, সুতরাং এ রোগের বিশেষ ফলদায়ক, কয়েকটী মুষ্টিযোগ প্রদর্শন করিতেছি, আশা করি ইহার দ্বারা অনেকেরই উপকার দর্শিবে।

১। পুরুষের দক্ষিণ পার্শ্বে এবং স্ত্রীলোকের বাম পার্শ্বে হরীতকীর বীজ ধারণ করিলে বসন্ত হয় না।

২। রুদ্রাক্ষ ও মরিচ চূর্ণ প্রত্যেকে ৴ আনা বাসি জলে মিশ্রিত করিয়া পান করিলে তিন দিনে বসন্ত উপশম প্রাপ্ত হয়।

৩। পটোল পত্র, নিম্বপত্র, ইন্দ্রযব মিলিত ২ তোলা, ৷৷০ সের জলে সিদ্ধ করিয়া, শেষ ৵০ পোয়া থাকিতে এই ক্বাথে বচ, ইন্দ্রযব, যষ্টিমধু, মদন ফল বাটিয়া প্রক্ষেপ করিবে। ইহা শীতল করিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত প্রশমিত হয়।

৪। (রোগীর জ্বর থাকিলে জলপান পরিত্যাগ, নির্ব্বাত গৃহে অবস্থান, গাত্রে জয়ন্তী চূর্ণ মর্দ্দন করা কর্ত্তব্য)।

৫। গোক্ষুরী মূল ও অনন্ত মূল তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্ত উপশমিত হয়।

৬। (হলুদের গুঁড়ার সহিত উচ্ছে-পাতার রস পান করিলে হামজ্বর ও বসন্ত ভাল হয়।)

৭। বাসি জলে মধু মিশাইয়া পান করিলে গুটী ও তজ্জন্য গাত্রদাহ নিবারণ হয়।)

৮। পটোল পত্র, গুলঞ্চ, মুথা,

বাসকছাল, দুরালভা, চিরেতা, নিম্বছাল, কটুকী, ক্ষেতপাপড়া মিলিত ২ তোলা জল ৷৷০ সের, শেষ ৵০ পোয়া, ইহা পান করিলে অপক্ক বসন্ত প্রশমিত এবং পক্ক বসন্ত শুষ্ক হয়।

৯। টাবা লেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত পাকিয়া উঠে ও দাহ প্রশমিত হয়।

১০। পায়ে বসন্ত হইয়া দাহ উপস্থিত হইলে, তণ্ডুলোদক সেচন করিবে।

১১। বসন্ত পাকিবার উপক্রমে, গুলঞ্চ, যষ্টিমধু, দ্রাক্ষা, ইক্ষুমূল, দাড়িম, গুড় সংযুক্ত করাইয়া, সেবন করাইলে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে ও বায়ু কুপিত হয় না।

১২। বসন্তে শূল, উদরাধ্মান ও কম্প উপস্থিত হইলে, সৈন্ধব লবণের সহিত মাংসের যুষ পান করিলে উপকার হয়।

১৩। কুল চুর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে, বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মজ বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠে।

১৪। বসন্তে অধিক পূঁয হইলে বট, যজ্ঞডুম্বুর, অশ্বত্থ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল চুর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইবে, কিম্বা বিল ঘুটের ভস্ম ছড়াইয়া দিবে।

১৫। বসন্তে কৃমীভয় নিবারণ জন্য সরল কাষ্ঠ ধূনা, দেবদারু, চন্দন ও অগুরু প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে।

১৬। ত্রিফলার ক্বাথে গুগ্‌গুল দিয়া পান করিলে পূঁয নির্গত হইয়া দাহ ও বেদনা ভাল হয়।

১৭। বসন্ত রোগের প্রথমাবস্থাতেই প্রতিদিন হিঞ্চেশাকের রস ৪ তোলা, ঘর্ষণ করা শ্বেত চন্দন ৷৷০ অর্দ্ধ তোলা, এই উভয়কে একত্র যোগ করিয়া দিবসে ২ বার পান করান কর্ত্তব্য। ইহাতে বসন্ত শীঘ্র বহির্গত হয়।

১৮। হাম রোগের শেষাবস্থায় কুড় ও বাবুই মিলিত ২ তোলাকে কুটা করিয়া ৩২ তোলা জলে সিদ্ধ করিয়া ৮ তোলা জল থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া পান করাইলে দেহে হামজন্য চিহ্ন সত্বর মিলিত হয়। ইহা দুই তিন দিন ব্যবহার করান আবশ্যক।

১৯। নিম্বছাল, ক্ষেতপাপড়া, আকনাদি মূল, পলতা, কটকী, হরীতকী, রক্ত চন্দন, শ্বেত চন্দন, বেণার মূল, আমলা, বাসক মূলের ছাল, দুরালভা, এই দ্বাদশ প্রকার মিলিত পাচন বসন্ত রোগীকে পানার্থ প্রথমাবস্থায় প্রদান করা যাইতে পারে।

২০। মুখে, কণ্ঠে বসন্ত জন্য ক্ষত হইলে আমলা ২ তোলা, যষ্টি মধু ২ তোলা এতদুভয়কে কুটা করিয়া ৬৪ তোলা জলে সিদ্ধ হইলে ১৬ তোলা আন্দাজ জল সত্বে ছাঁকিয়া রোগীকে বারম্বার কুলি করিতে দিবে। ইহারদ্বারা মুখ ও কণ্ঠস্থ ক্ষতাদি শীঘ্র শুষ্ক হইয়া যায়।

২১। গাত্র বেদনা, শিরোবেদনা, পেট ভার বোধ, মুখ ও চক্ষু রক্তবর্ণ এবং

কাশি থাকিলে সেই জ্বরে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পাইবার সম্ভাবনা। এই জ্বর অধিক দিন স্থায়ী হয় না। প্রায় তিন বা চারি দিনে হাম বা বসন্ত প্রকাশ পায়। এই সময়ে কোন ঔষধ প্রদান করা বিধেয় নহে, যাহাতে সামান্যরূপ বমন বা বিরেচন হয়, এরূপ ঔষধ প্রদান করাই উচিত।

২২। সমস্ত বসন্ত প্রকাশ হওয়ার পর ক্ষত শুষ্ক ও জ্বর ত্যাগ হইলে কাঁচা হরিদ্রা ও নিমপাতা মাখিয়া স্নান করিবে।

২৩। বসন্ত শুষ্ক হইবার সময় হইতে যাহাতে রোগীর শরীর স্নিগ্ধ থাকে, এরূপ পথ্য প্রদান করা উচিত।

২৪। বসন্তের মুখ ক্ষত হইয়া গেলে হরিদ্রাচূর্ণ ও মাখন লেপন করিলে ক্ষত আরোগ্য হয় ও বসন্তের চিহ্নগুলিও মিলাইয়া যায়।

২৫। যে রোগীর চক্ষু মধ্যে বসন্ত হইয়া যাতনা উপস্থিত হয়, সেই যাতনা নিবারণার্থে গড় গড় ১ তোলা, যষ্টিমধু ১ তোলা, এই উভয়কে কুটা ও সিদ্ধ করিয়া এবং ছাঁকিয়া ঈষৎ উষ্ণসত্ত্বে সেই জলদ্বারা চক্ষুর উপর স্বেদ (Foment-ation) প্রদান করিবে। তাহাতে যাতনা নিবারণ ও রস স্থানান্তরিত হয়।

২৬। বসন্ত পাকিয়া পূঁযাদি সঞ্চার হইলে কণ্টকাদিদ্বারা বিদ্ধ করিয়া পূঁয নির্গত করিবে। তৎপরে যষ্টিমধু, আমলা, হরীতকী, বয়ড়া, চালমুগরা বীজ, দারু-হরিদ্রা, নীলোৎপল, বেণার মূল, লোধ-কাষ্ঠ, মঞ্জিষ্ঠা, গোময় ভস্ম, এই সকল রৌদ্রে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করত সূক্ষ্মবস্ত্রদ্বারা পুটলী বাঁধিয়া বসন্তের ক্ষতের উপর মুহুর্মুহু ঝাড়িয়া ঝাড়িয়া গুঁড়া নিক্ষেপ করিবে। ইহাদ্বারা সত্বর ক্ষতাদি শুষ্ক হয়।

(ক্রমশঃ)

স্বরসাধন প্রণালী।

(৩৬২ সংখ্যা ৩৪৪ পৃষ্ঠার পর)

ললিত রাগিণী—তাল আড়াঠেকা

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার কৃত গীত।

শ্রীনবীনচন্দ্র দত্ত কৃত স্বরলিপি।

সা	ঋ	ম	ম	ম প	ম গ ঋ	ম	প ধ প
অ-	য়ি	সু-	খ	ম-	য়ি	উ-	ষে!

ম গ ম ধ | প পধপ প গ ঋ সা } প ধ
কে তো- মা- রে | নি- র- মি- ল? } বা- লা-

সা সা | ঋ নি সা নি ধ প নি ম গ ম ধ |
র্ক সি- | ন্দূ- র- ফোঁ- টা কে তো মা- র |

প পধপ প গ ঋ সা }
ভা- লে দি- ল? }

প প ম প | ধ সা সা সা সা
(১ম বার) হা- সি- তে- ছ | মৃ- দু, মৃ- দু- আ-
২য় বার) ক- ম- ল ন- | য়- ন মে সি, কা-
(৩য় বার) বা- রে- ক তু- | মি আ- মা- রে, দে-

সা সা সা | সা ঋ সা ঋ গ গ গ ঋ সা নি ধ প ধ প }
ন- ন্দে ভা- | সি- ছে স- বে, }
র পা- নে | চে য়ে আ- ছ,
থাও দে- খাও | দে খি ও- রে,

প ধ সা সা | ঋ নি সা নি ধ প ধ ম গ ম
কে শি- খা'- ল | এ- ত হা- সি, কে বা
কা- র ত- রে | ঝ- রি তে- ছে, প্রে ম
হে- ন স- ঞ্জী- | ব- নী শ- ক্তি, কে তো-

ম ধ | প পধপ প- গ ঋ সা } সা সা সা সা |
সে যে | ঢা- লা- ই- ল? } জ- গ- ত মো- |
অ- শ্রু | নি- র- ম- ল? } এ- ই ছি-- ল
মা- রে | প্র- দা- নি- ল।

ঋ ঋ ঋ ঋ সা ঋ ম ম |
হি- ত ক- রি, গা- হি'- ছ বি- |
জী- ব- গ- ণ, মৃ ত- প্রা- য়

+।	। ৩৺	৺	। ০ ।	৺	৺১৺	৺	।
ম	প ধ প	ম	প ম গ	সা	গ	ঋ	সা
পি-	নে-	কা-	য়ে;	ব-	ল	কে	সে
অ-	চে-	ত-	ন,	ত-	ব	প-	র-

+।	।৩৺	।	৺৫।	৺	৺১৺	৺	।
নি	সা	নি. ধ.	নি	সা	সা	সা	সা
পু-	ষ্পা-	ঞ্জ-	লি,	অ-	র্প-	ণ	ক-
শ-	ন	মা-	ত্র,	পা-	ই-	ল	ন-

+।	। ৩৺	৺	। ০ ।
ঋ	সা ঋ গ ঋ	ঋ	সা
রি-	ছ	যাঁ	রে?
ব	জী-	ব-	ন!

ফ্রান্সে ভারতরাজকুমারী।*

এক যায়, অন্য এক আইসে, একের পতন, অন্যের অভ্যুদয়—সংসারের এই নিয়ম। ইহার অধীন হইয়া সকলেই চলিতেছে। বড় বড় বীর পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করিলেন; প্রবলপ্রতাপে ধরাতল করতলশায়ী করিলেন; আবার কালের বিচিত্র গতিতে অন্যতর বীর দ্বারা পরাজিত হইলেন। বালার্কের ন্যায় যখন বোনোপার্টির গৌরব সূর্য্য অল্প অল্প করিয়া প্রকাশ পাইতেছিল, সেই সময় ফরাসী সাম্রাজ্যের নভোমণ্ডলে সাম্রাজ্ঞী জোজেফাইনের গৌরব সূর্য্য সম্পূর্ণ বিরাজমান। ইনি তখন য়ুরোপের অন্যান্য রাজসভার কেন্দ্রস্বরূপ উজ্জ্বলতম মণি। টুলারের রত্নখচিত রাজমন্দিরে সেই সময় ভারতবর্ষের এক অমূল্য নিধি ছিল, যাহার জ্যোতিতে অত্রত্য অন্যান্য মণি নিষ্প্রভ হইয়াছিল। সে নিধি কি? এক রূপলাবণ্যময়ী ভারত-রাজকুমারী। সাম্রাজ্ঞী ইহাঁকে দত্তক গ্রহণ করেন; করিয়া অপত্য নির্ব্বিশেষে বহুযত্নে লালন পালন করেন। একেত রাজকন্যা, রূপবতী, পূর্ণযৌবনা, তায় সাম্রাজ্ঞীর নয়নপুত্তলী; মণি কাঞ্চনের যোগ। এঅবস্থায় তিনি যে সমগ্র ফরাসী সাম্রাজ্যের কিরূপ আদরের বস্তু, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক নাই। সুতরাং অচিরে তিনি আবাল বৃদ্ধ বনিতা ছোট বড় সকলের মনোযোগ ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলা বাহুল্য সকলে ইহাঁর বিষয় জানিতে সমুৎসুক হইবেন, হইবারই ত কথা। আমাদের মধ্যে কাহার না জানিতে কৌতূহল হইতেছে?

ইহাঁর সম্বন্ধে এক অতি অদ্ভুত বিবরণ প্রকটিত আছে। তাহা ক্রমশঃ বিবৃত হইতেছে। রসিক ফরাসী জাতি কতক বিদ্রূপ ও কতক কৃপাপরতন্ত্র হইয়া ইহাঁকে La Sultana Indianna অর্থাৎ ভারত সুলতানা বলিয়া আপনাদিগের মধ্যে পরিচয় দিতেন এবং বাস্তবিকই প্যারী মহানগরীতে ইনি সুলতানার মত সসম্ভ্রমে প্রাসাদে অবস্থিতি করিতেন। তিনি যে ভারত-কন্যা তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই, তবে হিন্দু কি মুসলমান তাহা কিছু মাত্র নির্ণয় করা যায় না; যেহেতু যাঁহারা তাঁহার সহিত বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের প্রদত্ত বিবরণ বৈষম্য দোষে দূষিত। শুনা যায় তিনি দিলদার নামে আত্ম-পরিচয় দেন। নামে মুসলমান বলিয়া অনুমিত হয়। কিন্তু এত কালের পর সত্যে উপনীত হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। ইহাঁকে অবলম্বন করিয়া ১৭৯৭ ফরাসী দেশে "La Belle Indienne, ou les Aventures de la Pittie fille du Grand Mogol" এই দীর্ঘনামে এক উপন্যাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

কথিত আছে তাঁহার আত্মপরিচয় এই যে, তিনি এক বড় রাজার কন্যা তাঁহার পিতার যমুনা-পুলিনে মনোরম প্রাসাদ ছিল। কিন্তু কোথায় ছিল, সেই স্থানের নাম কি, কিম্বা তাঁহার পিতারই বা নাম কি ইত্যাদি অবশ্যজ্ঞাতব্য ও বক্তব্য বিষয় গুলি তাঁহার কিছু মাত্র স্মরণ ছিল না। চারি বৎসর বয়ঃক্রম কালে এক হিন্দু রাজার সহিত বিবাহের বাগদান হয়। এস্থলে পাঠক পাঠিকা দেখুন ইহাঁর নাম মুসলমান, হিন্দু রাজার সহিত বিবাহের কথা হইল আর যে সময়ের কথা বলা যাইতেছে, এইটীর কোনওটি ধরিয়া বিচার করিলে কিছুই স্থির করিতে পারা যাইতেছে না। তাহার কারণ এই—অদ্যাবধি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত এক মুসলমান শাসনাধীন হইয়া বাস নিবন্ধন আচার ব্যবহারে এমন কি নামের কতকটা মিল দৃষ্ট হয়। তজ্জন্য সুধু নাম ধরিয়া ইহাঁকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া স্থির করা যাইতে পারে না। আর যে সময়ের কথা, তখন হিন্দু মুসলমানদিগের মধ্যে বিশেষতঃ রাজা ও রেইস দিগের মধ্যে বিবাহ প্রচলিত ছিল। সুতরাং ইনি মুসলমান কন্যা হইয়া হিন্দু স্বামী গ্রহণ করিতেও পারেন এবং হিন্দু কন্যা হইয়া মুসলমান স্বামীর সহিত ও পরিণীত হইতে পারেন। দুইই সম্ভব। সে যাহাহউক প্রাচ্য দেশোচিত সমারোহে বিবাহের আয়োজন হইতে লাগিল। বিবাহ দিন উপস্থিত। কন্যা স্বর্ণবস্ত্র পরিহিতা ও বহুমূল্য অলঙ্কারাদিতে এত ভারাক্রান্ত হইলেন যে অন্যদীয় সাহায্য ব্যতীত এক পদও তিনি সঞ্চরণ করিতে পারেন না। কিন্তু কেহ কি স্বপ্নেও জানিয়াছিল যে, সিন্দুরবিন্দু-শোভিত বলি-প্রস্তুত ছাগের ন্যায় তাঁহাকে অবি-

লগ্নে প্রজাপতির সকাশে জন্মের মত বৈবাহিক সুখ বিসর্জ্জন করিতে হইবে? বাদ্যকর ও পতাকাবাহীতে তরণী পরিপূর্ণ। এক একখানি করিয়া শত শত তরণী বিবাহ বাটীর নিকট ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। একে যমুনা তটস্থ অট্টালিকা, তায় সন্ধ্যাকাল; প্রকৃতি এক অনুপম অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে। শোভন দৃশ্যে সকলের প্রাণ বিমোহিত। স্তন্যসুবাসিতা পাপে অকলঙ্কিতা মূর্ত্তিমতী সরলতা কি স্থির থাকিতে পারে? যৌবন-সুলভ লজ্জাশীলতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই, বিবাহ যে কি বস্তু তাহা কি তিনি তখন বুঝিয়াছেন? স্বামী স্ত্রীতে যে কি সম্বন্ধ তাহা তিনি কি তখন বুঝিয়াছেন? বুঝিলে লজ্জায় অধোমুখী হইতেন, অবরোধে রুদ্ধ থাকিতেন। কিন্তু তাহা ত নহে। অন্যান্য নর নারী যেরূপ আনন্দিত, তিনিও তদ্রূপ। আপনার বিবাহ দেখিতে—আপনার বরের আগমন-শোভা দেখিতে দেখিতে—আহ্লাদে আটখানা। তাড়াতাড়ি উত্তমরূপে দেখিবার জন্য সহচরীদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া ছাদের এক প্রান্তভাগে আরোহণ করেন। হায়! বিধাতার বিড়ম্বনা! স্রোতস্বিনীতে পড়িয়া গেলেন। টানে বহুদূরে ভাসিয়া গেলেন, কেহ জানিতে পারিল না। সকলে আমোদে মত্ত, সকলে জানে মেয়ে কোনও না কোনও স্থানে খেলায় মাতিয়া আছে; আর ভাবনাই বা কি, ভাবনারও কোনও কারণ নাই, যেহেতু সঙ্গে লোক আছে।

(ক্রমশঃ)

উদাসীনের চিন্তা।

(উপন্যাস।)

কোন এক নগরে একদা জনৈক সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলেন। তিনি এক বৃক্ষতলে অগ্নিকুণ্ড করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তিনি ঈশ্বরপরায়ণ পরম ভক্ত সাধু। তাঁহার সুনাম চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার নাম শুনিয়া নগরবাসী বহু নরনারী তথায় উপস্থিত হইতে লাগিলেন। এক দিন নগরের এক প্রসিদ্ধ ধনী বণিক্‌পত্নী তথায় উপস্থিত হইলেন—তাঁহার নাম লক্ষ্মী। পিতৃগৃহে শৈশবকালে তিনি এই নামে পরিচিতা ছিলেন। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা বলিয়া স্বামী আদর করিয়া তাঁহাকে চঞ্চলা বলিয়া ডাকিতেন। আমরাও তাঁহাকে শেষোক্ত নামেই অভিহিত করিব। চঞ্চলা সুন্দরী নহেন, তাঁহার বর্ণ কাল, চক্ষু দুইটি ক্ষুদ্র, নাসিকা চেপ্টা, হস্ত পদাদির গঠনও প্রশংসনীয় নহে। কিন্তু

প্রাকৃতিক অভাব দূর করিবার জন্যই হউক কিংবা ধনী লোকের গৃহিণী বলিয়াই হউক চঞ্চলার বেশভূষার প্রতি বেশ লক্ষ্য ছিল। তাই সাধুদর্শনে আসিবার কালেও বেশভূষা করিতে ত্রুটি করেন নাই। তাঁহার শরীর আপাদমস্তক রৌপ্য ও স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত ছিল। পরিধানে একখানি বহুমূল্য শাড়ী। চঞ্চলার ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর দেখিয়া সন্ন্যাসী ঠাকুর মনে মনে একটু বিরক্ত হইলেন। তৎপরে চঞ্চলাকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মা! এখানে কি চাই?"

চ—"আপনার শ্রীচরণ দেখবার জন্য এসেছি।

স—"সাধু দর্শনে এসেছ, তাতে আবার এত ঐশ্বর্য্যের আড়ম্বর কেন?

চঞ্চলা একটু লজ্জিতা হইলেন এবং কিয়ৎকাল নিঃশব্দে অধোবদনে রহিলেন।

স—মা, কিছু মনে কর না, আমি সন্ন্যাসী মানুষ, যা মনে উঠে তাই বলে ফেলি। ইচ্ছা হয়ত বস।

সন্ন্যাসীর আশ্বাসবাণী শুনিয়া চঞ্চলা সমীপবর্ত্তী এক আসনে উপবেশন করিলেন। সন্ন্যাসী আরও দুই এক ব্যক্তির সহিত কিয়ৎকাল বাক্যালাপ করিয়া চঞ্চলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন "মা! শ্রীচরণ দেখা হ'লত, এখন ইচ্ছা হ'লে যেতে পার।"

চ—"বাবা! আপনার নিকট কিছু ধর্ম্মোপদেশ চাই।"

স—তোমার ধর্ম্ম কর্ম্ম হচ্চে বেশভূষা করা। ঐ প্রবৃত্তিটা একটু থামলে ধর্ম্মের খবরটা নিলেই ভাল হয়।

চ—বাবা, আমরা সংসারী মানুষ, পাপেই আমাদের মতি, তাইতে আপনাদের শ্রীচরণ দর্শনে এসে থাকি, আপনারাও যদি পাপীজন ব'লে তাড়িয়ে দেন তা'হলে যাই কোথা?

স—আমরা পাপী ব'লে তাড়াই না, তবে কিনা ভরা কলসীতে বায়ু পূরা যায় না। বিষয়াসক্তিতে পূর্ণ তোমার হৃদয়ে আমি ধর্ম্মের বায়ু কি করে প্রবেশ করাব?

চ—বাবা, আপনাদের অসাধ্য আবার কি আছে? আপনারা কৃপা কল্লেইত অনেক পাপী তরে যায়।

সন্ন্যাসী দেখিলেন চঞ্চলা সহজে ছাড়িবার পাত্রী নহেন, তাহাকে ফাঁকি দেওয়া সোজা নয়। তৎপরে বলিলেন "মা, একটু অপেক্ষা কর। সন্ন্যাসী নিবস্ত হইবার প্রায় পনর মিনিট পরে তথায় অনাহারে জীর্ণ শীর্ণ, ছিন্ন বস্ত্র পরিধানকারী দুইজন ভিক্ষুক আসিয়া উপস্থিত হইল। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি সন্ন্যাসী মানুষ এখানে কি চাই?

ভিক্ষুক—বাবা, কিছু খাবার চাই, অনাহারে আর প্রাণ বাঁচে না।

কাতরোক্তি শুনিয়া সন্ন্যাসীর কোমল প্রাণ গলিয়া গেল। নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুবারি পড়িতে লাগিল। তৎপর বলিলেন বাবা বস, দেখি ভগবান্ তোমা-

দের জন্য কিছু দেন কিনা। সন্ন্যাসীর আশ্বাস বাণী শুনিয়া ভিক্ষুকদ্বয় নিকটে উপবেশন করিল। সন্ন্যাসী চঞ্চলার দিকে ফিরিয়া বলিলেন মা, তুমি ধর্ম্মোপদেশ চাহিয়াছ। "পুণ্যঞ্চ পরোপকারে পাপঞ্চ পরপীড়নং।" এইত ধর্ম্মের সার কথা। এখন পরোপকারের কাল উপস্থিত। সম্মুখে এই ভিখারীদ্বয়কে দেখিতেছ। অন্নাভাবে ইহাদের শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়াছে। পরিধেয় বস্ত্রখানি মলিন এবং ছিন্ন। আমি যতদূর বুঝিতে পারিতেছি তাতে বিচার করিয়া বলিতে গেলে বলিতে পারি যে ইঁহারা দানের উপযুক্ত পাত্র। "দরিদ্রান্ ভর কৌন্তেয় মা প্রযচ্ছেশ্বরে ধনম্। ব্যাধিতস্যৌষধম্ পথ্যং নিরুজস্য কিমৌষধৈঃ।" হে কৌন্তেয়! দরিদ্রদিগকে ভরণ কর, ধনীদিগকে ধন দান করিও না। রোগীরই ঔষধ ও পথ্যের প্রয়োজন, নীরোগীর প্রয়োজন নাই। তাই মা আমি অনুরোধ করি যে তোমার কানের দুল দুটী এই দুঃখীদ্বয়কে দাও। ইহারা অনাহারজনিত মৃত্যুর হস্ত হইতে রক্ষা পা'ক।

সন্ন্যাসীর সমক্ষে যে এইরূপ কঠিন সমস্যায় পতিত হইবেন, চঞ্চলা এইরূপ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। তিনি এখন কি করেন, কাণের দুল দুইটী এক কথাতেই পরিত্যাগ করিতে পারেন তাঁহার মনের বল এতটুকু হয় নাই। অথচ সন্ন্যাসী ঠাকুর উহা দাবি করিতেছেন। তিনি চিন্তা করিয়া একটি উত্তর ঠিক্ করিলেন। উত্তরটি সত্যমূলক হইলেও চঞ্চলা তাঁহার প্রকৃত অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিলেন। তিনি বলিলেন ঠাকুর! আমার বাবা আদর করে এই দুল দুইটী আমাকে দিয়েছেন, ইহা আমার বাবার চিহ্ন। আমি আর কোন গহনা দিতে পারি, কিন্তু এই দুইটী দুল দিতে পারি না।

স—মা তোমার হাতের বালা দু গাছি কে দিয়েছেন?

চ—তা ও বাবা দিয়েছেন।

স—তবে তাই কেন বাবার চিহ্ন হ'ক না?

চঞ্চলা যে এইরূপ পরীক্ষায় পড়িবেন তাহা ভাবিতে পারেন নাই। এখন সন্ন্যাসীর সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইলেন।

চ—আমি এই দুল দুইটির পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য ক'ল্লে কি আপনি সুখী হন না?

স—মা সন্ন্যাসীগণ এক ঝোঁকের লোক। তুমি লাখ টাকা দিবে বল্লেও আমি আমার সঙ্কল্প পরিত্যাগ কর্ত্তে পারি না। আমি বুঝেছি তোমার দুল দুইটীতে আসক্তি রয়েছে। তুমি যখন ধর্ম্মার্থিনী হ'য়ে এসেছ, তখন আমি তোমার আসক্তির জিনিষই সর্ব্বাগ্রে কাড়িয়া লব। তুমি দুল দুইটি দিবে কি না বল?

চ—(করযোড়ে) বাবা আমায় মাপ কর, আর কিছু দি, আপনি খুসী হউন।

স—অন্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বাক্যালাপ করিতে লাগিলেন। এদিকে চঞ্চলার অন্তরে দেবাসুরের সংগ্রাম চলিতে লাগিল। চঞ্চলা যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া দুল দেওয়াই স্থির করিলেন। তৎপর সন্ন্যাসীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "বাবা, এই দুল দুটী নিন। আমি এ পর্য্যন্ত আমার ভোগ-বাসনার সহিত সংগ্রাম করিতেছিলাম, কিন্তু বাবা এখন দেখতে পেলেম সৎ-পাত্রে দান জন্য ভোগবাসনায় জলাঞ্জলি দেওয়াই ধর্ম্মসঙ্গত। তাই আপনার আদেশ পালনে অগ্রবর্ত্তী হইয়াছি। সন্ন্যাসী দেখিলেন দুলের প্রতি চঞ্চলার যে অনুরাগ ছিল, তাহার অবসান হই-য়াছে। এই অনুরাগের বিনাশ সাধনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য সাধন হইয়াছে দেখিয়া তিনি আর দুল গ্রহণ করিলেন না। তিনি এক শিষ্যের প্রতি আদেশ করিয়া বলিলেন "আমার ঝুলনা হইতে গত কল্য-কার প্রাপ্ত টাকা কয়টী আনিয়া ভিখারী-দিগকে দাও। শিষ্য প্রভুর আজ্ঞাক্রমে টাকা কয়টি লইয়া ভিক্ষুকদ্বয়কে প্রদান করিল। চঞ্চলা সন্ন্যাসী ঠাকুরের এই ত্যাগের দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে মনে মনে ধিক্কার দিতে আরম্ভ করিল। চঞ্চলা সে দিন ত্যাগের যে দীক্ষা প্রাপ্ত হইল, জীবনে তাহা ভুলিতে পারে নাই। সন্ন্যাসী তাঁহার দত্ত দুল দুটী গ্রহণ করি-লেন না সত্য, কিন্তু চঞ্চলা গৃহে প্রত্যা-গমন করিয়া কেবল দুল কেন, সমস্ত গহনা এক বাক্সে বন্ধ করিয়া স্বর্ণকারের নিকট প্রেরণ করিলেন। স্বর্ণকারের নিকট সমস্ত ভূষণ বিক্রয় করিয়া যাহা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা এক কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে প্রেরণ করিলেন। কিন্তু আপ-নার নাম ধাম সমস্তই গোপন করিলেন। ইহারই নাম প্রকৃত দান, ইহারই নাম প্রকৃত বৈরাগ্য। দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া নরনারীগণ যে ভোগবাসনায় বিসর্জ্জন দেন, তাহাকেই প্রকৃত বৈরাগ্য বলা যায়। এজন্য সাধু বলিয়াছেন "স্বার্থ-নাশস্তু বৈরাগ্যং।" যাঁহারা কৃপণতা-বশতঃ কিম্বা নাম ক্রয় করিবার জন্য ভোগস্পৃহাকে দূরে নিক্ষেপ করেন, তাঁহারা প্রকৃত বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন না। আশা করি বেশভূষা-প্রিয় বঙ্গ-ললনাগণ এই আখ্যায়িকাটীর সার মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া স্ব স্ব জীবন তদনুসারে নিয়মিত করিবেন।

(ক্রমশঃ)

বিদেশবাসিনীর পত্র।

যাহাহউক ভগবৎপ্রসাদে, আমার শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়দিগের সদাশয়তায়, এবং রেলওয়ে গাড়ীর কল্যাণে এখন আমি পচম্বায়। পচম্বা ছোটনাগপুর

বিভাগে। ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের গিরিদি ষ্টেশন হইতে পচম্বা প্রায় ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। আমার কোনও ভক্তিভাজন আত্মীয়ের নিকটে শুনিয়াছি, এখানে পাঁচটী প্রকাণ্ড আমের গাছ থাকায় এই স্থানের নাম পচম্বা (পঞ্চাম্রা) হইয়াছে। পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থিত বলিয়া পচম্বার জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে শ্রদ্ধেয় সখা-সম্পাদক স্বর্গীয় প্রমদাচরণ সেন পচম্বায় আসিয়া ইহার অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। কিন্তু দশ বৎসর পরে আমরা এখানে অনেক পরিবর্ত্তন দেখিলাম। দুই একটী সামান্য বিষয় হইতে ইহা সকলের বোধগম্য হইবে। প্রমদা বাবু এখানে আসিয়া লাউ, কুমুড়া, ঝিঙ্গা, ব্যতীত অন্য তরকারী দেখেন নাই, কিন্তু আমরা এখানে লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, বেগুন আলু, সিম, বরবটী, মটর, কপি, ওল, কচু এবং আমাদের দেশীয় শাক সব্‌জী যথাক্রমে পাইতেছি। তবে এখানকার কচু আমাদের দেশের "মানকচু" জাতীয় নহে, "শোলা কচু" জাতীয়। প্রমদা বাবুর আসার সময়ে দুগ্ধ ঘৃত নাকি অতিশয় সুলভ ছিল, এখন কিছু মহার্ঘ হইয়াছে। যাহাহউক কলিকাতার তুলনায় এখানকার দুগ্ধ, ঘৃত, তরকারী, ফল প্রভৃতি যেমন সুখাদ্য, সেই রকম সুলভ।

এতো গেল পচম্বার সাধারণ অবস্থা। পচম্বার বিশেষত্ব এই যে পচম্বা প্রকৃতি দেবীর ক্রীড়া কানন। শ্রীযুক্ত * * * মহাশয় আমাদিগকে বলিয়াছেন যে পচম্বায় মানবের বসতি ও কৃষিকার্য্যের উন্নতি হইয়া ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য অনেক হ্রাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু এমন সৌন্দর্য্য আর কোথাও আছে কি না আমার মনে বড়ই সন্দেহ হয়! পচম্বার দিকে চাহিয়া চাহিয়া আমার মনে হয় যে, আমাদের বঙ্গদেশে (সহরের কোলাহলে, পল্লিগ্রামের ম্যালেরিয়ায়) প্রকৃতি-দেবী মনের সাধে সরলা বালিকার মত খেলিয়া বেড়াইতে পারে না—আমাদের বঙ্গভূমি—"সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শ্যামাসুন্দরী" দুঃখদারিদ্রতাপূর্ণ আঁচলে প্রকৃতি জননীকে বসাইয়া মনের মত সোহাগ করিতে পারেন না, তাই মা বাছিয়া বাছিয়া এই শ্যামল নির্জ্জনে তাঁহার ক্রীড়াকানন স্থাপন করিয়াছেন! তাই নদীনির্ঝর-নিনাদিত, বিহঙ্গ-কূজিত, পাহাড় প্রাচীর বেষ্টিত, শ্যামকান্ত বিজনে মা প্রাণ ভরিয়া খেলিয়া বেড়াইতেছেন! তাই পচম্বার বুকে এত শোভা, তাই পচম্বার শোভা এত মনোমোহিনী! এই অতুলনীয় সৌন্দর্য্য ছটা আঁকিয়া দেখাইতে পারি, সে শক্তি আমার কখনই নাই, তবে যথাসাধ্য পাঠিকা ভগিনীকে দেখাইতে চেষ্টা করিব।

এখানে আসিয়াই আমরা বিশ্রাম শিলা" এবং তাহার নিকটস্থ ঝরণা দেখিতে গিয়াছিলাম। যিনি আমার এই বিদেশ ভ্রমণের এক প্রধান সহায়, আমার

সে পরম স্নেহাস্পদ আত্মীয় অসুস্থতার জন্য সেদিন আমাদের সঙ্গী হইতে পারিলেন না। এমন আনন্দের সময়ে তাঁহাকে বাড়ীতে রাখিয়া যাইতে আমার মনটা একটু কেমন কেমন করিতে লাগিল। যাহাহউক আমরা বাড়ী ছাড়িয়া, রাস্তার উপরে উঠিয়াই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিলাম। কার্ত্তিক মাস, তথাপি দক্ষিণ দিকের আকাশের গায়ে স্তবকে স্তবকে মেঘ সকল—গাঢ় নীল রঙের মেঘ সকল সাজান রহিয়াছে! বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে সে দৃশ্য দেখিতে গিয়া শুনিলাম উহা সত্য সত্য নীল মেঘ নহে, উহা পরেশনাথ পাহাড়শ্রেণী! সেই মেঘমালা সদৃশ পাহাড় শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ চূড়াবৎ পরেশনাথের মন্দিরটী একখানি ছবির মত দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের অভিভাবক মহাশয় তাহাও আমাদিগকে দেখাইয়া দিলেন। ইহার পরেও আমরা পুনঃ পুনঃ সেই পরেশনাথ পাহাড়ের ছবি দেখিয়াছি, কিন্তু চাঁদের আলো দেখিয়া যেরূপ পরিতৃপ্তি জন্মে না, শিশুর হাসি দেখিয়া যেমন পরিতৃপ্তি জন্মে না, সেই রকম দূর হইতে পরেশনাথ পাহাড়ের ভুবনমোহন সৌন্দর্য্য দেখিয়াও আমার একটুকুও পরিতৃপ্তি জন্মে নাই! সে শোভা চিরদিনই নূতন! সূর্য্যাস্ত সময়ে সেই নীল ছটার উপরে রক্তিমবর্ণ, সোণালিবর্ণ, ফিঁকে গোলাপীবর্ণ মেঘমালা যখন খেলা করিয়াছে, দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, প্রভৃতি তিথিতে নবোদিত চন্দ্রমা যখন পশ্চাদ্বর্ত্তিনী তারাটী লইয়া হীরক মুকুটের নীচে দোদুল্যমান গজমুক্তার মত বাহার দিয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন আমরা নীরব নিস্পন্দ হইয়াই প্রকৃতির সেই মনোমোহিনী ছটা দেখিয়াছি! আর সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ঝাঁপ দিয়া পড়িবার জন্য মনে মনে পাগল হইয়া গিয়াছি! সে সৌন্দর্য্য লিখিয়া বুঝাইবার জিনিস নহে।

যাহাহউক আমরা ক্রমশঃ বিশ্রামশিলার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। পাঠিকা ভগিনী জানেন যে রেলওয়ের গাড়ীতে আমার জ্বর হইয়াছিল। তাই বিশ্রাম-শিলা দেখিবার দিনে, অভিভাবক মহাশয়ের আদেশে, বাধ্য হইয়া খানিক দূর আমাকে গাড়ীতে উঠিতে হইল। এ রকম স্থানে গাড়ীতে বসিয়া প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখা, আমার বিবেচনায় নিতান্তই "পোড়া কপালের ভোগ।" সেই জন্য আমার স্বাস্থ্যকে আমি মনে মনে বিলক্ষণ "দশ কথা" শুনাইতে লাগিলাম। তা' সৌভাগ্যক্রমে এই পোড়া কপালের ভোগ আমাকে অধিকক্ষণ ভুগিতে হইল না, খানিক দূরে গিয়া আমার স্নেহময় অভিভাবক মহাশয়, আমাকে গাড়ী হইতে নামিতে অনুমতি করেন। আমার বড়ই আনন্দ হইল—আজ্ঞাপ্রাপ্তি মাত্রে গাড়ী হইতে নামিয়া আমি বাঁচিলাম (!)। তখন সেই শ্যামল দূর্ব্বাদলপূর্ণ, গৈরিক মৃত্তিকার মাঠ দিয়া, মাঝে আম ও মোয়া ফুলের গাছ সকল দেখিতে দেখিতে,

পথে কাঁকরে ও সাদা কালো প্রভৃতি নানা বর্ণের উপলখণ্ডে "মৃদুমধুর" হোঁচট খাইতে খাইতে, আমরা বিশ্রামশিলার মাঠে উপস্থিত হইলাম। এই মাঠে প্রথমেই ব্যাঘ্র মুখাকৃতি, নরমুণ্ডাকৃতি ও কচ্ছপ পৃষ্ঠাকৃতি অনতিবৃহৎ প্রস্তর-স্তম্ভ সকল রহিয়াছে; তার পরেই বিশ্রামশিলা। বিশ্রামশিলা এক একটী অনতিবৃহৎ পাথরের বিছানা; এমন বিছানা, কত দূর ব্যাপিয়া রহিয়াছে। স্বর্গীয় প্রমদা বাবুই নাকি এই অপূর্ব্ব প্রস্তর শয্যাকে "বিশ্রাম শিলা" নাম দিয়া গিয়াছেন। এতক্ষণ পথে আমাদিগের যে টুকু শ্রান্তি হইয়াছিল, বিশ্রাম শিলার মাঠে আসিয়াই তাহা দূর হইল। আমার বোধ হইল আমি যেন কোমল মকমলের উপর দিয়া চলিতেছি; ব্যগ্র হইয়া পদ-প্রান্তে চাহিয়া দেখিলাম, এখানে এক জাতীয় পার্ব্বত্য শৈবাল জন্মিয়াছে; মকমলের উপর দিয়া চলিতে লাগিলে মানব যেমন আরাম লাভ করে, এই পার্ব্বত্য শৈবালের উপরে পাদুকাবিহীন পদে চলিতে লাগিলেও সেই রকম আরাম পাওয়া যায়! প্রমদা বাবু অল্প-বয়স্ক হইলেও একজন ভগবৎভক্ত সাধু ছিলেন। তাই তিনি এ সুখশয্যার নাম "বিশ্রাম শিলা" রাখিয়া গিয়াছেন! এ বিশ্রাম শিলা, সত্য সত্যই বিশ্রামশিলা। সত্য সত্যই মা' বিশ্ব জননী তাঁহার শ্রান্ত ক্লান্ত সন্তানদিগের আরামের জন্য স্বহস্তে এই প্রস্তর শয্যা রচনা করিয়াছেন। এখানে আসিয়া আমার প্রাণ কৃতকৃতার্থ হইল! হৃদয়ের উচ্ছ্বসিত আনন্দে আমার সঙ্গী বালকেরা কেহ বিশ্রাম-শিলার উপরে শুইয়া পড়িল, কেহ উল্টা বাজী খেলিবার মত গড়াগড়ি দিতে লাগিল; আমারও বড় সাধ হইল, মা'র স্বহস্ত রচিত এমন সুখশয্যায়, এই স্নিগ্ধ "পশ্চিমে বাতাস" রূপ অঞ্চল সঞ্চালনে, অদূরবর্ত্তী নির্ঝর স্রোতের মধুমাখা গীত শুনিতে শুনিতে, দিগন্তপ্রসারিত নীল আকাশের তলে শয়ন করিয়া, একবার প্রাণের প্রাণে এই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টিকারিণীকে গাঁথিয়া ফেলি! সেই সৌন্দর্য্যসাগরে ডুবিতে না পারিলে এ সুন্দর জগতে কিছুতেই পরিতৃপ্তি নাই!

বিশ্রাম-শিলার অনতিদূরে শালবন। শালবন দেখিতে যাইবার সময়ে আমরা চারিদিকের শস্যক্ষেত্রগুলিও দেখিলাম। যিনি বঙ্গভূমির হরিৎবর্ণ ধান্যক্ষেত্র প্রভৃতি দেখিয়াছেন, তিনি যে এ দেশের শস্যক্ষেত্রের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইবেন, আমি এমন ভরসা করি না। এখানে স্থানে স্থানে শস্যক্ষেত্র যাহা দেখিলাম, তাহা বঙ্গীয় পল্লিগ্রামের তুলনায় অল্প। যাহাহউক মাঝে মাঝে এক একখানি শরগুজার ক্ষেত্র * দেখিয়া আমার মনে হইল প্রকৃতি দেবী তাঁহার সবুজ বারাণসী শাড়ীর সোণার আঁচলটী এইখানে

* শরগুজা এক প্রকার শস্য। ইহা হইতে পশ্চিমবাসীরা তৈল প্রস্তুত করে। এ তৈল কতকটা সরিষা তৈলের মত।

বিছাইয়া দিয়াছেন! সোণালী রঙের ফুল সকল ফুটিয়া ক্ষেত্র যেন আলো করিয়াছে! আমার পল্লিগ্রামবাসিনী ভগিনী যদি সরিষার ও শণের ফুল-ভরা বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র দেখিয়া থাকেন, তবে পশ্চিমের গোরগুজা ফুলের ক্ষেত্র-শোভাও তিনি অনেকটা বুঝিতে পারিবেন।

শালবনে প্রবেশ করিবার সময়ে আমার মনে বিলক্ষণ একটু "সৌভাগ্য-গর্ব্ব" উপস্থিত হইল। কারণ ইতিপূর্ব্বে দেশে আমি শালের কড়িকাঠ, শালের খাট, তক্তাপোষ, শালের বাক্স প্রভৃতির সহিত বিশেষ পরিচিতা ছিলাম। অধিক কি, দেশে শালকাঠের প্রতিপত্তি দেখিয়া মানবজগতের গ্লাডষ্টোনের মত, বৃক্ষজগতে শালবৃক্ষের একটা যে ভারী বিশেষত্ব আছে, এ বিষয়ে আমি সন্দেহ-শূন্যা। তাই এত দিনে শালবন দেখিতে পাইয়া আমি আমার সৌভাগ্য অনুভব করিতে লাগিলাম। এ বনের বৃহৎ বৃক্ষ সকল লোকে প্রয়োজনার্থ কাটিয়া ফেলিয়াছে; এখন অনতিবৃহৎ, নধর, সরল শালতরু সকল স্নিগ্ধ ছায়া বিস্তার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। শালবনে প্রবেশ করিয়াই নির্ঝরের অস্ফুট শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। আর একটু অগ্রসর হইয়া নির্ঝরের অপূর্ব্ব কান্তি দেখিতে পাইলাম! সেখানে দেখি যে, দুর্ভেদ্য প্রস্তররাশি ভেদ করিয়া "গোঁ গোঁ সোঁ সোঁ" রবে প্রবহমান জলরাশি বহিয়া যাইতেছে! সে যেন দ্রবীভূত হীরক-স্রোত ছুটিয়াছে! সে যেন মানব-শ্রুতির অবোধ্য স্বর্গীয় গীতি গাহিতে গাহিতে দিগ্‌দিগন্তে চলিয়াছে! আমরা সেই পবিত্র অমৃতময় জল লইয়া মুখে চোখে দিলাম; সে জলের স্নিগ্ধতা যেন আমাদের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করিয়া অন্তরাত্মাকেও স্নিগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করিল। সেই সময়ে একটী বালকণ্ঠ নিঃসৃত ভগবদ্বিষয়ক অমৃতমাখা গীতি শুনিতে শুনিতে আমার হৃদয় দ্রবীভূত হইয়া গেল! আমার ইচ্ছা হইল আমি একবার প্রাণ খুলিয়া ডাকিয়া বলি "মা! বিশ্বজননি! তুমি আমার সুখের জন্য এত খাটুনি খাটিলে, আমি তোমার জন্য কি করিলাম? এ অকৃতজ্ঞ, হৃদয়হীন অধম সন্তানের জন্য এতটা খাটুনি কেন তুমি খাটিলে মা?"

ইহার পরে আমরা বাড়ীতে ফিরিলাম।

(ক্রমশঃ)

পুণ্ডরীক কাহিনী।

পণ্ডর পুরেতে বাস দ্বিজ একজন,
পুত্র আশে ভার্য্যা সনে পূজে নারায়ণ;
কত দিন পরে তবে প্রসাদে ধাতার,
জন্মিল সুন্দর পুত্র, উজলি আগার।

পিতা মাতা দিলা তারে "পুণ্ডরীক" নাম,
দিনে দিনে বাড়ে শিশু, পূর্ণ মনস্কাম।
পুণ্ডরীক, মা বাপের নয়নের তারা,
পলকে প্রলয় জ্ঞান, হ'লে আঁখি-হারা

এইরূপে শিশুকাল, বাল্যকাল গেল,
তরুণ যৌবন তবে যথাকালে এল ;
মধুমাসে তরু যথা নবীন নধর,
তেমনি বরাঙ্গ তার হইল সুন্দর !
উৎসাহ, উদ্যম, স্ফূর্ত্তি, উঠিল জাগিয়া,
সুখের পিপাসা দিল প্রাণ মাতাইয়া,
তাই হায় ! ধর্ম্মজ্ঞান করি বিসর্জ্জন,
পাপাচারে পুণ্ডরীক ঢেলে দিল মন !
ত্যজিল সে পবিত্রতা, মা'-বাপে ভকতি,
পাপে বুদ্ধি, পাপী সঙ্গী, পাপ কাজে মতি,
নাহি শোনে মাতা পিতা শিক্ষা দেন যত,
সে অবাধ্য অবিনীত কদাচারে রত !
এক দিন ভাসি মাতা নয়নের জলে,
ধরিয়া পুত্রের করে স্নেহভাবে বলে,
"তুই বাপ পুণ্ডরীক ! অঞ্চলের ধন,
এ দশা দেখিয়া তোর, বিদরিছে মন !
আমার মাথার কিরে, দিব্য দেবতার,
আজি হ'তে পাপ কাজ করিওনা আর।"
অমৃত ঔষধ যাহা, এ মর ধরায়,
মৃত্যুকালে রোগী তাহা ভয়ে নাহি খায়,
তেমনি মায়ের সেই পীযূষ বচন,
না শুনিল পুণ্ডরীক নাহি দিল মন ;
দুঃখিত অন্তরে পিতা কত গালি দিল,
তথাপি সে কোন মতে পাপ না ছাড়িল।
বিষম কুবাক্যে আর রুক্ষ ব্যবহারে,
মা বাপের ব্যথা দিল অশেষ প্রকারে ;
তুচ্ছ সুখ তরে হায় ! অমূল্য জীবন,
করিল এমনি ক'রে পাপে নিমগন ;
মা বাপের প্রাণে দিয়া দারুণ বেদনা,
না হইল অভাগার একটু চেতনা।
একদিন পুণ্য যোগে আনন্দিত মনে,
চলিল অনেক লোক কাশী দরশনে ;
পিতা মাতা সনে আর প্রতিবাসিগণ,
পুণ্ডরীক কাশী পথে করিল গমন।
কত দূরে যেতে যেতে আসিল রজনী,
আঁধার বসনে মুখ ঢাকিল ধরণী ;
সম্মুখে দেখিয়া এক সাধুর ভবন,
তাহারি নিকটে সবে করিল শয়ন ;
একে একে সকলেই পড়িল ঘুমিয়া,
শুধু একা পুণ্ডরীক রহিল জাগিয়া ;
নিদ্রা নাহি আসে তার তাই আন মনে,
নিরখিছে চারিদিকে চকিত নয়নে।
হেন কালে কৃষ্ণবর্ণা তিনটী যুবতী,
জলের কলস শিরে মৃদু মৃদু গতি ;
সাধুর আশ্রমে তারা করিল গমন,
নিরখিয়া পুণ্ডরীক সকৌতুক-মন,
কত ক্ষণে বামাগণে আসিল ফিরিয়া ;
অপূর্ব্ব জ্যোছনাময়ী মুরতি ধরিয়া ;
পবিত্র রূপের ছটা উঠেছে উথলি,
দেখিলেই মনে হয় দেববালাবলি !
হেরিয়া বিস্ময় মনে পুণ্ডরীক উঠি,
প্রণাম করিল গিয়া ভূমিতলে লুটি ;
যুড়িয়া যুগল কর ভক্তিভাবে কয়,
"কা'রা মা ! তোমরা, দাসে দেহ পরিচয় ?"
হাসি মুখে উত্তরিলা সে তিন যুবতী,
"আমরা যমুনা, গঙ্গা, আর সরস্বতী।"
শুনি পুণ্ডরীক পুন করে নিবেদন,
"এত রাত্রে এখানে মা, কিবা প্রয়োজন ?
দেখিনু যখন সবে আশ্রমে চলিলে,
তামসী নিশার মত কৃষ্ণবর্ণা ছিলে,
এবে যে রজত-শুভ্র, বরাঙ্গ-বরণ,
জানিতে বাসনা মম ইহার কারণ।"

দেবীগণ বলে "এই সাধু সদাশয়,
পিতা-মাতা-পদ সেবে সকল সময়।
আমাদের জলে গিয়া স্নান দান করে,
না পায় সে অবসর, এককক্ষণ তরে;
তাই মোরা নিজে আসি এ দেব-আশ্রমে
পরাণ পবিত্র হয় সাধু-সমাগমে।
লক্ষ লক্ষ মহাপাপী স্নান করি যায়,
তাই মোরা সারা দিন থাকি কৃষ্ণকায়;
কিন্তু পিতা-মাতা-ভক্ত এই সাধু জন,
এঁর পুণ্য অঙ্গ যবে করি পরশন,
পুন আমাদের দেহে দেব-জ্যোতিঃ আসে,
বলিনু সকল কথা তোমার সকাশে।
তুমি যদি পুণ্ডরীক! চাহ দিব্য গতি,
জনক-জননী-পদে রাখিও ভকতি;
মাতা পিতা পূর্ণ ব্রহ্ম এ মর ধরায়,
সে পদ পূজিলে নরে শুভ গতি পায়!"
এত বলি দেবীগণ হৈল অন্তর্দ্ধান,
কথা শুনি চমকিল পুণ্ডরীক-প্রাণ!
পিতৃ-মাতৃ-দ্রোহী সেই ব্রাহ্মণ-কুমার,
দেবীগণ বাক্যে হিয়া গলিল তাহার!
ঘুমন্ত মানব যেন উঠিল জাগিয়া,
অনুতাপে অশ্রু পড়ে কপোলে বহিয়া;
মনে মনে পুণ্ডরীক ভাবে সেই ক্ষণ,
"সর্ব্ব পুণ্যতীর্থ পিতা মাতার চরণ!
অধম পামর আমি মহাপাপে রত,
মা' বাপের বুকে সদা ব্যথা দেই কত!
জনমিনু পুণ্য কুলে আমি কুলাঙ্গার,
কি উপায় হবে হায়! এই অভাগার!!
আজি হ'তে পাপ কাজ সমূলে ছাড়িব,
মা'-বাপ-সেবার তরে জীবন সঁপিব।
পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত সুতে করিয়া করুণা,
ঘরে আসে সরস্বতী জাহ্নবী যমুনা—
দেবীরা পবিত্র হয় যে নরে পরশি,
মাথায় করিয়া বহে জলের কলসি!
ইহার অধিক ফল কিসে কেবা পায়?
কি তুচ্ছ পুণ্যের লোভে অন্য তীর্থে যায়!"
ইহা ভাবি মা বাপেরে সঙ্গেতে লইয়া,
পুণ্ডরীক নিজ বাসে আসিল ফিরিয়া।
তদবধি পাপ কাজ সকলি ছাড়িল,
মাতা-পিতা-সেবা তরে জীবন সঁপিল।
সে চরণ সেবা বিনা অন্য নাহি মনে,
মা' বাপেই পুণ্ডরীক দেখে নারায়ণে।
এইরূপে কিছু দিন হ'ল অবসান,
সাধনা হেরিয়া তার, তুষ্ট ভগবান;
ভকতের ভকতির পরীক্ষার তরে,
আসিলা করুণাময় পুণ্ডরীক-ঘরে।
ভক্তিমান্ পুণ্ডরীকে দেখিলা শ্রীহরি,
পিতা-মাতা-পদ সেবে আপনা পাসরি;
হরি-আগমনে গৃহ পূরিত গৌরবে—
অপূর্ব্ব স্বর্গীয় জ্যোতি, অমৃত সৌরভে!
সবিস্ময়ে পুণ্ডরীক ফিরি চাহে পাশে,
দেখিল ত্রিদিব ছটা, গৃহমাঝে ভাসে!
চাহিয়া চিনিল প্রভু সাধক বৎসলে,
ভরিল যুগল আঁখি প্রেম-অশ্রু জলে!
কিন্তু পিতা-মাতা-সেবা তবু না ছাড়িল,
হাত বাড়াইয়া এক ইষ্টক আনিল;
বিশ্বনাথে দিয়া সেই ইষ্টক-আসন,
পুনঃ মাতা পিতা সেবে হ'য়ে একমন।
রেখে সে ইটের প'রে চরণ কমল,
রহিলেন দাঁড়াইয়া ভকত-বৎসল!
বহুক্ষণে পুণ্ডরীক সেবা সমাপিল,
তবে ভগবান্-পদে প্রণাম করিল!

হেরি সে ভকতি, সেবা, প্রীত হয়ে অতি,
"বর লহ পুণ্ডরীক" বলে বিশ্বপতি।
পুণ্ডরীক বলে "প্রভো, কি চাহিব আর,
এমনি দাঁড়িয়ে থা'ক, সম্মুখে আমার।
সদা পিতা-মাতা-সেবা করিতে করিতে,
ও রাঙা চরণ যেন পাই নিরখিতে।"

ভকত-অধীন হরি ভকত-পরাণ,
"তথাস্তু" বলিয়া দিলা সেই বরদান!
সিদ্ধ হৈল পুণ্ডরীক মহাসাধনায়,
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডনাথে সদা দেখা পায়!
যেখানে সে পুণ্যবান্ হ'ল সিদ্ধকাম,
এ ভারতে সে নগর "পুণ্য-ক্ষেত্র" নাম।

শ্রীমা।

নূতন সংবাদ।

১। মহারাজ কুমার বিনয়কৃষ্ণ বাহাদুরের রাজভবনে গত ২৫এ চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সাংবৎসরিক উৎসব অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। অনারেবল রমেশ চন্দ্র দত্ত সভাপতির কার্য্য করেন। বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক সুন্দর বক্তৃতা দ্বারা সহস্র সহস্র লোককে মোহিত করিয়াছেন। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে এই সভা চিরজীবিনী হইয়া বঙ্গভাষার উন্নতিসাধনে সমর্থ হউন।

২। ভূতপূর্ব্ব সামরিক সেক্রেটারী সার জর্জ চেসনী ৬৫ বৎসর বয়সে হঠাৎ গতায়ু হইয়াছেন।

৩। কলুটোলার বাবু গোপাললাল শীল শিবপুর ভড়পাড়া খালের পুলের জন্য ৩০ হাজার টাকা দান করিয়াছেন এবং এই কার্য্যের জন্য গবর্ণমেন্ট হইতে ধন্যবাদ পাইয়াছেন।

৪। চিত্রলের উমার খাঁর সহিত গবর্ণমেণ্টের ঘোরতর যুদ্ধ বাধিয়াছে। ইতিমধ্যে ইংরাজ পক্ষে ৭০ জন, বিপক্ষদিগের ৫০০ লোক হত হইয়াছে শুনা যায়।

৫। কাবুলের আমীরের মধ্যম পুত্র নজরুল্লা খাঁ এই মাসেই বিলাত যাত্রা করিতেছেন।

৬। মহারাণী বিক্‌টোরিয়ার রাজত্ব কালের মধ্যে ৮০০ লোকের না কি প্রাণদণ্ড হইয়াছে। অকলঙ্ক রাজত্বের এ বড় কলঙ্ক। মহারাণী কি করিবেন, আইনের বাধ্য!!

৭। জাপানের যে যুবক চিন রাজদূত লিহংচকে গুলি করিয়াছিল, তাহার যাবজ্জীবন কারাবাস দণ্ড হইয়াছে।

৮। জাপানীরা দুইবার অকৃতকার্য্য হইয়া তৃতীয় বারের চেষ্টায় ফর্ম্মোসা দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন।

বামারচনা।

বসন্তে শৈশব-স্মৃতি।

মূর্ত্তিমান সুবসন্ত বিরাজিত তথা,
প্রাণ পুলকিত হয় ভাবিয়া সে কথা।
আমার আনন্দ ধাম,
ছোট খাট পল্লীগাম
নগরের হাব ভাব বিলাস সভ্যতা ;

২

নগরের কোটা বাড়ী গাড়ী ঘোড়া সব।
সহরের সাজ সজ্জা অতুল বিভব ;
সহরের মহা রোল,
সহরের গণ্ডগোল,
নাহি সেথা স্বার্থপর মানবের রব।

৩

সেখানে এ কিছু নাই—সব স্বতন্তর।
নির্জ্জনতা চারিদিকে বাঁধিয়াছে ঘর।
পুকুরের চারিধারে
বটগাছ শোভা করে
সুমিষ্ট রসাল তরু বাড়ীর ভিতর।

৪

পরিষ্কার পুকুরটী তটে বট গাছ,
সমান সমান তায় জল আর মাছ।
হাত-জালী লয়ে করে
সাঁজ বেলা মাছ ধরে
সরলা কৃষক-বালা স্বরগের ছাঁচ।

অদূরে হরিৎক্ষেত্রে মৃদুল কিরণ
ধীরে ধীরে স্নিগ্ধকারী বহে সমীরণ।
বাড়ীর পশ্চিমে গাছে
শিরিষ কুসুম আছে
প্রস্ফুটিত সুবাসেতে আকুল জীবন।

৬

ছোট বড় অনেক রয়েছে তরুচয়,
বসন্ত পরশে সবে নব শোভাময়।
সন্ধ্যা বেলা দাঁড়াইয়ে
চারিদিকে নিরখিয়ে
জুড়াইত প্রাণ দেখি নব কিশলয়।

৭

বাড়ীর দুদিকে আছে মাঠ মনোহর।
অন্যদিকে কয়খানি কৃষকের ঘর।
পূর্ব্বদিকে সরোবর
চিরপূর্ণ কলেবর
আনন্দে খেলিছে সেথা কত জলচর।

৮

কিছু দূরে মাঠ মাঝে ঝোপ পারা বন।
বন ফুলে আলো করে রয়েছে এখন।
ভৃত্যবৎ সমীরণ
আমাদের অনুক্ষণ
কুসুম সুরভি লয়ে করিত ব্যজন।

৯

জাগে মনে থেকে থেকে সে পুরাণ কথা
মধুর সে ঘ্রাণ পেয়ে বলিতেন পিতা।
'সুশী' মা গো গন্ধ পা'স?
আসিছে কি যে সুবাস,
সুরভি পবন আনে মনে পবিত্রতা।

১০

বট বৃক্ষে কোকিল কোকিলা প্রাণ খুলি,
ডাকে পরস্পরে সুমধুর তান তুলি।
কোকিল বলিছে আয়,
কোকিলাও তাই গায়,
মাতায় জগৎ প্রাণ সুমোহন স্বরে।

১১

হাত ধরাধরি করি দুই বোনে মিলে
বেড়াতাম চারিদিকে কত হেসে খেলে।
শৈশবের সরলতা
শৈশবের পবিত্রতা
শৈশবের স্নেহ মাখা আনন্দেতে গলে।

শ্রীমতী সুশীলাবালা সিংহ।

মরণ।

জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহিনা আর,
কে জানে কেমন কোথা
মরণের পর পার?
এখানে যেমন দুঃখ
সুখও তেমনি আছে,
হৃদয় ডুবিয়া থাক্
অতীত স্মৃতির মাঝে।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মম,
মরণ কি হবে কভু
এমন প্রাণের সম?
অথবা চাহিনা সুখ
হউক দগধ হিয়া,
হৃদয় করিব সুখী
পরসুখ নিরখিয়া।
ভাসিতে দিবনা কভু
হৃদয়ে পাপের ছায়া,
ভরিব পরাণ টুকু
পরার্থপরতা দিয়া।
জগতে এসেছি যদি
মরণ চাহিনা আর,
করিব পরাণ ভরি
জগতের উপকার।
দয়া মায়া স্নেহ সুখ
এখানে সকলি মম,
মরণ হবে কি কভু
এমন প্রাণের সম?

শ্রীঅম্বুজা সুন্দরী দাস গুপ্ত।